ব্ল্যাক বুদ্ধ



রবিন জামান খান

ব্ল্যাক বুদ্ধা

রবিন জামান খান

একটি বইরাগ পাবলিকেশন উদ্যোগ



প্রথম ইবুক প্রকাশ – ডিসেম্বর, ২০২০

প্রচ্ছদ- ইন্দ্রনীল ব্যানার্জি
প্রকাশক – বইরাগ পাবলিকেশন, কলকাতা

www.boiraag.in

contact@boiraag.in

সময়: ১৮০ খ্রিস্টপূবার্ব্দ। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন আর শুঙ্গ বংশের উত্থানের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষ যখন ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম গণহত্যায় উত্তাল, এমনি এক বিক্ষুব্ধ সময়ে অপহৃত হলো তিব্বতের সবচেয়ে বড় মঠের প্রধান লামা। তাকে উদ্ধার করতে ভারতবর্ষের মাটিতে পা রাখলো তিব্বতের সেরা যোদ্ধাদের একজন। অন্যদিকে, বর্তমান সময়ে আসাম থেকে রিসার্চ প্রজেক্ট শেষ করে দেশে ফেরার পথে গায়েব হয়ে গেল শাবিপ্রবি'র একজন শিক্ষক। তাকে খুঁজে বের করতে সিলেট পাঠানো হলো অফিসার তানভীর মালিককে। একদিকে সিলেট শহরকে ঘিরে পুরনো ব্যক্তিগত তিক্ততা, অন্যদিকে ফিল্ড লেভেলে কাজের অনভিজ্ঞতায় দিশেহারা তানভীর মালিক প্রতি পদে হোঁচট খেতে-খেতে যখন প্রায় রহস্য উন্মোচনের দ্বারপ্রান্তে তখুনি সে আর তার আপারেটিভ টিম জানতে পারলো অতীত আর বর্তমানের এই জটপাকানো ঘটনার মূল নিহিত আছে এমন এক বিন্দুতে যেখানে অবস্থান করছে দুই হাজার বছরের পুরনো এক রহস্য- মানব সভ্যতা যাকে বুদ্ধের অন্ধকার অবতার নামে জেনে এসেছে।

'২৫শে মার্চ' ও 'সপ্তরিপু' খ্যাত রবিন জামান খানের নতুন হিস্টোরিক্যাল থ্রিলার 'ব্ল্যাক বুদ্ধা'- ধর্ম, গোত্র, লোভ, বিশ্বাসঘাতকতা আর ক্ষমতার লড়াইয়ের এক বিস্তৃত উপাখ্যান, যেখানে অতীতের পাপাচার সংজ্ঞায়িত করে চলেছে বর্তমান সংশয়কে।

সূচিপত্র

পূর্বকথা

১৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ

বিহার, ভারতবর্ষ

মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্র থেকে শত ক্রোশ দক্ষিণ পূর্বে

অসীম শূণ্যতার পানে তাকিয়ে থাকার মাঝে সবসময়ই অন্যরকম এক অনুভূতি কাজ করে।

প্রাসাদের বিরাট জানালা দিয়ে শূণ্যের দিকে তাকিয়ে ভিন্ন সেই অনুভূতির খোঁজ করার চেষ্টা করছে মৌর্য সাম্রাজ্যের বর্তমান সম্রাট বৃহদ্রথ। তবে কেন জানি মনের গহীন কোনে ভালো কোন অনুভূতি কাজ করছে না। বরং অদ্ভুত সব শঙ্কা আর আর আকাঙ্খার মিশ্র এক অনুভূতি মনের ভেতরে হানা দিয়ে যাচ্ছে বার-বার।

প্রাসাদের কামরাটা বিরাট হলেও জানালাটা কেন জানি সেই তুলনায় ছোট মনে হচ্ছে সম্রাটের কাছে। সেই আফগান ভূমি থেকে শুরু করে সিংহল পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট সাম্রাজ্যের অধিপতি হবার পরও নিজের রাজধানি পাটলিপুত্র থেকে কখনোই খুব বেশি বের হয়নি সে। কিন্তু এবার বের হতে হয়েছে, অনেকটা বাধ্য হয়েই। রাজা তো আর জানে না, নিজের নিয়তিই তাকে টেনে নিয়ে এসেছে এই প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকায়।

জানালার সামনের ছোট পরিসরে পায়চারি করতে-করতে মনে-মনে সে হিসেব করতে লাগলো, কতোদিন পর নিজের প্রাসাদ ছেড়ে বের হয়েছে। আঙ্গুলের কড় গুনে দেখলো, সাত বছর। সিংহাসনে বসার পর একবারও নিজের রাজধানি ছেড়ে বের হয়নি সে। আবারো জানালার সামনে এসে থেমে গেল সম্রাট।

দূর-দুরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত পাহাড় দেখা যাচ্ছে। দিগন্তের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত এক তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে। কারণ যেদিকেই সে দৃষ্টি প্রসারিত করুক, আর যতো দূরেই করুক; ততোদূরেই নিজের মৌর্য সাম্রাজ্য বিস্তৃত। এ এক অন্যরকম অনুভূতি। পৃথিবীর ইতিহাসে হাতে গোনা খুব অল্প ক'জন মানুষই এই সুখানুভূতি অনুভব করতে পেরেছে। এরকম মানুষ পৃথিবীতে খুব কমই এসেছে, যেদিকে তাকাবে সমস্ত কিছুর মালিক সে। এই অনুভূতি সম্ভবত দু'ধরণের মানুষ টের পেয়ে থাকে।

পাগল, আর না হয় সত্যিকারের সম্রাট। বৃহদ্রথ হলো সত্যিকারের সম্রাট।

আজ থেকে শতবর্ষেরও বেশি সময় আগে তার পূর্বপুরুষদের একজন- রাজা চন্দ্রগুপ্ত ও তার ধূর্ত উপদেষ্টা চাণক্য মিলে গোড়াপত্তন করেছিল এই বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্য।

সে-সময়টাও ছিল এখনকার মতোই বিক্ষিপ্ত। একদিকে বিশ্বজয়ি গ্রীক রাজা আলেকজান্ডারের বাহিনীর আক্রমণে বিপর্যস্ত উপমহাদেশ, অন্যদিকে স্থানীয় রাজনীতির বিষে বিষাক্ত স্থানীয় পরিবেশ। ঘোলা জলের মতো ঘোলাটে সেই সময়ের সঠিক ব্যবহার করে ঠিকই মাছ শিকার করতে পেরেছিল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। এরপরে এসেছে সম্রাট আশোক, তারপর অন্যরা। সময়ের সাথে সাথে শুধু বিস্তারই ঘটেছে মৌর্য সাম্রাজ্যের। বেড়েছে রাজ্যের আকার, বদলে গেছে শাসন ব্যবস্থা, বদল হয়েছে ধর্মের। বদলায়নি শুধু সেই ক্ষমতার খেলা। সেটা তখনো যেমন ছিল, এখনো ঠিক তেমনিই আছে। ওটা সম্ভবত সবসময় একইরকম থাকে।

তবে পরিস্থিতি বদলে গেছে এইমুহূর্তে। আবারো ফিরে এসেছে গ্রীকরা। চানক্যের পরামর্শ অনুযায়ী বৃহদ্রথের প্রপিতামহ রাজা চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকদের আক্রমণকে অভিশাপ থেকে আশির্বাদে রূপান্তর করতে পেরেছিল। আলেকজান্ডারের বিক্ষিপ্ত সেনাবাহিনী যখন পশ্চাৎ পদসারণ করতে শুরু করেছে, সেই সুযোগে তাদের ফেলে যাওয়া রাজ্য একের পর এক সে দখল করে বিস্তার করতে থাকে নিজের সাম্রাজ্য। সেইসাথে রচনা করতে থাকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে সবচেয়ে শক্তিশালী মৌর্য সাম্রাজ্যের ভিত।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রচিত ভিতের ওপরেই মহীরূহ বিস্তার করেছে আশোক। চন্দ্রগুপ্ত উত্তর-পশ্চিম থেকে শুরু করে মধ্য ভারত পর্যন্ত দখল করেছিল। এরপরে আশোক তার প্রভাব বিস্তার করেছিল দক্ষিণে একেবারে কলিঙ্গ পর্যন্ত। যদিও কলিঙ্গের সেই রক্তের ধারা শুধু দয়া নদীর জলই লাল করেনি, রক্তাক্ত করেছিল অশোকের হৃদয়কেও। আর তাই সে ধর্মান্তরিত হয়ে গ্রহণ করে নেয় বৌদ্ধ ধর্মকে। বাকি জীবন সে শুধু শান্তির বাণীই প্রচার করে গেছে। তবে অশোকের শাসন শেষ হয়েছে আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। এখন বৃহদ্রথের সময়।

তবে এমন এক সময় বৃহদ্রথ রাজা হয়েছে যখন মৌর্য সাম্রাজ্যের আকাশে ঘোর বিপদের ঘনঘটা। পশ্চিম ইউরোপ থেকে আরো বেশি শক্তি আর সামর্থ্য নিয়ে ফিরে এসেছে গ্রীকরা। প্রথম-প্রথম শুধুমাত্র উড়ো-উড়ো কথাই কানে এসেছিল তাদের। এমনকি মৌর্য 'গুপ্তচর'রাও সঠিক কোন খবর দিতে পারেনি। তবে সব উড়ো খবরই হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতে সত্যিটা একেবারে চাক্ষুষ সামনে চলে এলো যখন গ্রীসের ব্যাকট্রিয়ার রাজা ডিমিট্রিয়াস মৌর্য সাম্রাজ্যের সবচেয়ে উত্তরের এলাকা কাবুল ঝড়ের গতিতে দখল করে নিলো।

ডিমিট্রিয়াসের আক্রমণে বিপর্যস্ত কাবুলের খবর বিহারের পাটলিপুত্রে এসে পৌছানোর সাথে সাথে বৃহদ্রথ তার উপদেষ্টাদের নিয়ে বসে কী করবে না করবে সেটা ঠিক করার আগেই ডিমিট্রিয়াসের বাহিনী এক ধাক্কায় একেবারে পাঞ্জাব পর্যন্ত দখল করে ফেলে। হই-হই রব ওঠে, কী করতে হবে, কিভাবে করতে হবে। কারো বুদ্ধি আর পরামর্শের কোন আগা-মাথা নেই। এরকম পরিস্থিতিতে রাজাকেই হতে হয় সবচেয়ে কৌশলি আর সাহসি। সকল বিপদ আর শঙ্কার রাশ টেনে ধরে যে-রাজা পরিস্থিতি সামলাতে পারে সে-ই হয়ে

ওঠে মহান রাজা। কিন্তু ওরকম পরিস্থিতিতে সঠিক নেতৃত্ব দিতে একরকম ব্যর্থই হয় বৃহদ্রথ। তার ওপরে সে সবচেয়ে বেশি ঘাবড়ে যায় যখন জানতে পারে রাজকোষে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ যথেষ্ট নয়।

বহু আগে কে বা কারা বলেছিল, যুদ্ধ আসলে সৈনিকেরা জেতায় না, যুদ্ধ জেতায় অর্থ। কথাটা সঠিকের চেয়েও বেশি সঠিক।

ফাঁকা রাজকোষ দেখে বৃহদ্রথের মাথা গরম হয়ে ওঠে। যুদ্ধ চালানোর জন্যে চাই তাল-তাল অর্থ, আর সেখানে কিনা তার অর্থমন্ত্রী খবর নিয়ে এসেছে, রাজকোষ একরকম ফাঁকাই বলা চলে। এবার কি হবে?

একদিকে ডিমিট্রিয়াসের আক্রমণে বিপর্যস্ত সাম্রাজ্য, অন্যদিকে সেনাবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা, তার ওপরে আবার ফাঁকা রাজকোষ। রাজা বৃহদ্রথ যে-কিনা কোনদিনই কোন শক্ত পরিস্থিতি মোকাবেলা করেনি তার জন্যে এ-তো নরকসম পরিস্থিতি। আগে রাজা যেখানে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত বলতে গেলে আয়েশ করেই সারাদিন কাটাতো সেখানে তার আয়েশ-আরাম তো দূরে থাক নাওয়া-খাওয়াই উঠে যাবার জোগাড় হয়। পায়ের তালু থেকে শুরু করে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত গরম হয়ে থাকে সর্বক্ষণ। এরকম পরিস্থিতিতে হঠাৎ একজন উপদেষ্টার পরামর্শ শুনে খানিকটা ভরসা পায় বৃহদ্রথ। উপদেষ্টার বাতলে দেয়া পরামর্শটা তার কাছে একেবারেই সময়োপযোগী মনে হয়। যদিও এর মধ্যে খানিকটা গোলমাল আছে।

কী সেই পরামর্শ? নিজের রাজধানি পাটলিপুত্র ছেড়ে বেরুতে হবে তাকে। জন্মের পর থেকেই বিরাট সাম্রাজ্যের অধিপতি হলেও কখনোই নিজের এলাকা আর নিজের রাজ্য ছেড়ে বেরোয়নি রাজা বৃহদ্রথ। তাহলে এরকম বাজে পরিস্থিতিতে কেন তাকে বেরুতে হবে। বেরুতে হবে কারণ তার এলাকা বিহার থেকে কিছুটা দূরে বহু পুরনো এক নগরী আছে।

হাজার বছরের পুরনো এই নগরীকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় ‘খান্ডাল’ অর্থাৎ পরিত্যক্ত এক নগরী। বিরাট মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজা বৃহদ্রথ নিজের সমৃদ্ধ নগরী পাটলিপুত্র ছেড়ে এই অসময়ে খান্ডালে কেন আসবেন। এর পেছনেও কারণ আছে। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে স্থাপিত হাজারো বছরের পুরনো এই নগরীর বিরাট ইতিহাস আছে।

বহু আগে অযোধ্যার রাজা হারিতের সময়ে স্থাপন করা হয়েছিল এই নগরী। হারিত ছিল ভারতবর্ষের সবচেয়ে বিখ্যাত রাজা হরিশচন্দ্রের বংশধর। যদিও তার জন্ম ইতিহাস অত্যন্ত পাপময়, তবে তার হাতেই গোড়াপত্তন ঘটেছিল এই নগরীর। কথিত আছে, প্রাচীন দেবতাদের সবচেয়ে কুখ্যাতদের একজন- কুবেরের হাত থেকে নিজের বিরাট ধনসম্পদ রক্ষা করার জন্যে আরেক দেবী গোমুখীকে উৎসর্গ করে বিশেষ কায়দায়-বিশেষ জায়গায় স্থাপন করা হয়েছিল এই নগরী।

সৃষ্টির আদি থেকেই এটা যেখানে যেভাবে তৈরী করা হয়েছিল সেভাবেই রয়ে গেছে। কেউ এতে হাত দিতে পারেনি। কথিত আছে স্বয়ং দেবী গোমুখী এই নগরী আর এর বিপুল ধনরাশির সুরক্ষা করে।

হাজার বছর ধরে এই নগরীর অভ্যন্তরে কোথাও না কোথাও লুকানো আছে রাজা হারিতের বিরাট ধনসম্পদের একাংশ। তবে হাজার বছর ধরেই অনেকে চেষ্টা করেছে সেটা উদ্ধার করার, কেউই পারেনি। বহু রাজা আর তাদের বাহিনী চেষ্টা করেও বের করতে পারেনি এই নগরীর লুকানো রহস্য। বরং ধ্বংস হয়ে গেছে নিজেরাই।

এরপর থেকে কঠিনভাবে এই নগরী এড়িয়ে চলে সবাই। বিশেষ ক'রে স্থানীয় উপকথা বলে, এই নগরীতে কোন সৈন্যবাহিনীর প্রবেশ নিষেধ। সেইসাথে এই নগরীতে রক্তপাতও নিষেধ। হাজার বছরের ইতিহাসে কেউই ভাঙেনি এই নিয়ম। তবে বহু বছর পর অর্থের লোভে ইতিহাসের এই শক্ত শেকল ভাঙতে চলেছে সম্রাট বৃহদ্রথ। আর সেজন্যেই নিজের রাজধানি পাটলিপুত্র ছেড়ে দুটো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বেরিয়ে এসেছে সে এখানে।

নিজের উপদেষ্টার কথা শুনে প্রথমে ভয়ে চমকে উঠেছিল বৃহদ্রথ। হাজার বছরে যে-নিয়ম কেউ ভাঙেনি সেটা সে ভাঙবে কী ক'রে। উপদেষ্টা তাকে জানায় হাজার বছরের ভেতরে কেউ এমন বিপদেও তো পড়েনি যেমনটা এই মুহূর্তে মহারাজা মোকাবেলা করছেন। আর হাজার বছরের নিয়ম ভেঙে যে সামনে এগিয়ে যায় সেই তো মহান রাজা। প্রথমে ব্যাপারটা আমলে নেয়নি বৃহদ্রথ, কিন্তু যতোই সময় যেতে থাকে ধীরে-ধীরে ব্যাপারটার গভীরতা অনুভব করতে থাকে সে। নিজের উপদেষ্টা আর সেনাবাহিনীর প্রধান পুশ্যমিত্রের কথামতো নিজের সেনাবাহিনীকে এই প্রাচীন নগরীর বাইরেই জড়ো করার নির্দেশ দেয় সে।

দুটো উদ্দেশ্যের একটি হলো, সে নিজে সেনাবাহিনীর কুজকাওয়াজ পরিদর্শন করবে। নিজের চোখে সে দেখতে চায় তার সেনাবাহিনীর সামর্থ আসলে কতোটুক। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, কুজকাওয়াজের প্রদর্শনীর পরই প্রাচীন নগরীর প্রবেশমুখে শুরু হবে বিশেষ যজ্ঞ। এই যজ্ঞের পরই নগরীর ভেতরে প্রবেশ করবে সেনাবাহিনীর একটা অংশ, খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে গোমুখী দেবীর মন্দির আর তার নিচে লুকানো বিরাট সম্পদ।

পায়চারি থামিয়ে রাজা বৃহদ্রথ তক্তপোশের ওপরে রাখা রাজকীয় পোশাক পরে নিয়ে প্রাসাদের জানালাটার সামনে এসে দাঁড়ালো। এখান থেকে দূরের পাহাড় সারি চোখে পড়ছে। পাহাড় সারির আগে একপাশে চিত হয়ে থাকা চিতল পাহাড়ের সামনে ত্রিশূল আকৃতির একটা শৈলশিলা চোখে পড়লো। রাজা জানে ওই ত্রিশূল আকারের শৈলশিলার পর থেকেই শুরু হয়েছে সেই প্রাচীন নগরী। ওই নগরীর সামনের পাহাড়ি উপত্যকায় নগর তোরণের অন্যপাশেই জমায়েত হয়েছে তার সেনাবাহিনীর একটা বিরাট অংশ। নিজে রাজা হলেও সেনাবাহিনীর সাথে কখনোই সরাসরি মোলাকাত হয়নি তার। এবারই

প্রথমবারের মতো সে পর্যবেক্ষণ করতে যাচ্ছে তাদেরকে। এটাও একটা বিশেষ অভিজ্ঞতা হতে যাচ্ছে, সন্দেহ নেই।

হঠাৎ দরজায় কড়াঘাতের শব্দে নিজের ভাবনার জগৎ থেকে বেরিয়ে এলো সে। ভেতরে আসার নির্দেশ দিয়ে পিঠ সোজা আর বুক টান-টান করে করে ফিরে তাকাল দরজার দিকে। রাজাকে জনসম্মূখে সবসময় রাজার মতোই থাকতে হয়। একজন চাপরাশি প্রবেশ করলো ভেতরে।

মাথা নিচু করে রাজার চোখে দৃষ্টি না মিলিয়ে সে বলে উঠলো, "মহারাজ, সব প্রস্তুত হয়েছে। সবাই অপেক্ষা করছে আপনার জন্যে।"

লোকটাকে ইশারায় বিদায় দিয়ে বিছানার পাশেই রাখা সুরাপাত্র থেকে সরাসরি দুঢোক সুরা গলায় ঢেলে নিলো সে। আজ একটা বিশেষ দিন, খানিকটা নিয়ম ভাঙলে সমস্যা নেই। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখ মুছে আবারো শরীরটাকে টান-টান করে বেরিয়ে এলো সে। কামরার বাইরে বেরুতেই দুইপাশ থেকে দুজন দেহরক্ষি তাকে প্রণাম করে পেছনে হাঁটতে লাগলো।

"কি ব্যাপার, রঙ্গলাল কোথায়?" রাজা বৃহদ্রথ হাঁটতে-হাঁটতেই জানতে চাইলো। রঙ্গলাল তার প্রধান দেহরক্ষি। সাধারণত রঙ্গলাল আর তার বিশ্বস্ত প্রহরী ছাড়া রাজা কোথাও যায়না।

"হুজুর, রঙ্গলালের আচানক শরীর খারাপ হয়েছে, সে ছুটিতে গেছে। আমাদেরকে দায়িত্ব বুঝায়ে দিয়ে গেছে," তার দ্বিতীয় প্রধান দেহরক্ষি সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে জানালো। রাজা বৃহদ্রথ একবার মাথা নেড়েই ব্যাপারটা ভুলে গেল। এখন তাকে আরো অনেক জরুরি বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে। এসব ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে মাথা না ঘামানোই শ্রেয়। নিজের কামরা থেকে বেরিয়ে সরু গলিপথের মতো জায়গাটা পার হতেই তারা চলে এলো ফটকের গোলমতো একটা জায়গায়। এখানে রাজাকে বরণ করে নেয়ার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। রাজা বৃহদ্রথ গিয়ে থামতেই একজন বৌদ্ধ পুরোহিত এসে তাকে পবিত্র শ্লোক পাঠ করে শোনালো। বহু পুরনো রীতি। এরপর রাজনিয়ম অনুযায়ী সমস্ত রীতি সম্পন্ন হবার পর সে রওনা দেয়ার অনুমতি পেল।

পূজোকর্ম শেষ হতেই সামনে এগিয়ে এলো রাজা বৃহদ্রথের প্রধান সেনাপতি ব্রাহ্মণ বংশদ্ভুত শুঙ্গ গোত্রের প্রতিনিধি পুশ্যমিত্র শুঙ্গ। পুরোপুরি সামরিক পোশাকে সজ্জিত সেনাপতি পুশ্যমিত্র আর তার সঙ্গীদের দেখে মনে হচ্ছে কুজকাওয়াজ নয় বরং যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে তারা। তাদের সামরিক সাজ-পোশাকের সামনে হঠাৎ রাজা বৃহদ্রথের খানিকটা হীনমন্যতা বোধ হতে লাগলো। আসলে একজন বৌদ্ধ রাজার ব্রাহ্মণ সেনাপতি নিয়োগ দেয়া নিয়ে রাজমহলে অনেকেরই আপত্তি ছিল, কিন্তু রাজা কারো কথা না শুনে কেন জানি পুশ্যমিত্রের ওপরেই ভরসা করেছে। সে ভরসার ফলও পেয়েছে হাতে-নাতে। মৌর্য সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এতো প্রভাবশালী সেনাপতি খুব কমই এসেছে এর আগে।

সেনাবাহিনীতে এমনকি রাজার চেয়েও অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে পুশ্যমিত্র। রাজাকে কুর্নিশ করে সে সকল প্রস্তুতির বিস্তারিত বিররণ জানালো।

সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত আছে, পদাতিক সৈন্য, ঘোড়সওয়ার, হাতির সওয়ারি থেকে শুরু করে সকলেই নিজেদের কর্মদক্ষতা রাজাকে দেখানোর জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

রাজা এগোতে গিয়েও থেমে গিয়ে হঠাৎ জানতে চাইলো হাজার বছরের নিয়ম উপেক্ষা করে সে যে এই প্রাচীন নগরীর ফটকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে এসেছে এটা নিয়ে সৈন্যদের মাঝে কোন ক্ষোভ আছে কিনা। রাজার প্রশ্ন শুনে তার ব্রাহ্মণ সেনাপতি একগাল হেসে জবাব দিলো, "সৈন্যদের এতো কথা শুনতে গেলে তো সেনাবাহিনী চালানো যাবে না। কর্তাব্যক্তিরা নির্দেশ দিবে, সৈন্যরা পালন করবে এটাই শুরু, এটাই শেষ কথা।"

সেনাপতির জবাব শুনে রাজা বৃহদ্রথের বুকটা গর্বে ফুলে উঠলো। এই না হলো মৌর্য সাম্রাজ্যের উপযুক্ত সেনাপতি। আবেগের আতিশয্যে সে হঠাৎ পুশ্যমিত্রকে জড়িয়ে ধরে ধন্যবাদ জানালো। একজন রাজার জন্যে ব্যাপারটা অত্যন্ত ব্যতিক্রম। পুশ্যমিত্র একবার কুর্নিশ করে সম্মান জানালো তাকে।

রাজা বৃহদ্রথ তার সেনাপতিকে পাশে নিয়ে পুরো বাহিনীর সন্মুখভাগে এসে দাঁড়ালো। একবার সবাইকে পর্যবেক্ষণ করে তারা নগর তোরণের ওপরে এসে উঠলো। এখানে শুধুমাত্র রাজা, সেনাবাহিনীর প্রধান আর তার বিশিষ্ট মন্ত্রীবর্গরা ছাড়া আর কেউ উঠতে পারবে না। রাজা ওপরে এসে উঠতেই সেনাপ্রধানের লোকেরা পুরো জায়গাটা নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তায় ঘিরে ফেললো। রাজা মশায় ওপরে এসে উঠতেই প্রথমে সৈন্যরা আনন্দধ্বনি করে উঠলো। তারপর সুশৃঙ্খল পন্থায় শুরু হলো কুজকাওয়াজ। রাজা আনন্দের সাথে দেখতে লাগলো।

সূর্য মাথার ওপর থেকে উত্তাপ ছড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ পরেই দর-দর করে ঘামতে লাগলো রাজা। তবে হঠাৎই এক ঝলক পাহাড়ি বাতাসে কেমন যেন শিরশিরে ঠান্ডা অনুভূতি হলো তার। আচমকাই কুজকাওয়াজ ছাড়িয়ে তার দৃষ্টি চলে গেল পাহাড়ের পাদদেশে সেই ত্রিশূল আকৃতির শৈলশিলার দিকে। লোভের বশবর্তী হয়ে হাজার বছরের পুরনো নিয়ম ভাঙতে যাচ্ছে সে, কাজটা কি আসলেই ঠিক হচ্ছে? ভয়ে গলা শুকিয়ে এলো হঠাৎ।

অনেকটা জোর করেই ওদিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সে ফিরে তাকাল নিজের লোকদের দিকে। কাউকে ডেকে জল বা শরবত আনানোর নির্দেশ দেয়ার ইচ্ছে। কিন্তু অবাক হয়ে রাজা খেয়াল করলো নগর তোরণের ওপরে এই মুহূর্তে শধুমাত্র সে একাই দাঁড়িয়ে আছে। সেনাপ্রধান, মন্ত্রী বা দেহরক্ষিরাও কেউ নেই। সে ফিরে তাকাতেই দেখতে পেল তার সেনাপ্রধান নিচ থেকে ওপরে উঠে এগিয়ে আসছে তার দিকে। একেবারে কাছে এসে থেমে গেল সে। একটু অবাক হয়েই রাজা কিছু বলার জন্যে মুখ খুললো, "পুশ্যমিত্র..."

তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। শক্তিশালী সেনাপ্রধান একহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে অপর হাতে বের করে আনলো একটা বিরাট ছোরা। রাজা কিছু বুঝে ওঠার আগেই একাধিকবার সেটা ঢুকিয়ে দিলো রাজা বৃহদ্রথের বুকে-পেটে। বিস্মিত-রক্তাক্ত-বিহ্বল রাজার মৃতদেহটাকে সে ছুঁড়ে ফেলে দিলো নগর তোরণের ওপর থেকে।

রক্তাক্ত রাজার মৃতদেহটা ছিটকে গিয়ে পড়লো তারই বাহিনীর একেবারে অগ্রভাগে। সাথে-সাথে স্তব্ধ হয়ে গেল পুরো সেনাবাহিনী। নগর তোরণের ওপর থেকে রাজাকে খুন করা রক্তাক্ত খঞ্জর হাতে চিৎকার করে ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুশ্যমিত্র নিজেকে রাজা ঘোষণা করলো। সাথে-সাথে শুরু হয়ে গেল রক্তের হোলি খেলা।

সেনাবাহিনীর কুজকাওয়াজের ময়দান থেকে শুরু করে বিহারের রাজধানি পাটলিপুত্র পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী প্রতিটি মানুষের প্রাণনাশের জন্যে উঠে পড়ে লাগলো পুশ্যমিত্রের বাহিনী।

দক্ষিণ ভারত থেকে শুরু করে নেপালের লুম্বিনি পর্যন্ত যাকে যেখানে পাওয়া গেল মেরে শেষ করা হলো বৌদ্ধদেরকে। পুড়িয়ে দেয়া হলো হাজার-হাজার মঠ, আশ্রম, স্তুপ আর আশ্রয়স্থল। মৌর্যদের শাসন চিরকালের মতো নিশ্চিহ্ন করে রাজা পুশ্যমিত্র নিজেকে শুঙ্গ বংশের চিরস্থায়ি রাজা ঘোষণা করে নির্দেশ জারি করলো; যে যেখানে পারো ভারতবর্ষের সকল বৌদ্ধদেরকে ধরে নিয়ে আসো। সে পরিষ্কার ঘোষণা করলো, প্রতিটি কর্তিত বুদ্ধ মস্তকের জন্যে স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেয়া হবে।

শুরু হয়ে গেল ভারতবর্ষের ইতিহাসে সবচেয়ে কুখ্যাত গণহত্যাগুলোর একটি, যা চিরকালের মতো বদলে দিলো ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি অংশ।

প্রথম অংশ: অন্তর্ধান

অধ্যায় এক

বর্তমান সময়

তামাবিল বর্ডার, সিলেট

প্রকৃত সুখ সম্ভবত একেই বলে। এই মুহূর্তে সত্যিকার অর্থেই নিজেকে তার পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ মনে হচ্ছে।

চার বছরের কঠিন প্রচেষ্টার ফল অবশেষে হাতে এসেছে। তার মতো গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ এতো লম্বা সময় ধরে যে-ব্যাপারটার পেছনে লেগেছিল, সেটা যদি সফল না হত তবে এরচেয়ে দুঃখজনক আর কিছু হত না। তবে এখন সফলতার সময়, সাফল্য উপভোগ করার সময়। আনমনেই একবার সে ট্রাকের পেছনের ছোট ফোকরটা দিয়ে ফেলে আসা তামাবিল বর্ডারের দিকে ফিরে তাকাল।

তার প্রচেষ্টার শেষ বাধা ছিল বর্ডারটা পার হওয়া, সেটা যেহেতু কোনরকম ঝামেলা ছাড়াই পার হওয়া গেছে, আর তেমন কোন ঝামেলা নেই। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে আনমনেই একবার মাথা ঝাঁকিয়ে ঘড়ি দেখলো সে।

এয়ারপোর্টে পৌছাতে আরো কমপক্ষে দুই ঘন্টার যাত্রা। কপাল ভালো হলে সময় আরেকটু কম লাগতে পারে। হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে চোখ বুজলো সে। ক্লান্তি লাগছে। সেই লন্ডনের রয়াল ক্লাব থেকে বৃটিশ মিউজিয়ামের লাইব্রেরি। এরপরে সেখান থেকে যে-যাত্রার শুরু হয়েছিল অবশেষে সেটা শেষ হতে চলেছে। কথাটা মনে হতেই তার মুখে ফুটে উঠলো মৃদু হাসি।

যাত্রা আসলে শেষ নয়, বরং শুরু হতে চলেছে। এই যাত্রা নতুন জীবনের যাত্রা। এ'জীবন হবে অন্য এক জীবন।

আজ থেকে চার বছর আগে, সময়টা তখনো খারাপ কাটছিল না। থাইল্যান্ড থেকে দামি একটা অ্যান্টিক মেরে দিয়ে ইংল্যান্ডের ব্ল্যাক মার্কেটে সবেমাত্র সেটার নিলাম শেষে সে ভাবছিল কিছুদিন বিশ্রাম নিবে। পুরনো দু'য়েকটা ক্লাবে ঢুঁ মারবে। ইয়ট ভাড়া করে ইউরোপ ঘুরে বেড়াবে, এমন সময় পুরনো এক ক্লাবেই এক বন্ধুর মাধ্যমে তার পরিচয় হয় প্রফেসরের সাথে।

দুজনেই দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস নিয়ে আগ্রহী, তাই আড্ডা জমতে বেশি সময় লাগেনি। কথায় কথায় সে প্রফেসরের কাছে জানতে পারে এক অদ্ভুত রহস্যের কথা। দুই হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে মানব সভ্যতার আড়ালেই রয়ে গেছে এই রহস্য। শুধুমাত্র মিথটা প্রচলিত হয়ে রয়ে গেছে মানুষের মুখে-মুখে। ব্যাপারটা শুনে প্রথমে সে খুব বেশি

পাত্তা দেয়নি কিন্তু পরবর্তীতে বিষয়টার গভীরত্ব অনুভব করে মাথা গরম হয়ে উঠেছিল তার। প্রফেসরের সাথে সম্মিলিতভাবে শুরু হয় দুজনের গবেষণা আর খোঁজ।

এক বছরের পড়ালেখা, আর এরপর বিস্তর খোঁজখবর করে তারা যখন প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছে এমন সময় ভাগ্য এগিয়ে আসে তাদেরকে সহায়তা করার জন্যে।

নেপাল ভূমিকম্প।

২০১৫ সালে নেপালের সেই ঐতিহাসিক ভূমিকম্পের পর উল্টেপাল্টে যায় অনেককিছু। সেই ভূমিকম্পের পর নেপালের থামেল থেকে গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনি, লুম্বিনি থেকে ভক্তপুর পর্যন্ত পিছু নিয়ে তারা খুঁজে বের করতে সক্ষম হয় সেই ঐতিহাসিক সূত্র যেটার সন্ধান অনেকেই করেছে কিন্তু খুঁজে বের করতে পারেনি কেউই। তারাও পারতো না, যদি নেপালের সেই ভূমিকম্পটা না ঘটতো। নেপালের সেই ভূমিকম্পের পর লম্বা সময় ধরে খুঁজতে থাকা মানুষটার সন্ধান পায় তারা, কারণ ভূমিকম্পের সময়ে বেশ আহত হয়ে প্রায় মরার দশা হয়েছিল লোকটার।

তবুও মানুষটা মুখ খুলতো না যদি না তার সাথে একটা বিশেষ সমঝোতায় আসা যেত। যাই হোক অবশেষে মানুষটা তাদের জানায় কোথায় আছে সেই মহার্ঘ বস্তু যেটার সন্ধানে গত কয়টা বছর ধরে অর্ধেক পৃথিবী চষে ফেলেছে তারা। নেপাল থেকে ওটার সন্ধান বের করে তারা চলে যায় আসামে। এবার শুরু হয় আসামের গহীন জঙ্গলে ট্র্যাক ডাউন। দীর্ঘ সময়ের কঠিন অনুসন্ধানের পর অবশেষে খুঁজে বের করতে পেরেছে...

ট্রাকের সামনে থেকে ঠক-ঠক শব্দ হলো। সামনের ছোট কাঠের প্যানেলটা সরিয়ে সে জানতে চাইলো, “কি ব্যাপার, রঘু? কি হয়েছে?”

“স্যার, সাইম্নে পাথরের টেরাকের লাম্বা লাইন, মূল রাস্তা দিয়াই যায়ার, নাই ভিতরে দিয়া যায়ার?” আধা আসামিজ আর আধা বাঙালি ড্রাইভার রঘুবীরের বাংলায় অদ্ভুত এক টান।

ড্রাইভারের প্রশ্নটা শুনে এক মুহূর্ত ভাবলো সে। মনে-মনে হিসেব করলো জিনিসটা আসাম থেকে এতো কষ্ট করে উদ্ধার করার পর এটাকে ঝুঁকি নিয়ে আবার বাংলাদেশে ঢোকানোর পেছনে অনেকগুলো কারণ আছে। তার মধ্যে অন্যতম একটা কারণ হলো, তার আন্তর্জাতিক কানেকশন যতোই থাকুক না কেন চাইলেও সে আসাম থেকে জিনিসটাকে নিয়ে ফ্লাই করার মতো প্লেনের বন্দোবস্ত করতে পারেনি। তাই তামাবিল বর্ডার দিয়ে ঢুকে তারা সোজা চলে যাবে সিলেট এয়ারপোর্ট। সেখানে আগে থেকেই চার্টার করা প্লেন ঠিক করা আছে। জিনিসটাকে নিয়ে প্লেনে তুলে দিলেই তার লোকেরা ফ্লাই করবে। আরেকবার ঘড়ি দেখলো সে।

চার্টার প্লেনটা ছাড়ার জন্যে যে সময় নির্দিষ্ট করা আছে সেটা পূরণ হতে আরো ঘন্টা দুয়েক সময় এখনো বাকি। কিন্তু ঝুঁকি নেয়ার দরকার নেই।

“মূল রাস্তা থেকে নামিয়ে শর্টকাটে চলো।”

তার অনুমতি পেতেই ড্রাইভার আরেকটু এগিয়েই ট্রাকটাকে মূল রাস্তা থেকে সরু একটা কাঁচা রাস্তায় নামিয়ে দিলো। এতোক্ষণ বেশ স্থির ভঙ্গিতে চললেও এবার হেলেদুলে ঝাঁকি খেতে-খেতে এগিয়ে চললো ট্রাক। ঝাঁকির কারণেই কিনা কে জানে তার পাশেই শুয়ে থাকা ঘুমন্ত প্রফেসর নড়েচড়ে উঠলো। আসাম থেকে রওনা দেয়ার সময়ে তাকে হেভি সিডেটিভ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল। নিশ্চই সেটার মেয়াদ এতোক্ষণে শেষ হয়ে আসছে। আসাম থেকে জিনিসটাকে নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করার পেছনে আরেকটা কারণ হলো এই প্রফেসর।

তাকে আসামে মেরে ফেলে রেখে এলে কোনভাবে যদি তার পরিচয় উদ্ধার হয়ে যেত তবে সর্বনাশ হত। এ'কারণেই তাকে বাংলাদেশে নিয়ে আসতে হয়েছে। প্রফেসরকে নিয়ে কী করবে এই ব্যাপারে একটা পরিকল্পনা আছে তার। এয়ারপোর্টে পৌছে প্লেনে ওঠার আগেই ব্যাপারটা সামলাতে হবে। সেইসাথে আরো একজনের ব্যাপারে ফয়সালা করতে হবে।

প্রফেসর ধর-মর করে উঠে বসেই জল খেতে চাইলো। এক হাতে মোবাইল প্যান্টের পকেটের ভেতরে পিস্তলটা চেপে ধরে অন্যহাতে জলের বোতল এগিয়ে দিলো তার দিকে। ঢক-ঢক করে জল গলায় ঢেলে দিয়ে খানিকটা ছিটিয়ে দিলো সে নিজের চোখে মুখে।

“আমরা এখন কোথায়?” কড়া সিডেটিভের কারণে তার গলার স্বর খানিকটা অস্পষ্ট।

“আমরা আধাঘন্টা আগে তামাবিল বর্ডার দিয়ে বাংলাদেশের প্রবেশ করেছি,” খুব শান্ত স্বরে কথাটা বললো সে।

কিন্তু তার কথার প্রতিক্রিয়া হলো সাংঘাতিক। প্রফেসর জলের বোতলটা ফেলে দিয়ে ঝট করে ফিরে তাকাল তার দিকে।

“তারমানে আমি প্রায় পনেরো ঘন্টার মতো ঘুমিয়ে ছিলাম,” বলে সে মাথা নাড়তে লাগলো। “এটা কিছুতেই স্বাভাবিক ঘুম হতে পারে না। তুমি আমাকে কিছু একটা করেছিলে!” অবিশ্বাসের সাথে মাথা নাড়তে লাগলো প্রফেসর। “এতোসব কিছুর পরেও! আমরা এতো কষ্টের পর তুমি কিভাবে...” কথাগুলো বলতে গিয়ে সে চুপ হয়ে গেল। তার মাথার ভেতরে কিছু একটা জট পাকিয়ে উঠেছে। কিছু একটা পরিষ্কার ধরতে পারছে সে। “তুমি আসামিজ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ না করেই ওটাকে নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছো, তাইনা? তারমানে-তারমানে উলফাদের সিস্টার কনসার্নের সাথে এতো মারামারি করে উদ্ধার করা জিনিসটা তুমি...”

আর লুকিয়ে লাভ নেই। পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে প্রফেসরের দুই চোখের মাঝখানে চেপে ধরলো সে।

“একেবারে ঠিক ধরতে পেরেছেন আপনি, তবে একটু দেরিতে...” বলে সে হাসতে লাগলো। তার সাথে যোগ দিলো ট্রাকের ভেতরে থাকা তার অস্ত্রধারি দুই সঙ্গী।

"প্রফেসর, আপনি যতো বোকাই হোন না কেন, একটা কথা বলতে দ্বিধা নেই। এই পুরো ব্যাপারটাতে আপনি যা করেছেন- যে খেল দেখিয়েছেন। বিশেষ করে নেপাল থেকে ওই ব্যাটার নির্দেশনা অনুসরণ করে যে তীক্ষ্ণ মেধার সাথে জিনিসটা আপনি খুঁজে বের করেছেন সেটা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। দুই হাজার বছরের বেশি সময় ধরে যা কেউ পারেনি আপনি সেটা করে দেখিয়েছেন। আপনি সত্যিই অতুলনীয়।"

"কিন্তু তাতে লাভ কি হলো? জিনিসটা আমি ভুল লোকের হাতে তুলে দিলাম," প্রফেসরের মাথা আনমনেই নিচু হয়ে গেছে। "এখন কি করতে চাও তুমি?"

এক মুহূর্ত ভাবলো সে। "কিছুই না, প্রফেসর। আপনি চুপচাপ বসে থাকুন, আর ঘন্টাখানেকের ভেতরে আমরা এয়ারপোর্টে পৌছে যাবো। এরপর আমি আমার রাস্তায়, আপনি আপনার রাস্তায়। আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা থেকে এ'টুকু আমি করতেই পারি।"

"আর জিনিসটা?" প্রফেসর অসহায়ের মতো জানতে চাইলো।

সে পিস্তলটা নামিয়ে আবারো পকেটে রেখে দিতে চাচ্ছিলো কিন্ত তার আগেই চরম বিস্ময়ের সাথে প্রফেসরের দিকে তাকাল। মনে-মনে সে ভাবতে লাগলো, এতো মেধাবি একটা লোক এতোটা বোকা হয় কিভাবে। সে বলেছে এয়ারপোর্টে পৌছে তাকে ছেড়ে দিবে আর এই লোক সেটা বিশ্বাস করে বসে আছে। কোথায় সে নিজের প্রাণ বাঁচানোর কথা ভাববে, উল্টো সে জিনিসটার কথা জানতে চায়।

"প্রফেসর, আপনি একটা গর্দভ। নিম্ন মানের গর্দভ," বলে সে একটু এগিয়ে এলো প্রফেসরের দিকে। "শুনুন, আপনি ওই জিনিসটার কথা বাদ দিয়ে নিজের পরিণতি নিয়ে ভাবুন। কারণ আমি যা বলেছি সেটা মিথ্যে। আমি আসলে আপনাকে..." কথাটা শেষ করার আগেই হঠাৎ স্কিড করে থেমে গেল ট্রাক। একে তো কাঁচা রাস্তা তার ওপরে ঝাঁকি খেয়ে থেমে যাওয়াতে ট্রাকের ভেতরের লোকজন একে-অপরের গায়ে ছিটকে পড়লো।

নিজেকে সামলে নিয়ে ড্রাইভারের সাথে কথা বলার কাঠের ছোট প্যানেলটা সরিয়ে ধমকে উঠলো সে, "রঘুবীর, হলোটা কি? এভাবে কেউ গাড়ি থামায়!"

"হুজুর, সামনে একটা চেকপোস্ট, হামাদেরকে গাড়ি থামার ইশারা করেছে।"

"কী, চেকপোস্ট! এখানে? অসম্ভব। দেখি," বলে সে গলা বাড়িয়ে দিলো। অন্ধকারের ভেতরে কমলা রঙের একটা পুলিশি আলো চমকাতে দেখা যাচ্ছে। এক মুহূর্ত ভাবলো সে, "ঠিকই আছে। ধীরে-ধীরে এগিয়ে যাও। উল্টোপাল্টা কিছু করো না। আমাদের কাছে সব কাগজপত্র আছে। কাজেই কোন সমস্যা হবে না," বলে সে নিজের দুই অস্ত্রধারি সঙ্গী আর প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো। "সবাই সাবধান, সামনে একটা পুলিশ চেকপোস্ট দেখা যাচ্ছে। ওরা সম্ভবত ইয়াবার চালান বা তামাবিল বর্ডার দিয়ে প্রবেশ করা অবৈধ

কিছুর খোঁজে সার্চ করছে। আমাদের সাথে সব কাগজ আছে, কাজেই কোন সমস্যা হবে না। তবে সবাই অস্ত্র সামলে স্বাভাবিক হও।"

হঠাৎ এই মাঝরাতে জঙ্গলে চেকপোস্টের সামনে পড়াতে সব পরিকল্পনার বারোটা বাজতে চলেছে। তবে ঠান্ডা মাথার লোক সে, সব সামলে নিতে পারবে, শুধু প্রফেসরকে ঠিক রাখতে হবে। কাঠের প্যানেলটা সরিয়ে ড্রাইভারকে ডাক দিলো, "রঘুবীর। "

ধাপ করে একটা শব্দ হবার সাথে-সাথেই ট্রাকের সামনের কাঁচ ফেটে গেল। ছোট একটা চিৎকারের সাথে ট্রাকের হুইলের ওপরে গড়িয়ে পড়লো রঘুবীর। সাথে-সাথে ট্রাকের মেঝেতে ঝাঁপিয়ে পড়লো সে। শব্দটা কিসের ঠিকই চিনতে পেরেছে সে। সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল দিয়ে গুলি করেছে কেউ রঘুবীরকে। তারমানে সামনে পুলিশি চেকপোস্ট নয় বরং কেউ অ্যামবুশ করেছে।

কথাটা ভেবে শেষ করার আগেই মৃত ড্রাইভারের শরীরের নিচে ড্রাইভিং হুইলটা পাক খেয়ে ট্রাকের মাথাটা ঘুরে গেল ডান দিকে। রাস্তা থেকে নেমে ট্রাকটা গিয়ে বাড়ি খেল একটা গাছের সাথে। ট্রাকের ভেতরে উল্টে-পাল্টে পড়লো সবাই।

সবার আগে নিজেকে সামলে নিলো সে-ই। প্রথমেই তাকাল প্রফেসরের দিকে। তাদের জন্যে পুরো ব্যাপারটা একটা দুঃস্বপ্নের মতো হলেও প্রফেসরের জন্যে অ্যামবুশটা একটা আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছু নয়।

তবে প্রফেসরের ভেতরে সুবিধা কাজে লাগানোর মতো কোন ভাব দেখা গেল না। সেও অন্যদের সাথে উল্টেপাল্টে পড়ে আছে। একবার প্রফেসরকে দেখে নিয়ে আরেকবার ট্রাকের মেঝেতে মুড়িয়ে রাখা জিনিসটাকে দেখলো সে। ধাক্কা লাগলেও ওটার কোন ক্ষতি হয়নি। বাইরে কান পেতে শোনার চেষ্টা করলো, সব নীরব। এই নীরবতা কোন ভালো লক্ষণ নয়। চট করে পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে আনলো। "বেরোও, সবাই বেরোও এক্ষুণি," বলে সে পিস্তল হাতেই ট্রাকের পেছনের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। একটানে তুলে ফেললো কার্গো ট্রাকের পেছনের ডালাটা।

প্রায় সাথে সাথেই শক্তিশালী ফ্ল্যাশ লাইটের আলোয় চোখ ঝলসে গেল। "সারেন্ডার, সারেন্ডার করুন। অস্ত্র ফেলে দিয়ে সারেন্ডার করুন," ভাঙা-ভাঙা একটা গলা বলে উঠলো।

"দেখুন আপনারা ভুল করছেন, জানি না আপনারা কাদেরকে..." বলতে বলতেই সে ট্রাকের নিচে নেমে এলো। পিস্তলটা ইতিমধ্যেই কোমরের পেছনে লুকিয়ে ফেলেছে। কিন্তু কথা শেষ করার আগেই তার পায়ের কাছে এক পশলা গুলি এসে লাগলো।

"খবরদার! কোনরকম চালাকির চেষ্টা চলবে না। হাত ওপরে তুলে ট্রাক থেকে সবাই বেরিয়ে আসুন।"

ফ্ল্যাশ লাইটের ওপাশ থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বরটা শুনে সে ভেতরে ভেতরে চমকে উঠেছে দুটো কারণে। একে তো প্রথমে ভেবেছিল ওরা হয়তো ভুল করেছে কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তা নয়। ওরা মোটেই ভুল করেনি। দ্বিতীয়ত যে-লোকটা কথা বলছে তার কণ্ঠস্বর শুনেই সে আন্দাজ করতে পারছে মানুষটা কে হতে পারে। মানে পুরো ব্যাপারটার ভেতরে বিরাট গোলমাল আছে। এখন চালাকি না করলে খবর আছে।

"দেখুন আপনারা বুঝতে পারছেন না। আমরা সরকারি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দল, আমরা..." কথা বলতে বলতেই সে মাথার ওপরে তুলে রাখা হাতে বিশেষ একটা ইশারা করলো। ট্রাকের ভেতরে থাকা তার দলের লোকজনের অবশ্যই বুঝে ফেলা উচিত এর মানে কি। সে কথা বাড়াতে লাগলো। "স্রেফ গবেষণার কাজে.." তার কথা শেষ হবার আগেই ট্রাকের ভেতর থেকে উঁড়ে এলো কিছু একটা। মাটিতে পড়ার সাথে সাথে ওটা ফেটে গিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরুতে লাগলো।

আসামের জঙ্গলে ক্যাম্প করার আগে এই স্মোক ক্যান দিয়ে তারা পোকামাকড় আর মশা পরিষ্কার করতো। ক্যানটা ফাঁটতেই ধোঁয়ার চোটে ফ্ল্যাশ লাইটের আলো ঘোলাটে হয়ে গেল।

সাথে-সাথে নিজের লোকদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে মাটিতে একটা গড়ান দিয়ে পিস্তলটা বের করে ফ্ল্যাশ লাইট লক্ষ্য করে অন্ধের মতো গুলি চালালো সে। গুলি লাগলো কি লাগলো না, সেটা দেখার সময় নেই। সে দৌড় দিলো ট্রাকের সামনের দিকে। কোনমতে ট্রাকটাকে চালু করতে হবে। কারণ এই ট্রাক আর জিনিসটাকে ফেলে সে কিছুতেই পালাবে না।

ট্রাকের সামনের দিকে প্রায় পৌছে গেছে এমন সময় শক্ত কিছু একটা এসে বাড়ি মারলো তার পায়ে। তীব্র বেগে দৌড়ানো অবস্থায় প্রায় উড়ে গিয়ে পড়লো সে মাটিতে। ব্যথার চোটে অন্ধকারের ভেতরে আরো অন্ধকার দেখছে চোখে। হাত থেকে পড়ে গেছে পিস্তলটা। পরিষ্কার দেখতে না পেলেও অনুভব করলো কেউ একজন শক্তিশালী হাতে তাকে খানিকটা শূণ্যে তুলে ফেললো।

খানিকটা তুলেই আছড়ে ফেললো মাটিতে। তারপর আবার, তারপর আবার। তীব্র ঝাঁকিতে নাক মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসেছে তার। যেকোন সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে মনে হচ্ছে। এবার আর মাটিতে আছড়ালো না কেউ তাকে বরং দুজনে মিলে দাঁড় করিয়ে দিলো। সেই সাথে কেউ একজন বিজাতীয় ভাষায় তার কানের কাছে ফিসফিস করে বলে উঠলো।

"বেশি চালাকি, না? ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা? একমাত্র আমরাই জানি তুমি কে," বলে খনখনে গলায় হেসে উঠলো মানুষটা।

অধ্যায় দুই

সময়: ১৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ

তিব্বতের কোন এক প্রত্যন্ত অঞ্চল

বাতাসে ভোরের আগমনি গন্ধ।

প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথে ব্যাপারটা অনুভব করতে পারছে শামান। নিজের অবস্থানে অনড় থেকে মাথা তুলে দিগন্তের দিকে তাকাল সে। যেকোন সময় পাহাড়ের আড়াল থেকে টুপ করে বেরিয়ে আসবে ডিমের কুসুমের মতো হলদে-লাল সূর্য। পুরো উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়বে অদ্ভুত সুন্দর এক সোনালি আলো। এই সৌন্দর্যের কোন তুলনা হয়না। ভোরের কুয়াশাচ্ছন্ন পাহাড়ে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির নির্জনে যে-এই সৌন্দর্য নিজে অবলোকন করেছে, একমাত্র সে-ই জানে এই সৌন্দর্যের গভীরতা কতোটুকু।

তবে শামানের মনের ভেতরে আসন্ন সৌন্দর্যের চিন্তা প্রাধান্য পাচ্ছে না, বরং তার মন আর মস্তিষ্ক দুটোই ডুবে আছে আসন্ন সংঘাত আর যুদ্ধের চিন্তায়। ওর দলের লোকজন আশেপাশে খোঁজ-খবর করে যতোটুকু জানতে পেরেছে তাতে এটা পরিষ্কার যে, ভোরের আলো ফোঁটার সাথে সাথেই আসবে ওরা। মৃত্যু আর আতঙ্কের প্রতিনিধি হয়ে ছুটে আসবে।

যদিও একেবারে সরু একটা জায়গায় স্থির হয়ে আছে শামান তবুও রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করার জন্যে শরীরটাকে একটু টান-টান করার চেষ্টা করলো সে। ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরে তাকাল উপত্যকার দিকে। ওরা এই মুহূর্তে যেখানে অবস্থান করছে জায়গাটা একটা সরু শৈলশিলার মতো। দুটো ছোট-ছোট পাহাড়ি টিলার মাঝ বরাবর চলে গেছে সরু একটা পথ। সেটা পার হয়ে উপত্যকায় প্রবেশ করার আগেই ছোট একটা গোলমতো ফাঁকা জায়গা। এই জায়গাটাই ওদের প্রধান লক্ষ্য। শামান চারপাশে চোখ বুলিয়ে প্রত্যেকের অবস্থান ঠিক আছে কিনা আরেকবার দেখে নিলো। তার পরিকল্পনামাফিক সবকিছু সাজানো আছে।

পাহাড়ি পথের শেষে ছোট্ট গোলমতো জায়গাটা পার হয়ে প্রবেশ করতে হয় মূল উপত্যকায়। ভোরের লালচে আলোতে দেখা যাচ্ছে উপত্যকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য ছোট-বড় মুর্তি। প্রাচীন হারুকি বংশ আর শৈন ধর্মের প্রতীক ওগুলো। নিজের পুরনো দিনের শিক্ষা থেকে শামান জানে শৈন ধর্ম এই বিশাল ভূখন্ডের সবচেয়ে পুরনো ধর্মগুলোর একটি। এই ধর্মের অনুসারিদের ভেতরে আবার হারুকি বংশের লোকেরা হলো সবচেয়ে পুরনো আর সম্পদশালী। তবে সময়ের সাথে-সাথে সব বদলে যায়।

সময়ের গর্ভে হারিয়ে গিয়ে বিশালাকায় সরীসৃপ পরিণত হয় ছোট্ট টিকটিকিতে। শৈন ধর্মের অনুসারি হারুকিদের জন্যে একই পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে বর্তমানে। ধর্মীয় অর্ন্তকোন্দল, নিজেদের ভেতরে বিবাদ আর সম্পদ নিয়ে কাড়াকাড়ি তাদেরকে দূর্বল করে ফেলেছে। এতোটাই দূর্বল যে দানবের আক্রমণে বিপর্যস্ত হারুকিদের এখন অন্য মানুষের সহায়তা নিতে হচ্ছে। আর এখানেই দেখা দিয়েছে শামান আর তার দলের ভূমিকা।

"ব্যাপার কি, কারো দেখা নেই কেন? ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে," ওর পাশ থেকে আধা তিব্বতি আর আধা নেপালি ভাষার সমন্বয়ে বলে উঠলো শামানের দলের ডানহাত গোর্খা যোদ্ধা খোম্বু। "পুরোহিত মশায়ের কথা ঠিক থাকলে তো এই সময়েই ওদের আসার কথা," খোম্বুর মন্তব্যের জবাবে শামান কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই খোম্বুর অন্যপাশ থেকে কথা বলে উঠলো আরেকজন।

"এইখানে আসাটা কি আমাদের ঠিক হয়েছে?" কালকি নামের এই যোদ্ধা শামানের দলের সর্বশেষ নিয়োগ। নেপালের উত্তরাঞ্চলের লোক সে, তাই কথার ভেতরে নেপালি ভাষার প্রভাব কড়াভাবে কানে বাজে। "শুনেছি ওরা নাকি ভয়ঙ্কর। অজানা-অচেনা একদল গ্রামবাসীর জন্যে ক'টা স্বর্ণমুদ্রার লোভে নিজেদের জীবন বিপন্ন করাটা কি ঠিক হয়েছে? হাজার হলেও এই গ্রামের লোকেরা ভিন্ন ধর্মের মানুষ। কে জানে এদেরকে বাঁচালে আবার ভগবানের কোপে পড়তে হবে কিনা।"

কালকির কথায় আধা শোয়া থেকে অনেকটা সোজা হয়েই বসে গেল শামান।

"আমরা..." আগের কথার পিঠে নতুন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো কালকি কিন্তু শামানকে ঝট করে উঠে বসতে দেখে কথার মাঝখানে হঠাৎ থেমে গেল। কালকি থেমে যেতেই সচেতন হয়ে উঠলো খোম্বুও। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো সে, তার আগেই শামান তাকে আঙ্গুলের ইশারায় চুপ থাকতে বললো। শামানকে উঠে বসতে দেখেই সচেতন হয়ে গেছে সবাই। একে-অপরের দিকে ইশারা করে কিছু একটা বুঝতে চাইছে। কিন্তু শামানের মুখ পাথরের চেয়েও স্থির। ঈগলের মতো সতর্ক দুই চোখ, শার্দুলের মতো খাড়া হয়ে আছে দুই কান। ভোরের বাতাস যেন স্থির হয়ে ঝুলে আছে টান-টান হয়ে থাকা তারের মতো।

হঠাৎ সে সামনের দিকে হাত তুলে একটা ইশারা করলো। এই ইশারার মানে জানা আছে সবার। প্রায় সাথে-সাথেই নিঃশব্দে প্রস্তুত হয়ে গেল শামানের দলের প্রতিটি লোক, বিশেষ করে তীরন্দাজেরা ছিলায় একটা করে তীর জুড়ে নিলো। ইশারা পেয়ে সবাই প্রস্তুত হয়ে গেছে কিন্তু এখনো কোন মানুষ তো দূরে থাক এমনকি একটা পাহাড়ি ছাগলও দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

"ব্যাপার কি! কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না..." খোম্বুর মুখের কথা শেষ হবার আগেই মৃদু একটা শব্দ পাওয়া গেল। পাহাড়ি চামরি গাইয়ের বড় দল একসাথে উপত্যকা পার হবার সময়ে যেরকম শব্দ হয় প্রায় তার কাছাকাছি একটা শব্দ। খুড়ের সাথে শক্ত মাটি আর

ছোট নুড়ি পাথরের ঠোকাঠুকির শব্দ। শব্দটা প্রায় কাছাকাছি হলেও কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। চামড়ি গাইয়ের দলের চলাচলের শব্দ হয় এলোমেলোভাবে কিন্তু এই শব্দটা হচ্ছে সুশৃঙ্খলভাবে। শব্দটা কানে আসার একটু পরেই উপত্যকার শেষ প্রান্তে দেখা গেল দলটাকে।

দলটা চোখে পড়া মাত্রই শামানের দলের প্রত্যেকের শরীর টান-টান হয়ে গেল। ভয়ের একটা মৃদু শিহরণ বয়ে গেল অনেকের মেরুদন্ড বেয়ে। একবার দলটাকে দেখে নিয়ে নিজের দলের কয়েকজনের ওপরে চোখ বুলালো খোম্বু, তারপর ফিরে তাকাল শামানের দিকে।

শামানের ভেতরে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পাহাড়ি পথ বেয়ে উঠে আসতে থাকা দলটার দিকে। যদিও নিজের মুখে ধীর-স্থির একটা ভাব ধরে রেখেছে সে কিন্তু ভেতরে-ভেতরে বিচলিত হয়ে উঠেছে। কারণ একে তো অচেনা জায়গা তার দলের লোকজনের মানসিকতার ওপরে চাপ তো ফেলছিলই তার ওপরে ওরা শত্রু সংখ্যা যা আশা করেছিল শত্রুরা সংখ্যায় তারচেয়ে অনেক বেশি। মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করলো শামান। নিজের লোকজন, নাকি প্রতিজ্ঞা- কোনটাকে প্রাধান্য দিবে, দোদুল্যতার মাঝে মুহূর্তের জন্যে একটা হালকা পর্দা ঝুলে রইলো।

কিন্তু সেটা ওই মুহূর্তের জন্যেই। উদ্দেশ্য ঠিক করে ফেলতেই সে এক হাত উঠিয়ে দুইদিকে ইশারা করলো। আক্রমণের আগে এটাই শেষ ইশারা এর পরের ইশারাতেই আক্রমণ হবে। শামানের ইশারা পেয়ে আরেকদফা দ্বিধার পর্দা ঝুলে রইলো সবার মনে।

“কিন্তু ওরা তো...” আবারো খোম্বু কথা শেষ করতে পারলো না। তার আগেই শামান তাকে থামিয়ে দিলো।

“কোন উপায় নেই, পিছিয়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। সবাই প্রস্তুত হও,” বলেই সে এক হাতে ধরা কুকরির ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। শরীরটাকে প্রায় তিনশ ষাট ডিগ্রী ঘুরিয়ে শেষবারের মতো দেখে নিলো তার দলের প্রত্যেকের অবস্থান। শেষবারের মতো মাথার ভেতরে ঝালিয়ে নিলো পুরো পরিকল্পনা। শত্রু যা ধারণা করেছিল তার প্রায় দ্বিগুণ, অন্যদিকে সর্বসাকুল্যে তার লোক সংখ্যা ওদের প্রায় তিনভাগের একবার। তবে সংখ্যা দিয়ে নয় বরং দক্ষতা আর ক্ষিপ্রতা দিয়ে পরাজিত করতে হবে শত্রুদের। আর সেটা করতে হলে নিখুঁতভাবে কাজে লাগাতে হবে সম্পূর্ণ পরিকল্পনা।

ওর পরিকল্পনটা খুব সহজ। সর্বসাকুল্যে ওর দলে লোক আছে এগারোজন। এই এগারোজনকে চারটা দলে ভাগ করে উপত্যকার চার জায়গায় বসিয়েছে ও। চারটি দলের ভেতরে দুটো দল তীরন্দাজদের, অন্য দুটো দল তলোয়ারবাজদের। আগমনরত দলটার ওপরে আক্রমণের জন্যে নির্ধারিত করা হয়েছে উপত্যকার সবচেয়ে সরু জায়গাটা। কারণ আক্রমণরত দস্যুদল যতো বড়ই হোক না কেন, উপত্যকার এই নির্দিষ্ট সরু জায়গাটাতে এলে প্রাকৃতিক কারণেই দলটাকে একসাথে না এগিয়ে বরং সারি দিয়ে একজন-একজন

করে এগোতে হবে। এই সুযোগটাই নিতে চেয়েছিল শামানের দল কিন্তু লোকসংখ্যায় দস্যুদল যে এতোটা বড় হবে সেটা কল্পনাতেও আসেনি কারো। কিন্তু এতো দূর এসে পিছিয়ে যাবার কোনই উপায় নেই। কারণ পিছিয়ে গেলে নিজেরা হয়তো প্রাণে বাঁচতে পারবে কিন্তু তাদের কাপুরুষতার বলি হতে হবে সাধারণ কিছু মানুষকে। শেষবারের মতো সব ঝালাই করে নিয়ে সামনে তাকাল শামান।

পাহাড়ি উপত্যকা বেয়ে দস্যুদের দলটা উঠে আসছে দ্রুত গতিতে। সবার সামনে মাথা উঁচিয়ে আছে বিশালাকায় একজন মানুষ। কখনো সামনা-সামনি না দেখলেও এই লোকের বর্ণনা লোকের মুখে এতো বেশি শুনেছে যে দূর থেকে দেখা মাত্রই তাকে চিনতে একবিন্দু সমস্যা হলো না শামানের।

মোঙ্গল দস্যু তামাঙ লি। মোঙ্গল রাজ পরিবারের দ্বিতীয় পুরুষ শী লিন'র অবৈধ সন্তান তামাঙ লি তিব্বত আর মান্দারিন এলাকার জীবন্ত ত্রাসের নাম। ছয় ফিটের ওপরে দীর্ঘ, খালি হাতে মারামারির বিশেষ উপাধি 'সুনা' অর্জনকারী তামাঙ লি'কে নিয়ে প্রচলিত উপকথার কোন শেষ নেই। সে নাকি কখনো ঘুমায় না, সে নাকি চব্বিশ ঘন্টা ঘোড়ায় চড়ে দূরদেশ পাড়ি দিতে পারে। দলের সর্বাগ্রে অবস্থানকারী তামাঙ লিকে দেখে দাঁতে দাঁত চাপলো শামান। "আজ দেখবো কতো তেজ তোমার," কথাটা বলেই একটা হাত উঁচু করলো সে।

এটা একটা ইশারা, পাহাড়ের অপর পাশে অবস্থানরত তীরন্দাজদের ভেতরে দুজনকে বিশেষ একটা দায়িত্ব দিয়ে রাখা হয়েছে। শামানকে বিশেষ কায়দায় হাত ওঠাতে দেখেই তারা দুজনে সতর্ক হয়ে উঠলো।

দস্যুদের দলটা একই গতিতে এগিয়ে আসছে, এবার দলের প্রায় প্রত্যেক ঘোড়সওয়ারকেই চোখে পড়ছে। শামান আন্দাজ করলো দলে তারা কম করে হলেও ত্রিশজনের বেশি হবে। দলটা এগোতে এগোতে প্রায় ওদের কাছে চলে এসেছে এমন সময় উঁচু করে রাখা হাতটা ঝট করে নামিয়ে আনলো শামান।

তাৎক্ষণিক কিছু হলো না। কিন্তু একটু পরেই মৃদু একটা কম্পন টের পাওয়া গেল। বেশ মৃদুভাবে শুরু হলেও কম্পনটা বাড়তে লাগলো ধীরে-ধীরে। শামান অনুভব করলো পায়ের নিচের মাটিতে কম্পনটা পাহাড়ের এপাশে থেকেও ওরা টের পাচ্ছে। তবে দস্যুদলটা থামছে না কেন। দস্যু দলটা এগিয়ে আসছিল হঠাৎ ওদেরও গতি ধীরে-ধীরে কমে আসতে লাগলো। মনে হচ্ছে ওরাও টের পেয়েছে, কিছু একটা হচ্ছে।

এমন সময় পাহাড় কাঁপিয়ে ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল থেকে উদয় হলো বিশাল আকারের এক পাথর। পায়ের নিচের মাটি কাঁপিয়ে দিয়ে পাহাড়ি পথটা যেখানে একেবারে সরু হয়ে গেছে সেখানে গিয়ে পড়লো। আরেকটু হলেই দস্যুদলের অন্তত দুজনকে ভর্তা করে ফেলতো ওটা।

পাথরটা আছড়ে পড়তেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো শামান। কারণ একদিকে তামাঙের দলটাকে চমকে দিয়ে ওদেরকে থামানোটা যেমন জরুরি ছিল অন্যদিকে আবার ওদের কেউ মারা পড়লে বিপদ হত। কারণ শুরুতেই বিনা রক্তপাতে অন্তত একবার হলেও ওদের সাথে সমঝোতায় আসার চেষ্টা করবে শামান। যদিও তাতে কাজ হবার কথা নয় তবুও একজন যোদ্ধা হিসেবে এই সম্মানটুকু ওকে রাখতে হবে।

পাথরটা পথের ওপরে আছড়ে পড়তেই ধীরে-ধীরে দলটা স্থবির হয়ে আসতে লাগলো। ওরা খানিকটা স্থির হতেই নিজের দলের লোকদেরকে আরেকবার প্রস্তুত থাকতে বলে উঠে দাঁড়ালো শামান। একটা হাত ভারি কুকরির বাটে রেখে খানিকটা এগিয়ে চলে এলো ছোট পাহাড়টার একেবারে কিনারায়। এখান থেকে নিচে দেখা যাবে পরিষ্কার। সেইসাথে নিচের লোকজনও দেখতে পাবে ওকে। জায়গামতো দাঁড়িয়ে নিচের দিকে উঁকি দিলো শামান।

থেমে দাঁড়িয়েছে তামাঙ লির দল। দলের ভেতরে এক ধরণের অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ এই অত্র এলাকায় ওরা কখনোই কোন ধরণের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়নি। আজ হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই ভোরবেলা এভাবে পথের ওপরে আস্ত একটা পাথর এসে পথ আটকে দিলে ওরা অবাক আর ক্ষিপ্ত তো হবেই।

“তামাঙ, ফিরে যাও,” যথাসম্ভব পরিষ্কারভাবে স্থানীয় তিব্বতী ভাষায় পাহাড়ের কিনারা থেকে চিৎকার করে উঠলো শামান। “এখানে তোমার জন্যে কিছু নেই। নিরীহ গ্রামবাসীদের বিরক্ত না করে ফিরে যাও। অথবা আত্মসমর্পণ করো। কথা দিচ্ছি প্রাণ ভিক্ষা দেয়া হবে তোমার লোকদেরকে,” কথাগুলো যথেষ্ট দৃঢ় স্বরে বললেও নিজের কানেই কেমন জানি হাস্যকর শোনাচ্ছে। তবে এতে কাজ হলো খুবই দ্রুত।

ও কথা শেষ করতে না করতেই একটা ছোট ভারি তলোয়ার-স্থানীয় ভাষায় যাকে বাটাল বলে- এরকম একটা বাটাল ছুটে এলো ওর দিকে। ঝট করে মাথা সরিয়ে না নিলে মাথার অর্ধেকটা হারাতে হত। ছুটে আসা বাটলটা এড়িয়ে আপনমনেই একবার মাথা নাড়লো শামান। মনে মনে বললো, ডাকাতে না শোনে ধর্মের কাহিনী। কথাটা বলেই আবারো একটা হাত উঁচু করে দুইবার নাড়লো ও, সেইসাথে সরে এলো পাহাড়ের কিনারা থেকে।

ওরা যেখানে বসে আছে সেই জায়গাটা আসলে পাহড়ি শৈলশিলার বেরিয়ে থাকা একটা জ্বিভের মতো। ওর সাথে এখানে আছে তিনজন সেইসাথে আরো দুজন অবস্থান করছে ওদের থেকে একটু দূরেই আরেকটা শিলশিলার ওপরে। তিনজন তিনজন করে ছয়জনের দুটো দলকে ভিন্ন দায়িত্ব দিয়ে অন্য দুদিকে বসানো হয়ছে। শামান ইশারা করতেই আবারো পায়ের নিচের মাটি কাঁপতে লাগলো।

নিচে তামাঙ লি’র দস্যুদল হল্লা করছিল আবারো কম্পন শুরু হতেই ওরা থেমে গেল। প্রায় সাথে সাথেই মাটি কাঁপিয়ে আরেকটা বড় আকারের পাথর ছুটে এলো, এবার দলটা

যে সরু শৈলশিলায় অবস্থান করছে সেটার উল্টোদিকে। শামানের পরিকল্পনা ছিল খুবই সহজ। প্রথমে ওদের সামনের দিকে একটা পাথর ফেলে সতর্ক করে দেয়া হবে। যদি তারা কথা শুনে ফিরে যায় তবে তো কথাই নেই। যদি না শোনে তবেই ছোড়া হবে দ্বিতীয় পাথরটা। যাতে সরু পাহাড়ি পথটাতে তারা দুদিক থেকে আটকা পড়ে। একবার সরু পথে তাদেরকে আটকে ফেলতে পারলে যতো বড় দলই হোকনা কেন তীরন্দাজ বাহিনী তাদেরকে একেবারে নাস্তানাবুদ করে ফেরতে পারবে। সেইসাথে ওরা ওপর থেকে নিক্ষেপ করবে পাথর।

পরিকল্পনাটা ছিল অসাধারণ কিন্তু প্রথমেই বাগড়া বাঁধলো দলের আকৃতি। তামাঙ লি ওদের ধারণার চাইতেও অনেক বড় দল নিয়ে হাজির হয়েছে। তাও সমস্যা হত না কিন্তু দ্বিতীয় ঘটনাটাই একেবারে পরিকল্পনার বারোটা বাজিয়ে দিলো।

দ্বিতীয় পাথরটা সঠিকভাবে পথের ওপরে পড়লেই আর কোন ঝামেলা হত না। ওটা ছুটে এলো ঠিকঠাক মতোই কিন্তু সরু পাহাড়ি পথটার যেখানে দস্যুদলটা অবস্থান করছে সেটার শেষ প্রান্তে না পড়ে বরং পাহাড়ি পথটার একেবারে ওপরে যেখানে দুটো ছোট টিলার নিচ দিয়ে পথটা গেছে সেই টিলা দুটোর ওপরে এসে আটকে গেল।

সাথে-সাথে সক্রিয় হয়ে উঠলো তামাঙ লি'র দলটা। প্রথমে একটা পাথর, তারপর শামানের সতর্কবাণী তারপরে আবারো পায়ের নিচের মাটি কেঁপে ওঠাতে এমনকি তামাঙের মতো দূর্ধর্ষ ডাকাতও বুঝে উঠতে পারছিল না আসলে হচ্ছেটা কি। কিন্তু দ্বিতীয় পাথরটা ছুটে আসতেই সে বুঝে গেছে শামানরা আসলে কী করতে চাইছিল। কিন্তু ততোক্ষণে কিছুই করার ছিল না তার। তবে যেইমাত্র পাথরটা আটকে গেল সাথে সাথে সক্রিয় হয়ে উঠলো সে। সামনের পথ রুদ্ধ, খোলা আছে একমাত্র পেছনের পথ। নিজের দলটাকে সেদিকেই ফিরে যাবার নির্দেশ দিলো সে কিন্তু ওইপথে পাথরটা এমনভাবে ঝুলে আছে ঘোড়া নিয়ে ফেরা সম্ভব না।

অন্যদিকে শামান দেখলো তার পরিকল্পনা পুরোপুরি মাঠে মারা গেছে। দস্যুদল্যটা পেছন দিকে রওনা হবার আগেই সে অন্য দুইপাশে অবস্থানরত তীরন্দাজদেরকে ইশারা করলো। ওরা প্রস্তুতই ছিল, সাথে সাথে ছয়জন তীরন্দাজ সক্রিয় হয়ে উঠলো। এক ঝাঁক তীর ছুটে গেল দুই পাথরের মাঝে অবস্থারত তামাঙ লির দলটার দিকে।

তামাঙ লি পেছন দিকে ফিরে যার জন্যে রওনা দিয়ে দেখতে পেল ঘোড়া নিয়ে ওই পথে ফেরা সম্ভব নয়। সে আর তার দলবল ঘোড়া থেকে নেমে এই দ্বিতীয় পাথরটার নিচ দিয়ে ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন সময় তীরগুলো ছুটে গেল তাদের দিকে।

প্রাথমিক ধাক্কায় একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থায় প্রায় প্রতিটা তীর বিদ্ধ করলো তামাঙের দলের লোকদের। শামানের দল দক্ষ হতে পারে তবে বছরের পর বছর ধরে কুকাজে অভ্যস্ত তামাঙ লি'র দলটাও কম দক্ষ আর অভিজ্ঞ নয়। কয়েকজন মাটিতে লুটিয়ে পড়তেই সতর্ক হয়ে উঠলো বাকিরা। ঘোড়া থেকে নেমে নিজেদের ঢাল মাথার ওপরে

চেপে ধরে অনেকটা ছাদের মতো তৈরী করে ফেললো তারা। সেইসাথে দ্রুত বেরিয়ে আসতে শুরু করলো আটকে পড়া পাথরের নিচ দিয়ে। একদিকে ক্রমাগত তীরের বৃষ্টি, তার ওপরে শামানের দলের লোকেরা ক্রমাগত ছোট বড় পাথর ছুড়ে মারছে ওদের দিকে। ওরাও উল্টো তীর ছুড়তে শুরু করেছে কিন্তু নিচে অবস্থান করার কারণে খুব একটা সুবিধে করে উঠতে পারছে না। তবে তামাঙের নেতৃত্বে বেশ দ্রুত তারা বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে পেছনের পাথরের নিচ দিয়ে।

শামান দেখলো একদিকে ওদের লোকবল কম, তার ওপরে আক্রমণ করার পরও খুব একটা সুবিধে করে উঠতে পারছে না ওরা। সেইসাথে দ্রুত গতিতে যেভাবে ওরা পাথরের নিচ দিয়ে খোলা উপত্যাকায় বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে এভাবে বেরুতে থাকলে কিছুক্ষণের ভেতরেই ওরা বেশিরভাগই বেরিয়ে এসে সোজা আক্রমণ চালাবে ওদের ওপরে। আর একবার সরাসরি আক্রমণে গেলে ওরা স্রেফ হাওয়ায় উড়ে যাবে তামাঙের দলের সামনে।

কিছু একটা করতে হবে। একবার ওদের অবস্থানরত শৈলশিলাটা দেখলো আরেকবার নিচের পথটা দেখলো। সেইসাথে দুই শিলার মাঝে আটকে থাকা পাথরটাও। মুহূর্তের মধ্যেই নিজের উদ্দেশ্য ঠিক করে নিয়ে নিজের লোকদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে নির্দেশনা দিলো, সেইসাথে হাতের ইশারা করলো তীরন্দাজদের উদ্দেশ্যে। ওর পাশ থেকে খোম্বু চেঁচিয়ে উঠে থামতে বললো ওকে কিন্তু ততোক্ষণে শূণ্যে লাফ দিয়েছে শামান।

একদিকে নিজের তলোয়ার সামলে সে জ্বিভের মতো বেরিয়ে থাকা শৈলশিলা থেকে প্রায় বিশ ফিট নিচে গিয়ে পড়লো। ওর শরীরটা পুরোপুরি মাটিতে পড়ার আগেই পাহাড়ি ঢাল বেয়ে গড়িয়ে দিলো শরীরটাকে। পাথুরে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নিচে পড়তে-পড়তেই একবার দেখে নিলো দুই শিলার মাঝে আটকে থাকা পাথরটার অবস্থান। পাহাড়ি ঢালের কিনারায় যেতেই পতনরত শরীরটাকে অনেকটা জ্যাঁ-মুক্ত তীরের মতো টান টান করে দিয়ে শূণ্যে লাফ দিলো ও। ঢাল থেকে নিচে ঝাঁপ দিয়ে প্রায় পঁচিশ ফিট নিচে শিলায় আটকে থাকা পাথরটার ওপরে শরীরের পূর্ণ ওজন দিয়ে পড়লো।

শামান প্রায় পঁচিশ ফিট ওপর থেকে শরীরের পূর্ণ ওজন নিয়ে পাথরটার ওপরে লাফিয়ে পড়ার সাথে-সাথে একপাশের পাহাড়ি শীলা থেকে ওটার একটা কিনারা ছুটে গেল। ওই মুহূর্তে পাথরটার নিচ দিয়ে বেরিয়ে আসছিল দুই দস্যু, পাথরটা ছুটে যেতেই তাদেরকে চিড়ে চ্যাপ্টা করে দিয়ে মাটিতে পড়ে পথটা আটকে দিলো ওটা। শামান গড়িয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

মাটিতে পড়ে একটা গড়ান দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো ও। প্রায় সাথে সাথেই আবারো শরীরটাকে বাঁকিয়ে কাত হয়ে গেল উল্টোদিকে। কারণ আরেকটু হলেই একটা তলোয়ারের ফলা দুইভাগ করে দিতে যাচ্ছিলো তাকে। উল্টো হয়ে থাকা শরীরটাকে সোজা না করে বরং সেটাকে পেছন দিকে গড়িয়ে দিলো শামান। উল্টোদিকে ঘুরে সোজা

হবার সময়ে শরীরের ঘূর্ণনের সাথে একই তালে বের করে আনলো নিজের তলোয়ার। সামনের যোদ্ধা কিছু টের পাবার আগেই প্রথমে নিজের তলোয়ার হারালো তারপর পেটে একটা বিরাট ক্ষত নিয়ে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। খানিকটা সুস্থির হয়ে মাটি থেকে একটা ঢাল তুলে নিয়ে একহাতে তলোয়ার বাগিয়ে ও ফিরে তাকাল সামনের দিকে।

তামাঙ লি ওর থেকে বেশ অনেকটাই তফাতে তবে তার লোকেরা ঘিরে ধরেছে ওকে। পাহারি ঢালের একদিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও, আর ঠিক ওর সামনেই তামাঙের লোকেরা। ওকে কোনঠাসা দেখতে পেয়ে একে একে অস্ত্র বের করে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো তারা। শামান আড়চোখে দেখলো ওর লোকেরা পাহাড়ি ঢাল বেয়ে নেমে আসছে, তবে এখনো সময় লাগবে ওদের নামতে। তামাঙের লোকদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো ওর মুখে। "এমনটাই তো চাই।"

কথাটা বলার সাথে সাথে শরীরটাকে একটু নিচু করে মাটিতে একটা গড়ান দিয়ে একপাশে সরে সর্বডানের মানুষটার কাছে চলে এলো। যেকোন অসি কিংবা মল্লযুদ্ধের প্রাথমিক নিয়মগুলোর ভেতরে এটা একটা। শত্রু যদি সংখ্যায় একের অধিক হয় তবে প্রথমেই একপাশে সরে যাও। এতে ক'রে তুলনামূলক কম লোকের মোকাবেলা করতে হবে।

শামানের হিসেবটাও তাই। শত্রু সংখ্যা অনেক, কাজেই প্রথমেই গড়ান দিয়ে ডানে সরে এসে প্রথমজনের হাতে ধরা ঢাল আর তলোয়ারের ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দিলো নিজের কাতানা। শামানকে এগোতে দেখে সবেমাত্র প্রস্তুতি নিতে যাচ্ছিলো সে, তার আগেই নিজের গলায় বিরাট এক ছিদ্র নিয়ে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়লো। আধা বসা অবস্থা থেকেই নিজের কাতানা গলা থেকে বের করে আনার আগেই অপর পাশ থেকে আরেকজন তলোয়ার চালিয়ে দিলো শামানের ওপরে। নিজের কাতানাটা বের করে আনার আগেই অন্য তলোয়ারটাকে ছুটে আসতে দেখে শরীরটাকে স্রেফ স্থির করে ফেললো ও। খোলা বামহাতে ধরা ঢালটাকে উল্টো চালিয়ে দিলো লোকটার দিকে। ছুটে আসা তলোয়ারটা খস-খস শব্দ করে ঢুকে পড়লো শামানের হাতে ধরা ঢাল আর তলোয়ারের ফাঁক দিয়ে। শামান হাতটা একটু বাঁকা করতেই সোজা হাতটা বাঁকা হয়ে গেল প্রতিপক্ষের। হাত থেকে খসে পড়লো তলোয়ার।

নিজের শরীরটাকে বৃত্তাকারে ঘুরিয়ে ঢাল আর কাতানা ছাড়িয়ে নিতেই গলায় ছিদ্র আর হাত ভাঙা দুই প্রতিপক্ষই ছিটকে পড়লো দুদিকে। বসা অবস্থা থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো শামান। বাম হাত থেকে ঢালটা ফেলে দিয়ে কোমর থেকে লম্বা মাথা বাঁকানো ছুরি বের করে আনলো। তলোয়ার আর ছুরি দুটোইকেই শূণ্যে ঘুরিয়ে ফিরে তাকাল সামনের ডাকাতদের দিকে।

মুহূর্তের ব্যবধানে দুজনকে হারিয়ে একটু চমকে গেছে তারা। শামানকে ছুরি আর তলোয়ার হাতে উঠে দাঁড়াতে দেখে এবার আর আগের মতো বোকামি করলো না।

তিনজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে অর্ধবৃত্তাকারে এগিয়ে আসতে লাগলো। কিন্তু তাদের এই সুশৃঙ্খল আক্রমণের বারোটা বেজে গেল একাধিক লোকের চেঁচামেচিতে। ঢালের দিকে তাকিয়ে শামান দেখলো ওর দলের লোকেরা নেমে এসেছে উপত্যকায়। তামাঙ লির দলটা শামানের সাথে মারামারির প্রস্তুতি নিচ্ছিলো তার আগেই ওর দলের লোকেরা পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লো লি'র লোকদের ওপরে। সমানে-সমানে লড়াই শুরু হয়ে গেল।

সেই আক্রমণকারী তিনজনের একজন তীর বিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো, অপর একজন দৌড় দিলো পেছন ফিরে। সর্বশেষ জন তলোয়ার বাগিয়ে ছুটে এলো ওর দিকে। লোকটাকে সামলে নিয়ে সোজা হবার আগেই তীব্র আঘাতে একপাশে ছিটকে পড়লো নিজেই। মাটিতে পড়তেই কালো একটা ঝিলিক দেখতে পেল ও। কোনমতে ডানহাতে ধরা তলোয়ারটা মুখের ওপরে তুলে আঘাতটা ঠেকিয়ে দিলো ও। তবে আঘাতের তীব্রতায় আরেকটু হলেই হাত থেকে ছুটে যাচ্ছিলো নিজের তলোয়ার। তলোয়ারের আঘাত ফিরিয়ে দিতেই একটা ছুটে আসা লাথি হাঁটু দিয়ে আটকে দিলো ও। ধরে ফেলা পা'টাকে সামান্য পেছনে ঠেলে দিয়ে উল্টোদিকে গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়ালো শামান।

ওর অপর দিকের যোদ্ধাও সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে ততোক্ষণে। একটু আগে তলোয়ারের আঘাতটা যখন ফিরিয়ে দিলো, আঘাতের তীব্রতা দেখে বোকা বনে গেছিল শামান। মনে-মনে ভেবেছিল কার আঘাতে এতো শক্তি। এবার বুঝতে পারলো আঘাতটা আসলে কে করেছিল।

মোঙ্গল ডাকু তামাঙ লি।

এই মুহূর্তে মাটির প্রায় সাড়ে ছয় ফিট ওপর থেকে ওর দিকে ছোট-ছোট চোখের কুঁত-কুঁতে দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। একহাতে ধরে রেখেছে বিরাট আকারের একটা তলোয়ার। বিশেষ সাদা লোহায় তৈরী এই তলোয়ারকে মোঙ্গলদের স্থানীয় ভাষায় বলা হয় 'কাপ্পুকি'। বলা হয়ে থাকে হাজার বছরের পুরনো পাহাড়ি বরফের নিচে জমা হওয়া আকরিক লোহা দিয়ে বানানো হয় এই তলোয়ার। নিজের বিরাট আকারের তলোয়ারটাকে দুইবার পাক খাওয়ালো লি।

নিজের পাতলা কাতানার চামড়ার ফালি মোড়ানো বাটে হাত রেখে শরীরটাকে একপাশে ঘুরিয়ে বিশেষ একটা কায়দায় দাঁড়িয়ে গেল শামান। একটা পায়ের পাতা সামনের দিকে, অপর পাতাটা বাম পাশে কাত করা। শরীরের অবস্থান ঠিক করে তলোয়ারটার ডগাতে খালি হাতের আঙ্গুলের গাট দিয়ে টুঙ করে একটা শব্দ করলো শামান। পাহাড়ি নিয়মে এটাই দ্বৈত লড়াইয়ে যুদ্ধের ঘোষণা।

কিন্তু ও অবাক হয়ে খেয়াল করলো তামাঙ লি ওকে আক্রমণ করলো না। বরং ওকে মাঝখানে রেখে ঘুরতে শুরু করলো। সাথে-সাথে সাবধান হয়ে গেল শামান। যেকোন যুদ্ধে জয়-পরাজয় যতোটা না দক্ষতার ওপরে নির্ভর করে তারচেয়ে বেশি নির্ভর করে

প্রতিপক্ষের মানসিকতার ওপরে কতোটুক চাপ সৃষ্টি করতে পারছে তার ওপরে। এই মুহুর্তে তামাঙও তাই করছে।

শামানকে যুদ্ধের ভঙ্গিতে দাঁড়াতে দেখেই সে বুঝে গেছে তার মতোই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোদ্ধা ও। শামানের প্রতিরক্ষা বুহ্য ভেঙে ফেলার জন্যেই সে সরাসরি আক্রমণ না করে ঘুরতে শুরু করেছে। যাতে তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে শামানকে সমকোণী ভঙ্গিটা ভেঙে পেছন ফিরতে বাধ্য হয়। কিন্ত তামাঙ লি ঘুরতে শুরু করার পরেও শামান স্থির দাঁড়িয়েই রইলো। একটা বাজি খেলতে চাইছে ও। সফল হলে ভালো, না হলে সর্বনাশ। শামানকে ঘুরতে না দেখে একটু অবাক হয়ে ওর ঠিক পেছনে এসে থেমে গেল লি।

সময় থমকে গেছে। চারপাশে মারামারি, তলোয়ারের সাথে তলোয়ারের ঝলকানি, তীর ছুটছে বিক্ষিপ্তভাবে। এরই মধ্যে দুই যোদ্ধা পরস্পরকে ঘায়েল করার জন্যে রচনা করে চলেছে অদ্ভুত এক যুদ্ধ কাব্য।

শামানের পেছনে দাঁড়িয়েই তামাঙ লি নিজের তলোয়ারের হাতলে আঙ্গুলের চাপ শক্ত করলো। তার মুখে নিঃশব্দে ফুটে উঠেছে জয়ের হাসি। শামান তার দিকে পেছন ফেরা অবস্থাতেই প্রস্তুত হয়ে গেল আক্রমণের জন্যে। তামাঙ লি ওর দিকে ছুটে এলো পাহাড়ি ঝড়ো বাতাসের মতো। সেই সাথে ওর মাথা বরাবর নামিয়ে আনলো নিজের ভারি তলোয়ার। সে প্রায় শতভাগ নিশ্চিত ছিল পেছন ফেরা অবস্থায় এই তীব্র আঘাত কোন মানুষেই ফেরাতে পারবে না। কিন্তু তাজ্জব হয়ে দেখলো তলোয়ারটা নেমে যাচ্ছে-যাচ্ছে পেছন থেকে শামানের ঘাড় প্রায় ছুঁয়ে ফেলবে এমন সময় আচমকাই শামানের শরীরের ওপরের অংশ একটু ঘুরে গিয়ে নিজের পাতলা কাতানা দিয়ে ঠেকিয়ে দিলো বিরাট তরবারির আঘাত।

সাথে-সাথে লি'র মুখের হাসি নিভে গেল। এরকম কিছু ঘটতে পারে দীর্ঘ যুদ্ধের অভিজ্ঞায় কখনো তার কল্পনাতেও আসেনি। তবে সে তো আর জানে না, পেছন ফিরে থাকলেও তার দেহায়বব নয় বরং বিপরীত দিক থেকে আসা সূর্যের আলোতে শামান আসলে তার ছায়াকে অনুসরণ করছিল। ফলে পেছন ফিরে থাকলেও তার ছুটে আসা, তার তলোয়ার ওঠানো সবই চোখে পড়েছে ওর। তাই আঘাতটা হানতেই সময়মতো ঠেকিয়ে দিয়েছে সেটাকে। তবে ওর হিসেবে গরমিল হয়ে গেল একটু।

ওর পরিকল্পনা ছিল শরীর ঘুরিয়ে আঘাতটা ঠেকিয়ে দিয়ে অন্যহাতে ছুরি বের করে সেটা বসিয়ে দিবে লি'র গলায়। কিন্তু লি'র আঘাতের তীব্রতা এতোই বেশি যে ওটাকে ঠেকিয়ে দিতে পারলেও আঘাতের তীব্রতায় ছিটকে পড়লো মাটিতে। আরেকটু হলেই তলোয়ারের চোখা ফলাটা ওর পাঁজরের পাশ দিয়ে ঢুকতে যাচ্ছিলো। কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে শরীরের ঘূর্ণনের সাথে-সাথে বাম হাতে বের করে আনলো ওর ছুরিটা। লি মাটি থেকে তলোয়ারটা ওঠানোর আগেই নিজের প্রতিরক্ষা বুহ্য ভেঙে তামাঙ ছুটে গেল তার দিকে।

মাটি থেকে তলোয়ারটা ওঠানোর সময়ে একগাদা ধূলোসহ সেটার একটা অংশ লি ছুঁড়ে দিলে ওর দিকে।

একহাতে চোখ ঢেকে ফেললেও কিছু ধূলোবালি ঢুকে গেল শামানের নাকে-মুখে। কিন্তু থামলো না ও। তলোয়ারটাকে সামনে ধরে আরো দুই ধাপ এগিয়ে সোজা আঘাত করলো লি'কে। কিন্তু লি ততোক্ষণে সামলে নিয়েছে নিজেকে। কাতানার আঘাতটাকে ফিরিয়ে দিয়েই উল্টো আঘাত করলো নিজের তলোয়ার দিয়ে। শামান জানে ওই বিশাল তলোয়ারের আঘাত ওর পাতলা কাতানা পরোপুরি সামলাতে পারবে না। তাই আঘাতটা পুরোপুরি না ঠেকিয়ে একদিকে সরিয়ে দিলো ওর কাতানা দিয়ে। নিজের ছুরিটাকে বসিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলো লির বুকে।

বুকের শক্ত বর্মে লেগে পিছলে গেল ছুরি। লি আবারো তলোয়ার ওঠানোর আগেই শামান দ্রুত নড়ে উঠলো। লি নিজেকে সামলানোর আগেই ওর শরীর বাঁকিয়ে একটা পা লির পেছনে নিয়ে ছুরিটা কোমরে গুঁজে খপ করে লি'র তলোয়ার ধরা হাতটা ধরে আর্ম লকের ভঙ্গিতে সেটাকে ঠেলে দিলো পেছন দিকে। আর পায়ের পেছনের পাটা দিয়ে টান দিলো সামনের দিকে। প্রায় সাথে সাথেই উল্টে গেল লি। হাত থেকে ছুটে গেল তলোয়ার। খানিকটা পিছিয়ে এলো শামান।

গত কয়েক মিনিটের তীব্র যুদ্ধে প্রথমবারের মতো একটু ফুসরত পেল ও। আশেপাশে তাকাতেই দেখতে পেল চারপাশের যুদ্ধ প্রায় থেমে গেছে। পক্ষ-বিপক্ষ দুই দলেরই লোকজন প্রায় গোল হয়ে ঘিরে ধরেছে ওদের দুজনকে। তিব্বতের সবচেয়ে বিখ্যাত আর কুখ্যাত দুই যোদ্ধার লড়াই দেখছে সবাই উৎসুক হয়ে। শামান ভিড়ের ভেতরে গ্রামবাসীদেরকেও দেখতে পেল। দ্রুত একবার চারপাশে দেখে নিয়ে ও দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলো লির ওপরে।

হাত থেকে ছিটকে যাওয়া তলোয়ারটা কুড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে লি। ঠোঁটের কোনায় রক্ত দেখা যাচ্ছে। রাগে-ক্রোধে বিকৃত হয়ে আছে মুখ। সম্ভবত তার দীর্ঘ যুদ্ধের জীবনে এমন মুহূর্ত বহুবছর অসেনি। কিংবা কে জানে হয়তো কখনোই আসেনি। তলোয়ারটাকে এক হাতে ধরে সে কোমরের পেছন থেকে বের করে আনলো একটা ছোট কুঠার। শামানও একহাতে কাতানা সামলে অন্যহাতে বের করে আনলো নিজের কুকরি।

এবার লি এগিয়ে আসার আগেই তলোয়ারটাকে শূণ্যে দুইবার পাক দিয়ে শামানই ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপরে। ও তলোয়ার ধরে শূণ্যে লাফ দিলো। মাটিতে পড়ার আগেই শরীরটাকে গড়িয়ে দিলো একপাশে। সরাসরি আঘাত না করে ডান দিক থেকে কাতানার ফলা দিয়ে আঘাত করার চেষ্টা করলো লি'র গায়ে। তবে ওর আঘাত খুব সহজেই ঠেকিয়ে দিলো লি। বরং উল্টো নিজের কুঠার দিয়ে দু-টুকরো করে দিতে চাইলো শামানের ছুরি ধরা হাত। ছুরি ফেলে দিয়ে খপ করে কুঠারের হাতলটা ধরে ফেললো

শামান। এই সুযোগটাই নিলো লি। সে কুঠার ছেড়ে দিয়ে দুই হাতে শামানকে শূণ্যে তুলে আছড়ে ফেললো মাটিতে।

হাত থেকে কুঠার ছুরি আর তলোয়ার সবই ছুটে গেছে। আঘাতের চোটে মনে হচ্ছে হাড়গোড় গুঁড়ো হয়ে গেছে। নিজেকে সামলে নিয়ে বসার আগেই এক লাথিতে ছিটকে পড়লো ও একপাশে। আরেকবার লাথি এসে লাগার আগেই লি'র একটা পা ধরে ফেললো ও। অন্যহাতে মাটি থেকে তুলে নিলো নিজের ছুরিটা। লি ভেবেছিল শামানকে সে কাবু করে ফেলেছে। সে বীরদর্পে আবারো আঘাত করার জন্যে এগোতেই ওর পা ধরে ছুরি দিয়ে পায়ের ওপরে আঘাত করলো শামান। সেইসাথে অন্য পা-টা ধরে টান মারতেই মাটিতে পড়ে গেল লি। পড়া অবস্থায় তাকে আঘাত না করে বরং তাকে উঠতে দিলো শামান। লি উঠে দাঁড়াতেই ছুরিটা ফেলে দিয়ে মাটিতে গড়ান দিয়ে সামনে এগোলো শামান। একটা গড়ান দিয়ে দুই হাত একসাথে মুঠো করে সেটা দিয়ে আঘাত করলো লি'র তলপেটে। খুব সহজেই সেটা আটকে দিলো লি।

যদিও ওর আঘাতটা খুব সহজেই ঠেকিয়ে দিয়েছে লি, কিন্তু ওটা ঠেকাতেই শুরু হলো আসল আক্রমণ। লি'র জড়ো করা হাতটা একসাথে ধরে ফেললো শামান। সেইসাথে নিজের শরীরটাকে মুহূর্তের জন্যে অনেকটা স্পিঙের মতো গুটিয়ে সেটাকে ছড়িয়ে দিলো লির দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে। লি'র পেছনে পৌছে সোজা হয়ে সর্বশক্তিতে নিজেকে টান দিলো লি'র জড়ো করা দুই হাত ধরে। ফল হলো ভয়াবহ।

অনেকটা উড়ে গিয়ে উল্টোদিকে ছিটকে পড়লো লি। নিজেকে সামলে নিয়ে মাটি থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ালো শামান। লি'র মধ্যে উঠে বসার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। প্রথমে শামানের দলের লোকেরা উল্লাসধ্বনি করে উঠলো, এরপর ওদের সাথে যোগ দিলো গ্রামবাসীরা।

কিছুক্ষণের ভেতরেই লি সহ তার দলের বাকি লোকদের বন্দি করে বুঝিয়ে দেয়া হলো গ্রামবাসীদের মোড়লের কাছে। বয়স্ক মোড়ল লোকটা ওর কাছে এসে ওর দুই হাত ধরে ফেললো কৃতজ্ঞতায়। স্থানীয় ভাষার সাথে ভাঙা তিব্বতি মিশিয়ে সে বলে উঠলো। "আপনারা না থাকলে আজ আমাদের গ্রামটা তছনছ হয়ে যেত," তার দুই চোখে জল চলে এসেছে।

শামান তার হাত শক্ত করে ধরে বলে উঠলো। "এটাই তো আমাদের কাজ," ওর পেছনে দলের লোকেরাও এসে দাঁড়িয়েছে। কয়েকজন বেশ আহত হয়েছে। বাকিদের প্রায় সবার অবস্থাই বিধ্বস্ত।

মোড়ল আরেকবার এসে ওকে ধন্যবাদ জানালো। তারপর একে একে ওর দলে সবাইকে। ধন্যবাদ জানানো শেষ করে সে শামানের দিকে ফিরে বললো, "কাল মাঝরাতে আপনারা গ্রাম থেকে বেরিয়ে আসার পর আপনার নামে একটা বার্তা এসেছে," বলে সে

জামার ভেতর থেকে একটা গোল করা চামড়ার ফালির মতো দেখতে জিনিস বের করে দিলো।

ওপরে বিশেষ একধরণের সুতো দিয়ে বাঁধা জিনিসটা। সুতোর ওপরে একটা বিশেষ সিলমোহর বসানো। ওটা দেখে একটু চমকে উঠলো শামান। বার্তাটা খুলে পড়লো ও।

“কি ব্যাপার, ওস্তাদ? কোন বিশেষ খবর?” ওর পাশ থেকে খোম্বু জানতে চাইলো। একটু আগের যুদ্ধে গাল কেটে গেছে তার। সেখান থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু মুখে হাসি।

তবে তার হাসিতে যোগ দিতে পারলো না শামান। একবার দিগন্তের দিকে দেখে নিয়ে ও খোম্বুসহ দলের বাকি সবার দিকে ফিরে বলে উঠলো। “আমার নামে একটা বিশেষ র্বাতা এসেছে,” বলে ও একটু থেমে যোগ করলো। “খোম্বু, আমি না ফেরা পর্যন্ত তোমাকে দলের নেতৃত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছি। তোমরা ডেরায় ফিরে যাও, আপাতত আমার আর ফেরা হচ্ছে না। কারণ আমাকে শান্তির মঠে যেতে হবে,” সবার উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলে ও আবারো ফিরে তাকাল দিগন্তের দিকে। নিজের বাড়ি থেকে ডাক এসেছে তার।

ফিরে যেতে হবে ঘরে, নিজের শৈশবে।

অধ্যায় তিন

বর্তমান সময়

মার্শল্যান্ড এরিয়া, স্কটল্যান্ড

জলাভূমির ওপরে ভারি পর্দার মতো ঝুলে থাকা কুয়াশার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তানভীর। শক্তিশালী পলিমারে তৈরী হালকা গ্লাভস পরা বাম হাতের একটা আঙ্গুল তুলে কুয়াশার ভেতরে সামান্য নাড়া দিলো ও। ঘোলা জলের ভেতরে হাত নাড়লে যে-ধরণের অনুভূতি হয় অনেকটা সেরকম একটা অনুভূতি হলো।

“শালারা কী জিনিস বানিয়েছে দেখেছো?” ওর পাশ থেকে এক সহযোদ্ধা বলে উঠলো। তানভীর তাকিয়ে দেখলো ওরই মতো একইরকম গ্লাভস পরা হাতের তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে সে ঝি ঝি পোকার মতো দেখতে একটা পোকা চেপে ধরে রেখেছে।

“অবস্থা দেখেছো, তানবীর?” লোকটা আইরিশ উচ্চারণে ‘ব’ আর ‘ভ’কে আলাদা করতে পারে না, যে-কারণে নামের এই বিকৃত উচ্চারণই মেনে নিতে হচ্ছে তানভীরকে। লোকটার অবশ্য অন্য কোনদিকে খেয়াল নেই। সে হাতে ধরা কৃত্রিম পোকাটা নিয়ে ব্যস্ত।

“ইটস, সো রিইয়ে...ল,” বলে সে দুই আঙ্গুল ফাঁক করতেই উড়ে চলে গেল পোকাটা। “হ্যাভ ইউ সিন ইট?” তার বিস্মিত প্রতিক্রিয়া তানভীরের চোখে ধরা পড়লো না মুখের মাস্ক আর চোখের নাইট ভিশনের কারণে।

সহযোদ্ধার বিস্ময়ের জবাব না দিয়ে বরং তার দিকে একটা আঙ্গুল তুলে সামনের দিকে ইশারা করলো তানভীর। “উইলিয়াম, এসব আজেবাজে জিনিসে মনোযোগ না দিয়ে তোমার বরং সামনের দিকে নজর দেয়া উচিত,” এ’টুকু বলে ও কুয়াশার ভেতর দিয়ে ভেসে আসা আবছা আলোর দিকে দেখালো। শীতকালে রাতের বেলা মাঝ নদীতে টর্চ জ্বাললে যেমন দেখায় অনেকটা সেরকম দেখতে ঘোলাটে একটা আলো ভেসে আসছে সামনে থেকে। জলাভূমির ওপরে ভেসে থাকা কুয়াশার ঘন স্তরের ভেতর দিয়ে ভেসে আসা আলো একটু প্রাণের আভাস দিচ্ছে ওদেরকে।

বাংলাদেশি তানভীর আর আইরিশ উইলিয়াম এই মুহূর্তে বসে আছে স্কটল্যান্ডের কুখ্যাত এক জলাভূমির ভেতরে। এরকম অদ্ভুত জলাভূমি অদ্ভুত কাঁদা আর এমন পর্দার মতো ঘন কুয়াশা এর আগে কখনো দেখেনি বাংলাদেশের ছেলে তানভীর মালিক। ওর পাশে বসা উইলিয়ামের অবস্থাও অনেকটা একইরকম। এই গভীর রাতে ভয়াবহ ঝুঁকিপূর্ণ জলাভূমিতে ওদের অবস্থান নিতে হয়েছে বিশেষ একটা অপারেশানের কারণে। ওদের

কাছে খবর আছে কুখ্যাত এক সন্ত্রাসী এই বাড়িতেই আত্মগোপন করে আছে। যাকে ধরার জন্যে জার্মান পুলিশ আর স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের এই যৌথ অপারেশান।

উইলিয়ামকে সাবধান করে দেবার প্রায় সাথে সাথেই কানে লাগানো এয়ার পিসের ভেতর থেকে ভেসে এলো অপারেশান কমান্ডারের ভারি গলা। "উইলি, এখানে ফালতু আলাপ করার জন্যে তোমাদেরকে ডেকে পাঠানো হয়নি। নিজের কাজে মনোযোগ দাও। যেকোন সময়ে এয়ার সাপোর্ট ব্যাকআপ কনফার্ম করা মাত্রই অপারেশন শুরু করা হবে। কাজেই প্রস্তুত থাকো।"

কমান্ডারের সাবধানবাণী শেষ হতেই উইলির দিকে তাকিয়ে সামান্য মাথা নাড়লো তানভীর। ভাবটা এমন, যেন বলছে আমি আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম। ওর মাথা নাড়ার জবাবে উইলিও চোখ মটকালো, যদি দুজনার কেউই কারো কোন প্রতিক্রিয়া দেখতে পেল না তবে দুজনেই একে-অপরের টিটকিরি অনুভব করে নিলো। পরনের পলিমারের বুলেট প্রুফ জ্যাকেটের গায়ে একবার হাত ঘসে নিয়ে হাতের স্টান-সাবমেশিনগানের হাতলটা শক্ত করে ধরলো তানভীর।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত অত্যাধুনিক সব কমান্ডো আউটফিট আর অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আছে ও। কাপড়ের চেয়েও হালকা স্পেশাল পলিমারের বুলেটপ্রুফ ভেস্ট, কার্বনের লাইট-ওয়েট ছুরি, লেজার বিমের কাটার, ফগ স্টিমুলেটেড নাইট ভিশন এসবের লেটেস্ট ভার্সন তো আছেই সেইসাথে অবাক করার মতো একটা অস্ত্র আছে ওদের সাথে।

অস্ত্রটা দেখতে হুবহু সাবমেশিনগানের মতো, কিন্তু সাবমেশিনগানের সাথে এটার একটা পার্থক্য হলো, এটাতে সাবমেশিনগানের মতো গুলি বের হবার জন্যে কোন ব্যারেল নেই বরং এটার সামনের অংশ দেখতে অনেকটা সাধারণ টিভি রিমোটের সামনের অংশের মতো। ট্রিগারে চাপ দিলে ওটার সামনের অংশ দিয়ে খুব হালকা স্ফুলিঙ্গের মতো দেখতে একটা জিনিস বেরিয়ে যায়। ওটা আসলে বিদ্যুৎ। বিশেষ প্রক্রিয়ায় বিদ্যুতকে ছোট-ছোট ইউনিটে বন্দি করে ছুঁড়ে দেয়া হয় প্রতিপক্ষের গায়ে।

সাধারণ সাবমেশিনগানের যে-জায়গাটাতে সেফটি লক থাকে সেখানে এটাতে সেফটি লকের পরিবর্তে ছোট একটা মেজারমেন্ট ইউনিট দেয়া আছে। ওটা দিয়েই নির্ধারণ করা যায় কতোটুক শক্তির বিদ্যুৎ ছুঁড়ে দেয়া যাবে প্রতিপক্ষের গায়ে। মোটামুটি দশ থেকে পঞ্চাশ ইউনিটের যেকোনটা ছুঁড়ে দিলেই তাৎক্ষণিক জ্ঞান হারানো থেকে শুরু করে শরীরের নির্দিষ্ট অংশ অচল হয়ে যাওয়া, এমনকি সাথে-সাথে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটানো সম্ভব। অস্ত্রের দুনিয়ায় একেবারে আধুনিক সংযোজন এই জিনিসটা তুলে দেয়া হয়েছে ওদের হাতে। কারণ অপারেশনটার গুরুত্বও অপরিসীম।

তানভীর বাম হাতের কব্জির কাছে লাগানো ঘড়ির মতো দেখতে একটা জিনিসে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো। ঘড়ির মতো দেখতে জিনিসটা আসলে একটা ছোট একটা

অবর্জাবেশন ইউনিট। এটাতে প্রত্যেকের অবস্থান সহ পুরো অপারেশনের আউটলেটের ইনপুট দেয়া আছে। শেষবারের মতো আরেকবার দেখে নিলো ও আউটলেটটা।

চারপাশে বিস্তৃত জলাভূমির ঠিক মাঝখানে একেবারেই নির্জন জায়গায় এই বাড়ি। তথ্য অনুযায়ী এতেই বর্তমানে অবস্থান করছে অবসরপ্রাপ্ত কুখ্যাত ফরাসি খুনি ও বর্তমান ড্রাগ লর্ড সারভান্সে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড আর এফবিআইয়ের যৌথ অপারেশনটা সাজানো হয়েছে খুব সংক্ষেপে ও সাবধানে। বাড়িতে প্রবেশের ও বেরুবার দুটো রাস্তা আছে। সে-দুটোকে এই মুহূর্তে কভার করে একদিকে তানভীর আর উইলিয়াম অন্যদিকে কমান্ডার ও তার সাথে আরেকজন। এর পাশাপাশি বাড়িটার দেয়ালের কাছে এই মুহূর্তে অবস্থান করছে আরো দুজন। মোট ছয়জন মিলে অপারেশটা চালানো হবে। এই মুহূর্তে ওরা অপেক্ষা করছে ওপর থেকে এয়ার সাপোর্টের।

এয়ার সাপোর্ট বলতে ড্রোন। ওদের অস্থায়ি অপারেশান সেন্টার থেকে দু'টো ড্রোন ফ্লাই করার কথা, ওদেরকে ভিজুয়্যাল দেয়ার জন্যে। তানভীর ওপরে দেখার জন্যে মাথা তুলতেই বিল্ট-ইন এয়ারফোনে কমান্ডারের গলা ভেসে এলো।

"এয়ার সাপোর্ট ইজ হেয়ার," কমান্ডারের গলা শোনা মাত্রই উইলি আর তানভীর দুজনেই নিজেদের কব্জির ঘড়ির মতো ইউনিটটা ওপেন করলো। প্রায় সাথে-সাথেই একটা ঘোলাটে ছবি ভেসে উঠলো ইউনিটে।

"কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না," কুয়াশার করণে ড্রোন থেকে পাঠানো ইমেজ একেবারেই ঘোলাটে দেখাচ্ছে। তবে ধীরে-ধীরে ঘোলাটে ভাবটা কেটে গিয়ে সম্পূর্ণ বাড়িটার একটা ছবি ফুটে উঠলো। প্রায় সাথে-সাথেই আবারো ভেসে এলো কমান্ডারের গলা।

"স্কট আর ম্যাথিউ পশ্চিম দিক থেকে বাড়িতে প্রবেশের পথ প্রায় পরিষ্কার করে ফেলেছে। ওরা ক্লিন সিগন্যাল দিতেই তানভীর আর উইলি ওদের সাথে বাড়িতে প্রবেশ করবে। একই সময়ে আমি আর জেরি পূর্ব দিকের ছোট গেটটা টপকে ভেতরে ঢোকার পর প্রথমে গ্রাউন্ড ফ্লোর ক্লিয়ার করবে তোমরা তিনজন, আর বাকি দুজনকে নিয়ে আমি ওপরে যাবো। রিমেমবার, বি কেয়ারফুল অব বডি সেন্সর। আমরা কাউকে মারবোও না আবার পালিয়েও যেতে দিবো না। আমি আবারো বলছি..." কমান্ডারের কথা শেষ হবার আগেই কারো চিৎকার শোনা গেল সেইসাথে ধুপ করে একটা শব্দ। ওদের সবুজে স্ক্রিন ঘোলাটে হয়ে গেল।

"হলি শিট... হচ্ছেটা কি?" উইলির প্রশ্ন শেষ হবার আগেই কমান্ডারের গলা ভেসে এলো আবারো।

"ওরা আমাদের দুটো ড্রোনের একটাকে শুট করেছে। তারমানে ওরা টের পেয়ে গেছে আমাদের উপস্থিতি। গো গো গো..."

“বালের মাথা,” রাগের চোটে দেশি ভাষায় চেঁচিয়ে উঠলো তানভীর। সেইসাথে একলাফে কাঁদাটে জল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়াতে শুরু করলো। ওকে অনুসরণ করলো উইলি। দেয়ালের প্রায় কাছাকাছি পৌছে দেখলো স্কট আর ম্যাথিউ দেয়ালের ওপরে কাঁটাতারের বেড়া অনেকখানি সরিয়ে চড়ে বসেছে ওপরে। ওরা কাছাকাছি পৌছাতেই একজন লাফিয়ে পড়লো অন্যপাশে। দ্বিতীয়জনও ঠিক একইভাবে অনুসরণ করলো প্রথমজনকে।

“উইলি, তুমি আগে,” বলেই দুইহাত জড়ো করে ধরলো ও। ওর দিকে একবার মাথা নেড়ে একটা পা তানভীরের জড়ো করা দুই হাতের ওপরে তুলে দিলো। তানভীর জোরে একটা ঠেলা দিলো ওপরের দিকে। এক লাফে উইলি উঠে গেল দেয়ালের ওপরে। উইলি ওপরে উঠতেই, দ্রুত বেগে কয়েক পা পিছিয়ে এলো তানভীর। বিদ্যুৎবেগে দৌড় দিয়ে লাফিয়ে উঠলো দেয়ালের দিকে। ওর একটা হাত ধরে ফেললো উইলি। তানভীর উঠে বসতেই দুজনেই প্রায় একসাথে লাফিয়ে নেমে এলো দেয়ালের অন্যদিকে।

ওরা নামার সাথে সাথেই কয়েক রাউন্ড গুলি এসে লাগলো আশেপাশে। ছোট একটা ঘরের পেছনে আড়াল নিলো দুজন। ওটার অন্যপাশে দেখতে পেল স্কট আর ম্যাথিউ বসে আছে। ওরা আড়াল নিতেই আঙ্গুল দিয়ে বিশেষ একটা ইশারা করলো স্কট। মাথা নাড়লো তানভীর।

স্কট মাথা বের করে নিজের পিস্তল বের করে কয়েক রাউন্ড আলগা গুলি করলো। অন্যপাশ থেকে নিজের স্টান-সাবমেশিন দিয়ে দোতলার একটা ছায়াকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে দিলো তানভীর। স্কটের গুলিগুলো ছিল কভার। তানভীর গুলি করতেই ও দেখলো ছোট একটা স্পার্কের মতো বেরিয়ে গেল সাবমেশিনটা থেকে। আর অন্যপাশে গুলি করতে থাকা ছায়াটা চিৎকার করে পড়ে গেল মাটিতে।

“বাহ, দারুণ তো,” আনমনেই বলে উঠলো তানভীর।

“আসলেই দারুণ, কিন্তু কিভাবে সম্ভব?” উইলি আবারো বলে উঠলো। সে ছোট ঘরটার ততোধিক ছোট দরজা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখছে। জায়গাটা একটা ছোট খোঁয়ার। ভেতরে এক দঙ্গল মুরগি কল-কল করছে। “শালারা মুরগিও বানিয়েছে!”

“উইলি, চলো,” বলে ওকে নিজের কনুই দিয়ে মৃদু একটা গুঁতো দিয়ে ঘরের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়ালো তানভীর। একবার চেক করে নিলো স্টান সাবমেশিনের পাওয়ার রেঞ্জ। ঠিকই আছে, মনে হলো। দুইপাশে তাকিয়ে দেখলো ওর সাথে আছে বাকি তিনজন। আঙ্গুলের ইশারায় আরেকটু ছড়িয়ে পড়ে এগোতে বললো ওদেরকে। একে অপরের থেকে চার ফিট দূরত্ব রেখে ওরা বাড়িটার দিকে এগোতে লাগলো। বাড়ির এখানে-ওখানে লোকজনের নড়া-চড়া আর হাঁক-ডাক শোনা যাচ্ছে। তবে তানভীর অনুমান করলো বাড়ির ভেতরে লোক সংখ্যা খুব বেশি হবে না।

ভেতর থেকে দৌড়ে বের হয়ে এলো আরেকজন। সাথে সাথে উইলি গুলি করলো তাকে। গুলির শব্দের সাথে সাথে উইলির উচ্ছাস-ধ্বনি বেরিয়ে এলো গলা দিয়ে। মৃদু হেসে উঠলো তানভীর। বাড়ির ভেতরে কয়জন থাকতে পারে একটা অনুমান করে কমান্ডারকে বলতে যাবে তার আগেই কমান্ডারের অস্পষ্ট গলা ভেসে এলো, সে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করতে যাচ্ছে পেছন দিয়ে।

নিজের সঙ্গীদেরকে দ্রুত এগোতে বললো তানভীর। ইতিমধ্যে ও আরো দুজনকে ওরা ঘায়েল করেছে স্টান-সাবমেশিন দিয়ে। বাড়িটার দরজার কাছে এসে থেমে গেল তানভীর। খোলা দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে মন সায় দিচ্ছে না ওর। এসব মিশনে খুব সহজে কিছু হওয়া ওর ঠিক পছন্দ নয়। তবে ও মানা করার আগেই উইলি ভেতরে ঢুকেই গুলি খেয়ে পড়ে গেল। ধুপ-ধাপ আরো কয়েকটা গুলি ভেসে এলো খোলা দরজা দিয়ে। একবার পিছিয়ে গিয়েও থেমে গেল তানভীর।

সময় নেই, ভেতরে যেকোন সময় কমান্ডারের সাহায্য দরকার হতে পারে। ও স্কটের দিকে একবার ইশারা করেই মাটিতে ডাইভ দিয়ে ঢুকে পড়লো দরজার ভেতরে। সোজা হয়ে দেখলো দুজন উৎ পেতে বসে আছে সিঁড়ির কাছে। সোজা একজনের কপালে গুলি করলো ও। অন্যজনকে সরাসরি শরীরে গুলি না করে গুলি করলো সিঁড়ির রেলিঙে। লোকটা সিঁড়ির স্টিলের রেলিঙে হেলান দিয়ে বসে ছিল, তীব্র কারেন্টের ধাক্কায় সাথে সাথে জিভ বেরিয়ে এলো তার।

দুজনকেই নিকেশ করে মাটিতে পড়ে থাকা উইলির দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিলো ও। গুলি খেয়ে পড়ে গেলেও পলিমারের বুলেট প্রুফ জ্যাকেটের কারণে তেমন কিছু হয়নি তার। স্কট আর ম্যাথিউও প্রবেশ করলো ভেতরে। এমন সময় ওপর থেকে ভেসে এলো তীব্র চিৎকার। চারজনেই দৌড় দিলো ওপরের দিকে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে ওরা ছুটে গেল চিৎকার লক্ষ্য করে। ওপরে উঠতেই বড় একটা কামরার বাইরে একজনকে অস্ত্র তুলতে দেখে তাকে ফেলে দিলো ম্যাথিউ। তিনজনকে তিনদিকে ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়ে ও নিজে প্রবেশ করলো বড় কামরাটায়।

উত্তেজনায় শরীরের প্রত্যেকটা লোম দাঁড়িয়ে গেছে ওর। ভেতর থেকে ভেসে আসছে হুঁটোপুটির শব্দ। সাবধানে কামরায় প্রবেশ করলো ও। ভেতরে ঢুকে দেখতে পেল কমান্ডারের সঙ্গী পড়ে আছে মাটিতে। তাকে টপকে আরেকটু এগোতে বেডরুমের লাগোয়া বারান্দায় দেখতে পেল কমান্ডার আর অন্য এক লোক হাতাহাতি লড়াই করছে। লোকটাকে দেখে চিনতে না পারার কোন কারণ নেই।

সারভান্সে।

তানভীর ঝেড়ে দৌড় দিলো বারান্দার দিকে কিন্তু জায়গামতো পৌছানোর আগেই কমান্ডার আর সারভান্সে জড়াজড়ি করে পড়ে গেল বারান্দার রেলিঙ টপকে।

তানভীর দৌড়ে গিয়ে দেখলো দুজনেই ছিটকে পড়েছে নিচের টালি করা বারান্দার চালের ওপরে, সেখান থেকে ছিটকে পড়লো আঙ্গিনাতে।

"শিট," আনমনেই বলে উঠলো ও। নিজের সঙ্গীদেরকে নিচে নামতে বলে খানিকটা পিছিয়ে এসে দৌড় দিলো ও। রেলিং টপকে শূণ্যে লাফ দিলো ও। শরীরটাকে যথাসম্ভব গুটিয়ে বিশেষ একটা কায়দায় নিয়ে এলো। এতে ক'রে পতনের ধাক্কা কম লাগবে। তবে কায়দায় খুব একটা কাজ হলো না। বারান্দার টালি করা ছাদের ওপর পড়ে মনে হলো হাড় সব গুড়িয়ে গেছে। একটা গড়ান দিয়ে টালি থেকে লাফিয়ে নামলো ফিট আটেক নিচের আঙ্গিনাতে।

মাটিতে পড়েই অস্ত্র তুললো ও। একগাদা ভাঙা টালি আর রক্তের ছিটে দেখা গেল মাটিতে।

কারো চিহ্নমাত্র নেই। অস্ত্র তুলে সাবধানে আরেকটু এগোল ও। একদিকে বাড়ির দরজা, অন্যদিকে একটা গ্যারাজের দরজা হাট করে খোলা। কোনটার দিকে এগোবে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই গ্যারেজের খোলা দরজা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এলো একটা পিকআপ। আরেকটু হলেই মাড়িয়ে দিতে যাচ্ছিলো ওকে। একেপাশে লাফিয়ে সরে গিয়ে অস্ত্র তুললো ও।

পিকআপটা বাড়িটার মূল গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ওটার দোদুল্যমান অবস্থা দেখে বুঝলো, ওটার সামনের অংশে সম্ভবত কমান্ডার আর সারভাঙ্গে দুজনেই এখনো লড়াইয়ে ব্যস্ত।

স্টান-সাবমেশিনটা খাপে রেখে কোমর থেকে আসল পিস্তল বের করে আনলো তানভীর। মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো ও। পিস্তল তুলে টানা কয়েকটা গুলি করলো পিকআপের নির্দিষ্ট একটা পয়েন্ট লক্ষ্য করে। ওটা এমনিতেই টাল-মাতাল অবস্থায় ছিল, গুলি খেয়ে সোজা ধেয়ে গেল দেয়ালের দিকে। বাড়ি খেয়ে থেমে গেল ওখানেই। পিস্তল রেখে স্টান-সাব তুলে নিয়ে রেডিওতে বাকি সঙ্গীদেরকে সাবধান করতে-করতে দৌড় দিলো ও। পিকআপটা ঘিরে ধোঁয়ার আস্তরণ, সেটা পরিষ্কার হতেই আঁতকে উঠলো তানভীর।

পিকআপের খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে দুজন মানুষ। এই মহূর্তে রক্তাক্ত সারভাঙ্গের হাতে একটা পিস্তল। সেটা সে চেপে ধরে রেখেছে আহত কমান্ডারের মাথার পাশে।

তানভীর এগিয়ে যেতেই ওর দিকে তাকিয়ে বিভৎস ভঙ্গিতে হেসে উঠে রক্তাক্ত থুতু ফেললো সে। "কিছু বলবো, ছোকরা? সিনেমার কোন ডায়লগ?" বলে সে আবারো হেসে উঠলো সে।

"দরকার নেই, এরকম ডায়লগ আমি বহু শুনেছি," বলেই গুলি করলো তানভীর। সারভাঙ্গেকে নয় বরং কমান্ডারকে।

নির্দিষ্ট পরিমাণ ভোল্টেজের গুলি কমান্ডারের গায়ে লাগতেই কমান্ডারের চোখ উল্টে গেল। সেইসাথে তাকে ধরে থাকা সারভান্সেও একই পরিমাণ ভোল্টেজের শক খেয়ে ছেড়ে দিলো কমান্ডারকে। স্টান-সাবটা ছেড়ে দিয়ে একটানে কোমর থেকে আসল পিস্তল বের করে সারভান্সের পায়ে গুলি করলো তানভীর।

গুলি খেয়ে মাটিতে পড়ে কাতরাতে থাকা সারভান্সের কাছে কাছে এসে তার পায়ের ক্ষততে পা দিয়ে চাপ দিলো তানভীর। মুখে বলে উঠলো, "এবার আমি কিছু বলবো, গডফা-দা-র..."

ওর কথা শেষ হবার আগেই চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা হতে শুরু করলো। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো দুলতে লাগলো সব। সেইসাথে ধাতব একটা শব্দ। ওর কান ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠলো তালির শব্দে। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার সাথে সাথে আপনাতেই তানভীরের হাত চলে গেল মাথার দুইপাশে লাগানো ভার্চুয়াল স্টিমুলেটরটাতে। হাতে ধরে ওটাকে টান দিতে যাবে, কেউ ওর হাত চেপে ধরলো। "ধীরে ধীরে..." বলেই কপালের পাশ থেকে আলতোভাবে টান দিয়ে স্টিমুলেটরটা খুলে নিতেই অ্যান্টিসেপ্টিকের গন্ধ নাকে এসে লাগলো। "ধীরে-ধীরে চোখ খুলুন," শেষ কথাটা না বললেও চলতো। কারণ ইতিমধ্যেই চোখ খুলে ফেলেছে ও। আলো খুব অল্প তাই চোখে আলোর ধাক্কা লাগলো না কিন্তু গা গুলানো একটা ভাবের সাথে ওর মনে হলো পেটের সবকিছু উগড়ে দিবে। দাঁতে দাঁত চেপে ধরলো ও।

এখনো বাস্তব জগৎ আর ভার্চুয়াল জগতের ভেতরে পরিভ্রমণের ভেতরে রয়েছে ওর মস্তিষ্ক। শরীর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেও বাস্তবতার সাথে মানিয়ে নিতে মস্তিষ্কের কিছুটা সময় প্রয়োজন। ওরা এইমাত্র যে-অপারেশনটা সম্পন্ন করলো সেটা পুরোটাই কৃত্রিম ভার্চুয়াল সেটিঙে বানানো।

বর্তমান উন্নত বিশ্বে যেকোন পুলিশ কিংবা মিলিটারি ট্রেনিঙে সত্যিকারের অপারেশনে যাবার আগে এই ধরণের ভার্চুয়াল ট্রেনিং দেয়া হয়ে থাকে। পুরো অপারেশরটাই সাজানো হয় কৃত্রিমভাবে। সমস্ত ইনপুট দেয়ার পরে অপারেশনর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের মাথার পাশে লাগানো হয় ভার্চুয়াল স্টিমুলেশন সেন্সর। এরপর তাদেরকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় একেবারেই বাস্তবের মতো অপারেশন সম্পন্ন করতে হয়। তানভীরদের অপারেশনটাও ছিল সেরকমই একটি ভার্চুয়াল স্টিমুলেশন প্রোগ্রাম।

চোখের সামনেই ডাক্তারি কোট পরা সোনালি চুলের একজন মানুষকে দেখতে পেল ও, গোল গোল চশমার ভেতর দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। তার পাশেই দাঁড়িয়ে আরেকজন নোট নিচ্ছে একটা ছোট্ট প্যাডে। "রিল্যাক্স মাই বয়, বড় বড় নিঃশ্বাস নাও। ঠিক হয়ে যাবে। তোমার মস্তিষ্ক এখনো ভার্চুয়াল জগৎ থেকে বাস্তব জগতে ফিরে আসার ভ্রমণটা সম্পন্ন করে উঠতে পারেনি। কাজেই..." ডাক্তারের কথা পুরো পুরোপুরি শুনতে পাচ্ছে না তানভীর ও দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বমি সামলাতে ব্যস্ত। একটু ধাতস্থ হতেই

কেউ একজন জলের বোতল ধরিয়ে দিলো ওর হাতে। জল খেয়ে অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে এলো।

আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো ওর দুইপাশে অনেকগুলো চেয়ারে একটু আগের ভার্চুয়াল অপারেশনের সবাই আধশোয়া হয়ে আছে। দু'য়েকজনকে দেখতে পেল সামনে রাখা পটে বমি করছে। খক-খক করে কাশছে কয়েকজন। নিজে স্বাভাবিক হয়ে হেলান দিলো চেয়ারে। মুখে ফুটে উঠলো মৃদু হাসি।

"ওয়েলকাম মাই বয়, হায়েস্ট ডিগ্রী ভার্চুয়াল স্টিমুলেশন অপারেশান সাকসেসফুল করে ফিরে আসার জন্যে," ওর সামনে দাঁড়ানো সোনালি চুলের সেই ডাক্তার হাসিমুখে বলে উঠলো।

"ইট ওয়াজ ফাকিং রিয়েল, সো ফাকিং রিয়েল..." ওর পাশ থেকে উইলি বলে উঠলো। "আমি কুয়াশা পর্যন্ত ফিল করতে পারছিলাম। ঝি-ঝি পোকা, এমনকি খোঁয়ারের ভেতরে শালার ফাকিং মুরগিগুলো পর্যন্ত সত্যিকারের লাগছিল..." উইলি কথা শেষ করার আগেই তার পাশ থেকে বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে এসে সপাটে তানভীরের কাঁধে একটা চড় মারলো অপারেশন কমান্ডার।

"ব্লাডি সোয়াইন, ইউ শট মি," দুই হাতে ধরে শক্ত করে ওকে চেয়ার থেকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলো ওদের কমান্ডার। "সাহস কতো বড়! আমাকে গুলি করেছে সে," সত্যিই কমান্ডারের বিস্ময় বাঁধ মানছে না। দলের অন্যদের দিকে তাকিয়ে অভিযোগের স্বরে বলে উঠলো সে, "তিন মাস ধরে ট্রেনিং দিলাম আমি, আর সে কিনা..." কমান্ডারের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসছে তানভীর।

"তুমি এই কথা বলছো কমান্ডার, এই কালুয়া আমার পায়ে গুলি করেছে, তারপর আবার জুতো দিয়ে চেপে ধরেছে... অন্যপাশ থেকে পায়ের পাজামা তুলে হাঁটুর নিচের লাল দাগ দেখাচ্ছে সরকারের বিশেষ ক্ষমাপ্রাপ্ত সাবেক ড্রাগ লর্ড ও বর্তমান স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ট্রেনিং প্রোগ্রামের অফিসার সারভান্সে।

"ও মাই গড, ইটস রিয়েল," তানভীর সহ সবাই অবাক হয়ে সারভান্সের লালচে হয়ে ওঠা জায়গাটা দেখতে দেখতে বলে উঠলো। আরো দুয়েকজন নিজেদের এরকম আঘাতের চিহ্ন দেখাতে লাগলো।

"ব্যথা ও আঘাতগুলো আমাদের মস্তিষ্কে বাস করে আর এ'ধরণের ভার্চুয়াল স্টিমুলেশন তো সম্পূর্ণ মস্তিষ্কেরই ব্যাপার। এ'কারণেই..." ডাক্তার ব্যাখার সুরে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই একাধিক মানুষের পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। সর্বোচ্চ হাই কমান্ডের লোকজন ল্যাবে প্রবেশ করতেই ওরা সবাই সটান দাঁড়িয়ে গেল। ইংল্যান্ডসহ আরো বিভিন্ন দেশ থেকে আসা মোট এগারোজন ট্রেইনি অফিসার। গত তিনমাস ধরে ওরা সবাই এই বিশেষ ট্রেনিং প্রোগ্রামে ট্রেনিং নিচ্ছে।

"কনগ্রাচুলেসন্স বয়েজ, প্রথমবারের মতো রিয়াল ভার্চুয়াল স্টিমুলেশান অপারেশন সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্যে," বলেই চীফ ট্রেইনিং প্রোগ্রাম অফিসার তানভীরের দিকে ফিরে বলে উঠলো। "অফিসার তানভীর মালিক, ইউ রিয়েলি ডিড আ গুড জব দেয়ার," বলে সে একটা ট্যাব থেকে পড়তে লাগলো। "ইন্সট্যান্ট ডিসিশন মেকিং, সাহসিকতা ও দক্ষতার জন্যে সর্বোচ্চ মার্ক পেয়েছো তুমি," চীফ এই পর্যন্ত বলতেই সবাই তালি দিয়ে উঠলো। "তবে, অপারেশনের নিয়ম ভাঙার জন্যে অনেক মার্কস কেটে নেয়া হয়েছে তোমার। এ'কারণেই আজকের অপারেশানে কমান্ডো টিমে সর্বোচ্চ মার্কস পেয়ে প্রথম হয়েছে..." চীফ অফিসার একে একে সবার নাম ঘোষণা করে গেল। ব্রিফিং শেষে সে জানালো ট্রেনিঙের এই শেষ পর্যায়ে এরকম আরো দুটো ভার্চুয়াল প্রোগ্রামে অংশ নিতে হবে ওদেরকে। সবশেষে একটা সত্যিকারের অপারেশনের পর সম্পন্ন হবে ওদের ট্রেনিং প্রোগ্রাম।

ওরা ল্যাব থেকে বেরিয়ে আসার সময় ওর কানের কাছে মুখ এনে ফরাসি টানে সারভান্সে বলে উঠলো, "তুমি একটা সত্যিকারের হারামি," দাঁত বের করে তার দিকে নিজের মধ্যাঙ্গুলি প্রদর্শন করতে যাচ্ছিলো তার আগেই চীফ কমান্ডার ডাক দিলো ওকে।

দলের বাকিদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ও চলে এলো চীফের রুমে। গত কয়েকমাসের ট্রেনিঙে দলের সদস্যদের সাথে তো বটেই চীফের সাথেও বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ও।

"হ্যালো, চীফ," তার রুমে প্রবেশ করে একটা চেয়ার টেনে বসতে-বসতে বলে উঠলো ও।

"হ্যালো, তানভীর... আজকের অপারেশনে তোমার পারফরমেন্স সত্যি অতুলনীয় ছিল। ট্রেনিঙের শুরুর তুমি আর এখনকার তোমার ভেতরে অনেক পার্থক্য। ব্যাপারটা নিয়ে আমি সত্যি অনেক খুশি।"

তানভীর কিছু না বলে হাসলো শুধু। কেন জানি খুব ক্লান্ত লাগছে ওর। "হ্যাঁ চীফ, আপনি তো জানেন আমি একেবারেই ভিন্ন এক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছি। তাই শুরুতে ব্যাপারগুলো বুঝে উঠতে বেশ সময় লাগছিল। তবে আশা করছি শেষ পর্যন্ত সবকিছু ভালোভাবেই শেষ করতে পারবো।"

তানভীরের শেষ কথাটা শুনে চীফের মুখের হাসি একটু ম্লান হয়ে গেল। "সেটা আর হচ্ছে না," বলে সে ড্রয়ার খুলে একটা খাম বের করে টেবিলের ওপর দিয়ে ওর দিকে ঠেলে দিলো। "তোমার নামে বিশেষ বার্তা এসেছে। তোমার সংস্থার প্রধান জরুরি তলব পাঠিয়েছে তোমাকে দেশে ফিরে যাবার জন্যে। তবে তুমি চিন্তা করোনা, তোমার ট্রেনিং যেহেতু প্রায় নব্বই ভাগ সম্পন্ন হয়েছে কাজেই ট্রেনিং সম্পন্ন করণের সার্টিফিকেট তুমি পাবে। তবে গ্র্যাজুয়েশন প্রোগামে হয়তো জয়েন করা হচ্ছে না তোমার। তোমার সার্টিফিকেট প্রস্তুত হয়ে গেলে আমি দেশে পাঠিয়ে দিবো তোমার নামে," বলে কমান্ডার একটু থেমে যোগ করলো। "আমি তোমাকে মিস করবো, মাই বয়।"

তানভীর কোন জবাব না দিয়ে খামটা হাতে নিয়ে খুললো।

বাংলাদেশের পিবিআইয়ে হেড অফিস থেকে এসেছে চিঠিটা। ওর উইঙের প্রধান হাবিব আনোয়ার পাশা জরুরি ভিত্তিতে দেশে ফেরত যাবার নির্দেশ দিয়েছে ওকে।

চিঠিটা পড়ে খামে ঢুকিয়ে চীফের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি দিলো ও। "আমিও আপনাদের সবাইকে মিস করবো চীফ।"

মুখে কথাটা বললেও ওর মনের ভেতরে বাজছে অন্য সুর। দেশে ফিরে যেতে হবে ওকে, মাতৃভূমির ডাক এসেছে ।

অধ্যায় চার

সময়: ১৮০ খ্রিস্ট পূবার্ব্দ

শান্তির মঠ, লাসা, তিব্বত

খুব হালকা মিষ্টি একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল শামানের। ঘুমটা ভেঙে যেতেই চট করে উঠে বসলো ও। শক্ত কাঠের বিছানার ওপরে পাহাড়ি শালুক গাছের পাতা দিয়ে তৈরী পাতলা পাটিতে হাত বুলালো আনমনেই।

পাহাড় কেটে তৈরী মঠের অভ্যন্তরীণ কামরাটাতে চোখ বুলালো একবার। শেষবার এখানে আসার পর, কতো-শত বছর যেন পার হয়ে গেছে, কিন্তু সবকিছু ঠিক আগের মতোই আছে। বিছানা থেকে উঠতে-উঠতে শামানের মনে পড়ে গেল ডুকপা লামা ওদেরকে পাঠ দান করার সময়ে মাঝে-মাঝে বলতেন 'কিছু-কিছু জায়গা আর মানুষকে নাকি সময় ভুলে যায়'। নিজের শৈশবের সেই কামরাটাতে দাঁড়িয়ে হাজারো স্মৃতির ভিড়ে ডুকপা লামার বলা সেই কথাটা মনে পড়ে গেল শামানের।

সত্যিই স্মৃতি আর সময় যেন একসাথে ষড়যন্ত্র করে সময়কে আটকে রেখেছে এই কামরাতে। উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে থেকে পরিচ্ছন্ন হয়ে কামরায় ফিরে এসে ও দেখতে পেল কামরায় ছোট একটা টুলের ওপরে গেরুয়া রঙের পোশাক রেখে যাওয়া হয়েছে। কাপড়টা তুলে নিতেই শৈশবের পরিচিত সেই সোঁদা গন্ধে মনটা আনচান করে উঠলো।

চামড়ার ফতুয়া আর নিম্নবস্ত্র পাল্টে একখন্ডের গেরুয়া গায়ে চড়িয়ে নিলো ও। কামরা থেকে বেরিয়ে মঠের কিনারায় এসে দাঁড়ালো শামান।

সকালের প্রথম প্রহরের সাথে-সাথে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে পবিত্র ধূপের গন্ধ। শাস্ত্র মতে এই গন্ধ নাকি সকল নেতিবাচক প্রভাবকে সরিয়ে ইতিবাচক একটা অনুভূতি বজায় রাখে। সেইসাথে কানে এলো সেই সুমিষ্ট আওয়াজ। যে-আওয়াজে ঘুম ভেঙেছিল ওর।

শামান মঠ ছেড়েছে আজ প্রায় দেড় যুগেরও বেশি সময় আগে, অথচ এই আওয়াজ এখনো ঘুমের মাঝে শুনতে পায় ও। প্রবল ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সময়ে মনের কোনে বাজতে থাকা এই আওয়াজ শান্তি ফিরিয়ে আনে ওর মনে। এতোদিন পরে সেই সুমিষ্ট শব্দ ফিরিয়ে নিয়ে আসছে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া অসংখ্য স্মৃতি।

গেরুয়া কাপড় খন্ডটা গায়ে ভালোভাবে জড়িয়ে মঠের ঝুল বারান্দায় এসে দাঁড়ালো শামান। পাহাড়ের গা কেটে নির্মিত এই মঠের তিব্বতি ভাষায় দেয়া নামের অর্থ শান্তির মঠ। মঠের ওপর থেকে একদিকে শত মাইল ব্যাপি বিস্তৃত হিমালয়ের সারি চোখে পড়ে। অন্যদিকে তিব্বতের প্রত্যন্ত অঞ্চলের পাহাড়ি উপত্যকার অনেকটাই চোখে পড়ে এখান

থেকে। ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে শামানের মনে পড়ে গেল এই মঠের বিস্তৃত সৌন্দর্য শত-শত বছর ধরে মানুষকে বিমোহিত করে আসছে। প্রাচীন স্বেচ্ছাচারী রাজার শান্তিকামী বংশধরদের আর্শীবাদে রাজ পরিবারের প্রাচীন বসতিতে গড়ে উঠেছে তিব্বতে বৌদ্ধ ধমের সবচেয়ে বড় মঠগুলোর একটি, যার আক্ষরিক নামের প্রকৃত অর্থ শান্তির মঠ।

পাহাড়ের কিনারায় ঝুল বারান্দা ধরে হাঁটতে-হাঁটতে শামানের মনে পড়লো এই মঠে শত বছরের নিয়মের ব্যতিক্রম করেছিল সে-ই প্রথম। ওর কারণেই এক সময় শান্তির মঠে নেমে এসেছিল অশান্তির ছায়া।

ও হাঁটতে-হাঁটতে জনসন্মূখে চলে এলো। ছোট-ছোট ছেলেরা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রাত্যহিক প্রার্থনায় অংশ গ্রহণ করছে। ওকে দেখতে পেয়ে ছেলেদের অনেকেই ফিরে তাকাল। ওর ব্যতিক্রমী চেহারা এই এলাকার মানুষের সাথে একেবারেই মেলে না। আর এই ব্যতিক্রম বাচ্চাদেরকে আকর্ষণ করারই কথা। বিশেষ করে ওর কাঁধ পর্যন্ত নেমে আসা লাল চুল আর নীল চোখ খুব সহজেই আকর্ষণ সৃষ্টি করে।

প্রার্থনারত বাচ্চাদের সারি পার হয়ে ও চলে এলো মঠের আরেক ধাপ ওপরে। মঠের এই প্রান্তে নিয়মিত কঠিন শারীরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয় নবীন ছাত্রদের। শামানেরও যুদ্ধের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নেয়া হয়েছিল এখানেই। ওর মনে পড়ে গেল ছোটবেলায় প্রশিক্ষণের সেইসব কঠিন দিনগুলো। তবে এসব জায়গার কোনটাই ওর প্রিয় নয়। নিজের সেই প্রিয় জায়গাটাতে যাবার জন্যে দ্রুত পা চালালো ও।

মঠের একের পর এক দোর পার হয়ে ও চলে এলো একেবারে ওপরের দোরে। এই জায়গাটা একেবারে পাহাড়ের ওপরে। কার্নিশ দিয়ে ঘেরা জায়গাটার ঠিক মাঝামাঝি বিরাট আকারের সোনালী রঙের একটা বিরাট বুদ্ধ মুর্তি। অত্যাধিক উঁচু এই মুর্তিটা আশেপাশের দশ ক্রোশের ভেতরে যেকোন জায়গা থেকে চোখে পড়ে। মুর্তিটার চারপাশে তঞ্জুরের সারি বসানো। আসতে-যেতে একবার হাত বুলালেই আরেকটু কাছে পৌছে যাওয়া যাবে স্রষ্টার।

ওপরে উঠে শামান একটু হাঁপাতে লাগলো। ছোটবেলা থেকেই ওর যখন মন খারাপ হত, দুঃস্বপ্ন দেখতো কিংবা নিজের মা-বাবার জন্যে মনটা হাহাকার করতো- এখানে চলে আসতো ও। পাহাড়ের একেবারে ওপরে এই জায়গাটাতে এসে বুদ্ধের সামনে বসলেই অশান্ত মনটা শান্ত হয়ে আসতো ওর।

তবে এখানে এলে বেশিরভাগ সময় ও দেখতে পেতো বুদ্ধ মুর্তির সামনে নিমগ্ন হয়ে প্রার্থনারত ডুকপা লামাকে। শান্ত সৌম্য প্রার্থনারত ডুকপা লামার পাশে গিয়ে বসে পড়তো ছোট্ট শামান। ঠিক তার মতো করে অনুকরণ করার চেষ্টা করতো ও। তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়তো প্রাথনারত ডুকপা লামার কোলে। কখনো-কখনো ওর সাথে গল্প করতো ডুকপা লামা। ওকে নানা দেশের গল্প শোনাতো সে। আবারো কখনো কখনো ওকে শেখাতো ধ্যানের নিয়মাবলী, শোনাতো বুদ্ধের জীবনের নানা গল্প।

আজো এখানে দৌড়ে এসে ও ভেবেছিল প্রর্থনারত ডুকপা লামাকে দেখতে পাবে কিন্তু বুদ্ধ মুর্তির সামনের ফাঁকা জায়গাটা যেন ব্যঙ্গ করলো ওকে।

পরনের গেরুয়া বসন সামলে, পায়ের খড়ম খুলে ও উঠে পড়লো জায়গাটাতে। সাবধানে নির্দিষ্ট আসনে বসে কিছুক্ষণ নীরবে নিঃশ্বাসের ব্যায়াম করলো। তারপর ধ্যানের মাধ্যমে মনোযোগ স্থাপন করলো নিজের মাথার তালুতে। ধীরে-ধীরে নিজের মস্তিষ্কের সমস্ত শক্তি নিয়ে এলো দুই চোখের ঠিক মাঝখানে।

দীর্ঘদিনের অনভ্যাসে খানিকটা মরচে পড়ে গেছে ধ্যানের পরিক্রমায়। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর খানিকটা ধ্যনমগ্ন হয়েছে হঠাৎ সামনে বসানো তঞ্জুরগুলো থেকে ঘুর্ণনের আওয়াজ ভেসে এলো। একটু চমকে উঠে চোখ খুললো শামান। ঘুর্ণনরত তঞ্জুরগুলোর সামনে থেকে হাসিমুখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে ওর ধর্মের বড় ভাই, লামা উপাধিপ্রাপ্ত নোরবু। আবারো হাত দিয়ে তঞ্জুরগুলোকে নাড়িয়ে দিলো সে। হেসে উঠে আপন মনে মাথা নাড়লো শামান।

যদিও মঠের মানুষেরা সাধারণ মানুষদের চেয়ে অনেক বেশি সংযত হয়। এমনকি তাদের আনন্দ বা দুঃখের বহিঃপ্রকাশও এর ব্যতিক্রম নয়। তবুও নোরবুকে দেখে নিজেকে সামলাতে পারলো না শামান। মুর্তির পাদদেশ থেকে নিচে নেমে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো তাকে। ধরেই রাখলো।

“আরে, আস্তে,” বলে জোরে হেসে উঠলো নোরবু। তাকে আরো কিছুক্ষণ শক্ত আলিঙ্গনে নিষ্পেষিত করে অবশেষে ছাড়লো শামান। ছেড়ে দিতেই নিজের দুই হাতে ওর শক্ত দুই কাঁধ চেপে ধরলো নোরবু।

“দেখেছো, ছেলে কতো বড় হয়ে গেছে!” বলে ওর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে। ছোট-খাট নোরবুর চেয়ে শামান আরো প্রায় এক ফুট বেশি লম্বা। “সময় কতো দ্রুত পার হয়ে যায়, তাইনা?” বলে সে শামানকে পাশে নিয়ে চলে এলো ছাদের কিনারায়।

“সেই দিনটার কথা আজো আমার পরিষ্কার মনে আছে। বরাবরের মতোই দ্বিবার্ষিক সফর শেষ করে ফিরে আসছিলেন ডুকপা লামা। আসার পথে পাহাড়ের ধারে জঙ্গলের কিনারায় কুড়িয়ে পায় ছোট্ট একটা ছেলেকে। অদ্ভুত নীল চোখ তার, আর লাল চুল মাথায়। শুধুই কাঁদছিল সে, কিছুই বলতে পারছিল না,” বলে সে শামানের কাঁধ ছাড়িয়ে নেমে আসা চুলগুলো একটু নেড়ে দিলো। “আমার পরিষ্কার মনে পড়ে, মঠে ঢোকার পর সে অবাক হয়ে দেখছিল চারপাশ আর বার-বার ডুকপা লামার পেছনে গিয়ে লুকিয়ে পড়ছিল,” বলে সে হেসে উঠলো। “কতো আগের কথা, অথচ মনে হয় এইতো সেদিন।”

তার হাসিতে যোগ দিলো শামান। “হ্যাঁ, প্রায় ছাব্বিশ বছর আগের কথা। মঠে আসার পরে সেই অদ্ভুত দেখতে ছেলেটার দায়িত্ব পড়ে আরেক অদ্ভুত ছেলের ওপরে, যে-তখন মঠের ছোট-ছোট ছেলেদের প্রার্থনাগুরু,” বলে শামান আবারো হেসে উঠলো নোরবুর

দিকে তাকিয়ে। “এরপরে একদিন সেই লালচুলের অদ্ভুত ছেলেটা তার প্রতি মঠের সমস্ত ভালোবাসা আর অর্জন মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে মঠের নাম বদনাম করে পালালো, তাইনা?” শামানের চোখ সামান্য ভিজে উঠলো।

“শামান, আমাদের প্রত্যেকের একটা নিয়তি আছে। চাইলেও সেই নিয়তি আমারা এড়াতে পারিনা। যা ঘটেছিল সেটার জন্যে মনের গহীনের অব্যক্ত যন্ত্রণাগুলোকে প্রশ্রয় না দেওয়াই ভালো। তাতে মন শান্ত থাকে, জীবন সুখের হয়,” বলে নোরবু আবারো হেসে উঠলো। “শামান, তোমার নাম, তোমার অর্জন সবই জানি আমরা। অন্যদের ব্যাপারে জানি না তবে আমি তোমাকে নিয়ে গর্বিত।”

“সেটা আপনার মহানুভবতা। তবে আমি আপনাকে নিয়ে অধিক গর্বিত। আপনার লামা উপাধি পাবার খবর শুনে আমি কী যে খুশি হয়েছিলাম- বলার নয়,” বলে শামান আবারো নোরবুর দুই হাত চেপে ধরলো। “আচ্ছা তখন থেকে শুধু কথাই বলে যাচ্ছি। ডুকপা লামা কেমন আছেন? আমি তার সাথে দেখা করার জন্যে অস্থির হয়ে আছি। সরাসরি তার ওখানে চলে যাইনি কারণ ভেবেছিলাম হয়তো তার সকালের প্রার্থনা এখনো শেষ হয়নি। কেমন অছেন উনি?”

“তুমি কাল রাতে কখন এসে পৌছেছো? এখানে পৌছাতে কোন কষ্ট হয়নি তো?”

নোরবুর হঠাৎ এই প্রসঙ্গ পরিবর্তন একটু অবাক করলো শামানকে। “আমি মাঝরাতের আগে দিয়েই পৌছেছি,” ডাকাতের কবল থেকে রক্ষা করা সেই গ্রাম থেকে রওনা দিয়ে দুই দিনের মাথায় শামান আর ওর দল নিজেদের ডেরায় পৌছায়। ওর দলের দ্বিতীয় প্রধান খোম্বুকে দলের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে শামান রওনা দেয় মঠের উদ্দেশ্যে। তিনদিনের পথ দুই দিনে পাড়ি দিয়ে কাল রাতে এসে পৌছায় মঠে। মঠের ভেতরে অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ নিষেধ, তাই মঠের বাইরেই নিজের ঘোড়া একজন সহিসকে বুঝিয়ে দিয়ে অস্ত্র দোর-রক্ষীর কাছে জমা দিয়ে ও চলে আসে পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত মঠে। সেখানে পৌছে দেখে ছোটবেলায় ও যে-কামরাটায় থাকতো সেখানেই ওর থাকার ব্যবস্থা করেছে নোরবু। যাত্রার ধকলে ক্লান্ত শামান ঘুমিয়ে যায় প্রায় সাথে সাথেই।

“নাহ, আমার কোন সমস্যা হয়নি,” বলেই ও হঠাৎ থেমে গেল। কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করছে। “যে আপনি গত প্রায় অর্ধ যুগে কোনদিন আমার সাথে যোগাযোগ করেন নি, সেই আপনি নিজে থেকে হঠাৎ আমাকে জরুরি তলব পাঠালেন। এরপরে এখন ডুকপা লামার কথা বলতেই আপনি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করছেন, ব্যাপারটা কি, বলুন তো?” দুজনে পাশাপাশি হাঁটছিল। হঠাৎ থেমে গেল শামান। ওর সাথে থেমে গেছে নোরবুও।

একটা ব্যাপার খেয়াল করে তাজ্জব হয়ে গেল শামান। এই ধরণের মঠে সাধারণত যেসব ছেলেরা ছোটবেলা থেকে দীক্ষা নিয়ে থাকে তারা সবাই তীব্র সংযম, শরীরিক কসরৎ আর মানসিক শক্তিকে বছরের পর বছর ধরে চর্চা করতে-করতে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যায় কোন সাধারণ ব্যাপারকেই এরা অন্য দশজন সাধারণ মানুষের থেকে খুব সহজেই

আলাদাভাবে সামলাতে পারে। এমনকি নিজের আবেগও। সত্যি কথা বলতে এরা সবাই একেকজন মানুষ নামের যন্ত্রের মতো। সেই যন্ত্রদের কারো চোখে যখন জল দেখা যায় তখন সেটা অবাক করার মতোই বটে। শামান জীবনে বহু অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে গেছে কিন্তু এমন অবাক করার মতো ব্যাপার দেখেনি।

লামা নোরবুর চোখে জল।

"নোরবু, আপনি কাঁদছেন?" বলে ও এক পা এগিয়ে গেল নোরবুর দিকে। "কেউ যদি আমাকে বলতো হিমালয়ের সবচেয়ে বড় চূড়াটা ধসে গেছে, তাও আমি এতোটা অবাক হতাম না। যতোটা আপনার চোখে জল দেখে হয়েছি। কি হয়েছে নোরবু?"

নোরবু নিজেকে সামলানোর যথা সম্ভব চেষ্টা করছে কিন্তু তাতে খুব একটা কাজ হচ্ছে ব'লে মনে হয়না।

"শামান... শামান," বলে সে ভেজা চোখে শামানের দিকে ফিরে তাকাল। "ডুকপা লামা হারিয়ে গেছে। তাকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি। একমাত্র তুমিই পারো তাকে ফিরিয়ে আনতে," বলে সে একটু থেমে যোগ করলো। "যদি ইতিমধ্যেই তাকে মেরে ফেলা না হয়ে থাকে।"

অধ্যায় পাঁচ

বর্তমান সময়

টোলারবাগ এলাকা, মীরপুর

"তুই কি আমার কথা শুনছিস, নাকি আমি বাতাসের সাথে বক-বক করছি?"

"হুম্, কি?" একটু বিরক্ত হয়েই মায়ের দিকে ফিরে তাকাল তানভীর। মনে-মনে কিছু একটা ভাবছিল ও, মায়ের কথা শুনে ভাবনার তাল কেটে গেছে। "কি বললে?"

"যা ভাবছিলাম! তুই আমার একটা কথাও শুনোস নাই," ওরা পাশ থেকে রাগের সাথে বলে উঠলো মা।

"না-না শুনছি তো," মনে-মনে ও ভাবার চেষ্টা করছে মায়ের কথা থেকে মনোযোগ হারানোর আগে শেষবার কী শুনেছিল। সম্ভবত বাসার কিছু একটা নিয়ে কথা বলছিল মা। ঝড়ে বক মারতে হবে, উপায় নেই।

"বললাম তো ডাইনিং টেবিল এ-মাসেই বানাতে দিবো। আর তোমার গাছগুলোর জন্যে বড়-বড় কয়টা ড্রাম কিনে মাটি ভরে দিবো, যাতে তুমি পেঁপে, হাবি-জাবি যা যা চাষ করতে চাও, করতে পারো। ঢাকায় বাসার ছাদে তো লোকজন এখন এভাবেই বাগান করে," কথা শেষ করে মায়ের প্রতিক্রিয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো ও। মনের ভেতরে দুরাশা, হয়তো ঝড়ে বক মরেছে।

কিন্তু ওর দুরাশা মনেই রয়ে গেল, বক আর মরলো না। প্রথমে দেখতে পেল মায়ের মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠলো, তারপর সেই রাগের জায়গা দখল করে নিলো হতাশ একটা ভাব।

"তুই..." কিছু বলতে নিয়েও থেমে গেল মা। হতাশার সাথে বলে উঠলো, "তুই আমার সাথে চাপা মারতে চাস?" বলে সে তানভীরের একটা হাত ধরে আবারো হাঁটতে শুরু করলো। "দেখ বাবা, তোর বুঝতে হবে আমার বয়স হচ্ছে। তোর বাবা মারা গেছে আজকে তিন বছর। তুই আমার একমাত্র ছেলে। তোরে তো আমি কাছে পাই না। ঠিক আছে, তোরে আমি আর পাবো না এইটা আমি বুঝে গেছি। কিন্তু আমার তো একটা সঙ্গী দরকার," বলে সে তানভীরে দিকে ফিরে বলে উঠলো, "আমার স্কুলের চাকরি আর দুই বছর আছে। একবার অবসরে গেলে আমি কী করবো, বল তো? কাকে নিয়ে থাকবো। তুই তো দিন-রাত দেশে-বিদেশে টো-টো করে বেড়াবি। আমারে তুই একটা সঙ্গী দে," বলে সে থেমে গেল। তানভীরের কাঁধে একটা হাত রেখে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলে

উঠলো। “বাপ, এইবার বিয়াটা কর। এক হারামজাদির জন্যে জীবনটা আর কতো নষ্ট করবি?”

“মা!” বলে তানভীর একবার অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকালো। “তুমি তো একজন শিক্ষিত মানুষ। তুমি যদি আর দশজনের মতো করো, হবে বলো?” বলে ও একটু থেমে যোগ করলো। “আর তুমি ভালো করেই জানো তুমি যা বলছো ব্যাপারটা মোটেই ওরকম কিছু না।”

“তাইলে কীরকম আমারে বল, সেইটাও তো বলতে পারবি না। তোর কি ধারণা আমি কিছু বুঝি না!” রাগের সাথে ঝাপটা দিয়ে তানভীরের হাতটা ছাড়িয়ে সামনে হাঁটতে লাগলো মা।

“আরে, সকালবেলা এমন করলে হয়। এতোদিন পরে দেশের বাইরে থেকে এলাম। আসতেই শুরু করেছো তোমার প্যানপ্যানানি!” মায়ের পেছন পেছন জোরে হাঁটতে লাগলো তানভীর। “তোমার জন্যে আনা ঘড়িটা পছন্দ হয়েছে কিনা?”

জোরে-জোরে হাঁটছিল মা হঠাৎ থেমে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো। “তোর কাছ থেকে ঘড়ি না, তোর একটু সময় চাই আমি। দিতে পারবি?” বলে সে আবারো হাঁটতে লাগলো।

“আরে, কী করে!” বলে তানভীর জোর করে মাকে এসে ধরে ফেললো। তানভীরদের বাসা মীরপুর এক নম্বরের কাছেই টোলারবাগ এলাকায়। ওর বাবা সরকারি চাকরি করতেন। অবসরে যাবার পর ওদের তিনতলা বাড়িটা তৈরী করে যান উনি। বছর তিনেক আগে বাবা মারা যাবার পর থেকে সেটারই দোতলায় মা আর ছেলে মিলে থাকে ওরা। দেশে থাকলে আর কাজের চাপ না থাকলে সাধারণত প্রতিদিন সকালে মাকে নিয়ে হাঁটতে বের হয় তানভীর।

ওর ট্রেনিঙের শেষ পর্যায়ে দেশ থেকে জরুরি তলব পেয়ে হিথরো এয়ারপোর্ট থেকে রওনা দিয়ে কাল সন্ধ্যের দিকে দেশে এসে ল্যান্ড করে ওর প্লেন। বাড়ি আসতে-আসতে রাত। এতোদিন পরে ছেলেকে পেয়ে মা খুশিতে আত্মহারা। তবে মায়ের সাথে আনন্দ ভাগ করে নেয়ার মতো অবস্থায় ছিল না ও । জলদি ঘুমিয়ে গেছিল ক্লান্তির কারণে। তবে সকাল হতে ঠিকই মাকে নিয়ে হাঁটতে বেরিয়েছে।

টোলারবাগ এলাকাটা সুন্দর, রাস্তা-ঘাটগুলোও ঢাকার অন্যান্য জায়গার তুলনায় ভালো। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা প্রচুর লোক হাঁটাহাটি করে। একটু পর পর জল-ডাব এসবের দোকান তো আছেই সেইসাথে আছে প্রেসার-ডায়বেটিজ মাপানোর ব্যাবস্থা।

মা রাগ করার পরে বহুক্ষণ ধরে এটা-ওটা বুঝিয়ে অনেকটাই শান্ত করে একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মার ডায়বেটিজ মাপছে এমন সময় তানভীরের ট্রাউজারের পকেটে থাকা পেজারটা বাজতে লাগলো। পকেট থেকে ওটা বের করে ভ্রু কুঁচকে কিছুক্ষণ ওটার দিকে তাকিয়ে রইলো ও।

সকালে হাঁটতে বেরুলে সাধারণত মোবাইলটা বাসায় রেখে আসে তানভীর। তবে ও যে সংস্থায় কাজ করে সেটার নিয়ম অনুযায়ী মোবাইল না থাকলেও যেখানেই যাক বিশেষ একটা পেজার ওদেরকেই অবশ্যই সাথে রাখতে হয়। যাতে ক'রে যেকোন সময় অফিস ওদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। পেজারে আসা টেক্সটা পড়ে নিয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল তানভীর।

ডায়বেটিজ মাপানোর জন্যে তর্জনী ফুটো করে রক্ত নিয়েছিল যে-আঙ্গুল থেকে সেই আঙ্গুলটা মুখে পুরে কঠিন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ছে মা।

"খবর এসে গেছে, তাইনা?" বলে আরেকবার কাঁধ ঝাঁকালো তানভীরের মা। "সব মা দোয়া করে সন্তান যেন আরো পরিশ্রমী হয়, আর আমি দোয়া করি, আমার ছেলেটা যেন একটু আলসে হয়। আমি একটা জিনিস বুঝিনা, তোর বাপে যা রেখে গেছে সেটা দিয়েই তোরা কয়েক পুরুষ বসে খেতে পারবি। তাহলে তুই এমন কাজ পাগলা হয়েছিস ক্যান?"

তানভীর এগিয়ে এসে মা'র একটা হাত ধরে হাঁটতে লাগলো। "কাজ তো আর শুধু টাকার জন্যে না। তুমি তো জানোই আমি এই অভ্যাস তোমার কাছ থেকেই পেয়েছি। বাবা সারাজীবন ভালো চাকরি করেছে তারপরও তুমি কাজ করেছো কাজের আনন্দে। আসলে আসলে-" তানভীর মাকে বলার মতো কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

"শোন, বাবা। তোরা অল্প বয়সের পোলাপান মনে করিস দুনিয়ার সব বুঝিস। আসলে কিছুই বুঝোস না," বলে ছেলের একটা হাত ধরে সে বলে উঠলো, "বাবা, একটা কথা মনে রাখবি কাজ-সফলতা-বিফলতা-ভালোবাসা এগুলো জীবনের অংশ হতে পারে কিন্তু এগুলোর কোনটাই পরিপূর্ণ জীবন না। ওই মেয়েটা তোর সাথে যা করেছে সেটা হয়তো তোকে অনেকটাই বদলে ফেলেছে কিন্তু মনে রাখিস এইগুলা সবই জীবনের অংশ বরং কোনটাই ... বাদ দে। বাসায় চল। তোকে আবার অফিসে যেতে হবে।"

মায়ের আগের কথাগুলো শুনে তানভীর কিছু একটা বলতে চাচ্ছিলো কিন্তু চুপ হয়ে গেল। বাড়িতে ফেরার জন্যে রিকশা ডাক দিলো ও।

নিজের বাড়ি আসলে নিজের বাড়িই। দুনিয়ার যেখানেই যাক আর যাই করুন না কেন, সবসময়ই ওর মনের একটা অংশ পড়ে থাকে এই বাড়িতে, নিজের পরিবারের কাছে। বিশেষ ক'রে বাবা মারা যাবার পর থেকে মা একেবারেই একা হয়ে গেছে। নিজে তো সঙ্গ তেমন দেয়ই না, তার ওপরে মা বার-বার বিয়ে করার জন্যে চাপ দেয়ার পরও এসব নিয়ে ভাবারও সময় পাচ্ছে না ও। ব্যাপারটা মনে আসতেই নিজের ভেতরে একটা অপরাধবোধ কাজ করে ওর। কী করার আছে, জীবনটাই বদলে গেছে এমনভাবে।

ঘরে ঢুকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের কামরার দিকে চলে এলো ও। বাড়ির বাইরে থাকলেও মা সমসময়ই ওর কামরা সুন্দর করে গুছিয়ে রাখে। ওর মায়ের ওসিডি আছে, মানে বাংলায় যাকে বলে শুচিবায়ু আছে। বাসা-বাড়ির কোথাও এতোটুকু এলোমেলো

দেখতে পারে না। একই অভ্যাস ওরও। বরং বলা চলে ওর ওসিডি মায়ের চেয়ে একটু বেশিই।

বাসায় থাকলে নিজের কামরা থেকে শুরু করে নিজের সবকিছু ও নিজেই গুছিয়ে রাখে। এমনকি চরম ব্যস্ততার সময়ও এলোমেলো থাকতে পারে না ও। এটা নিয়ে বাড়িতে, অফিসে- বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়ে ওকে ঝামেলাও কম পোহাতে হয়নি। তবে অভ্যাস তো অভ্যাসই, ওর ধারণা কখনোই এর হাত থেকে মুক্তি নেই। কথাগুলো ভাবতে-ভাবতেই নিজের কামরা সংলগ্ন ওয়াশরুমে এসে ঢুকলো তানভীর।

ইংল্যান্ডে থেকে কেনা ফিলিপস ট্রিমার দিয়ে দাড়ি ট্রিম করে নিলো। একসময় নিয়মিত ক্লিন শেভ করলেও গত কয়েক বছর ধরে ক্লিন শেভ করেনা। শেষবার কবে ক্লিনশেভ করেছে মনেও নেই। দাড়ি রাখতে রাখতে অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে এখন। ট্রিম-শাওয়ার সেরে কাঠের আলমারি থেকে পছন্দসই পোশাক বের করলো।

এই জন্যেই মাকে ওর ভালো লাগে। ও বাড়ি না থাকলেও ওর প্রতিটা পোশাক সুন্দরমতো লন্ড্রিতে দিয়ে ওয়াশ করে এনে গুছিয়ে রাখবে। ফেডেড ডেনিম জিন্সের সাথে ইংল্যান্ডে থেকে কেনা ডানহিলের সাদা শার্ট পরে নিলো ও। অ্যাশ কালারের ব্লেজারটা বের করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। ডিসেম্বর মাসের ঠান্ডা বাইরে বেশ জাঁকিয়ে বসতে শুরু করেছে। ব্লেজার রেখে ইটালিয়ান লেদারের ডার্ক ট্যান জ্যাকেটটা বের করলো ও। পোশাক পরা শেষ করে হাতে ফসিলের ঘড়ি পরে ওর প্রিয় ফাইটার ব্র্যান্ডের বুট পায়ে গলিয়ে পাশা স্যারের জন্যে ইংল্যান্ড থেকে নিয়ে আসা প্যাকেটটা নিয়ে যখন ডায়নিং রুমে এলো ততোক্ষণে টেবিলে নাস্তা সাজিয়ে ফেলেছে মা।

ও টেবিলে এসে বসতেই দেখতে পেল মা তার ওষুধের বাক্স বের করে সিরিঞ্জে ইনস্যুলিন ভরছে।

"দাঁড়াও, আমি দিয়ে দিচ্ছি," বলে ও উঠে এলো মায়ের কাছে। "কতো দাও এখন তুমি?" মায়ের কাছ থেকে ঔষুধের মাত্রা শুনে নিয়ে সেই অনুযায়ী মিক্স করে ইনসুলিন পুশ করে দিলো মার হাতে।

নাস্তা করতে-করতে কথা বলতে লাগলো মার সাথে। "তোমার ডায়বেটিজ দিন-দিন এরকম বাড়ছে কেন? আমি না থাকলে বুঝি হাঁটো না?"

"তুই না থাকলে তো হাঁটতে ইচ্ছে করে না," নীরবে খেয়ে চলেছে মা।

"কেন, সুমন ভাইয়ের মা আর যায় না?"

"না সে তো বেশ অসুস্থ অনেকদিন ধরে, ইদানিং আর হাঁটে না," বলে উনি তানভীরের দিকে না তাকিয়েই জানতে চাইলেন। "সকালবেলা দেখলাম তোর ওটা বাজছে," পেজারটার কথা বলছে মা। "এখন আবার এতো সাজগোজ করে বেরুচ্ছিস। আবার কোথাও যাবি নাকি?"

"আরে নাহ," নাস্তা করতে-করতেই জবাব দিলো তানভীর। "সেরকম কিছু না, এখন আর ঢাকার বাইরে যাবো না। কিছুদিন নিয়মিত অফিসের বাইরে কিছুই করার ইচ্ছে নেই," প্লেটের দিকে তাকিয়েই কথাগুলো বললো ও। মায়ের সাথে দৃষ্টি মেলানোর ইচ্ছে নেই। কিন্তু ঠিকই কিছুক্ষণ পর মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল খাওয়া বন্ধ করে মা এক দৃষ্টিতে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে।

"কি? খাওয়া থামিয়ে দিয়েছো কেন?" তানভীর হাসতে-হাসতে জানতে চাইলো।

"তোর ওই মেশিনটা এখন পর্যন্ত যতোবার বেজেছে ততোবারই তুই কতো দিনের জন্যে গায়েব হয়েছিস খোদা জানে," বলে মা আবার খেতে শুরু করলো। তানভীর খাওয়া শেষ করে পেছন থেকে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে বললো, "এবার তেমন হবে না," বলে ও এবার চলে এলো নিজের কামরায়। নিজের পিস্তলটা নিতে ভুলে গেছিল।

কাবার্ড থেকে বের করে নিজের স্ট্যান্ডার্ড ইস্যু নাইন এম এম ল্যুগারটা একবার পরীক্ষা করে নিয়ে কোমরে বেল্টের সাথে আটকে গলায় একটা সিল্কের স্কার্ফ পেঁচিয়ে বেরিয়ে এলো ডায়নিং রুমে। "মা আমি বেরুচ্ছি। তোমার ইনস্যুলিন দেখলাম প্রায় শেষ। সন্ধ্যেবেলা আসার সময়ে আমি নিয়ে আসবো। আর তুমি একটা কল করে দিও সুমন ভাইয়ের দোকানে, ওরা এসে টেবিলের মাপ নিয়ে যাক। আমি পরে ডিজাইন ঠিক করে একটা ডাইনিং টেবিল আর ছয়টা চেয়ার অর্ডার করে দিবো," বলে ও একটা হাসি দেয়ার চেষ্টা করলো।

"টেবিল-চেয়ার বানালেই বা লাভ কি। ওতে বসবে কে?" গম্ভীর মুখে বলেই মা হেসে ফেললো। "আচ্ছা, ঠিক আছে যা। এখন বেরুচ্ছিস বেরুবার আগে মুখ গোমড়া করবো না।"

মা'র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ও চলে এলো গ্যারেজে। পাশা স্যারের জন্যে নিয়ে আসা গিফটের প্যাকেটটা বাইকের পেছনে নেটের সাথে আটকে বাইক স্টার্ট দিলো ও।

মিরপুর টোলার বাগ থেকে ধানমন্ডি চার নম্বরে আসতে ওর সময় লাগলো মোট ছাব্বিশ মিনিট। মনে-মনে ও ভাবলো, ব্যাপার কি, ও ঢাকা ছেড়েছে ছয় মাস হয়েছে। এরই মধ্যে কি ঢাকা শহরের জ্যাম কমে গেল নাকি। সাথে সাথেই এই দ্রুত আগমনের রহস্যটা ধরতে পারলো ও। একে তো সকালবেলা তার ওপরে আবার মঙ্গলবার। মনে-মনে ও ভাবলো, আচ্ছা এই তাহলে রহস্য। ঢাকা শহরের জ্যাম চিরজীবি হোক, কথাটা মনে-মনে বলে ও বাইকটা পার্ক করে পিবিআইয়ের মূল ভবনের দিকে এগোল।

পিবিআই-পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের ক্রিমিনাল অ্যানালিসিস উইঙের সিনিয়র অফিসার তানভীর মালিক আজ থেকে চার বছর আগে পিবিআইতে জুনিয়র অ্যানালিস্ট হিসেবে যোগদান করে বছর দুয়েক কাজ করার পর পিবিআই থেকে আলাদা করে যখন ক্রিমিনাল অ্যানালিসিসের আলাদা উইং গঠন করা হয় তখন তাতে সিনিয়র অফিসার

হিসেবে ট্রান্সফার করা হয় তানভীরকে। সেখান থেকে ধীরে-ধীরে পদোন্নতি পেয়ে বর্তমান অবস্থানে কাজ করছে ও।

ইতিমধ্যে দেশের অভ্যন্তরীণ কাজে বেশ দক্ষতা দেখানোর পর মাস ছয়েক আগে ক্রিমিনাল অ্যানালিসিস উইঙের বর্তমান প্রধান হাবিব আনোয়ার পাশার মাধ্যমে বিদেশে ট্রেনিঙে যাবার সুযোগ আসে ওর। ইংল্যান্ডের স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড আর জার্মান পুলিশের বিশেষ একটা টেকনো স্ট্রাইকিং ফোর্সের ট্রেনিঙের একেবারে শেষ ধাপে পৌছে গেছে এমন সময় ওকে জরুরি তলবের মাধ্যমে ডেকে পাঠানো হয় দেশে।

ছয় মাস আগে ওর বস হাবিব আনোয়ার পাশা বিদেশে ট্রেনিঙে যাবার জন্যে যখন ওকে মনোনীত করলো ব্যাপারটা অফিসের সবাইকে তো অবাক করেছিলই, তবে বেশি অবাক হয়েছিল ও নিজে। কারণ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড আর জার্মান পুলিশের এই যৌথ ট্রেনিঙে যাবার জন্যে ওদের অনেক ফিল্ড এজেন্টই মুখিয়ে ছিল। অফিসের সব ফিল্ড এজেন্টদের রেখে ওর মতো ডেস্কে বসা অফিসারকে বাইরে ট্রেনিঙে পাঠানোটা অবাক করার মতোই একটা ব্যাপার ছিল। সবশেষে ট্রেনিঙে যাবার জন্যে দুজনকে মনোনীত করা হয়। একজন ও নিজে আর অন্যজন আরেক ফিল্ড এজেন্ট শারিয়ার। দুজনে মিলে মাস ছয়েক আগে লন্ডনে পাড়ি দেয়। শারিয়ারের সাথে শুরুতে ওর সম্পর্কটা খুব একটা ভালো না থাকলেও একসাথে ট্রেনিঙে অনেকটা সময় কাটানোর পর দুজনের ভেতরে সুন্দর একটা বোঝাপড়া গড়ে ওঠে। তবে ওকে এভাবে জরুরি ভিত্তিতে ডেকে পাঠানোর ব্যাপারটা একটু দ্বিধার সৃষ্টি করেছে ওর ভেতরে।

এসব ভাবতে-ভাবতেই ভবনের ভেতরে প্রবেশ করে লিফটে উঠে চলে এলো টপ ফ্লোরে। মূলত ক্রিমিনাল অন্যালিসিস উইং এখন পর্যন্ত পিবিআইয়ের একটি শাখা হলেও ওরা অনেকটা স্বতন্ত্রভাবেই কাজ করে। আর তাই ওদের বস হাবিব আনোয়ার পাশা চেষ্টা করছেন দাপ্তরিকভাবে এটাকে পুরোপুরি স্বতন্ত্র একটা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার।

ওকে দেখতে পেয়ে শটগান হাতে দাঁড়িয়ে থাকা গার্ড এক গাল হেসে কাঁচের দরজাটা মেলে ধরলো। ভেতরে প্রবেশ করে দুয়েকজন কলিগের সাথে সাধারণ শুভেচ্ছা বিনিময় করে সোজা চলে এলো হাবিব আনোয়ার পাশার কামরার সামনে।

পিবিআইয়ের ক্রিমিনাল অ্যানালিসিস উইঙের প্রধান হাবিব আনোয়ার পাশার কামরার সেগুন কাঠের কারুকাজ করা দরজার ঠিক বাইরেই কাঁচ ঘেরা আরেকটা অফিস।

অফিসটা পাশা স্যারের ব্যক্তিগত সেক্রেটারি মৌসুমি জাফরিনের। এই মুহূর্তে সে তার টেবিলের ওপাশে বসে খুব মনোযোগের সাথে কম্পিউটারের কী-বোর্ডে খটাখট কিছু একটা টাইপ করে চলেছে। তার টাইপ করার স্পিড যেকোন প্রফেশনাল কম্পোজারকেও লজ্জায় ফেলে দিতে পারে।

হালকা ঘোলাটে কাঁচের অন্যপাশে থেমে গেল তানভীর। হঠাৎ সামনে গিয়ে কিছু একটা বলে চমকে দেবার ইচ্ছে ছিল ওর কিন্তু তার আগেই অন্যপাশ থেকে ভারি গলায় মৌসুমি বলে উঠলো, "হইছে! আমি চমকাইছি, এখন সামনে আয়," মৌসুমির কথাগুলো শুনে তানভীর হতাশ ভঙ্গিতে সামনে চলে এলো।

"আমি একটা জিনিস আজো বুঝতে পারলাম না, এই ঘোলা কাঁচের অন্যপাশ থেকে তুমি সবসময় ক্যামনে বুঝে যাও কে আসছে। বোঝা সম্ভব, কিন্তু তাই বলে প্রতিবার সঠিক কিভাবে বলা সম্ভব?" তানভীর এগিয়ে এসে মৌসুমির ডেস্কের এক কোনায় বসে পড়লো ও। বসের সেক্রেটারি মৌসুমির সাথে তানভীরের সম্পর্কটা বড় বোন আর ছোট ভাইয়ের মতো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ে ক্রিমিনলজিতে মাস্টার্স পড়াকালীন সময় থেকেই মৌসুমির সাথে তানভীরের পরিচয়। ওর থেকে বয়সে বেশ বড় মৌসুপি আপা ছিল ওদের ব্যাচের সেরা ছাত্রী। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র তানভীর ক্রিমিনোলজির মাস্টার্সে যখন একেবারেই ভালো করতে পারছিল না তখন এই মৌসুমিআপাই ছিল ওর একমাত্র ভরসা। সেখান থেকেই ওদের দুজনার ভেতরে ভাই-বোনের সম্পর্ক। কর্মক্ষেত্রে একইসাথে কাজ করতে করতে সেটা আরো গভীর হয়েছে।

"তিসরি আঁখ, বালক," বলে মৌসুমি কী-বোর্ডে টাইপ থামিয়ে ওর দিকে ফিরে তাকাল। "শোন, তুই মাঝে মাঝে ভুলে যাস বিহেভিয়র অ্যানালিসিসে আমি বরাবরই তোর চেয়ে ভালো ছিলাম। সবসময় মনে রাখবি মানুষকে যতোটা না তার আকৃতি দিয়ে চেনা যায় তার চেয়ে বেশি চেনা যায় তার নড়াচড়া দিয়ে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট-রেটিনা এসব যেমন প্রতিটা মানুষের আলাদা ঠিক তেমনি প্রতিটা মানুষের শরীরের নড়াচড়াও আলাদা। একবার যেকোন মানুষের সুক্ষ্ণ মুভমেন্টগুলো বুঝে ফেলতে পারলে তাকে তুই হাজারজনের ভেতর থেকেও খুব সহজেই আলাদা করতে পারবি। বুঝছিস?"

"এটা তো বুঝলাম কিন্তু তুমি ফিল্ড লেভেলে না গিয়ে এই ডেস্ক জবে কেন এলে সেটা আজো বুঝতে পারলাম না," বলে ও হাতের প্যাকেটটা টেবিলের ওপরে নামিয়ে রাখলো। "তোমার যা মেধা, দারুণ করতে তুমি।"

"দুই বাচ্চার মা হলে বুঝতি," বলে সে আবারো চোখ রাঙালো। "এসব বাজে প্যাঁচাল বাদ দে। ইর্মাজেন্সি পেজ করার দেড় ঘন্টা পর এসেছিস তুই। এটা কোন কথা। তোর এই শাস্তি মওকুফ হবে, আগে বল ইংল্যান্ড থেকে যা আনতে বলেছিলাম সেটা এনেছিস কিনা?"

"সরি আপা," বলে ও দুই হাত তুললো। "এমনভাবে ডেকে পাঠালে তোমরা, কোন কেনাকাটাই তো করতে পারলাম না," বলে ও হাতের প্যাকেটা খুলে সেটার ভেতর থেকে বড় এক বাক্স চকোলেট বের করে মৌসুমিআপার হাতে তুলে দিলো। "তাও শেষ মুহূর্তে এয়ারপোর্ট থেকে এটা কিনেছি।"

“বাহ্‌, চকলেট। দারুণ,” বলে সে প্যাকেট খুলে চকলেট বের করে মোড়ক ছিঁড়ে কামড় বসালো। “অহ্‌, মাই গড! আসল বর্নভিল, শ্যালে.. তুই নিশ্চই এত্তোগুলা চকলেট আমার জন্যে আনিস নি?” বলে সে ভ্রু কুঁচকালো।

“আরে, তোমার জন্যেই এনেছি। এখানে অনেক চকলেট। তুমি অফিসের সবাইকে দিয়ে দিও,” বলে ও টেবিলের ওপর থেকে নেমে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো। বসের জন্যে নিয়ে আসা প্যাকেটটা রেখে দিলো টেবিলের ওপরে।

“ওটার ভেতরে আবার কি? নিশ্চই বসের জন্যে। আমাদের জন্যে স্রেফ চকলেট আর বসের জন্যে গিফট।”

“এটা আমার কেনা গিফট না, বসের জন্যে তার বন্ধু আমাদের চীফ ট্রেনিং প্রোগ্রাম অফিসার দিয়েছেন। ওসব বাদ দিয়ে আগে বলো, এতো জরুরি তলব কিসের? কিছু হয়েছে নাকি?” তানভীর কাজের কথায় ফিরে আসতে চাইছে।

ওর কথা শুনে মৌসুমি আপাও একটু গম্ভীর হয়ে গেল। সে একবার মনিটরের দিকে দেখে নিয়ে বলে উঠলো, “আর বলিস না! কাল রাতে এগারোটায় বাসায় গেছি। আজ আবার সকালে সাতটায় অফিসে ঢুকে এখনো টানা কাজ করে যাচ্ছি।”

“হয়েছেটা কি? সেটা বলো,” তানভীর ভেতরে-ভেতরে কৌতুহল বোধ করছে।

মৌসুমি একটু চুপ থেকে কি জানি ভেবে নিয়ে বললো, “আমি জানি না তা বলবো না, তবে তুই বসের কাছ থেকেই জেনে নে। দাঁড়া এক মিনিট,” বলে সে ইন্টারকমে কথা বলতে লাগলো। কথা শেষ করে ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, “ভেতরে যা, বস অপেক্ষা করছেন।”

তানভীর মাথা নেড়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। “দেখি, ভেতরে কী অপেক্ষা করছে,” মৌসুমি আপার দিকে পেছন ফিরতে ফিরতে শুধু দেখতে পেল তার মুখে রহস্যময় হাসি।

বছরদুয়েক আগে এই সেকশনে আসার আগে ও সবার মুখে শুধু হাবিব আনোয়ার পাশার নামই শুনেছে। তাই মনের ভেতরে একটা ইমেজ দাঁড় করিয়েছিল মানুষটার। তাই এই সেকশনে আসার আগে ও যখন বিশেষ একটা ভাইভা ফেস করতে যায় তখন মানুষটার সাথে কথা বলে বেশ অবাক হয়েছিল। কারণ ওর মনের ভেতরে যে ইমেজ ও দাঁড় করিয়েছিল, মানুষটার সাথে তার কোন মিলই নেই। হাসিখুশি একজন মানুষ। তবুও এই সেকশনে জয়েন করার পর বসের সাথে ওর সম্পর্ক খুব একটা গভীর ছিল না। তবে ও জয়েন করার পরেই একটা বিশেষ ঘটনা ওদের দুজনকেই খুব কাছাকাছি নিয়ে আসে। তানভীর ভারি কাঠের দরজায় একবার নক করে ভেতরে ঢোকার জন্যে দরজায় চাপ দিলো।

ভেতরে ঢুকতে প্রথমেই ওর দৃষ্টি গেল বসের বিরাট টেবিলটার দিকে। কিন্তু ওটার পেছনে কেউ নেই। ও সামনে এগোতেই রুমের এক কোনা থেকে থেকে কেউ বলে উঠলো,

“আরে, তানভীর, মাই বয়, কাম অন,” হাবিব আনোয়ার পাশা বইয়ের একটা সেলফের সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকটা ফাইল ঘাঁটছিল ওকে দেখতে পেয়ে সামান্য এগিয়ে একবার ওর সাথে হাত মিলিয়ে একটা নির্দিষ্ট ফাইল তুলে নিয়ে ডেস্কে বসে পড়লো। “বলো, কি অবস্থা তোমার?”

“এই তো স্যার,” বলে ডেস্কের সামনে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো ও। টেবিলের ওপর দিয়ে প্যাকেটটা এগিয়ে দিলো আনোয়ার পাশার দিকে। “স্যার এটা আমাদের ট্রেনিঙের চীফ আপনাকে দিয়েছেন।”

“অহ্, টেডি। ওল্ড ফ্রেন্ড। তুমি আর শারিয়ার যেমন ট্রেনিং করতে গেছো একসাথে, ঠিক একইভাবে বহু আগে আমি আর টেডি আমেরিকাতে গেছিলাম প্রায় এ’ধরণেরই একটা ট্রেনিঙে অংশ নিতে। অহ, মাই গড এটা কি?” উনি প্যাকেট থেকে বের করে আনা অস্ত্রটা দেখে তাজ্জব হয়ে গেছেন। “এটা সাব মেশিনগান নাকি?”

“না, স্যার। এটা আরো অনেক উন্নতমানের জিনিস। আমি দেখাচ্ছি,” বলে ও দেখাতে লাগলো জিনিসটা কিভাবে কাজ করে। “এটাকে ওরা বলে স্টান-সাবমেশিনগান,” বলে ও সব ব্যাখ্যা করে যোগ করলো, “এইযে এখান দিয়ে কারেন্টের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। বিশেষ অ্যাডাপ্টর দিয়ে ঠিকমতো চার্জ দিলেই কাজ করে। যদিও ওরা এটাকে নাম দিয়েছে স্টান-সাবমেশিনগান আমি এটাকে নাম দিয়েছি বিদ্যুৎ চক্রবাণ।”

ছোট বাচ্চারা নতুন খেলনা পেলে যেরকম খুশি হয় আনোয়ার পাশা সেভাবেই দেখছে জিনিসটা। “কি দারুণ জিনিস বানিয়েছে, না?” বলে সে চোখ তুলে তাকাল ওর দিকে। “কি বললে, বিদ্যুত চক্রবাণ না? মহাভারতের সেই চক্রবাণ থেকে। যথাযথ নামকরণ হয়েছে। থ্যাঙ্কু,” বলে আবার প্যাকেটে মুড়িয়ে রেখে দিলো সে অস্ত্রটা। “এয়ারপোর্টে এটা পার করতে তোমার সমস্যা হয়নি?”

“না, স্যার। বিশেষ অনুমতিপত্র ছিল।”

“তা তোমার ট্রেনিং নাকি খুব ভালো হয়েছে। পারফর্মেন্সও নাকি খুব ভালো ছিল। বিশেষ করে শেষ অপারেশনে তুমি নাকি দুর্দান্ত সাফল্য দেখিয়েছো?” বলে সে হাসতে লাগলো। “যদিও বসকে গুলি করা কিন্তু খুব একটা কাজের কথা নয়,” এটা বলে সে খুব রহস্যময় একটা হাসি দিলো।

তানভীরও একটু লাজুক হাসি দিলো। “স্যার, আপনি তো তাহলে সবই জানেন। শারিয়ার আর আমি শুরুতে মাস তিনেক একই টিমে ছিলাম। পরে ওকে ভিন্ন টিমে ট্রান্সফার করা হয়। তবে শুনেছি ও ভালো করছে। ও তো শেষ পর্যন্ত থাকতে পারছে তাও,” শেষ কথাটা ও ইচ্ছে করেই একটু ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বললো।

ওর কথাটা শুনে আনোয়ার পাশার মুখে মৃদু একটা হাসি ফুটে উঠলো। “তানভীর, তুমি কি একটা ব্যাপার জানো, আমাদের দেশে সরকারিভাবে বিদেশ থেকে যখন কোন

স্কলারশিপ, ফান্ডিং কিংবা ট্রেনিঙের সুযোগ আসে তখন সেটার পেছনে কী পরিমাণ লবিং হয়?”

তানভীর বসের চোখের দিকে তাকিয়েই জবাব দিলো। “জ্বি, স্যার। আমি দুই দুইটা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি। আমি জানি, স্যার। আমার প্রশ্নটাও সেখানে। এতো এতো ভালো ফিল্ড এজেন্ট থাকতে ডেস্কের পেছনে বসা একজন অ্যানালিস্টকে কেন বিদেশে ট্রেনিঙে পাঠালেন আপনি?”

“আমি যে পাঠিয়ে ভুল করিনি সেটার প্রমাণ তো আমার হাতেই আছে,” বলে সে উঁচু করে ফাইলটা দেখালো।

তানভীর বুঝতে পারলো এতোক্ষণ বস ওর ফাইলই পড়ছিল কোন বিশেষ কারণে। “এমনকি ফিল্ড এজেন্ট শারিয়ারের চেয়েও তোমার ট্রেনিং পয়েন্ট অনেক বেশি। ঠিক কিনা?”

“স্যার, সেটা আপনারাই বলতে পারবেন,” তানভীর একটু অস্বস্তি বোধ করছে।

“তবে এগুলোর কোনটাই তোমাকে বেছে নেয়ার পেছনে মূল কারণ নয়। কারণ একটা আছে, তবে সেটা আজ না, আরেকদিন বলবো। এখন কাজের কথা হবে,” বলে সে ছোট একটা রিমোট হাতে নিয়ে ওদের পেছনের দেয়ালে বসানো বড় একটা মনিটর ওপেন করলো। “তোমার ট্রেনিং হাতে-কলমে কাজে লাগানোর সময় এসে গেছে। একটা বিশেষ ঘটনা ঘটেছে। যেটার জন্যে আমি ব্যক্তিগতভাবে তোমাকে সেই ইউরোপ থেকে টেনে এনেছি এখানে।”

“তুমি তো জানো আমি বহুদিন ধরে স্বাধীনভাবে কাজ করার মতো একটা ডিপার্টমেন্ট তৈরী করতে চাচ্ছি। সেটার প্রাথমিক কিছু প্রস্তুতিও নেয়া শুরু করেছি। সেটারই অংশ হিসেবে আমি একটা বিশেষ কাজ করতে চাচ্ছি,” বলে সে রিমোটে একটা বাটন চাপতেই মনিটরে একজন মানুষের চেহারা ফুটে উঠলো।

“উনার নাম বাবুল আহমেদ। তুমি তো নিশ্চই ইমার্জেন্সি অ্যাকশন ফোর্সের নাম শুনেছো। সংক্ষেপে যাদেরকে ইএএফ নামে ডাকা হয়। বাবুল আহমেদ ওটার প্রধান। উনি আমার কাছে একটা বিশেষ কাজে সহায়তা চেয়েছেন। উনি নির্দিষ্টভাবে তোমার নাম বলেছেন এই ব্যাপারে। যে-কারণে তোমাকে তলব করা হয়েছে,” বলে তানভীরের দিকে ফিরে তাকাল সে।

“সিলেটে একটা ঘটনা ঘটেছে দুইদিন আগে। ওরা ব্যাপারটার কোন সুরাহা করতে পারছে না। আমি চাই তুমি ওখানে গিয়ে ব্যাপারটা দেখো।”

“সিলেটে?” তানভীরের একটা ভ্রু কুঁচকে উঠলো। সিলেট শব্দটা কানে যেতেই স্মৃতির মানসপটে ফুটে উঠলো চলমান সিনেমার মতো কিছু দৃশ্য। “তবে আমি কেন?”

“বাবুল আহমেদ কেন তোমাকে চেয়েছেন আমি সঠিকভাবে জানিনা। তবে এর পেছনে একটা কারণ হতে পারে, ঘটনাটার সাথে তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা সংযোগ আছে।”

“সাস্টের?” তানভীর পুরোপুরি চমকে উঠেছে। “মানে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের?”

“হ্যাঁ, সাস্টের। সাস্টের আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্টের একজন টিচার হারিয়ে গেছে। তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই ঘটনার সাথে আরো কিছু আন্তর্জাতিক ব্যাপার জড়িয়ে গেছে। আমি চাই তুমি সিলেটে গিয়ে ব্যাপারটার একটা সুরাহা করো।”

অধ্যায় ছয়

সময়: ১৮০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ

শান্তির মঠ, লাসা, তিব্বত

“কিভাবে হারিয়ে গেল ডুকপা লামা?” খুব গম্ভীর সুরে আবারো একই প্রশ্ন করলো শামান।

ওরা এই মুহূর্তে বসে আছে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে অবস্থিত মঠের একেবারে শেষ প্রান্তে। এদিকটা একেবারেই নির্জন, মঠের বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ ছাড়া এদিকে বলতে গেলে তেমন কেউ আসে না। ওদের দুজনার সামনেই ছোট ছোট মাটির পাত্রে মাখন চা রাখা, কিন্তু দুজনার কেউই সেদিকে নজর দিচ্ছে না।

একটু আগে লামা নোরবু যখন বললো ডুকপা লামা হারিয়ে গেছে, মুহূর্তের জন্যে শামানের মনে হয়েছিল যেন পায়ের নিচে মাটি কেঁপে উঠেছে। কিন্তু নোরবুর কাছ থেকে বিস্তারিত সব জানার আগেই ওখানে মঠের প্রার্থনারত ছেলেদের একটা দল চলে আসে, সেইসাথে একজন শিক্ষানবীশ নোরবুকে এসে জানায় সকালবেলার খাবার দেয়া হয়েছে। ওরা আর কথা না বাড়িয়ে খাবারের জায়গায় চলে যায়।

মঠের খাবার খুবই সাধারণ। নিচু তক্তপোশের মতো ছোট জলচৌকির ওপরে খাবার সাজানো হয়। সেটাকে ঘিরে সবাই সারি দিয়ে একসাথে খেতে বসে। ওরাও গিয়ে শিক্ষানবীশদের সাথে খেতে বসে যায়। খাবারও খুবই সাধারণ। মঠ সংলগ্ন স্থানেই শিক্ষানবীশদেরই চাষ করা সব্জি দিয়ে পাতলা তরলমতো একটা জিনিস, যবের রুটি আর মন্ডের মতো একটা মিষ্টি জিনিস, এটাকে ওরা বলে থুকপা। খাওয়া শেষ করার পর ছোট-ছোট মাটির পাত্রে পরিবেশন করা হয় মাখন চা।

খাওয়া শেষ হবার পর চায়ের পাত্র হাতে নিয়ে ওরা চলে আসে মঠের একেবারে শেষ প্রান্তে। এখানে বসে নির্জনে কথা বলা যাবে। কিন্তু বসার পর থেকেই একই প্রশ্ন দুবার জিজ্ঞেস করেও কোন জবাব পাচ্ছে না শামান।

অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে বসে আছে লামা নোরবু। লামারা তাদের বহু বছরের সাধনায় আবেগের সংযত বহিঃপ্রকাশে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু মাঝে মাঝে যখন তাদের সেই আবরণ ভেঙে পড়ে তখন খুবই দিশেহারা হয়ে পড়ে তারা। ঠিক তেমনটাই ঘটছে এই মুহূর্তে লামা নোরবুর সাথে। ডুকপা লামা হলো তাদের কাছে বট বৃক্ষের মতো। তার অন্তর্ধানে একদিকে সবাই যেমন দিশেহারা হয়ে পড়েছে ঠিক তেমনি কী করবে বুঝে উঠতেও পারছে না।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে শামান চায়ের কাপ উঠিয়ে চুমুক দিলো। সেই পুরনো স্বাদ। কিন্তু তাতে মন বসছে না, বরং ও চায়ে চুমুক দিতে-দিতে কিছুক্ষণ দিগন্তের দিকে তাকিয়ে রইলো। "নোরবু, আপনি যদি বিস্তারিত না বলেন তাহলে আমি কিন্তু কিছুই করতে পারবো না। আর যতোই সময় অতিবাহিত হচ্ছে ততোই কাজটা আমাদের জন্যে কঠিন হয়ে যাবে। কাজেই কী ঘটেছে খুলে বলুন আমাকে।"

লামা নোরবু চোখ তুলে ফিরে তাকাল ওর দিকে। শামানের কথায় মনে হচ্ছে একটু ভরসা পেয়েছে সে। নিজেকে সামলে নিয়ে সে যখন কথা বলে উঠলো তখন অনেকটাই স্বাভাবিক শোনালো। "তুমি ভারতবর্ষের ব্যাপারে কি জানো?"

শামান মৃদু কাঁধ ঝাঁকালো। "খুব বেশি কিছু না। এটুকু জানি, ওটা সমতল ভূমি। অনেক সবুজ। জীবন-যাপন অনেক আরামের। আমাদের পাহাড়ি জীবনের মতো এতো কষ্টের জীবন নয় ওখানে। জল-ফসল-খাবার অনেক বেশি সহজলভ্য," বলে আরেকটা ব্যাপার যোগ করলো। "ও হ্যাঁ, সম্রাট অশোকের নাম শুনেছি। সে নাকি জীবনের শেষ একটা অংশ অহিংসার বাণী প্রচার করেছে। অশোকের রাজ পরিবার ভারতবর্ষের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ পরিবার। সম্ভবত সবচেয়ে বড়ও। তারা আমাদের প্রতি অত্যন্ত সহনশীল।"

"ওদের রাজ পরিবারের শাসন শেষ," দিগন্তের দিকে তাকিয়েই বলে উঠলো লামা নোরবু। "মৌর্য বংশের পতন হয়েছে ভারতবর্ষে। সম্রাট বৃহদ্রথের শুঙ্গ সেনাপতি তাকে খুন করে নিজেই রাজ্যের দখল নিয়ে নিয়েছে। এমনকি রাজ পরিবারের বেশিরভাগ মানুষকেও মেরা ফেলা হয়েছে।"

নোরবুর কথা শুনে চমকে উঠলো শামান। ও শুনেছিল সম্রাট আশোক দক্ষিণ ভারতের কলিঙ্গ রাজ্য দখলের সময়ে শেষবার এ'রকম ঘটেছিল। এরপর ভারতবর্ষ বৌদ্ধদের শাসনতলে আসার পর এরকম রক্তাক্ত ঘটনা আর ঘটেনি। "সম্রাট বৃহদ্রথের সেনাপতি..."

ওকে কথাটা শেষ করতে দিলো না লামা নোরবু, তার আগেই বলে উঠলো, "নাম পুশ্যমিত্র শুঙ্গ। ব্রাহ্মণ বংশীয় লোক সে, জাতিতে শুঙ্গ বংশদ্ভুত। যদিও সে বৌদ্ধ রাজার অধীনে কাজ করতো কিন্তু সে বৌদ্ধদেরকে দুচোখে দেখতে পারতো না। কিন্তু রাজা এটা জানতেন না। এর ফল রাজা বৃহদ্রথকে ভালোভাবেই ভোগ করতে হয়েছে। তবে রাজা তো গেছেই, তার বোকামির ফল ভোগ করতে হয়েছে তার পরিবারকেও, এখন সেই ফল ভোগ করতে হচ্ছে সাধারণ প্রজাদের।"

শামান চুপ করে রইলো। সে পুরো ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছে।

"ব্রাহ্মণ সেনাপতি রাজা বৃহদ্রথকে খুন করে নিজেকে ভারতবর্ষের আজীবন সম্রাট ঘোষণা করেছে। সেইসাথে মৌর্য সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘোষণা করে স্থাপন করেছে শুঙ্গ বংশের

শাসন। তবে এতেও সমস্যা ছিল না। সমস্যা অন্য জায়গায়," বলে সে শামানের দিকে মুখ তুলে চাইলো। শামান এখনো পরিস্থিতিটা ধরতে পারছে না।

"সমস্যাটা তাহলে কোথায়?"

"রাজা পুশ্যমিত্র নিজেকে ভারতবর্ষের রাজা ঘোষণা করা মাত্রই সে আরেকটা ঘোষণা দিয়েছে। ভারতবর্ষকে বৌদ্ধ মুক্ত করতে হবে। রাজ পরিবার থেকে শুরু করে যেখানে বৌদ্ধ পাও হয় খুন করো, আর না হয় এদেরকে ধরে ভারতবর্ষ থেকে বের করো। তবে খুন করাটাই বেশি শ্রেয়। কারণ রাজা ঘোষণা করেছে একেকজন বৌদ্ধের কর্তিত মস্তক এনে রাজার কাছে দিতে পারলে শত-শত স্বর্ণমুদ্রা পুরষ্কার দেয়া হবে।"

"কি! একজন রাজা এই ঘোষণা দিয়েছে! এটা কিভাবে সম্ভব? এটা কবের ঘটনা?" শামান জানতে চাইলো।

"আজ থেকে দু-হপ্তা আগের ঘটনা। রাজা এই ঘোষণা দেয়া মাত্রই পুরো ভারতবর্ষে বৌদ্ধদের ওপরে আক্রমণ শুরু হয়েছে। জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে- ধ্বংস করা হয়েছে শত-শত মঠ, আশ্রম আর স্তুপ। কাতারে-কাতারে খুন করা হচ্ছে বৌদ্ধদের।"

"কিন্তু এর সাথে ডুকপা লামার অন্তর্ধানের সম্পর্ক কি?" বলেই ও ব্যাপারটা খেয়াল করলো। হাতে গুণে হিসেব করলো এটা বছরের কোন সময়। "সর্বনাশ! বছরের এই সময়েই তো ডুকপা লামার দ্বিবার্ষিক ভ্রমণের সময়।"

"ঠিক তাই। আজ থেকে দিন বিশেক আগে যখন এই ঘটনা ঘটে তার আগেই ডুকপা লামা তার দ্বিবার্ষিক ভ্রমণে বেরিয়ে গেছিলেন। এসব যখন ঘটছে তখনো আমরা কিছুই জানি না, উনিও জানতেন না। এরপরে এই ঘটনা শুরু হবার পর তার সাথে সমস্ত যোগাযোগ হারিয়ে ফেলি আমরা। বার-বার দূত পাঠিয়েও কোন খবর পাওয়া যাচ্ছিলো না। তারপর তার সহযাত্রি ভ্রমণকারীদের একজন আহত-বিধ্বস্ত অবস্থায় লাদাখে আমাদের এক মঠে পৌছাতে সক্ষম হয়। সেখান থেকে যখন আমাদের কাছে খবর এসে পৌছায় ততোক্ষণে সেই আহত সহযাত্রি মারা গেছে," বলে সে একটু থেমে ঠান্ডা চায়ে চুমুক দিয়ে আবারো বলতে শুরু করলো। "কিন্তু মারা যাবার আগে সে যা জানিয়ে গেছে সেটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।"

"কি জানিয়ে গেছে সে?" শামান অনুভব করলো ওর তলপেটের নিচে যেন অনেকগুলো প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। গলায় শক্ত এক ধরণের অনুভূতি।

"যখন বৃহৎ রাষ্ট্রযন্ত্রের চাকা নির্দিষ্ট কোন একটা দিকে ঘুরতে শুরু করে সেই চাকার নির্দেশনা অনুযায়ীই পরিচালিত হতে থাকে সাধারণ মানুষের জীবন। সহজভাবে বলতে গেলে কেন্দ্রিয় শক্তির প্রভাবে ছোট-ছোট ক্ষেত্রগুলো সবসময়ই প্রভাবিত হতে শুরু করে। ঠিক এই ব্যাপারটাই এই মুহূর্তে ঘটছে ভারতবর্ষে," লামা নোরবু বলে চলেছে। "ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় যা শুরু হয়েছে সেটারই প্রভাব ফলতে শুরু করেছে

সমস্ত ভারত জুড়ে। আর সেটারই বলি হয়েছেন ডুকপা লামা। আগেই বলেছি উনি যখন এখান থেকে রওনা দেন তখন তো এসব ঘটনার কিছুই আমরা জানতাম না। উনি খুব স্বাভাবিকভাবেই তার দলবল নিয়ে পরিকল্পনামাফিক দ্বিবার্ষিক ভ্রমণের পরিক্রমা অনুসরণ করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই প্ররিক্রমারই অংশ হিসেবেই উনি সাঁচিতে গিয়ে পৌছান।"

"আমি যতোদূর জানি সাঁচিতেই ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় স্তুপগুলোর একটি অবস্থিত। ঠিক?"

"হ্যাঁ, সেটা পরিদর্শন করার জন্যেই উনি সেখানে যান। উনি যেদিন সাঁচিতে গিয়ে পৌছান তার ঠিক একদিন আগেই রাজা বৃহদ্রথ তার সেনাপতির হাতে খুন হয়েছেন। সাঁচি রাজ্যটা একটা জঙ্গুলে উপত্যকায় অবস্থিত, পৃত্থুরা বনভূমি সংলগ্ন এর মূল এলাকাটাকে বলা হয় কন্নোর। কন্নোর এলাকাটা একাধিক ভাগে বিভক্ত। একটা অংশ বৌদ্ধ শাসিত শাক্য বংশীয় রাজা বিক্রম শাসন করতো, অন্য অংশটা থারু বংশীয় শাসক মানরুর অধীনে শাসিত। দুই গোত্রের ভেতরে ঝামেলা বহু পুরনো ব্যাপার। এই শাসক দলের ভেতরে শাক্য বংশীয় বিক্রমাদিত্যের পরিবার সবসময়ই বেশি প্রভাবশালী। একে তো পারিবারিকভাবে তারা অধিক প্রভাবশালী তার ওপরে রাজা বিক্রমাদিত্যের প্রপিতামহের শাসনামলে অশোকের সময়ে তারা নিজেদের পূর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে সরাসরি মৌর্যদের শাসনের অধীনে চলে আসে। ওই সময়ে শাক্যদের একটা অংশ বৌদ্ধ শাসনের অধীনে না এসে আলাদা হয়ে যায়। ওদেরকে বলে লিচ্ছবী। শাক্য আর লিচ্ছবীদের ভেতরে গন্ডগোল লেগেই ছিল সবসময়।"

"আজ থেকে বিশ বছর আগে এক যুদ্ধে থারুদেরকে পরাজিত করে শাক্যরাই ওই এলাকার কেন্দ্রীয় শাসন নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। "এই যুদ্ধের পর থেকে শাক্য বংশই সবসময়ই থারু কিংবা লিচ্ছবীদের থেকে বেশি প্রভাবশালী হিসেবে পুরো কন্নর এলাকা শাসন করে এসেছে।"

লামা নোরবু একটু থেমে যোগ করলো, "যাই হোক, সেসব অনেক পুরনো কথা। বর্তমানের ঘটনা বলি। ডুকপা লামা সাঁচিতে পৌছানোর পর স্থানীয় রাজাকে নিয়ে সাঁচির স্তুপে নিয়মিত দ্বিবার্ষিক আয়োজন করার কথা ছিল। কিন্তু ওখানে পৌছানোর পর উনারা প্রথমে নাকি পরিস্থিতির জটিলতা বুঝতে পারেনি। কিন্তু স্থানীয় রাজা বিক্রম ডুকপা লামাকে পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলার পরও উনি অনেকটা জোর করেই নিজের কার্যক্রম ঠিক রাখার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ তার ধারণা ছিল ধর্মীয় যজ্ঞানুষ্ঠানে কোন সমস্যা হবে না। কিন্তু ওইদিনই আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের মাঝখানে সাঁচির স্তুপে আক্রমণ হয়। স্থানীয় লিচ্ছবী রাজা হেমচন্দ্র নিজের বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করে স্তুপে।"

"সর্বনাশ," শামান একেবারে ঠান্ডা গলায় বলে উঠলো।

"আসলে লিচ্ছবী বংশীয় লোকজন অশোকের সময়ে শাক্যদের থেকে আলাদা হবার পর থেকেই সুযোগ খুঁজছিল ওদের ওপরে প্রতিশোধ নেয়ার। কিন্তু তারা দূর্বল হবার কারণেই

পিছিয়ে পড়ছিল শাক্যদের থেকে। আর তাই ওরা বহুদিন ধরেই সুযোগ খুঁজেও সুবিধে করতে পারেনি।"

"এবার পুশ্যমিত্র ভারতবর্ষের শাসন দখল করে নিতেই এই সুযোগটা নিয়েছে ওরা," শামান চিন্তিত। "কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারলাম না। এই ঘটনার সাথে ডুকপা লামার অর্ন্তধানের সম্পর্ক কি?"

"পরিস্থিতি আসলে আমি-তুমি যা ভাবছি সম্ভবত তারচেয়েও অনেক খারাপ। ডুকপা লামার যে শিষ্য লাদাখে আমাদের মঠ পর্যন্ত এসে পৌছেছিল সে সবকিছু বিস্তারিত বলে যেতে পারেনি। তার আগেই মারা যায় সে। কিন্তু মারা যাবার আগে সে যা বলে যায় ব্যাপারটা অনেকটা এমন; রাজা বিক্রম আর ডুকপা লামা সব ভেবে দ্বি-বার্ষিক আয়োজন চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেন। তারা যখন তাদের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের ঠিক মাঝামাঝি এমন সময় তাদের অনুষ্ঠানের মাঝে সাঁচির স্তুপে আক্রমণ হয়। শুধুমাত্র রাজা বিক্রম আর ডুকপা লামা বাদে বাকি প্রায় সবাইকে খুন করা হয় ওখানে। সাঁচির স্তুপে রক্তের বন্যা বয়ে যায়।"

"কিন্তু রাজা বিক্রমের বাহিনী ছিল না সেখানে? তারা কি করেছে?" শামান কয়েকটা ব্যাপার এখনো ধরতে পারছে না।

"আসলে সাঁচিতে ঠিক কী ঘটেছিল, তা আমরা কেউই বুঝতে পারছি না। এমনকি ওখান থেকে আমরা কোন খোঁজ খবরও বের করতে পারছি না। ওই এলাকার মাটি এখন আমাদের জন্যে নরক হয়ে উঠেছে। এ-কারণেই আমাদের এই মুহূর্তে এমন একজন দরকার যার যুদ্ধের ব্যাপারে সম্যক অভিজ্ঞতা আছে, সেইসাথে এসব ব্যাপার সামলানোর মতো ক্ষমতা।"

"আপনি কি চাইছেন, নোরবু?" শামান নোরবুর দিকে চোখ তুলে তাকাল।

"শুধু আমি না এই শান্তির মঠের সবাই আমরা মনে-প্রাণে চাই ডুকপা লামা আমাদের মাঝে ফিরে আসুক," নোরবু কোনমতে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছে। "তাকে যদি মেরে ফেলাও হয়ে থাকতে অন্তত তার স্মৃতিভস্মটুকু হলেও যেন আমাদের মাঝে থাকে," নোরবু আর নিজেকে সামলাতে পারলো না। টপ-টপ করে জল ঝড়তে লাগলো তার দুই চোখ বেয়ে।

"আমি যাবো," হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো শামান। ও মনে-মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, প্রয়োজনে জীবন দিয়ে হলেও ওকে ডুকপা লামার কাছাকাছি পৌছাতে হবে। সেটা জীবিত বা মৃত যাই হোক না কেন। "কিন্তু আমার কিছু ব্যাপারে সহায়তা লাগবে।"

"শামান, তুমি যদি যাও তবে আমরা আমাদের তরফ থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো তোমাকে সহায়তা করার। আমি জানি এটা তোমার পেশা। প্রয়োজনে আমি তোমাকে মঠের তরফ থেকে তোমার যা পাওনা..." নোরবু কথা শেষ করার আগেই শামান এগিয়ে এসে নোরবুর দুই হাত চেপে ধরলো।

“আপনি আমাকে অপমান করছেন নোরবু। আমি...আমি হয়তো চেষ্টা করেও পুরোপুরি এই মঠের একজন হয়ে উঠতে পারিনি, সেটা আমার ব্যর্থতা। কিন্তু এই মঠ আমাকে যা দিয়েছে সেই ঋণ আমি কোনদিনই শোধ করতে পারবো না। বিশেষ ক’রে একটা এতিম অসহায় ছেলেকে ডুকপা লামা যেভাবে বড় করে তুলেছেন সে-ব্যাপারে আর কিছু নাই বা বললাম। সেই ডুকপা লামা আজ বিপদে আর তাকে উদ্ধার করার জন্যে আমি অর্থ গ্রহণ করবো, সেটা ভাবা আমার জন্যে অন্যায় হবে। তবে আমার অন্য কিছু ব্যাপারে সহায়তা লাগবে।”

“সেটা কিরকম?” নোরবু জানতে চাইলো। শামান রাজি হওয়াতে তার চোখে-মুখে স্বস্তির ছায়া।

“প্রথমত, এই কাজে আমি আমার দলকে নিতে পারবো না। কারণ তারা এই মুহূর্তে এখান থেকে বহুদূরে আছে। আর তাছাড়া সাঁচিতে খুব বেশি লোকজন নিয়ে গেলে বিপদ আরো বাড়ার সম্ভাবনা আছে। কাজেই আমাকে একাই যেতে হবে।”

“তোমাকে একা যেতে হবে না শামান। তোমার কি বিধুর কথা মনে আছে?”

“বিধু, কোন বিধু?” শামান চেষ্টা করেও মনে করতে পারছে না।

“মোটা ক’রে একটা ছেলে ছিল, খালি মারামারি করতো, আর-”

“বিধু! সর্বনাশ। বিধুর কথা ভুলে যাবো, যার-তার সাথে মারামারি বাঁধিয়ে দিতো। সারাক্ষণ খেতো আর কারো কথা শুনতে চাইতো না। ওর একটা কান...”

“হ্যাঁ, তুমি চিনতে পেরেছো শামান। ওর একটা কান অন্য কান থেকে ছোট ছিল। এ-নিয়ে ছোটবেলা তোমরা তাকে কম জ্বালাতন করোনি,” নোরবুর মুখে মৃদু হাসি।

“বিধুর সাথে এই ব্যাপারটার সম্পর্ক কি?” শামান জানতে চাইলো। ওরা মঠের নিচু এলাকার দিকে হাঁটতে শুরু করেছে।

“শামান, আমি তোমার কাছে সহায়তা চেয়ে যেমন খবর পাঠিয়েছি ঠিক একইভাবে বিধুর কাছেও খবর পাঠিয়েছিলাম সহায়তা চেয়ে। তুমি হয়তো জানো না- তুমি যেমন মঠ থেকে পালিয়ে গেছিলে ঠিক তেমনি বিধুও আমাদের সাথে থাকতে পারেনি। ও এখান থেকে পালিয়ে বাঙ্গাল প্রদেশ পার হয়ে সপ্তভূমিতে চলে যায়, তারপর সেখান থেকে সিংহল। সিংহলেই বড় হবার পর সেখানে সিংহল রাজার সৈন্যবাহিনীতে তীরন্দাজ হিসেবে কাজ করে সে। তোমাকে যখন খবর পাঠাই আমি জানতাম না তুমি যেতে রাজি হবে কিনা, তাই আমি বিধুকেও খবর পাঠিয়েছিলাম। সেও চলে এসেছে। তাই আমার মনে হয় সমস্যা না থাকলে তোমরা দুজনে একসাথে যেতে পারো এই অভিযানে। এটা তোমাদের উভয়ের জন্যেই ভালো হবে। এখন চলো তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাই,” বলে জোরকদমে এগোতে লাগলো সে।

খানিকটা দ্বিধান্বিত শামান অনুসরণ করলো তাকে।

অধ্যায় সাত

বর্তমান সময়

পিবিআই অফিস, ধানমন্ডি

রুমের ভেতরে পায়চারি করতে থাকা পাশা স্যারকে দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করছে চিন্তিত তানভীর। হাঠাৎ পায়চারি থামিয়ে মেশিন থেকে এক মগ কফি ভরে তানভীরের দিকে এগিয়ে দিলো হাবিব আনোয়ার পাশা। নিজেও ভরে নিলো এক মগ।

"পিওর ব্রাজিলিয়ান কফি, আমি নিজে ব্লেন্ড করে মেশিনে দিয়েছি," বলে তৃপ্তি সহকারে নিজের মগে চুমুক দিতে-দিতে তানভীরের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো সে, "কী যেন বলছিলে তুমি?"

"স্যার, আমি সিলেট যেতে একেবারেই আগ্রহি না, কারণ..." বলে পরের কথাটা বলতে গিয়েও একটু অস্বস্তি বোধ করাতে কথাটা পরিবর্তন করলো। "কারণ, স্যার আমার তো ফিল্ড লেভেলে তেমন কোন অভিজ্ঞতা নেই," শেষ কথাটা ও সরাসরি পাশা স্যারের চোখের দিকে না তাকিয়ে বরং অন্যদিকে তাকিয়ে বলে উঠলো। কিন্তু একটু পরে যখন তার দিকে ফিরে তাকাল ও দেখতে পেল পাশা স্যার মুখে মৃদু হাসি নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ধরা পড়ে গেছে বুঝতে পেরে তানভীরের অস্বস্তি আরো বেড়ে গেল।

"তানভীর, মাই বয়," বলে আনোয়ার পাশা ওর কাঁধে একটা হাত রাখলো। "তুমি তো জানো আমি মানুষের সাইকোলজি খুব ভালো বুঝতে পারি। কাজেই আমাকে এসব কথা শুনিয়ে কোন লাভ নেই। আর তাছাড়া এই অপারেশনের ব্যাপারটা পুরোপুরি আমার হাতেও নেই। আগেই বলেছি, এই অপারেশনে তোমাকে চাওয়া হয়েছে একেবারে ওপর মহল থেকে। দ্বিতীয়ত, তোমাকে পাঠাতে পারছি এতে আমি খুশি। এর পেছনে কারণ আছে।"

আনোয়ার পাশা কফি মগ হাতে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলে উঠলো, "তুমি তো জানোই দীর্ঘদিন ধরে রীতিমতো সংগ্রাম করে আমি একটা নিজস্ব সংস্থা দাঁড় করানোর চেষ্টা করছি। ইতিমধ্যে সেদিকে খানিকটা ধাবিতও হয়েছি। আর সেই পথে আরেকটু এগোনোর ধাপই ছিল তোমাকে আর শারিয়ারকে দেশের বাইরে ট্রেনিঙে পাঠানো। এ'কারণেই আমি চাইছি তুমি ওখানে যা শিখে এসেছো সেটাকে কাজে লাগিয়ে ফিল্ড লেভেলে পরখ করে দেখো। আর তাছাড়া ইএএফ'কে এবার সাহায্য করতে পারলে একদিকে যেমন ওদের কাছ থেকে ভবিষ্যতে আমরা সাহায্য পাবো, আবার অন্যদিকে আমি চাই তুমি নিজের যোগ্যতা দিয়ে এই অপারেশনে ভালো করো, যাতে পরবর্তীতে

নিজস্ব সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে আমরা জোর গলায় প্রমাণ দেখাতে পারি, আমাদেরও ভালো ফিল্ড এজেন্ট আছে।"

পাশা স্যারের কথা শুনে তানভীর একবার মাথা নাড়লো। "কিন্তু স্যার, এই ব্যাপারে তো আমি কিছুই জানি না।"

"আমি তোমাকে ইএএফ' এর সাথে কাজ করতে পাঠাচ্ছি এর মানে এই না যে আমি তোমাকে খোলা মাঠে একা ছেড়ে দিবো। আমি অবশ্যই তোমার সাথে নিজের লোক পাঠাবো। সিলেটে এই মুহূর্তে একটা কাজে আছে সুলতান। আমি ওকে তোমার সাথে কাজে লাগিয়ে দিবো। আর তাছাড়া জালাল নামে একটা ছেলে আছে, গাজীপুরের অপারেশনে ও আমার সাথে ছিল, ওকেও আমি সিলেট পাঠাবো। কিন্তু ওকে পাঠাতে একটু সময় লাগবে। আর তোমাকে সব ধরণের লজিস্টিক আর আইটি সাপোর্ট দেয়ার জন্যে একজন ট্রেইনড আইটি এক্সপার্টকেও দেয়া হবে। কাজেই একবারের জন্যেও মনে করো না তুমি একা।"

তানভীর একবার বড় করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। "ঠিক আছে স্যার, আমাকে কবে সিলেট যেতে হবে?"

এবার ওর প্রশ্ন শুনে হা-হা করে হেসে উঠলো হাবিব আনোয়ার পাশা, "কবে না বালক, বলো কখন?" বলে সে কফির মগে শেষ চুমুক দিয়ে সেটা নামিয়ে রাখলো টেবিলে। "বাইরে তোমার জন্যে স্পেশাল জিপ দাঁড়িয়ে আছে। তুমি আমার রুম থেকে বেরিয়ে মৌসুমির কাছ থেকে 'ফাস্ট প্যাক' নিয়ে জিপে উঠবে। তোমার জন্যে প্রয়োজনীয় সবকিছু প্যাকেই তৈরী করে রেখেছে মৌসুমি। কাজেই কোন সমস্যা হবে না।"

"স্যার, আমাকে কি গাড়িতে করেই..."

"আরে নাহ," আনোয়ার পাশা চিকন লম্বা সিগারের মতোন দেখতে একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলে উঠলো, "তুমি এখান থেকে জিপে করে এয়ারপোর্টে যাবে। সেখানে প্লেনে তোমার জন্যে সিট বুকিং দেয়াই আছে। সোজা চলে যাবে সিলেটে। আর হ্যাঁ, শাহজালাল এয়ারপোর্টে ইএএফে'র অফিসার তোমাকে কিছু ব্যাপারে ব্রিফ করবে। তবে তুমি বিস্তারিত জানতে পারবে সিলেট গিয়ে। আর তোমার প্রয়োজনীয় যেকোন জিনিসের যোগানও ওরাই দেবে," বলে সে উঠে এলো তানভীরের কাছে।

"তানভীর, আমি জানি সিলেটে ফিরে যাওয়াটা তোমার জন্যে কষ্টকর। বিশেষ করে সাস্ট ক্যাম্পাস নিয়ে তোমার যে বাজে স্মৃতি আছে তারপরে অবশ্যই না। কিন্তু মনে রেখো যে-কষ্ট তুমি বহন করে বেড়াচ্ছো সেই কষ্টের মোকাবেলা একটা সময় তোমাকে করতেই হবে। কাজেই যতো জলদি সেটা করতে পারো ততোই ভালো। আর ভালোভাবে অপারেশানটা শেষ করে ফিরে এসো। আমাদেরকে একসাথে অনেক কাজ করতে হবে," বলে সে মৃদু হাসলো কিন্তু তানভীরের হাসি এলো না।

বর্তমান সময়

ভিআইপি টার্মিনাল,

শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা

তানভীরের অস্ত্রটার দিকে তাকিয়ে কাস্টমস চেকিঙের লোকটা এমন এক ভঙ্গি করলো যেন ওটা একটা পচা মাছ। লোকটা একবার জিনিসটা দেখে নিয়ে ওর দিকে ফিরে তাকাল।

তানভীর ওর আইডি কার্ডটা তুলে দেখালো। আইডি দেখেও লোকটার চেহারা কোন পরিবর্তন হলো না। বরং আইডি দেখে সে একইরকম শুকনো মুখে জানতে চাইলো, "আমার বিশ্বাস আপনার কাছে এটা বহন করার জন্যে একটা বিশেষ পাস কিংবা অনুমতিপত্র আছে," এবার লোকটার ব্যর্থ হাসি ফোটানোর চেষ্টা।

"হ্যাঁ অবশ্যই, এক মিনিট," বলে তানভীর সাথে নিয়ে আসা বিশেষ ব্যাকপ্যাকটা ঘাঁটতে লাগলো। এই ধরণের বিশেষ ব্যাকপ্যাককে ওরা বলে 'ফাস্ট প্যাক'। জিনিসটাকে নামকরণ করা হয়েছে ফাস্ট ফুডের সাথে মিল রেখে। প্রতিটি এজেন্টের জন্যে এ'ধরণের একটা ফাস্ট প্যাক অফিসে সবসময় প্রস্তুত রাখা হয়। এজেন্টের রুচি আর শারীরিক গঠনের সাথে মিল রেখে তার মাপেই প্রস্তুত দু'সেট কাপড় থেকে শুরু করে যথেষ্ট পরিমাণ কারেন্সি এমনকি মোবাইলের চার্জার- টুথ ব্রাশ, অতিরিক্ত অস্ত্র, প্রয়োজনীয় কমিউনিকেশন ডিভাইস, সুইস নাইফ এমনকি এক জোড়া হ্যান্ডকাপ সহ প্রয়োজনীয় প্রায় সবকিছুই খুব সুন্দরভাবে রাখা থাকে, যাতে খুব ইর্মাজেন্সির সময়ে চট করে এটা নিয়ে মুভ করতে পারে যেকোন এজেন্ট। ব্যাকপ্যাকের সামনের ছোট একটা খোপে একটা কাগজ হাতে লাগতেই ওটা বের করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো তানভীর। যাক পাওয়া গেছে জিনিসটা।

লোকটা মনোযোগের সাথে ওর অনুমতিপত্রটা পড়লো। তারপর ওকে অপেক্ষা করতে বলে সে কোথায় জানি চলে গেল। তানভীর একটু বিরক্ত হয়েই ঘড়ি দেখলো একবার। হাবিব আনোয়ার পাশা স্যারের সাথে দেখা হবার পর থেকে সবকিছু এতো অস্বাভাবিক দ্রুত ঘটছে ওর মস্তিষ্ক ঠিক প্রসেস করে উঠতে পারছে না।

"এক্সকিউজ মি," হঠাৎ পাশ থেকে ভারি একটা কণ্ঠস্বর শুনে ফিরে তাকাল। নেভি ব্লু স্যুট, সাদা শার্ট আর লাল টাই পরা বিশালদেহি এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। মোটা ঠোঁটের ওপরে ততোধিক মোটা গোঁফ তার। "আপনি আমার সাথে আসুন। একজন ভদ্রলোক দেখা করবেন।"

লোকটার কণ্ঠস্বর যতোটা কর্কশ, আচরণ তারচেয়ে বেশি রুক্ষ। কথাটা বলে লোকটা এমনকি অপেক্ষাও করলো না। তানভীরকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই সে পেছন ফিরে হাঁটতে লাগলো। মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করে ব্যাকপ্যাকটা তুলে নিয়ে তানভীর অনুসরণ করলো লাল টাইকে।

লোকটা ওকে নিয়ে ভিআইপি টার্মিনালের একটা লাউঞ্জের সামনে চলে এলো। "ভেতরে ইমার্জেন্সি অ্যাকশন ফোর্সের প্রধান বাবুল স্যার অপেক্ষা করছেন," বলে সে দরজাটা ওর সামনে মেলে ধরলো লাল টাই। লাল টাইয়ের পাথরের মতো মুখের দিকে তাকিয়ে একটা ধন্যবাদ সুলভ হাসি দেয়ার চেষ্টা করলো তানভীর কিন্তু লাল টাই পাথরের মতোই তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। বড় করে একবার দম নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো তানভীর।

লাউঞ্জের ভেতরটা যেকোন আর দশটা টার্মিনালের লাউঞ্জের মতো করেই সাজানো কিন্তু অনেক বেশি জাকজমকপূর্ণ আর আরামদায়ক। লাউঞ্জের নীল রঙের পুরু ভেলভেটের সোফায় বসে আছে দুজন মানুষ। তাদের ভেতরে বাম দিকে বসা তুলনামূলক ছোট-খাট মানুষটাকে দেখে তানভীর চিনতে পারলো, উনিই বাবুল আহমেদ। বাবুল আহমেদ শুধু একজন ল' এনফোর্সমেন্ট কর্মকর্তাই নয় বরং এক সেন্সে বলতে গেলে সে মিডিয়া সেনশেসন। সোশাল মিডিয়া থেকে শুরু করে ইলেকট্রনিক মিডিয়া তো বটেই এমনকি প্রিন্ট মিডিয়াতেও তাকে নিয়ে মাতামাতির শেষ নেই। তাই সামনা-সামনি না দেখলেও তাকে চিনতে এক মুহূর্ত লাগেনি তানভীরের।

বেশ দৃঢ়পায়ে তার দিকে এগিয়ে গেল তানভীর। মানুষটার সামনে গিয়ে একেবারে দপ্তরিক কায়দায় স্যাল্যুট করলো ও।

তানভীর কিছু বলার আগেই বাবুল আহমেদ বসা অবস্থা থেকেই ওর দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিলো। "তানভীর, তানভীর মালিক, কাম অন। হ্যাভ আ সিট," বলে সে তার বিপরীতে একটা সোফা দেখালো।

ব্যাকপ্যাকটাকে একপাশে রেখে পিঠ একেবারে খাড়া করে বসে পড়লো তানভীর। "থ্যাঙ্কু, স্যার।"

"তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেই, অহ্ সরি তানভীর," বলে মৃদু হেসে বাবুল আহমেদ বলে উঠলো। "সরাসরি তুমি বলে ফেললাম।"

"দ্যাট'স ওকে স্যার," ছোটখাট বাবুল আহমেদকে এতোদিন ভাষণ- বক্তৃতা আর টিভির টক-শো'তে দেখেছে ও। কিন্তু সামনা-সামনি লোকটার প্রাঞ্জল কথা-বার্তা আর ব্যক্তিত্বে রীতিমতো মুগ্ধ ও।

"ও হচ্ছে আলীম, আলীম পাটোয়ারি," বাবুল আহমেদের অন্যপাশে বসা কাঁচাপাকা চুলের মধ্যবয়স্ক মানুষটার পরনে মন্ধাতার আমলের ঢোলা প্যান্ট আর শার্ট, মাথায় আবার একটা গোল টুপি। বাবুল আহমেদ তার নাম বলাতে সে থুতনির নিচের ছাগুলে দাড়িতে একবার

হাত বুলিয়ে ওকে আপাদ মস্তক দেখলো। তারপর চশমার মোটা কাঁচের অন্যপাশ থেকে ওর দিকে তাকিয়ে সামান্য চোখ নাচিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেল নিজের কাজে। সে তার সামনে টেবিলে ওপরে কিছু একটা করতে ব্যস্ত।

"পাটোয়ারিই তোমাকে অপারেশানের ব্যাপারে বিস্তারিত ব্রিফ করবে। কিন্তু তার আগে আমি তোমাকে কয়েকটা ব্যাপারে একটু বলে নিতে চাই।"

"অবশ্যই স্যার," তানভীর আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু তার আগেই পাশ থেকে আলীম পাটোয়ারি কথা বলে উঠলো।

"আমি কিন্তুক পরায় রেডি। আপনেরা কথা শেষ করলেই আমি বিরিফ করতে পারুম," বলে সে আরেকবার তানভীরকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে ছাগুলে দাড়িতে হাত বুলালো।

তানভীর একটু অবাক হয়েই আবারো পরখ করলো লোকটাকে। বাবুল আহমেদের মতো উচ্চপদস্থ একজন লোক কিনা এরকম একটা লোককে নিয়ে এসেছে অপারেশানের ব্যাপারে ব্রিফ করার জন্যে। লোকটা এমনকি কথাও বলছে অশুদ্ধ ভাষায়। ওকে আরো এক দফা অবাক করে লোকটা তার পুরনো চামড়ার ব্যাগ থেকে বের করলো চকচকে স্টিলের একটা বাক্স। সেটার ভেতরে সারি দিয়ে রাখা খিলি পান থেকে একটা তুলে মুখে পুরে চোখ বন্ধ করে হেলান দিলো সোফায়। চরম বিস্মিত তানভীর ফিরে তাকাল বাবুল আহমেদের দিকে।

"শোন, তানভীর, যে-অপারেশানটায় তোমাকে পাঠানো হচ্ছে সেটার গুরুত্ব কিন্তু অপরিসীম," বলে সে একটা হাত তুলে বলে উঠলো, "এর পেছনে একটা কারণ আছে। আগে তোমাকে প্রেক্ষাপটটা বলে নেই। আজ থেকে কয়েক বছর আগে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্কিওলজি মানে প্রত্নতত্ত্বের এক প্রফেসর- ডক্টর মিতায়ন আহমেদের কাছে একটা বিদেশি সংস্থা থেকে প্রপোজাল আসে বাংলাদেশ ভারত মিলিয়ে ভারতের আসামে একটা যৌথ প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান চালানোর। এই প্রপোজালটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল কয়েকটা কারণে। প্রথমত, প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানটা কী নিয়ে ছিল সেটা আমি জানি না, তবে আবিষ্কারটা করতে পারলে সেটা নাকি শতাব্দির সেরা প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হতে পারে। যাই হোক, এটা আমার বিবেচ্য বিষয় নয়। দ্বিতীয়ত, তখন সদ্য প্রতিষ্ঠিত আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্টের জন্যে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অভিযানটার গুরুত্ব তারচেয়ে বেশি ছিল কারণ আমরা এর আগে ভারতের আসামে এরকম যৌথ অভিযান চালাইনি। তুমি হয়তো ভারতের সেভেন সিস্টার্সের সাথে বাংলাদেশের জিও-পলিটিক্স খানিকটা জানো," বলে একটা ভ্রু উঁচু করলো সে।

"উলফাদের সাথে এর আগে যা হয়েছে সেটা ভুলে আমরা বহুদিন যাবৎ চাইছিলাম সেভেন সিস্টারসের সাথে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার। কাজেই এই অভিযানটা সেদিক দিয়েও বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সব মিলিয়ে এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের জন্যে ডক্টর মিতায়ন ছিল সেরা মানুষ। আর উনি সেটা প্রমাণও করেন। গত দুই বছরে প্রায়

ছয়টা বড় ধরণের অভিযান চালানোর পরে মাস তিনেক আগে তারা একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র আবিষ্কার করে। এরপর থেকে গত তিনমাস ধরে ডক্টর মিতায়ন, সাউথ এশিয়ার আর্কিওলজিক্যাল এসেসিয়েশনের অন্যতম সদস্য ডক্টর টেড চ্যাঙ টানা অভিযান চালিয়ে জিনিসটা খুঁজে করার ব্যাপারে অনেকদূর এগিয়ে যায়। এরপরে আসামের গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করার পর তাদের সাথে আমাদের আর কোন যোগাযোগ ছিল না। এরপরে পার হয়ে যায় প্রায় দুই মাস।"

"এই দুই মাসে তাদের আর কোন খোঁজ-খবর ছিল না?" তানভীর চিন্তিত মুখে জানতে চাইলো।

"নাহ, তবে মাঝে-মাঝে স্যাটেলাইট ফোনে আমাদেরকে কল করতো ডক্টর মিতায়ন। অপারেশনের আপডেট দিতো। কিন্তু মাসখানেক আগে সেটাও বন্ধ হয়ে যায়। এরপরে দুই দিন আগে তারা বাংলাদেশে ফিরে আসে।"

"তাই নাকি, তারা যা উদ্ধার করতে গেছিল সেটা কি...?"

তানভীর প্রশ্নটা শেষ করতে পারলো না, তার আগেই বাবুল আহমেদ থামিয়ে দিলো তাকে, "সেটা আমরা এখনো জানি না। এরপর হঠাৎ ডক্টর মিতায়ন আসামের স্থানীয় একটা মোবাইল নম্বর থেকে তার স্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করে জানায়, তাদের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তারা নাকি দ্রুতই বাংলাদেশে ফিরে আসবে। তার স্ত্রীকে কিছু নির্দেশনাও দেয় সে। এর কয়েকদিন পরই তাদের গাড়ি বাংলাদেশে প্রবেশ করে। বর্ডার গার্ড এই ব্যাপারটা নিশ্চিত করেছে। বাংলাদেশে প্রবেশের পর ডক্টর মিতায়নের সাথে তার স্ত্রীর আবারো কথা হয়, এমনকি বাসায় ফিরে কী খাবে সেগুলোও জানায়। এরপরে তারা স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।"

"মানে কি?" তানভীর অবাক হয়ে জানতে চাইলো।

"সেটাই তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে, মাই বয়। মানেটা যে আসলে কি সেটা আমরা কেউই বুঝতে পারছি না। সেটাই বের করতে হবে তোমাকে। বাংলাদেশে প্রবেশ করার পর ডক্টর মিতায়ন স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল কিভাবে ব্যাপারটা কিছুতেই আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না। তুমি সিলেট যাও। তোমার যাবতীয় সাপোর্ট যা লাগে ইএএফের তরফ থেকে দেয়া হবে। তুমি সিলেট গিয়ে খুঁজে বের করবে ওখানে আসলে কী ঘটেছে।"

আনমনেই একবার মাথা নাড়লো তানভীর, "স্যার, কিছু মনে না করলে আমার একটা প্রশ্ন ছিল।"

"বলো," প্রশ্ন করার অনুমতি দিয়ে উনি পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করে ওটা থেকে একটা সিগারেট ঠোঁটে লাগিয়ে চকচকে সোনালি লাইটার দিয়ে আগুন দিলো ওটাতে।

“স্যার, আমি কেন?” প্রশ্নটা করতে গিয়ে একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো তানভীর। “মানে স্যার, আপনাদের ইএএফ’র ই তো অনেক দক্ষ আর অভিজ্ঞ ফিল্ড এজেন্ট ছিল, তাহলে আমার মতো ফিল্ডে অনভিজ্ঞ একজনকে কেন বেছে নিলেন আপনারা?”

ওর প্রশ্ন শুনে মৃদু হেসে উঠলো বাবুল আহমেদ। “তোমাকে বেছে নেবার পেছনে কারণ যাই থাক, তোমার জন্যে তো এটা একটা বিরাট সুযোগ। সম্প্রতি একটা ট্রেনিং শেষ করে এসেছো তুমি, কাজেই সেটাকে ফিল্ড লেভেলে কতোটুকু কাজে লাগাতো পারো সেটা পরীক্ষা করার জন্যে এমন গোল্ডেন অপরচুনিটি তুমি আর পাবে না। তাছাড়া তুমি একজন ক্রিমিনাল অ্যানালিস্ট, তার ওপরে আবার এখন ফিল্ডের ট্রেনিং পেয়েছো- তো এ’ধরণের সফিসটিকেটেড কেস হ্যান্ডেল করার জন্যে তুমিই উপযুক্ত ব্যক্তি। তবে আমার একটু বিরক্ত লাগলো, পাশা আবার ওই সুলতান আর জালালকে এই কেসে ইনভলভড করতে গেল কেন। আমাদের ইএএফের সাপোর্ট তো ছিলই,” বাবুল আহমেদ বিরক্তির সাথে মাথা নাড়লো।

“যাকগে, তোমার টিকেট রেডি আছে। পাটোয়ারির সাথে ব্রিফিং শেষ করে তুমি প্লেনে উঠে যাবে। তোমার জন্যেই যাত্রিবাহী প্লেনটাকে গত আধঘন্টা ধরে বসিয়ে রাখা হয়েছে। আমি এখান থেকেই বিদায় নেবো,” বলে হাতের সিগারেটে শেষ টান দিয়ে সেটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে উঠে দাঁড়ালো বাবুল আহমেদ। তার সাথে সাথে তানভীরও উঠে দাঁড়িয়েছে।

বাবুল আহমেদ ওর একটা হাত ধরে শক্ত করে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলে উঠলো, “আই থিঙ্ক, তুমি বুঝতে পারছো তোমার ওপরে অনেক কিছুই নির্ভর করছে। কাজেই আমি আশা করবো তুমি ব্যাপারটার একটা সামাধান বের করতে পারবে।”

“স্যার, আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো,” একেবারে পিঠ টান-টান করে জবাব দিলো ও।

“সর্বোচ্চ চেষ্টায় কাজ হবে না, আমি সফলতা চাই,” বলে গট-গট করে হেটে রুম থেকে বেরিয়ে গেল ইমার্জেন্সি অ্যাকশন ফোর্সের প্রধান বাবুল আহমেদ।

তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে ছিল তানভীর, হঠাৎ খিক-খিক হাসির শব্দে ফিরে তাকাল সোফার দিকে। আলীম পাটোয়ারি সোফায় হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ অবস্থায় খিক-খিক করে হাসছে। “‘সফলতা চাই’... এতোই সুজা! মাডে নাইম্মা দেখ মাদারি,” সে চোখ বন্ধ করেই বলে উঠলো।

“সরি, আপনার কথা ঠিক বুঝতে...”

“বুজতে পারো নাই তো, বুজবা, মাডে নামলেই বুজবা,” বলে সে একবার আড়মোড়া ভেঙে সোজা হলো। “ভাতিজা, তুমার বয়স কতো?” প্রশ্নটা করেই সে নিজেই জবাব দিয়ে দিলো। “ও এইহানেই তো আছে সব। তানভীর দেখলো মানুষটার ল্যাপটপে ওর ফাইল ওপেন করা। ও কিছু বলার আগেই মানুষটা বলে উঠলো, “এই লও তুমার কেইস ফাইল,

এইনে সব আছে। ওই মাস্টার মিতায়ন, টেড চ্যাঙ, হেগো অবিযান থাইক্কা শুরু কইরা হের লগে সংযুক্ত সব,” বলে সে একটা স্বচ্ছ ফোল্ডার এগিয়ে দিলো তানভীরের দিকে। তানভীর ওটা ওপেন করতে যাচ্ছিলো ধমকে উঠলো লোকটা।

“ওই পুলা, অইডা পরে পইরো, আগে হাত আইগাও দেহি।”

তানভীর কিছু না বলে একটু অবাক হয়েই ওর ডান হাতটা এগিয়ে দিলো পাটোয়ারির দিকে।

“আরে ভোদাই পোলা, ডাইন হাত না বাম হাত দেও। ডাইত হাতের বহুত কাম আছে সামনে,” বলে সে তানভীরের বাম হাতটা নিজেই ধরে ফেললো। হাতের ঘড়ি আর শার্টের বোতাম খুলে কনুই পর্যন্ত গুটিয়ে দিলো শার্টটা। “বাহ, ভাতিজা দেহি ঘড়ি তো ভালাই লাগাইছো। হাতও তো শক্ত আছে দেহি,” বলে সে তার সামনে রাখা ব্যাগের ভেতর থেকে সিরিঞ্জ আর পিস্তলের মাঝামাঝি দেখতে একটা জিনিস বের করে আনলো। বাম হাতের কব্জি আর কনুইয়ের মাঝামাঝি জায়গায় হালকা এন্টিসেপটিক ডলে নিয়ে জিনিসটা ঠেকিয়ে ট্রিগারের মতো দেখতে বাটনটা চেপে দিলো।

কোকের বোতল খুললে যেরকম ‘ফঁচ’ করে শব্দ হয়, ওরকম শব্দ করে কিছু একটা বসে গেল তানভীরের হাতে। তীব্র জ্বালা ধরানো একটা অনুভূতির সাথে হাতটা ঝাঁকি খেলো ওর।

“উফ্‌,” তানভীর না চাইতেও মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল ছোট্ট একটা আর্তনাদ। “ট্র্যাকার, আপনি কি ট্র্যাকার বসালেন আমার হাতে?”

“নাহ, তুমার বিয়ার মেন্দি লাগাইলাম,” বলে সে নিজে-নিজেই হাসতে হাসতে তানভীরের হাতে একটা ব্যান্ড এইডের মতো দেখতে ছোট্ট ব্যান্ডেজ লাগিয়ে দিলো। “কোন ব্যথা পাইবা না, কাইল নাগাদ ঠিক অইয়া যাইবো। জিনিসটা এক্কেরেই আধুনিক, এইটা চাইরদিন পর্যন্ত অ্যাকটিভ থাকবো। এরপরে ডিঅ্যাকটিভ অইয়া যাইবো। আর বাইর করতেও কুনো ঝামেলা নাই। অহন দেহি তুমার পিস্তলটা,” বলে সে হাত বাড়িয়ে দিলো তানভীরের দিকে।

কোমর থেকে নিজের পিস্তলটা খুলে খাপসহ সেটা বাড়িয়ে দিলো সে আলীম পাটোয়ারির দিকে। জিনিসটা হাতে নিয়ে বের করে চোঁখ কুঁচকে উঠলো তার। “এই মান্ধাতার আমলের জিনিস এহনো দিয়া রাখছে।”

“এইটাও তো ঠিকমতো চালাতে পারি না,” তানভীর হাতের ট্র্যাকার বসানো জায়গাটা ডলছে।

ওর কথা শুনে চট করে ফিরে তাকাল আলীম পাটোয়ারী। “হুনো পোলা, এতোদিন টেবিলের পিছে বইসা বইসা কম্পুটারে চাবি টিপতা, কিন্তুক অহন মাডে নামতাছো, একটা কথা কইয়া দেই। কহনোই নিজের দূর্বলতা কেউর সামনে ফাঁস করবা না। কহনোই না,

কুনো অবস্থাতেই না," বলে সে তার ব্যাগের ভেতর থেকে একটা ডার্ক ট্যান রঙের বেল্ট আর খাপসহ পিস্তল বের করে আনলো।

"কি বাল-ছাল ব্যবহার করতা, এইডা দেহ। মাই লেটেস্ট বিউটি," বলে সে খাপ থেকে পিস্তলটা বের করে আনলো।

তানভীর মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলো জিনিসটা। সাধারণ ল্যুগার কিংবা নাইন এম এমের চেয়ে আকারে একটু বড়। মাথার কাছটায় অনেকগুলো খাঁজ কাটা। "ডেজার্ট ঈগল," আনমনেই বলে উঠলো ও।

"ইয়েস মাই বয়, ডেজার্ট ফাকিং ঈগল," বলে সে অভ্যস্ত হাতে পিস্তলটা থেকে বের করে আনলো ম্যাগজিন। "ফিফটিন রাউন্ড ম্যাগজিন," ক্লাচ টেনে একটা বুলেট বের করে আনলো। "সুপার সেনজিটিভ বোল্ড এন্ড..." লোড করে একবার ট্রিগার টেনে চেক করলো সে। "আ ফাকিং লাইট টাচড ট্রিগার," তানভীর অবাক হয়ে দেখলো অস্ত্রটা হাতে নিতেই মানুষটার কথা বলার ধরণ থেকে শুরু করে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ পর্যন্ত সব বদলে গেছে। আবার ম্যাগজিনে বুলেট ঢুকিয়ে লোড-আনলোড পরীক্ষা করে সেফটি অন করে জিনিসটা ধরিয়ে দিলো তানভীরের হাতে। "লেটেস্ট এই মালডা দিয়া তুমার মতোন আনাড়িও রীতিমতো গান লিখতে পারবো শত্রুগর উপ্রে। আইচ্ছা, আমি একটা জিনিস বুঝতে পারলাম না। তুমার প্রোফাইলে দেখলাম তুমি সেকেন্ড ডান বেলেক বেল্ট। কুন স্টাইলে?"

"ব্যান্দো স্টাইলে, সেই এসএসএসসি পরীক্ষার পর থেকে অ্যাকাডেমিতে আন-আর্মড কমব্যাট শিখতাম," হাসতে-হাসতেই জবাব দিলো তানভীর।

"আইচ্চা, হের লাইগ্গাই তো কই ডেস্কের পিছে থাহা অ্যানালিস্ট কেমনে বেলেক বেল্ট পাইলো, তাও এতো কম সময়ে। তয় ভাতিজা তুমার শুটিঙের রেকর্ড খুব খারাপ। এইডা তুমার ডেললপ করতে অইবো। আর এই ডেজার্ট ঈগলটার লগেও তুমার অভ্যস্ত অইতে অইবো। অহন তুমার জ্যাকেটটা খুলো দেহি?"

"সরি?" তানভীর পিস্তলটা হাতে নিয়ে দেখছিল পাটোয়ারীর শেষ কথটা ঠিক ধরতে পারেনি।

পাটোয়ারী ওর কথার জবাব না দিয়ে, পকেট থেকে টিস্যু বের করে পানের রসে লাল ঠোঁট মুছে তার ব্যাগ থেকে ধুসর রঙের পাতলা ভেস্টের মতো কিছু একটা বের করে এগিয়ে দিলো ওর দিকে। "সরি মরি না কইয়া জ্যাকেট খুইল্লা এইডা পিন্দা লও," বলে সে জিনিসটাতে দুটো টোকা দিয়ে বললো। "পলিমার দিয়া বানানি লেটেস্ট মাল।"

তানভীর এক হাতে পিস্তল সামলে জিনিসটা হাতে নিয়ে দেখলো ওটা একটা বুলেট প্রুফ ভেস্ট। জিনিসটা দেখার সাথে সাথে ও চিনতে পেরেছে। কারণ কিছুদিন আগেই ট্রেনিঙে ও এরকম ভেস্ট ব্যবহার করেছে। পিস্তলটাকে হোলস্টারসহ টেবিলের ওপরে রেখে, ভেস্টটা পরে নিলো শার্টের ওপরে। তারপর পিস্তলসহ হোলস্টার সেটের বেল্ট আটকে

নিলো ওটার ওপরে। এখন চাইলেই খুব সহজে ডান হাতে পিস্তলটা বের করে আনতে পারবে যখন খুশি। শার্ট আর হোলস্টারের ওপরে লেদার জ্যাকেটটা পরে নিয়ে চেইন টেনে দিলো তানভীর।

"আপনার সাথে কি আমার কাজ শেষ?" জ্যাকেট পরে নিয়ে একবার ঘড়ি দেখলো তানভীর। প্লেনটাতে যতোটা সম্ভব দ্রুত ওঠা দরকার। কাজে নামতে হবে।

আলীম পাটোয়ারী নিজের ব্রিফকেস থেকে আরেকটা জিনিস বের করে আনলো। তবে সেটা তানভীরের হাতে না দিয়ে নিজের হাতেই রেখে ওকে বসার জন্যে ইশারা করলো। হাতের জিনিসটা পাশে রেখে পানের বাক্স থেকে আরেকটা পান নিয়ে মুখে পুরে দিলো সে।

"শুনো ভাতিজা, তুমি হয়তো আমার কথা শুইন্না আর কাপর-চুপর দেইখ্যা আমারে ঠিক ভক্তি করবার পারতেছো না। তয় শুইন্না রাখো আইজ বিশ বছর আমি এই লাইনে আছি। আইজ পর্যন্ত বহু এজেন্টের লগে দেশে-বিদেশে আমি কাম করছি। তয় এই অপারেশনডা কিন্তুক ব্যতিক্রম। আমি নিজে ইএএফরে লুক না হের লাইগাই কইতাছি। তুমার পাশা স্যারে তো শুটার সুলতান আর জালাল ইন্সপেক্টরে পাঠাবোই। আইটি সাপোর্টের লাইগা আমার এক অফিসার টমিরেও আমি পাঠায়া দিছি সিলেট। হেরা তুমারে সাহাইয্য করবো," তয় বলে সে এক ধাপ এগিয়ে এলো তানভীরের দিকে। "কেউরেই বিশ্বাস কইরো না, কেউরেই না, এমনিক নিজেরেও না। একমাত্র তাইলেই মাডে টিক্কা থাকতে পারবা। আর যহন সবকিছু ফেইল অইয়া যাবো তহন এইডা কামে দিবো," বলে সে হাতে ধরা জিনিসটা এগিয়ে দিলো তানভীরের দিকে।

তানভীর হাতে নিয়ে দেখলো। জিনিসটা একটা আধুনিক সুইচ নাইফ, এটাকে স্টিলেটোও বলে। ও ছুরিটা পকেটে ঢুকিয়ে আলীম পাটোয়ারির দিকে তাকিয়ে হাসি দেয়ার চেষ্টা করলো ও।

পাটোয়ারী হাসলো না। সে ওর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর মুখে খুবই স্মার্ট ভঙ্গিতে বলে উঠলো, "গুড বাই, মাই বয় এন্ড গুড লাক। ওটাই এখন তোমার সবচেয়ে বেশি দরকার।"

তানভীর চিন্তিত মুখে পাটোয়ারীর কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে ফর্মালিটি সেরে প্লেনে এসে উঠলো। কানে হেডফোন লাগিয়ে গান ছেড়ে দিলো। প্লেন টেক-অফ করছে। তবে সেই শব্দ শুনতে পাচ্ছে না ও। টেক-অফের শব্দ ছাপিয়ে হেডফোনের এয়ারটাইট খুদে স্পিকারের ভেতর দিয়ে ভেসে আসছে জন ডেনভারের গলা...

'মাই ব্যাগস আর প্যাকড, এন্ড আ'ম রেডি টু গো... আ'ম লিভিং অন আ জেট প্লেন...'

শেষ কথাটা কানে যেতেই মৃদু হেসে উঠলো তানভীর। জন ডেনভার বাস্তব জীবনে জেট প্লেনে করেই নিজের মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেছিল।

ও কোনদিকে যাচ্ছে কে জানে।

অধ্যায় আট

সময়: ১৮০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ

শান্তির মঠ, লাসা, তিব্বত

দুজনার প্রথম সাক্ষাৎটা কোনদিকে মোড় নিচ্ছে ঠিক বুঝতে পারছে না শামান।

দুজনেই দুজনার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। শামান একবার মানুষটার দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করলো। কিন্তু, ওর মনে হলো সেটা হাসির চেয়ে মুখ ভেংচানো হলো বেশি। সামনে বসে থাকা মানুষটার উচ্চতা হবে ওর থেকে এক ফুট কম। কিন্তু মানুষটা চওড়ায় ওর থেকে ঠিক দ্বিগুনের বেশি হবে। শামান একটু ঘাড় বেঁকিয়ে মানুষটার বাম পাশের কান দেখার চেষ্টা করলো কিন্তু কালো লম্বা চুলে দুই পাশের কানই ঢেকে আছে তাই সেটা সম্ভব হলো না।

"হে-হে শামান, তোমার চুলগুলা তো এহনো দেহি আগের মতোনই আছে," বলে বিধু নামের মানুষটা বড় এক টুকরো রুটি মুখে পুরে দিলো। সেইসাথে সামনের বাটিতে স্তুপ করে রাখা সিদ্ধ সব্জি থেকে অনেকটা পুরে দিলো মুখে। সেগুলোকে সামলে নিয়ে বলে উঠলো। "তোমার চুলগুলা কেমুন জানি মরচা পইড়া নষ্ট অওয়া লুহার মাতোন দেহায়। হে-হে," বলে মানুষটা আবারো ব্যস্ত হয়ে পড়লো তার খাবার নিয়ে।

বিধুর কথা শুনে শামান রাগ হবে নাকি ঠিক বুঝতে পারলো না। সে একবার অসহায়ভাবে পাশে বসে থাকা নোরবুর দিকে তাকাল। নোরবু হাত নেড়ে ওকে শান্ত থাকতে বললো। "বিধু, তুমি তো আশা করি জানো পরিস্থিতি কি," বলে নোরবু আরো যোগ করলো। "আর কেনই বা ডেকে পাঠানো হয়েছে তোমাকে।"

শামান, নোরবু আর বিধু নামের মানুষটা এই মুহূর্তে বসে আছে মঠের বড় রসুই ঘরের এক প্রান্তে। একটু আগে শামানকে নিয়ে নোরবু চলে আসে রসুইতে। সেখানে পৌছে দেখে বিধু ইতিমধ্যেই খেতে বসে গেছে।

"হুম," নোরবুর প্রশ্নের জবাবে বিধু শুধুমাত্র একটু মাথা নাড়লো। আস্তে ক'রে সে থুকপা'র বাটিটা তুলে নিয়ে পুরোটাই ঢক-ঢক করে চালান করে দিলো গলায়। খাওয়া শেষ করে মস্ত একটা ঢেকুর তুলে বাম হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখ মুছে সে একটা হাসি দিলো ওদের দুজনার দিকে তাকিয়ে। "আহ্, যা ক্ষুধা পাইছিল। হুম, আমি জানি। কুনো বিষয় না। আমারে ভালো তীর ধনূক দেন। সব মাইরা সাফ কইরা ফেলাবো," বলে সে আবারো একটা হাসি দিয়ে মাখন চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে তাতে চুমুক দিলো।

শামান কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই নোরবু আবারো হাত নেড়ে ওকে মানা করলো। "বিধু, তোমার তাহলে কন্নোরে যেতে কোন আপত্তি নেই?"

"না-না, ডুকপা লামা বিপদে আর আমি চুপ-চাপ বইসা থাকবো এইটা হয়?" বলে সে মঠের শিক্ষানবীশ এক ছেলেকে ডাক দিলো। "এই যে ভাই, আরেকটু চা এনে দাওনা। এতো অল্পে হয়, কও দেহি!"

"শামান যদি তোমার সাথে যায় তবে তোমার কোন সমস্যা নেই তো?" নোরবু জানতে চাইলো।

নোরবুর প্রশ্ন শুনে বিধু একটু অবাক হয়ে তাকাল নোরবুর দিকে। তারপর শামানকে দেখলো। "ওহ, তাইলে তো ভালাই হয়। কিন্তু ও মারামারি পারে তো নাকি? যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে ওর? নাকি সব আমারই করা লাগবো। আমি কিন্তু বাপু তোমারে বোঝার মতোন টানতে পারবো না," বলে সে মাথা নাড়তে লাগলো।

শামান নোরবুর দিকে তাকিয়ে অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাকালো।

"ঠিক আছে, তাহলে তো কোন ঝামেলাই রইলো না," শামানের দিকে তাকিয়ে দ্রুত বলে উঠলো নোরবু। "এখন চলো তোমাদেরকে আমি এক জায়গায় নিয়ে যেতে চাই," ওরা দুজনেই উঠে দাঁড়িয়ে নোরবুকে অনুসরণ করতে লাগলো। নোরবু ওদেরকে নিয়ে মঠের নিচে একেবারে পাতালে চলে এলো। পুরো মঠটাই পাহাড় কেটে নির্মিত, তাই এর একেবারে অভ্যন্তরে একটা অংশ আছে যেটা পাহাড়ের একেবারে পাদদেশে চলে গেছে। ওরা দুজনেই নোরবুর পেছন-পেছন হাঁটছে আর অবাক হয়ে দেখছে মঠের নিচে আরেক জগৎ।

"কি অবস্থা, এই মঠে এতো বছর থাকছি অথচ এইটার তলে এইরহম কিছু আছে ভাবতেও পারি নাই," বিধু অবাক হয়ে বলে উঠলো। শামান মুখে না বললেও মনে-মনে ভাবলো বিধু ভুল বলেনি।

নোরবু ওদেরকে নিয়ে একেবারে পাতালে এসে একটা লোহার তৈরী বড় দরজার সামনে থামলো। দরজার বাইরের কব্জাতে আটকানো হাতের কব্জির মতো মোটা শিকলটা ধীরে-ধীরে খুলে ফেললো। তারপর শক্ত করে ঠেলে ফাঁক করে দিলো লোহার ভারি দরজাটা।

তিনজনে মিলে ভেতরে প্রবেশ করতেই শামান শুনতে পেল ওর পাশ থেকে বিধু বিস্ময়সূচক শব্দ করে উঠলো। ও নিজেও কম অবাক হয়নি কামরাটা দেখে। ওদের এই শান্তির মঠের নিচে এরকম একটা কামরা আছে তাও আবার এরকম সংগ্রহসহ এখানে না এলে জীবনে কোনদিন মানতেও পারতো না শামান।

প্রথমেই যে-ব্যাপারটা অবাক করছে ওদেরকে সেটা হলো পাহাড়ের একেবারে ভেতরে পাতালে হবার পরও কামরার ভেতরটা বেশ আলোকিত। কোথাও প্রদীপ বা মশাল জ্বলার কারণে এই আলো আসছে, ব্যাপারটা এমন নয়। বরং আলোটা আসছে প্রাকৃতিক কোন উৎস থেকে। শামান অনুমান করলো সম্ভবত পাহাড়েরই ফাঁক-ফোকর দিয়ে এমন কোন ব্যবস্থা করা আছে যাতে প্রাকৃতিক আলো দিনের বেলা ভেতরে প্রবেশ করতে পারে।

“তোমরা শান্তির মঠের ইতিহাস কতোটুকু জানো আমি জানি না। তবে এই শান্তির মঠের যে বাহ্যিক আকৃতি তোমরা এখন দেখতে পাও এই কাঠামো তৈরীর ইতিহাস কিন্তু মোটেও শান্তির কিছু নয়। রাজা ভূমি ও রাজা মহীশূড় যারা মঠ স্থাপনের জন্যে এই দুর্গটা আমাদেরকে দান করেন তার দাদার বাবা স্থাপন করেছিল এই দুর্গটা। চৈনিক দেশ- তিব্বত- আর ভারতবর্ষের সংযোগ স্থলের এই জায়গাটা ছিল তার রাজ্য নিয়ন্ত্রণের অন্যতম হাতিয়ার। উনি ছিলেন ভয়ঙ্কর অত্যাচারি মানুষ। তারই বংশধরেরা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের পর দুর্গে এই মঠ স্থাপন করা হয়। কিন্তু তার কিছু সংগ্রহ রাজার অনুরোধেই রেখে দেয়া হয় পাতালের এই তালাবদ্ধ কামরায়। সেটারই একটা অংশ তোমরা দেখতে পাচ্ছো এই মুহূর্তে,” বলে নোরবু একটা ছোট লাঠির মতো জিনিস তুলে নিয়ে মাথার ওপরে গোল চাকতির মতো দেখতে সোনালি রঙের একটা জিনিসে বাড়ি মারলো।

সাথে সাথে সোনালি রঙের গোল ধাতব চাকতির মতো দেখতে জিনিসটা একটু শব্দ করে খানিকটা ঘুরে গেল। বাইরে থেকে আসা আলোটা ধাতব চাকতিতে প্রতিফলিত হচ্ছিলো। সাথে সাথে সেটা ছড়িয়ে পড়লো অন্যদিকে, সেখানে আরেকটা চাকতির ওপরে গিয়ে পড়লো। সেটা থেকে আরেকটা। কয়েক মুহূর্তের ভেতরে গুহার মতো পুরো কামরা জুড়ে বিশটার মতো এরকম চাকতিতে ছড়িয়ে পড়লো সোনালি আলো। ঝলমলে আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো পুরো কামরা।

আর যা দেখলো তাতে এমনকি শামান আর বিধুর মতো যোদ্ধারও গা শিউরে উঠলো।

জায়গাটাকে কামরা না বলে গুহা বলাটাই শ্রেয়- পুরো গুহাটাই আসলে একটা অস্ত্রাগার। গুহাটা অনেকটা মোটা একটা গলির মতো। সোজা সামনের দিকে এগিয়ে শেষ মাথায় একটু ডানে বাঁক নিয়েছে। সোনালি চাকতিগুলো থেকে ছড়ানো আলোয় যা দেখতে পাচ্ছে সেটা এক কথায় অবিশ্বাস্য।

শামান খেয়াল করে দেখলো ওর জানামতে এমন কোন ধরণের অস্ত্র নেই যা এখানে দেখতে পাচ্ছে না ওরা। অসংখ্য ধরণের কাতানা, কুকরি, কোঁচ, জোয়ালা, বাটালসহ হরেক রকমের তীর-ধনুক, বর্শা এমন কোন ধরণের অস্ত্র নেই যা এখানে নেই। সারি দিয়ে রাখা ঝকঝকে-চকচকে অস্ত্রগুলোতে আনমনেই হাত বুলাতে-বুলাতে সামনে এগিয়ে যেতে লাগলো ওরা। ওর পাশ থেকে ভেসে আসা নানা ধরণের বিস্ময়সূচক শব্দে বুঝতে পারছে বিধুরও একই অবস্থা।

“তোমাদেরকে রাজা মহীশূরের বিশেষ অস্ত্রাগারে নিমন্ত্রণ। প্রাচীন চৈনিক দেশ, তিব্বত আর মোঙ্গল দেশে পাওয়া যায় এমন কোন অস্ত্র নেই যা এখানে নেই,” নোরবু বলে উঠলো।

“এইজইন্যেই,” শামানের পাশ থেকে বিধু বলে উঠলো। “ছোটবেলা থেইকে যহনি মঠে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ হইতো সেইগুলা কই থেকে আইতো এইটা নিয়া আমার মনে বরাবরই

প্রশ্ন আছিল," বলে সে শামানের দিকে দেখলো একবার। "আইজ বুজলাম ওইগুলা কই থেইকে আইতো।"

শামান এক জায়গা থেকে চেইনের সাথে আটকানো একটা লোহার বল তুলে নিলো। চেইনটা তুলে ঝাঁকি দিতেই বলের মসৃণ উপরিতল থেকে এক ঝাঁক লোহার কাঁটা বেরিয়ে এলো। মৃদু একটা হাসি দিয়ে বলটা রেখে দিলো ও। "এমন কোন ধরণের অস্ত্র আছে যা নেই এখানে?" প্রশ্নটা ও করেছে নোরবুর উদ্দেশ্যে।

ওর প্রশ্ন শুনে হেসে উঠলো নোরবু। আনমনেই হাত নেড়ে বলে উঠলো, "এসব বাদ দাও। যে-জিনিসটা দেখানোর জন্যে তোমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছি সেটা দেখাই চলো," বলে সে অস্ত্রাগারের শেষ মাথার বাঁকটার দিকে রওনা দিলো। বাঁকের অন্যপাশে চলে এলো সে। তাকে অনুসরণ করে সেদিকে এগোল শামান আর বিধুও। জায়গামতো পৌছে শামানরা বুঝতে পারলো অস্ত্রাগারের এই বিশেষ জায়গাটাতে শুধুমাত্র বিশেষ ধরণের অস্ত্রগুলোকেই রাখা হয়ে থাকে। এখানকার প্রতিটি জিনিস আকৃতি আর বৈশিষ্ট্যে যেন এক অদ্ভুত আভিজাত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে।

"এটা দেখো," বলে নোরবু একটা কাঠের কারুকাজ করা বাক্সের সামনে এসে থামলো। কালো রঙের কাঠের বাক্সটার গায়ে সুন্দর কারুকাজ করা। তবে কাঠের রঙ আর কারুকাজের আকৃতি যতোই সুন্দর হোক না কেন, সেটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে জিনিসটা অনেক পুরনো।

নোরবু বাক্সটার সামনে গিয়ে ওটার একপাশে লাগানো হুঁড়কোটা খুলে ডালাটা তুলে দিলো। শামান আর বিধু দুজনেই বেশ কৌতুহলো নিয়ে ফিরে তাকাল ওটার ভেতরে। কিন্তু ভেতরে তাকিয়ে যেন একটু হতাশই হলো শামান। ভেতরে বেশ সাধারণ দেখতে দুটো চামড়ায় মোড়ানো কাতানা- মানে এক ধরণের তলোয়ার- পাশাপাশি রাখা। নোরবু দুটো কাতানার একটা হাতে তুলে শামানের দিকে ফিরে তাকাল। "শামান, তুমি হয়তো অনেক অস্ত্র দেখতে পাচ্ছো এখানে। কিন্তু ইতিহাস, ঐতিহ্য, আভিজাত্য আর গঠন বৈশিষ্ট্যে এগুলোর কোনটাই এই জোড়া কাতানার সামনে কিছুই নয়।"

"এইগুলা?" বেশ অবাক হয়ে শামানের পাশ থেকে বিধু বলে উঠলো। "এইগুলা তো কেমন জানি পুরান লাগতাছে।"

তার কণ্ঠস্বরেই বোঝা যাচ্ছে সে বেশ হতাশ হয়েছে ও-দুটো দেখে।

বিধুর কথা শুনে হেসে উঠলো নোরবু। "তুমি যতোটা সাধারণ ভাবছো জিনিসদুটো ততোটা সাধারণ নয়। তবে হ্যাঁ, এগুলো বেশ পুরনোই বটে। কেন সেটাও বলছি," বলে সে একহাতে কাতানার খাপটা ধরে অন্যহাতে চামড়ার ফালি দিয়ে মোড়ানো বাটে ধরে টান দিলো। চামড়ার কারুকাজ করা খাপের ভেতর থেকে লোহার টুকরোটা বেরিয়ে আসার পর শামান প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলো না। কিন্তু জিনিসটার দিকে ভালোভাবে

তাকাতেই ওর অভিজ্ঞ চোখ ঝিঁকিয়ে উঠলো। অনেকটা মুগ্ধ হয়েই সে নিজের হাতে তুলে নিলো কাতানাটা। হাতে নেয়ার সাথে সাথে আরেক দফা মুগ্ধ হয়ে গেল ও।

প্রথম দেখায় প্রেম না হলেও, প্রথমবার হাতে নেয়ার সাথে সাথে সে প্রেমে পড়ে গেল জিনিসটার। তবে ও কিছু বলার আগেই পাশ থেকে নোরবু বলে উঠলো, "আশা করি হাতে নেয়ার পর তুমি বুঝতে পারছো জিনিসটা একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির।"

ভিন্ন তো অবশ্যই, শামান মনে-মনে বলে উঠলো। কারণ সব লোহার কাতানা যেখানে হয় চক-চকে সাদা এটা একেবারেই কুচকুচে কালো। তবে এটার ধারালো প্রান্তের ঠিক আগে অদ্ভুত এক চকচকে সোনালি আবহ বিদ্যমান, এরকম এর আগে কখনো দেখেনি শামান। এছাড়া কাতানার মাথা সাধারণত হয় ভোতা, কিন্তু এটার মাথা একদিকে চোখা। তবে এগুলোর কোনটাই শামানকে অবাক করেনি, যতোটা অবাক করেছে এর ওজন। একবারেই পালকের মতো হালকা জিনিসটা। "এটা...এটা এতো হালকা কেন? মানে কিভাবে?" বেশ অবাক হয়ে নোরবুর কাছে জানতে চাইলো সে।

"এর কারণ জিনিসটা সাধারণ কোন লোহায় তৈরী নয়। কথিত আছে রাজা মহীশূরের পূর্বপুরুষরা নাকি হিমালয়ের পাদদেশে পাওয়া এক উল্কাপিন্ড থেকে সংগ্রহ করা লোহা থেকে তৈরী করেছিল এই বিশেষ তলোয়ার। আর তাই এটার বৈশিষ্ট্যও একেবারে আলাদা। আকৃতি অনুযায়ী অস্বাভাবিক হালকা, কখনো ভাঙেনা, বাঁকা হয় না এমনকি ধারও করতে হয় না একে। পৃথিবীর বুকে পাওয়া যেকোন আকরিক ধাতুর চেয়ে শক্ত এটা। একেবারেই ব্যতিক্রম এই ধাতু। এই জোড়া কাতানাতে যতোটুকু ব্যবহৃত হয়েছে এই ধাতু এর বাইরে নাকি আর কিছুটা আছে শুধুমাত্র উরগ নামে এক সর্পপূজারি জাতির কাছে। আর নাকি কোথাও নেই এই ধাতু," বলে লামা নোরবু থামলো।

"রাজা মহীশূরের পূর্বপুরুষেরা এই তিব্বত আর হিমালয়ে নিজেদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার পেছনে নাকি এই তলোয়ারের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তবে রাজা মহীশূরদের পরবর্তী বংশধরেরা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে শান্তির পথে আসার সময় সে নাকি এই তলোয়ার গৌতম বুদ্ধকে উৎসর্গ করে একে চিরতরে এই অস্ত্রাগারে রেখে দেন। আর তাই এই কাতানা জোড়ার একটা বিশেষ নাম আছে," বলে নোরবু একটু থেমে যোগ করলো। "স্বয়ং বুদ্ধ নাকি এই নাম দিয়েছিলেন। কথিত আছে রাজা মহীশূরের পূর্বপুরুষদের একজনের হয়ে এক অন্ধকারের দেবতার সাথে লড়াই করেছিলেন নাকি বুদ্ধ। এই জোড়া কাতানা দিয়ে উনি অন্ধকারের সেই দেবতাকে পরাজিত করে এর বিশেষ গুনাবলীর জন্যে স্বয়ং বুদ্ধ এই জোড়া কাতানাকে নাম দিয়েছিলেন 'হিম্বা'।"

বলে লামা নোরবু জোড়া কাতানা নিজের হাতে তুলে নিয়ে সে-দুটোকে শামানের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠলো, "বৃহত্তর হিমালয়ে শান্তি নামিয়ে আনতে এই 'জোড়া হিম্বা'কে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। আমি একে সেই বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে তোমার হাতে তুলে

দিচ্ছি। যাতে ক'রে তুমি এটা দিয়ে আরেকবার শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারো। সেইসাথে ফিরিয়ে আনতে পারো ডুকপা লামাকে," বলে সে অস্ত্র জোড়া তুলে দিলো শামানের হাতে।

অধ্যায় নয়

সময়: ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ

স্থান: নির্মাণাধীন ক্যাফেটেরিয়া,

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, সিলেট

মেয়েটা এমনভাবে বান্ধবিদের দিকে আঙ্গুল তুলে কথা বলছে যেন অস্ত্র তাক করে আছে।

যদিও কানে হেডফোন লাগানো থাকার ফলে বাইরের কোন শব্দ তার কানে পৌছানোর কথা নয়, তবুও মেয়েগুলোর তীক্ষ্ণ গলা সে পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে। কারণ আর কিছুই না তাদের অতি মাত্রায় উচ্চস্বর। হাত নেড়ে-নেড়ে অতি উচ্চস্বরে কথা বলছে তারা।

পেন্সিলটা নামিয়ে রেখে লেখার খাতা থেকে চোখ তুলে আড়চোখে মেয়েগুলোর দিকে ফিরে তাকাল তানভীর। বিকেলের এই সময়ে সাধারণত এখানে কেউই আসেনা, আর এ-কারণেই এই জায়গাটা ওর অনেক প্রিয়। ক্লাসরুম আর ক্যান্টিন দুটোরই সংকট থাকার পরও নির্মাণাধীন ক্যাফেটেরিয়া আর 'ই' বিল্ডিঙের কাজ কোন এক অজানা কারণে অনেকদিন ধরেই স্থগিত হয়ে আছে। এ-কারণে ক্যাফেটেরিয়ার পেছনের এই জায়গাটা বলতে গেলে ব্যবহৃতই হয় না। নির্জনতার পাশাপাশি এই জায়গাটা তানভীরের প্রিয় হবার পেছনে আরেকটা কারণ আছে।

এখানে বসলে প্রচুর বাতাস তো আছেই সেইসাথে বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন পাহাড়ি এলাকার চমৎকার একটা ভিউ পাওয়া যায় এখান থেকেই। তাই এখানে বসেই সে এটা-ওটা লিখতে পছন্দ করে। খোলা হাওয়া আর আর বিস্তৃত খোলা প্রান্তরের সামনে বসে হারিয়ে যেতে পারে নিজের ভাবনার জগতে।

'ধূর বাল...' একবার আড়চোখে তাকালেও চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল ও কিন্তু ভেসে আসা উচ্চকিত কণ্ঠস্বরটা শুনে আবারো সেদিকে ফিরে তাকাল তানভীর।

চারটা মেয়ের একটা দল। দেখার প্রায় সাথে-সাথেই সে চিনতে পারলো; এই মুহূর্তে চারজন হলেও এদের দলে আরেকজন আছে। সংখ্যায় এরা পাঁচজন। সাস্ট ক্যাম্পাসে এরা একনামে 'টমবয়' গ্রুপ নামে পরিচিত।

প্রতিটি মেয়েই বলতে গেলে প্রায় ছেলেদের মতো পোশাক পরা, যেটা এই সাস্ট ক্যাম্পাসে একরকম বিরল বলা চলে। এই গ্রুপটা ক্যাম্পাসে একেবারে ছেলেদের মতো চলাফেরা করে, একটা মেয়ে আছে রক মিউজিক গায়। একভাবে বলতে গেলে এই ক্যাম্পাসের নারী মাস্তান এরা। সরাসরি এদের সাথে কখনো কথা না হলেও তানভীর খুব ভালো করেই চেনে গ্রুপটাকে। প্রতিটি মেয়েই সুন্দরি, পোশাক-আশাকে বেশ আধুনিকা,

হলের বড় ভাই আর ফ্রেন্ডদের কাছে ও শুনেছে এই গ্রুপের দুয়েকটা মেয়ে বাদে বাকিদের প্রতেক্যেই নাকি খুব ভালো ছাত্রীও। তবে এই গ্রুপের মধ্যমণি আছে একটা মেয়ে, তার জন্যে বলতে গেলে সাধারণ ছাত্র থেকে শুরু করে বহু শিক্ষকও নাকি একবাক্যে বলতে গেলে ফিদা।

তানভীর দেখলো একটু আগে গালি দেয়া মেয়েটা একটা সিগারেট ধরিয়ে টানছে, অন্য আরেকটা মেয়ে কথা বলে উঠলো, 'এই বালের প্রক্টর আসার আর টাইম পাইলো না, মাত্র মুরগিটা ধরছিলাম...' কথা বলতে বলতেই হঠাৎ ওদের দলের একজনের চোখ পড়লো তানভীরের দিকে। সাথে-সাথে সে অন্যদেরকে জানালো ব্যাপারটা। প্রায় সবাই একযোগে ফিরে তাকাল ওর দিকে। সিগারেট টানতে থাকা মেয়েটা হাতের ইশারায় ডাকলো ওকে।

অনেকটা না দেখার ভান করে অন্যদিকে ফিরে তাকাল তানভীর। বেশ বুঝতে পারছে না চাইতেও একটা অযাচিত ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছে ও। তালির শব্দ শুনে চমকে উঠে ফিরে তাকাল ওদের দিকে। হাতের ইশারায় ডাকছে ওকে। এবার আর এড়িয়ে যাবার উপায় নেই।

অর্ধনির্মিত দেয়ালের ওপরে বসে পিলারে হেলান দিয়ে লিখছিল ও। সেখান থেকে নেমে হাতের খাতা ভাঁজ করে পায়ে পায়ে এগোল মেয়েগুলোর দিকে, দুই কানে গুঁজে রাখা হেডফোনের একটা খুলে ফেললো।

"এই এদিকে আয়," সিগারেট টানতে থাকা মেয়েটা কড়া ভাষায় ডাক দিলো ওকে। প্রায় সবগুলো মেয়েই তাকিয়ে আছে ওর দিকে। শুধুমাত্র মাঝখানের একজন বাদে। তানভীর অনুমান করলো, সম্ভবত এই মেয়েটাই দলের মধ্যমণি। "এই তোরে ডাক দিলাম দেখস নাই?"

"জি, দেখেছি-"

"তাইলে আইতে দেরি করলি ক্যান?" বলেই সে টান দিয়ে ওর হাত থেকে রাইটিং প্যাডটা নিয়ে নিলো।

"কোন ডিপার্টমেন্ট?" একজন প্রশ্ন করলো।

"ওয়ান-ওয়ান?" আরেকজন জানতে চাইলো। ফার্স্ট ইয়ার ফার্স্ট সেমিস্টার কে ওয়ান ওয়ান বলা হয়।

"জি- না, টু-ওয়ান," মানে তানভীর বলতে চাইছে ও সেকেন্ড ইয়ার ফার্স্ট সেমিস্টারে পড়ে।

"এই তুই পোলা না? এমুন মাইয়াগো মতোন করতাছোস ক্যান?" একাধিক প্রশ্নবাণে জর্জরিত তানভীর বুঝতে পারছে আজ খবরই আছে, কঠিন একটা র্যাগ খেতে হবে।

“আরে, গায়ে-গতরে তো ভালোই,” পাশ থেকে আরেকটা মেয়ে টি-শার্টের ওপর দিয়ে ওর বাইসেপে জোরে চাপ দিলো। “বাহ তোর বডি তো ভালোই, জিম করোস নাকি?”

কিছু না বলে ও মাথা উঁচু করে রাগত দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল ওর হাতে চাপ দেয়া মেয়েটার দিকে। হঠাৎই ওর মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে, আর এটাও বেশ বুঝতে পারছে বেশি নরম হলে বেশি নাজেহাল হতে হবে।

ওকে আগুন চোখে তাকাতে দেখে চট করে গ্রুপ লিডার মেয়েটা ফিরে তাকাল ওর দিকে, এতোক্ষণ সে সরাসরি তানভীরের দিকে তাকায়নি। তানভীরের দিকে সোজা তাকিয়ে আছে সে। তানভীরও বুঝতে পেরেছে এই মেয়েটাই সেই মেয়ে যার জন্যে পুরো সাস্ট ক্যাম্পাস দিওয়ানা। মেয়েটা উঠে দাঁড়িয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো ওর সামনে, তানভীর সরাসরি তাকিয়ে আছে তার চোখের দিকে। এরকম ভয়ঙ্কর সুন্দর চোখ তানভীর জীবনেও দেখেনি।

“নিজেকে খুব বাহাদুর মনে করিস তুই, তাই না? তোর বাহাদুরি চাইলে... এই চোখ নামা,” তানভীর এক দৃষ্টিতে মেয়েটার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। পাশ থেকে আরো দুটো মেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

“এই তোরে চোখ নামাইতে বললো না?” সূর্যের চেয়ে বালি গরম, নেত্রির চেয়ে তার চামচারা বেশি গরম। তানভীর তাকিয়েই আছে ভয়ঙ্কর সুন্দর চোখ জোড়ার দিকে। মেয়েটাও তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার চোখের মণি নড়ে উঠলো। মনে-মনে খুশি হয়ে উঠলো তানভীর, দৃষ্টির লড়াইয়ে হেরে যেতে বসেছে মেয়েটা।

চোখ নামিয়ে টান দিয়ে ওর বাম কান থেকে হেডফোনটা খুলে ফেললো মেয়েটা, “কানে আবার হেডফোন লাগায়া রাখছে। দেখি কি বাল-ছাল শুনছিস,” বলেই সে হেডফোনটা কানে লাগালো। কয়েক সেকেন্ডের ভেতরে তার দৃষ্টি পরিবর্তন হয়ে আসতে লাগলো। “‘ল্যায়লা’, এরিক ক্ল্যাপটন?” বলে সে চোখ তুলে তাকাল তানভীরের দিকে। “আসলেই তুই ক্ল্যাপটন শুনছিলি নাকি হুদাহুদি?”

“আমি এরিক ক্ল্যাপটনের ফ্যান,” তানভীর শক্ত মুখেই বলে উঠলো। যদিও ভেতরে-ভেতরে ও জানে দৃষ্টির লড়াইয়ে হেরে গিয়ে ভয়ঙ্কর সুন্দরি এখন দূর্বল। তবুও বেশি কথা বলা ঠিক হবে না। এর চামচারা আবার ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। “তার সব গান আমার শোনা।”

মেয়েটা আরেকবার ওকে দেখলো। “বাহ্, বিটলসের টি-শার্ট পরে আছিস, আবার গান শুনছিস ক্ল্যাপটনের, বিরাট মিউজিক বোদ্ধা মনে হয়। তোকে ছেড়ে দেবো এক শর্তে,” পাশ থেকে অন্য একটা মেয়ে কিছু বলতে চাচ্ছিলো তার আগেই হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলো ভয়ঙ্কর সুন্দরি। “বিটলস আর এরিক ক্ল্যাপটনের ল্যায়লার মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে বলতে পারলে তুই ফ্রি।”

“বাল বলতে পারবে...” পাশ থেকে অন্য একটা মেয়ে ফোড়ন কাটতেই উঠতেই সবাই একযোগে হেসে উঠলো।

“বিটলসের জর্জ হ্যারিসনের ওয়াইফ প্যাটি বয়েডকে পছন্দ করতো এরিক ক্ল্যাপটন, তাদের মধ্যে একটা সময় সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। ক্ল্যাপটন মূলত প্যাটি বয়েডকে উদ্দেশ্য করেই নির্মাণ করেছিল তার অনবদ্য সৃষ্টি ‘ল্যায়লা’,” বলা শেষ করে তানভীর মৃদু হাসলো।

সবাই একটু অবাক হয়েই তাকিয়ে আছে। ভয়ঙ্কর সুন্দরি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। “আমার নাম লু,” বলে সে একটা হাত বাড়িয়ে দিলো তানভীরের দিকে। “আমি ভাবতাম, এই ক্যাম্পাসে এরিক ক্ল্যাপটনের সবচেয়ে বড় ফ্যান আমি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে...”

“এই এই প্রক্টর স্যারের গাড়ি, শালা আবারো...”

তানভীর মাটি থেকে ওর রাইটিং প্যাডটা তুলে নিলো। মেয়েগুলো যেতে যেতে হঠাৎ পেছন ফিরে তাকাল ‘লু’ নামের সেই ভয়ঙ্কর সুন্দরি, মুচকি হাসি দিয়ে উঠলো সে।

‘স্যার...স্যার...’

বর্তমান সময়

সিলেট এয়ারপোর্ট

“স্যার...” এয়ার হোস্টেসের মৃদু ঝাঁকি খেয়ে চমকে উঠলো তানভীর। “স্যার, প্লেন ল্যান্ড করতে যাচ্ছে। আপনার সিট বেল্টটা বেঁধে নিন প্লিজ।”

সিটবেল্ট বেঁধে নিয়ে বড় ক’রে একবার দম নিলো তানভীর। উফ্, আধাঘন্টার এই ছোট্ট যাত্রার ভেতরেও ঘুমিয়ে গেছিল ও। কানে গুঁজে রাখা হেডফোনের ভেতর থেকে বিদায় নিয়েছে জন ডেনভার। সেখানে এখন একমনে গিটার বাজিয়ে চলেছে কার্লোস সান্তানা। গিটারের সুরলহরীর ভেতর দিয়ে মাঝে-মাঝে ভেসে আসছে তার কণ্ঠস্বর,

‘ব্ল্যাক ম্যাজিক ওমেন... ব্ল্যাক ম্যাজিক ওমেন’

প্লেন ল্যান্ড করছে, কানের ব্যথায় দাঁতে দাঁত চেপে মনে-মনে তানভীর বলে উঠলো, এই হয় দুনিয়াতে, লায়লারা চলে যায়, রয়ে যায় ব্ল্যাক ম্যাজিক ওমেনরা।

আরো আধা ঘন্টার ভেতরে ও যাবতীয় ফর্মালিটি সেরে বেরিয়ে এলো এয়ারপোর্টের বাইরে।

সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, দেশের তৃতীয় বৃহত্তম এয়ারপোর্ট হিসেবে তানভীরের চোখে একটু ছোটই মনে হলো। অবশ্য সদ্য দেশের বাইরে থেকে আসার কারণেও সেটা হতে পারে। এর আগে পাঁচ বছরের বেশি সময় সিলেট থাকলেও এয়ারপোর্টে কখনো আসা হয়নি ওর।

সময়টা প্রায় শীতকাল হলেও এয়ারপোর্টের বাইরে রোদের তেজ অত্যন্ত প্রখর। লেদার জ্যাকেটটা খুলে হাতে নিয়ে চোখে সানগ্লাস পরে নিলো তানভীর। প্লেনে সামান্য সময়ের জন্যে ঘুমিয়ে পড়ায় মনে-মনে একটু আফসোস হচ্ছে ওর। কারণ ওই সময়ে ফাইলটাতে চোখ বুলিয়ে নিতে পারতো ও। তবে ওর কমিউনিকেশন পারসনের নাম-নম্বর আর পাসওয়ার্ডটা ঠিক করাই আছে, কাজেই সমস্যা হবার কোন কারণ নেই। এয়ারপোর্টের বাইরে এসে মূল ভবনটা পার হয়ে কার পার্কের কাছে চলে এলো তানভীর। লোকজন খুবই কম, আর যাত্রির সংখ্যাও একেবারেই অপ্রতুল। কাজেই কেউই যদি নেম-প্লেট হাতে দাঁড়িয়ে থাকতো তবে অবশ্যই চোখে পড়তো ওর।

কারপার্কের সারিতে একেবারেই শুরুতে একটা ধূসর রঙের মাইক্রোর মতো দেখতে ভ্যান-টাইপের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সেটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে লম্বামতো দেখতে জিন্স-শার্ট-গ্যাবাডিন জ্যাকেট আর কালো সানগ্লাস পরা এক মেয়ে। ক্ষণিকের জন্যে ভ্যানটা আর মেয়েটাকে পরখ করে ওটা পার হয়ে এলো ও।

মোবাইল বের করে একটু আগেই সেট করা নাম আর নম্বরটা দেখে নিলো। পাশা স্যারের নির্দেশনা যদি ঠিক হয়ে থাকে তবে এই সুলতান হচ্ছে বাংলাদেশের সেরা পিস্তল শ্যুটারদের একজন। কল বাজতে লাগলো কিন্তু কেউ ধরলো না। আবারো কল দিলো ও।

সুলতান- শ্যুটার সুলতান, ব্যাটার নামটা বেশ ভালো মানিয়েছে, মনে মনে ভাবলো ও। রিং বাজছে, এখনো কেউ ধরছে না। হঠাৎ পেছন থেকে রিংটোনের শব্দ শুনে চট করে ঘুরে দাঁড়ালো তানভীর। আরেকটু হলেই মোবাইল ফেলে পিস্তলটা বের করে এনেছিল কিন্তু পেছন ফিরে বোকা বনে গেল ও।

পেছনে সেই গ্যাবাডিন জ্যাকেট আর সানগ্লাস পরা মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একটা মোবাইল, সেটা ক্রমাগত বেজে চলেছে এই মুহূর্তে। তানভীর কলটা কেটে দিতেই সেটার রিংটোন বন্ধ হয়ে গেল। একটু অবাক হয়েই একবার তাকে দেখলো আরেকবার হাতে ধরা মোবাইলটা দেখলো তানভীর। আবারো কল দিয়ে নিশ্চিত হবে কিনা ভাবছে তার আগেই গ্যাবাডিন জ্যাকেট এগিয়ে এলো ওর দিকে।

তানভীর এবার ভালো করে খেয়াল করে দেখলো মেয়েটার পরনের গ্যাবাডিন জ্যাকেটের হাতায় পুলিশি লোগো লাগানো। ও কিছু বলার আগেই প্রায় ওর সমান লম্বা মেয়েটা মাটিতে বুট ঠুকে, চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, "স্যার, আমি সুলতান। আপনি নিশ্চই তানভীর স্যার?" বলেই সে ছয় ডিজিটের পাসওয়ার্ডটা আউড়ে গেল।

তানভীর এখনো নিজের বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সে মেয়েটার চেহারা আর নামের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজতে ব্যস্ত।

“ও, আপনিই সুলতান, আমি আমি ভেবেছিলাম... যাই হোক,” ও নিজের পাসওয়ার্ড উচ্চারণ করতেই মেয়েটা এগিয়ে এসে ওর হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে ওকে পথ দেখালো।”

মেয়েটা হঠাৎ ব্যাগটা নিয়ে নেওয়াতে একটু অস্বস্তি বোধ করলেও কিছু করার নেই কারণ ইতিমধ্যেই সে ব্যাগটা কাঁধে চাপিয়ে হাঁটতে শুরু করেছে। মনের মধ্যে অনেকগুলো প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, কিন্তু সেগুলো আপাতত পেটের ভেতরে চালান করে দিয়ে সুলতান নামক মেয়েটার পিছু-পিছু হাঁটতে লাগলো ও।

মেয়েটা ওকে নিয়ে সেই ভ্যানটার কাছে চলে এলো। ভ্যানের দরজায় দুবার টোকা দিতেই ড্রাইভারের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। বয়স্ক দেখতে এক ড্রাইভার। সুলতানের হাত থেকে ব্যাগটা নিতে-নিতে মুরুব্বি কিসিমের ড্রাইভার সালাম দিলো ওকে। “স্লামালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাআলাইহি। স্যার খিতা বালা নি?” বত্রিশ দন্ত প্রদর্শন করে খাস সিলেটি ভাষায় সম্ভাষণ জানালো ওকে ড্রাইভার।

“ওয়ালাইকুম সালাম, জি ভালো, আপনি ভালো তো?” বহুদিন পর সিলেটি ভাষা শুনে পুরনো অনেক স্মৃতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো ওর। “আমরা এখান থেকে কোথায় যাবো?”

“ইতা তো বাখতা ভালা, ম্যাডাম খইতো ফারিয়ের,” ড্রাইভার মাথা নেড়ে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই হাতের ইশারায় তাকে থামিয়ে দিয়ে তানভীরের পাশ থেকে কথা বলে উঠলো সুলতান।

“স্যার, আপনি কি বিশ্রাম নিতে চান, নাকি-”

সুলতানকে কথা শেষ করতে না দিয়ে তানভীর বলে উঠলো, “আমি সরাসরি কাজে নামতে চাই,” বলে একটু ভাবলো ও। “কিন্তু তার আগে কেসের ব্যাপারে আমাকে বিস্তারিত জানতে হবে, সেইসাথে ওয়ার্কপ্ল্যান ঠিক করে আমার টিম মেম্বারদের সাথে বসতে হবে। সেটা কোথায় করবো আমরা? মানে এ-ব্যাপারে সরাসরি পিবিআইয়ের কাছ থেকে সাহায্য নিচ্ছি আমরা নাকি ইএএফের মাধ্যমে কাজ করতে হবে?”

ওর প্রশ্ন শুনে একটু ভাবলো সুলতান। “স্যার, যদিও অপারেশানটা ইএএফের কিন্তু পাশা স্যার আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন ইএএফের কাছ থেকে সরাসরি সাহায্য যথাসম্ভব কম নিতে,” বলে সে অস্বস্তির সাথে একটু মাথা নাড়লো। “স্যার, এখানে একটু সমস্যা আছে। এই জায়গাটা...” সে আরো কিছু বলতে চাচ্ছিলো তার আগে তানভীর মাথা নেড়ে মানা করলো। এই খোলা জায়গাতে ও বেশি কথা বলতে চাইছে না।

“এক কাজ করেন, আমরা যদি এখান থেকে আমরা সরাসরি আম্বরখানা চলে যাই। সেখানে আমি একটা হোটেল রুম বুক করে একটু ফ্রেশও হতে চাই সেইসাথে সম্পূর্ণ ব্যাপারে কিছু বিস্তারিত আলাপ-আলোচনাও করতে চাই। সেটা কি সম্ভব নাকি?”

"অবশ্যই সম্ভব স্যার, তবে আমার মনে হয় সেটার প্রয়োজন হবে না। আমরা এখান থেকে আম্বরখানা গিয়ে টমি স্যারের ল্যাবে চলে যাবো," বলে সে একটু বিরতি দিয়ে যোগ করলো। "টমি স্যার এই মুহূর্তে পিবিআই আর হোমিসাইডের জন্যে নির্মাণাধীন বিশেষ ল্যাবে আছে। উনি আমাদের টিমেও আছেন। আমার মনে হয় আমরা ল্যাবে চলে যেতে পারি। সেখানকার ডর্মে গিয়ে আপনি ফ্রেশ হয়ে রেস্টও নিতে পারবেন। আর বাকি কাজগুলোও করা সম্ভব হবে। আর তাছাড়া এই কেসের সমস্ত ডিটেইল টমি স্যারের কাছে থেকেও পাবেন স্যার। "

সব শুনে মাথা ঝাঁকালো তানভীর। "ঠিক আছে, তবে তাই চলুন।"

ওরা উঠে বসতেই গাড়ি ছেড়ে দিলো বয়স্ক ড্রাইভার।

সুলতান নামের এই মহিলার কথা-বার্তা থেকে শুরু করে শারীরিক ভঙ্গি পর্যন্ত একেবারেই যান্ত্রিক। হঠাৎ তার কথা শুনলে কিংবা নড়া-চড়া দেখলে মনে হয় যেন কোন রোবট। তবে তার একসাথে কাজ করতে শুরু করলেই বোঝা যাবে সে আসলে কতোটা কাজের, তবে পাশা স্যার যেহেতু রিকমেন্ড করেছে, মেয়েটা অবশ্যই কাজের হবার কথা। গাড়িতে বসে থাকতে থাকতে আশেপাশের দৃশ্য দেখতে লাগলো ও।

কতো স্মৃতি, কতো ভালোলাগা আর মন্দ লাগা এই শহরকে ঘিরে। কতো বছর পর এলো আজ। অপরিসীম কষ্ট বুকে নিয়ে এই শহর ছাড়ার আগে ও পণ করেছিল আর কোনদিন ফিরে আসবে না এখানে। ভাগ্যের ফেরে জীবনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ মিশনে এখানেই আসতে হলো ওকে।

একমনে গাড়ি চালাচ্ছে আর একটা পুরনো দিনের গানের কলি ভাজছে বুড়ো ড্রাইভার। ওর পাশে ঠিক রোটবের মতো বসে আছে সুলতান। মেরুদন্ড সোজা- দৃষ্টি সামনের দিকে, মুখে কোন ভাব নেই। মনে-মনে ও ভাবলো এই মহিলার নাম এমন অদ্ভুত কেন, আর এরকম এক ফোর্সে এই মহিলা শুটার হিসেবেই বা কেন যোগ দিলো। সময়-সুযোগ হলে ব্যাপারটা জেনে নিতে হবে।

গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে হঠাৎ মনে-মনে একটু হেসে উঠলো ও। একটা সময় লেখক হবার ইচ্ছে ছিল ওর। শার্লক হোমস পড়তে পড়তে মানুষ অবজার্ভ করা- মানুষের জীবনের গল্প শোনা নেশার মতো হয়ে গেছিল। সেই অভ্যাস এখনো রয়ে গেছে। তবে সেই একই কাজ এখনো করতে হয় পেশাগত কারণে। হঠাৎ কেন জানি খুব অসহায় আর বিরক্ত লাগলো ওর। এভাবে প্রায় কোন প্রস্তুতি ছাড়াই, ডিটেইল ব্রিফিং ছাড়া মিশনে এসে খুব অসহায় লাগছে।

কে-কেন-কিভাবে, বলতে গেলে প্রায় কিছুই জানে না ও। এভাবে মাঠে নেমে কতোটুকু কী করতে পারবে কে জানে। "আচ্ছা, আমরা যেখানে যাচ্ছি এই ল্যাবের ব্যাপারটা

আসলে কি? এই ব্যাপারে তো আগে কিছু শুনিনি।" দেশ ছাড়ার আগেও এ-ব্যাপারে কিছুই জানতো না ও।

ওর প্রশ্ন শুনে রোবটের মতোই ঘুরে গেল সুলতান, "স্যার, আপনি জানেন কিনা, পিবিআই-হোমিসাইড আর অন্যান্য দুয়েকটা প্রতিষ্ঠান মিলে দেশের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ শহরে একটা করে অত্যাধুনিক ল্যাব স্থাপন করছে। এই কাজটা পরিচালিত হচ্ছে পাশা স্যারের অধীনেই। পাশা স্যারেরই সহকারি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য আর অভিজ্ঞ মানুষ- ডক্টর মনিকা ম্যাডাম আর টমি স্যার এই কাজের দায়িত্বে আছেন। সিলেটের ল্যাবটা করা হচ্ছে আম্বরখানা আর শাহী ঈদগাহ'র মাঝামাঝি একটা জায়গায়। ল্যাবের তদারকির কাজে টমি স্যার এখন সিলেটেই আছেন। উনিই পুলিশ থেকে শুরু করে সব সংস্থার রিপোর্ট একসাথে করে অ্যানালিসিস করা শুরু করেছেন।"

রোবট সুলতানের কথা শুনতে শুনতে আনমনেই মাথা নাড়লো তানভীর। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই ওর মোবাইল বাজতে লাগলো। পকেট থেকে মোবাইল বের করে দেখলো মা'র কল।

সর্বনাশ, ও সিলেট চলে এসেছে এখনো মাকে জানানো হয়নি। ব্যাপারটা জানতে পারলে নিশ্চিত সে এখন চিল্লাচিল্লি শুরু করে দেবে। কলটা কেটে দিতে গিয়েও কী মনে করে রিসিভ করলো। "হ্যালো মা।"

তানভীর ওর মায়ের সাথে কথা বলতে বলতে গাড়ি শহরে প্রবেশ করে আম্বরখানা দিয়ে বামে মোড় নিয়ে চলে এলো শাহী ঈদ গা'র কাছাকাছি। সেখানে এসে মূল রাস্তা থেকে বামে মোড় নিয়ে একটা বাউন্ডারির ভেতরে প্রবেশ করলো ওদের মাইক্রো। বাউন্ডারির ভেতরে টিলার মতো উঁচু জায়গাতে নির্মাণাধীন একটা বিল্ডিং। সেটার সামনে এসে থেমে গেল মাইক্রো।

গাড়ির ভেতর থেকে মুখ অন্ধকার করে বেরিয়ে এলো তানভীর। মায়ের সাথে কথোপকথনটা বেশি ভালো হয়নি। মা'কে না জানিয়ে এভাবে সিলেট চলে আসায় খুব রাগ করেছে মা। আর নিজেকে খুব অপরাধি মনে হচ্ছে ওর। ছয় মাসের ট্রেনিং মাত্র শেষ করে এসেছে বিদেশ থেকে, এরপরে মা'কে অন্তত কয়েকদিন সময় দেয়াটা খুব জরুরি ছিল।

মন খারাপ নিয়ে গাড়ি থেকে নামলেও জায়গাটা দেখে মন ভালো হয়ে গেল ওর। বিরাট জায়গা নিয়ে ঘেরা বাউন্ডারির ভেতরে গাছের সারি, তার মাঝখানে বেশ সবুজ একটা টিলা। টিলার ওপরে সুন্দর কাঁচঘেরা ভবন। এই মুহূর্তে শ্রমিকগোছের লোকজন আনাগোনা করছে। কারণ টিলার ওপরের বাড়িটা এখনো আন্ডার কন্সট্রাকশন।

ভালোভাবে তাকিয়ে তানভীরের কাছে মনে হলো নির্মাণাধীন চারতলা বাড়িটা দুইভাবে বিভক্ত। দুটো বাড়িকে সংযোগকারী একটা ওয়াকিং ব্রিজ দেখতে পেল ও। মনে মনে

বাড়িটার আর্কিটেকচারাল ডিজাইনকে প্রশংসা না করে পারলো না ও। ল্যাব কাম বাড়িটার কাজ সম্পন্ন হলে দেখার মতো একটা বাড়ি হবে।

"স্যার, এদিকে," সুলতানের ডাক শুনে তার দিকে ফিরে তাকিয়ে তানভীর দেখতে পেল ওর ব্যাকপ্যাকটা কেয়ারটেকার গোছের একজনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ওকে এগোনোর জন্যে ইশারা করছে সে। সুলতানের পিছু নিয়ে চিকন একটা অসম্পূর্ণ সিঁড়ি বেয়ে টিলার ওপরে উঠে ওরা প্রবেশ করলো বাড়িটার ভেতরে।

সুলতান ওকে নিয়ে নির্মাণাধীন ল্যাবের দোতলায় এসে সেই বিজ্রের মতো দেখতে অংশটার কাছে চলে এলো। তানভীর মনোযোগ দিয়ে দেখলো, জায়গাটা অনেকটা দেখতে হ্যাঙ্গিং ব্রিজের মতো, দুটো বিল্ডিংকে সংযুক্ত করেছে।

ব্রিজটার কাছাকাছি আসতেই পুলিশের পোশাক পরা সুদর্শন এক তরুণ অফিসার ওদেরকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলো।

প্রথমে সুলতানের দিকে তাকিয়ে সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে তানভীরের দিকে ফিরে স্যালুট ঠুকে ওর দিকে হ্যান্ড শেইকের ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিলো সে। "স্যার আমি, এস আই ইকবাল, ইকবাল মোল্লা।"

সুদর্শন এস আইয়ের দুই ভ্রুর মাঝে বড় একটা তিল, অনেকটা দেখতে টিপের মতো লাগে। এমনিতেই একটু বেশি ফর্সা আর সুন্দর ছেলেটা, তার ওপরে কপালে এই অদ্ভুত তিলের কারণে তাকে দেখতে তানভীরের চোখে একটু মেয়েলি মনে হলো।

"আমি তানভীর, তানভীর মালিক," বলে একটু অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেল। নিজের পরিচয় আরো একটু দেয়া উচিত মনে হচ্ছে ওর কাছে। অন্তত এই অপারেশানের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু একটা। তবে কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। ওকে উদ্ধার করলো সুলতান।

"স্যার, এই অপারেশান কমান্ডের দায়িত্বে আছেন। আপনি কি ল্যাবের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট নাকি এই অপারেশানের সাথে সংশ্লিষ্ট?"

সুদর্শন এস আই ইকবাল আরেকবার মাটিতে পা ঠুকলো। ব্যাপারটার কি কোন আলাদা গুরুত্ব আছে নাকি এটা এই ছেলের অভ্যাস, তা ঠিক বুঝতে পারলো না তানভীর। তবে এসব নিয়ে বেশি ভাবার আগেই সুদর্শন এস আই কথা বলে উঠলো, "স্যার, আমি এই অপারেশনে পুলিশ ফোর্সের প্রতিনিধিত্ব করছি।"

"ইএএফের কেউ সংশ্লিষ্ট আছে আছে নাকি এতে?" তানভীর জানতে চাইলো।

"না স্যার, সরাসরি ওদের কেউ এই ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট নেই, আমি যতোদূর জানি এই কেসে আপনাকেই ইএএফের প্রতিনিধি হিসেবে নথিভূক্ত করা হয়েছে," বলে সে একটু থেমে আবারো যোগ করলো। "আমাকে পুলিশ ফোর্স থেকে পাঠানো হয়েছে আপনাকে

সার্বিক সহায়তা করার জন্যে। কারণ একেবারে শুরু থেকেই এই কেস আমার অধীনে ছিল।”

ছেলেটার কথা শুনতে-শুনতে তানভীরের মনের ভেতরে অনেকগুলো প্রশ্ন পাক দিয়ে উঠতে লাগলো কিন্তু সেগুলো করতে গিয়েও থেমে গেল ও। বরং উল্টো ঘুরে সুলতানের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো, “আমরা এখান থেকে যাচ্ছি কোথায়?”

সুলতান যথারীতি তার সটান মেরুদন্ড আরেকটু সটান করে জবাব দিলো, “স্যার, আমরা যাচ্ছি এই ল্যাব সংশ্লিষ্ট ডরমেটরিতে। ডর্মের কাজও পুরোপুরি সম্পন্ন হয়নি তবে ওখানে তিনটে কামরা মেহমানদের থাকার উপযোগী করে রাখা হয়েছে। স্যার ওখানেই যাচ্ছি আমরা, আপনি যাতে বিশ্রাম নিতে পারেন”

এক মুহূর্ত চিন্তা করলো তানভীর। বিশ্রামের কোনই দরকার নেই ওর, বরং কাজে নামতে হবে। কারণ অনেকগুলো বিষয় ওর কাছে একেবারেই এলোমেলো লাগছে। সেগুলো পরিষ্কার করে কাজে না নামা পর্যন্ত স্বস্তি বোধ করছে না ও। “বিশ্রামের দরকার নেই, তবে আমি একটু ফ্রেশ হতে চাই। সেটা করতে আমার মোটেও বেশি সময় লাগবে না,” একবার নিজের ঘড়ি দেখে নিয়ে ও সুলতানের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো, “এখানে কি কোন মিটিং রুম আছে? মানে কাজ চালানোর মতো?”

“আছে স্যার,” সুলতান সামান্য মাথা নেড়ে জবাব দিলো।

“ভেরি গুড, আধা ঘন্টার ভেতরে সেখানে এই কেসের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে এক হতে বলেন। প্রয়োজনীয় যা যা উপকরণ আর রিসোর্স দরকার সেগুলোও নিয়ে আসতে বলেন। আমি পুরো পরিস্থিতি অ্যানালিসিস করে এক ঘন্টার ভেতরেই কাজে নামতে চাই। ঠিক আছে?”

ওর প্রশ্নের জবাবে সুদর্শন এস আই আর শ্যুটার সুলতান দুজনেই মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

অধ্যায় দশ

সময়: ১৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ

পৃথুরা বনভূমি, কন্নোর, ভারতবর্ষ

একজন যোদ্ধা হিসেবে শামানের শরীর আর মনের মধ্যে অসাধারণ সমন্বয় আছে।

এ-কারণেই অদ্ভুত খট-খট শব্দটা শুনে চট করে সতর্ক হয়ে উঠলো সে। যোদ্ধা হিসেবে বহুদিনের পুরনো অভ্যাস। যদিও সে চোখ খোলেনি কিংবা শরীরের কোন পেশী এক ইঞ্চিও নাড়ায়নি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার যোদ্ধা স্বত্বা পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে গেছে। চোখের পাতাটা মৃদু ফাঁক করে তাবুর পরিচিত কালচে অবয়ব চোখে পড়তেই সতর্ক হয়ে ওঠা শরীরটা ঢিলে করে দিলো শামান।

এই সতর্কতা-এই অভ্যাস অনেকটা বুনো প্রাণীর জঙ্গলে টিকে থাকার মতো একটা ব্যাপার। কুকুরের যেমন অন্যান্য যেকোন প্রাণীর চেয়ে ঘ্রাণশক্তি অনেক বেশি, বেড়াল যেমন যে-কারো চেয়ে অন্ধকারে অনেক বেশি দেখতে পায়, ঠিক তেমনি একজন যোদ্ধাকেও নিজের মতো কিছু অনন্য ক্ষমতা বৃদ্ধি করে নিতে হয়। কেউ হয়তো তলোয়ার ভালো চালাতে পারে, কেউ হয়তো অসাধারণ তীরন্দাজ, কেউ হয়তো শত্রুর চিহ্ন খুব ভালো অনুসরণ করতে পারে। একজন যোদ্ধা হিসেবে এগুলোর যেকোন অন্তত একটি কিংবা একাধিক ব্যাপারে অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করতে না পারলে ভয়ঙ্কর যোদ্ধা জীবনে টিকে থাকা অসম্ভব। শামান অবশ্য এগুলোর ভেতরে বেশ ক'টাতেই দক্ষ।

তবে ওর প্রধান সখ্যতা তলোয়ারের সাথে। ছোটবেলায় শান্তির মঠে থাকার সময়ে প্রথমে কাতানা দিয়ে ওর প্রথম প্রশিক্ষণ হয়েছিল। এরপরে নিজের ভয়ঙ্কর যোদ্ধা জীবনে বহুবার-বহুভাবে নানা ধরণের তলোয়ারের সাথে গড়ে উঠেছে ওর সখ্যতা আর ভালোবাসা। হঠাৎ নোরবুর দেয়া জোড়া কাতানার কথা মনে হতেই ঘুমানোর মাদুরের নিচ থেকে টান দিয়ে বের করে আনলো কাতানা জোড়া। আনমনেই হাত বুলাতে লাগলো ওগুলোর গায়ে।

স্বাভাবিক আর দশটা কাতানা যে মাপের হয় এটা তারচেয়ে একটু বেশি লম্বা, অনেক বেশি পাতলা, আগাটা চোখা। শামান দুহাতে ধরে জিনিসটা শূণ্যে ছুঁড়ে দিয়ে আবার লুফে নিলো দক্ষ হাতে। নোরবুর কাছে শোনা অস্ত্র জোড়ার বিস্তারিত ইতিহাস মনে পড়ে গেল ওর।

জোড়া হিম্বা নামের এই কাতানা দুটো তৈরী করা হয়েছিল বিশেষ এক ধরণের ধাতু দিয়ে। এই ধাতু পৃথিবীর পরিচিত কোন ধাতু নয়। সেই সময়ে মঙ্গলদের সাথে

চৈনিকদের মারাত্মক যুদ্ধ চলছিল, এক পর্যায়ে তিব্বতও এর সাথে জড়িয়ে পড়ে। রাজা মহীশূড়ের পূর্বপুরুষরা ছিল চৈনিকদের পক্ষে।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে মান্দানিজরা রাজা মহীশূড়ের পূর্বপুরুষদের কাছে সহায়তা চায়। তারা সাহায্যের জন্যে এগিয়ে যাবার পথে হিমালয়ের পাদদেশে নিজেদের বাহিনী দিয়ে অবস্থান নেয়। যুদ্ধ শুরু হবে হবে এমন সময়ে এক উল্কার আঘাতে দুই বাহিনীই সমূহ ক্ষয়ক্ষতির সন্মুখীন হয়ে তারা দুই পক্ষই সন্ধির আওতায় আসতে বাধ্য হয়। রাজা মহীশূড়ের পূর্বপুরুষেরা পাহাড়ের পাদদেশে আঘাত করা সেই উল্কপিন্ডের ভেতরের অর্ধগলিত লাভার মতো জ্বলতে থাকা ধাতু দিয়ে তৈরী করেছিল এই জোড়া কাতানাসহ আরো কিছু অস্ত্র, সেইসাথে সংগ্রহ করেছিল সেই ধাতুর বেশ কিছুটা। তবে ওরা উল্কাপিন্ডের কাছে পৌছানোর আগেই নাকি পাহাড়ি আরেক সর্পপূজারি গোত্র এই ধাতুর বেশ অনেকটা নিয়ে পালিয়েছিল।

এই ধাতু এতোটাই ভয়ঙ্কর যে, কথিত আছে রাজার পূর্বপুরুষেরা এই অস্ত্রগুলো হাতে আসার পরে অদমনীয় হয়ে ওঠে তারা। পুরো তিব্বতসহ মান্দানিজ উপত্যকা থেকে শুরু করে মোঙ্গল দেশ পর্যন্ত তারা শাসন-শোষণ আর রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়। তাদের তীব্র আগ্রাসন চলতে থাকে প্রায় একশ বছর ধরে, যতোদিন পর্যন্ত না তারা স্বয়ং বুদ্ধের সংস্পর্শে এসে বদলে যায়। এরপরে একসময় বুদ্ধ স্বয়ং নাকি রাজা মহিশূড়ের পূর্বপুরুষদের হয়ে অন্ধকারের দেবতাদের সাথে লড়াই করেছিলেন এই কাতানা দিয়ে। সেই থেকে এই জোড়া তরবারির নাম দেয়া হয় ‘হিস্বা’।

ইতিহাস ভাবতে-ভাবতেই শামান পরিচ্ছন্ন হয়ে নিজের পোশাক পরে নিয়ে পিঠের ওপরে ঝুলিয়ে নিলো জোড়া কাতানা আর কোমরে নিজের প্রিয় কুকরি মানে বাঁকা ছুরিটা, তারপর একটা চাদর কাঁধে ফেলে বেরিয়ে এলো বাইরে।

মাথার লালচে রঙের লম্বা চুলগুলো একটা ছোট চামড়ার ফালি দিয়ে বেঁধে নিয়ে আড়মোড়া ভাঙলো। ওদের তাবুটা বসানো হয়েছে পাহাড়ি উপত্যকার প্রায় শেষ সীমানায়। তাবুর একপাশে একটা হাতে বানানো ছোট চুলা থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখে শামান অনুমান করলো বিধু আশেপাশেই কোথাও আছে। গায়ের চাদরটা আরেকটু টেনে মাথাসহ নিজের চুলগুলো ঢেকে দিয়ে পাহাড়ি শৈলশিলার কিনারায় এসে দাঁড়ালো শামান।

এখান থেকে পাহাড়ি পথটা সামান্য বাঁক নিয়ে নেমে গেছে নিচের দিকে। আধ মাইলের মতো এগোনোর পরেই শুরু হয়েছে সবুজে ছাওয়া ঘন জঙ্গল। একেবারে পাহাড়ি এলাকা ছেড়ে ওরা চলে এসেছে অর্ধ-সমতল ভূমিতে। তবে ছোটবেলা থেকে পাহাড়ের কোলে বড় হওয়া শামানের কাছে পাহাড়ই হলো ওর মাতৃভূমি।

রুক্ষ পাহাড়ের বুকেই ও শান্তি খুঁজে পায়। তাই চিরকালই সবুজে ঢাকা সমভূমি থেকে ধূসর পাহাড়ই ওর কাছে বেশি স্বস্তির জায়গা। তবে এবার না চাইলেও কন্নোরের এই এলাকাতে ওকে আসতেই হত। কারণ আর কিছুই না; এতিম-অসহায়-অবোধ শিশুটিকে

পাহাড়ি জঙ্গুলে পথের প্রান্ত থেকে তুলে নিয়ে যে-মানুষটা আশ্রয় দিয়েছিল সেই মানুষটা আজ জীবন-মরণের খেলার এক নিষ্ঠুর উপাদানে পরিণত হয়েছে। মানুষটা আদৌ বেঁচে আছে নাকি মারা গেছে তারও কোন হদিস নেই।

পাহাড়ি শৈলশিলার কিনারায় পা ঝুলিয়ে বসে পড়লো শামান। নিজের পোশাকের সাথে কোমরে ঝুলানো চামড়ার বন্ধনি থেকে বাঁশির মতো দেখতে একটা ছোট জিনিস বের করে আনলো। থলের ভেতর থেকে এক ধরণের গুঁড়ো বের করে হাতে ডললো কিছুক্ষণ। গুঁড়োগুলো অনেকটা মন্ডের আকার ধারণ করতেই সেটাতে ঢুকিয়ে দিলো বাঁশিটার এক প্রান্তে। মন্ডটাকে আঙ্গুলে টিপে ঠিকমতো বসিয়ে ছোট দুটো চকচকে আকরিক পাথর ঠুকে আগুন ধরিয়ে দিলো মন্ডের এক প্রান্তে। কষে দুই টান দিয়ে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলো আগুনটা, এবার বাঁশিটার মাথায় মন্ডের এক প্রান্তে ধিকি-ধিকি করে জ্বলতে লাগলো আগুন। আরো দু-দফা কষে টান দিয়ে ধোঁয়া ওড়ালো শামান। তারপর ডুবে গেল নিজের ভাবনার জগতে।

ওর মনের কোনে বার-বার ভেসে উঠছে মঠ থেকে বিদায় নেয়ার সময়ে লামা নোরবুর বলা শেষ কথাগুলো। আনমনেই ওর একটা হাত চলে গেল নিজের চুলে। আলতো করে হাত বুলাতে বুলাতে ও ভাবতে লাগলো, নোরবু যা বলেছে সেটা সরাসরি না জানলেও এতোদিন ধরে একটা উপলব্ধি অবশ্যই ওর ভেতরে কাজ করতো। ছোটবেলা থেকেই ও জানতো ওকে পথের ধারে কুড়িয়ে পেয়েছিল ডুকপা লামা। কিন্তু ও এও জানতো ওর পরিচয়ের মধ্যে অবশ্যই কোন না কোন গূঢ় রহস্য রয়েছে।

কারণ দেখতে ও এই এলাকার মানুষদের থেকে একেবারেই আলাদা। ওর চুলের রঙ লাল, সামান্য কোকড়ানো, যেখানে এই এলাকার লোকদের চুল হয় ঘন কালো, একেবারে সোজা। তাছাড়া ওর নাক একেবারে সটান খাড়া, এই এলাকার লোকজনের নাক হয় বোঁচা। এছাড়াও চোখের রঙ, গায়ের রঙ, শারীরিক আকৃতি থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ওকে দেখলেই বোঝা যায় ও কোনভাবেই এই এলাকার মানুষ নয়।

এমনকি ওর নিজের যোদ্ধা জীবনে পশ্চিমে সুদূর চৈনিক দেশ থেকে শুরু করে উত্তরে গূর্খাভূমি, মধ্যবর্তি এলাকার মোঙ্গলদের দেশ পর্যন্ত কয়েক হাজার ক্রোশ ও ভ্রমণ করেছে নানা প্রয়োজনে, কিন্তু কোথাও এমনকি ওর মতো চেহারার কোন মানুষ আজ পর্যন্ত ওর চোখে পড়েনি। এটা কোনভাবেই সম্ভব নয় যে একেবারে কোথাও কোন সম্পর্ক ছাড়া হাজার ক্রোশের ভেতরে একজন মানুষ অন্যদের থেকে একেবারেই ব্যতিক্রম হবে। তবে নোরবুর কাছে ও যা জানতে পেরেছে ওর পরিচয় নিয়ে ডুকপা লামার কাছে...

হঠাৎ পেছনে সামান্য শব্দ হতেই শামানের শরীর শক্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু নড়ে ওঠার আগেই পেছন থেকে একটা ভারি কণ্ঠস্বর সাবধান করে দিলো ওকে, "এক্কেরে নড়বা না," শামানের শরীরটা পাথরের মুর্তির মতো স্থির হয়ে গেল, কারণ ওর ধারণা ও জানে এরপর কী হতে যাচ্ছে। আর সত্যি-সত্যি হলোও তাই।

শামান স্থির হয়ে যেতেই ওর মুখের সামনে দিয়ে হুঁশশ করে বেরিয়ে গেল কিছু একটা।

জিনিসটা বেরিয়ে বেরিয়ে যাবার সময়ে ওর হাত থেকে ছোঁ দিয়ে নিয়ে গেল বাঁশিটা। পরমুহূর্তে শামান দেখতে পেল ওর হাতে ধরা বাঁশিটার ভগ্নাংশ একটা ছোট তীরের মাথায় গেঁথে আছে পাহাড়ের গায়ে। তীরের পালক লাগানো লেজের অংশটা এখনো তির-তির করে কাঁপছে। রাগের সাথে ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়ালো শামান। মেজাজের কাঁটা মুহূর্তের ভেতরে তুঙ্গে চড়ে গেছে।

উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরে তাকাতেই দেখতে পেল, মুখে একদলা বিগলিত হাসি নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে টিটকিরির হাসি হাসছে বিধু। হাতে ধরা বিরাট ধনুকটা নামিয়ে নিয়েছে ইতিমধ্যেই। সেটার ওপরে একটা হাত রেখে বিজয়ীর ভঙ্গিতে সে বলে উঠলো, "দেখলে বাপু আমার নিশানা, চাইলে অবশ্য বাঁশিটার সাথে সাথে তোমার দুটো আঙ্গুলও পাঠিয়ে দিতে পারতাম পাহাড়ি খাদে," বলে সে আবারো সেই টিটকিরির হাসি হাসতে লাগলো।

রাগের সাথে আরো দুই পা এগিয়ে এলো শামান, একটা হাত স্থির কাতানার বাটের ওপরে।

"বিধু, পাগলামির একটা সীমা থাকা উচিত, গত ক'দিন ধরে দেখছি তোর পাগলামি, আমরা এখানে একটা কাজে..." কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছিল শামান, খট করে আরেকটা তীর এসে বিঁধলো ওর পায়ের কাছের পাথুরে মাটিতে। মুখটা প্রায় হা হয়ে গেল শামানের। কারণ মুহূর্ত আগেও ধনুকটা প্রায় মাটির কাছে নামানো ছিল, ধনুক ওঠানো আর তীর ছোড়ার কাজটা বিধু এতোটাই দ্রুত আর দক্ষতার সাথে করেছে বলতে গেলে শামানের চোখেই পড়েনি।

ওর হা হয়ে থাকা মুখের সামনে আবারো খিক-খিক করে হেসে উঠলো বিধু। "অয় অয়, আমরা এইখানে কামে আসছি," বলে সে ধনুক তুলে ইশারায় সামনের সমতল ভূমি দেখালো। "এইহান থাইক্কা আমগো চিনা-জানা এলাকা শেষ, শত্রু এলাকা শুরু। কাজেই," এই পর্যন্ত বলে সে বাঁকা থেকে সোজা হয়ে ধনুকটা একটানে হাতে তুলে নিলো। ওটার একটা প্রান্ত দিয়ে বাড়ি মারলো শামানের কোমরে। "আমারে বুজতে হইবে তোমারে নিয়া আমি কামে নামতে পাইরবো কিনা। মানে তুমি আমার উপযুক্ত সঙ্গী কিনা, এই বিপজ্জনক কামে," বলে সে আবারো বাড়ি মারলো শামানের কোমরে। এবার আরেকটু জোরে।

পর-পর দুবার কোমরে বাড়ি খেয়েও শামান কোন প্রতিক্রিয়া দেখালো না। সে খুব শান্ত দৃষ্টিতে হিসেব করার চেষ্টা করছে। বিধুর মাথার বেণী করা লম্বা চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে, চোখ দুটো টকটকে লাল। তার একটা কান থেকে যে আরেকটা কান ছোট এবার বেশ ভালোভাবেই চোখে পড়ছে সেটা। সেদিকে তাকিয়ে সামান্য হেসে শামান বলে উঠলো, "বিধু তুই এই সকালবেলা সোমরস খেয়েছিস?"

বলতে-বলতে চট করে এক পা সরে গেল শামান। মনে-মনে হিসেব করার চেষ্টা করছে বিধু আসলে কতোটা মাতাল। ওর জানামতে বিধু গোর্খা বংশদ্ভুত। গোর্খা জাতির লোকজন এমনিতেই অসাধারণ যোদ্ধা হয়, তার ওপরে বিধু আসাম-ত্রিপুরার দরবার আর সিংহল রাজার সেনাবাহিনীতে প্রশিক্ষণ নিয়েছে, যুদ্ধ করেছে। কাজেই তীর-ধনুকে তো বটেই তলোয়ারেও তার দক্ষতা অপরিসীম।

গত সাতদিনের ভ্রমণে ও যা অনুধাবন করেছে, সম্ভবত অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণেই সিংহল রাজার বাহিনী থেকে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তবে আসন্ন বিপজ্জনক অভিযানে সঙ্গী হিসেবে ওকে দরকার শামানের, আর তাকে উপযুক্ত সঙ্গী হিসেবে পেতে হলে-সেই সাথে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিধুর চোখে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে ওর। অপর পক্ষে সম্ভবত বিধুও একই উদ্দেশ্য ওকে খোঁচাচ্ছে। ঠিক আছে, বিধুর উদ্দেশ্য যদি ওকে পরখ করাই হয়ে থাকে তবে সেটাই হোক।

চট করে আরেক পা সরে এলো ও একপাশে। নিজে তো সরছেই সেই সাথে বিধুর নড়াচড়াও পরীক্ষা করছে ও। "এই সকালবেলা বিধু," বলে একবার টিটকিরিসূলভ হাত নাড়লো। "তুই আসলে না খেয়ে থাকতে পারিস না, তাই না?" ও আরো দ্রুত নড়তে শুরু করেছে। বিধুকে কেন্দ্র করে এক পা এক পা করে পেছাতে শুরু করেছে। "এইজন্যেই বিধু, তাইনা? এই জন্যেই সিংহল রাজার বাহিনী থেকে তোকে বের করে দিয়েছে," সাথে-সাথে বিধুর চোখ ছোট হয়ে গেল, বদলে গেছে মুখের ভাব।

"তোর চোখ দেখে মনে হচ্ছে আমি ঠিকই বলেছি," বলে ও পেছাতে পেছাতে চট করে থেমে গেল। "আহহা, আমি শুনেছি ওরা নাকি বহিঃষ্কার করা সৈন্যদের সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করে। হাজার হাজার পদাতিকের সামনে তলোয়ার দিয়ে পোশাক কেটে টুকরো-টুকরো করে ন্যাংটো করে ফেলে। তারপর নাকি..." শামান কথা শেষ করতে পারলো না তার আগেই এগিয়ে এলো বিধু। ঝট করে হাতের ধনুকটা পিঠে লটকে দিয়ে একটানে বের করে আনলো নিজের খাটো তলোয়ারের মতো দেখতে ভারি অস্ত্রটা। বিদ্যুৎবেগে সেটা দিয়ে কোপ মারলো শামানের মাথায়। বাতাসের বেগে নেমে আসতে থাকা ভারি বাটালটা নিজের কাতানা দিয়ে ফিরিয়ে দিলো শামান।

"ওগোরও এতো সাহস নাই। বিধুরে এমনে অপমান করবে। তার আগেই বিধু..."

"পলাইছে, তাই না?" বিধুর বাটালটাকে একপাশে নামিয়ে দিয়ে নিজের কাতানার ডগা দিয়ে ওটার মাথার বাড়ি মারলো শামান। উদ্দেশ্য বিধুকে আরো রাগিয়ে তোলা। বলতে গেলে শতভাগ সফল হলো ও।

"শামান, মুখ সামলে কথা বলবি," নিজের ভারি অস্ত্রটা উঁচিয়ে ধমকে উঠলো ও। "পাহাড়ি রাস্তার এক লুটেরার কাছে আমার জবাব দিতে হইবে না। আমি যদি রাজার সৈন্যবাহিনী থেইকে পলায়ে থাকি তো তুই কি করছোস, তুই একটা ডাকাইত..." বিধু কথা শেষ করার আগেই এবার শামান আক্রমণ চালালো। নোরবুর কাছ থেকে পাওয়া জোড়া হিম্বার

একটা উল্টো করে একপাশ থেকে বাড়ি মারলো বিধুকে। বাড়ি খেয়ে খেপে উঠলো বিধু। আবারো মারলো শামান। ও ইচ্ছে করেই ছোট ছোট আঘাত করছে বিধুকে খেপিয়ে তোলার জন্যে। দ্বিতীয়বার আঘাত পেয়ে শামানের দিকে অনেকটা অন্ধের মতো এগিয়ে এলো বিধু। ঠিক এই ব্যাপারটাই চাইছিল শামান।

মুহূর্তের ভেতরে শরীরের অবস্থান বদলে শরীরটাকে টান-টান করে ফেললো ও। রাগে-ক্ষোভে অন্ধ বিধু তার বিরাট দেহ নিয়ে ঝড়ের মতো এগিয়ে আসছে। বাঁকা হয়ে থাকা শরীরটাকে আরেকটু বাঁকিয়ে এগিয়ে আসতে থাকা বিধুর তলোয়ারটাকে এড়িয়ে নিজের তলোয়ারের উল্টোপিঠ দিয়ে বাড়ি মারলো শামান। সাথে সাথে মাটি কাঁপিয়ে পড়ে গেল বিধু।

বিধু পড়ে যেতেই শরীরটাকে সোজা করে কাতানাটা খাপে ভরে সোজা হলো ও। খানিকটা পিছিয়ে এসে ফিরে তাকাল বিধুর দিকে, এই শিক্ষাটা খুব দরকার ছিল ওর। হাঁপাতে-হাঁপাতে সোজা হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লো বিধু। "আহ্," আধশোয়া থেকে উঠে বসলো সে। একটা হাত তুলে ওর দিকে ফিরে বললো, "মানতে বাধ্য হইছি শামান, তুমি তলোয়ার চালাইতে জানো," বলে সে আরেকটু হাঁপালো। "যেই বিধুরে কেউ কুনোদিন কাইতও করতে পারে নাই, তুমি তারে..."

ওর দিকে দুই পা এগিয়ে গেল শামান। মুখে মৃদু হাসি। ঔষুধ কাজে দিয়েছে মনে হচ্ছে। সে একটা হাত বাড়িয়ে দিলো বিধুর দিকে। ওর হাতটা ধরলো সে। "তয়, তুমি তো তুমার খেল দেহাইলা, এইবার আমার খেল দেহানো বাকি," বলেই সে শামানের হাতটা শক্ত করে চেপে ধরলো। শামান সতর্ক হবার আগেই অন্য হাতে ধরে থাকা ধনুকটা দিয়ে বাড়ি মারলো ওর হাঁটুতে। হাঁটুর ওপরে শক্ত বাড়ি খেয়ে উল্টে পড়ে গেল ও।

নিজেকে সোজা করে বিধুর দিকে তাকাতেই দেখলো ধনুকে এরইমধ্যে একটা তীর জুড়ে ওর দিকে তাক করে ফেলেছে সে, আপনাতেই ওর দুইহাত ঢেকে ফেললো নিজের মুখটা। সাথে সাথেই হুঁশ করে একটা শব্দের সাথে ও অনুভব করলো কিছু একটা চলে গেল ওর কোমর ছুঁয়ে। নিচে তাকিয়ে দেখলো ওর তামাকের ঝোলাটা ছিঁড়ে নিচে পড়ে আছে। মুখ তুলে তাকাল ও বিধুর দিকে।

পরিষ্কার বুঝতে পারলো ইচ্ছে করেই এই দুষ্টামিটা করেছে বিধু, চাইলেই সে ওর পেটে ঢুকিয়ে দিতে পারতো তীরটা। রাগের একটা হল্কা বয়ে গেল ওর শরীরে। মুহূর্তের মধ্যে শরীরটাকে শূণ্যে তুলে মাটিতে ঝাঁপ দিলো ও। একটা গড়ান দিয়ে একপাশে সরে গেল, সোজা হবার পাশাপাশি হাতে বের হয়ে এসেছে কাতানা। অন্যদিকে ধনুকে আরেকটা তীর জুড়ে ফেলেছে বিধু, ও এগিয়ে যেতেই সেটা ছুঁড়ে দিলো শামানের দিকে, অগ্রগামী অবস্থাতেই শূণ্যে কাতানা চালিয়ে তীরটাকে ও বাড়ি মারলো কাতানা দিয়ে, সাথে-সাথে দিক পরিবর্তন করে অন্যদিকে চলে গেল সেটা।

বিধুর মুখ হাঁ হয়ে গেছে। কোন মানুষ শূণ্যে চলমান তীরের দিক পরিবর্তন করিয়ে দিতে পারে কাতানা দিয়ে এটা কল্পনাতেও আসেনি ওর। তার এই বিস্ময়ের সুযোগ নিলো শামান।

শরীরটাকে আরেক গড়ান দিয়ে এগিয়ে গেল বিধুর দিকে। বিধুর বিস্মিত মুখের হাঁ আরেকটু বড় হয়ে গেল কাতানার হালকা বাড়িতে ধনুকটা হাত থেকে ছুটে যেতেই। ধনুকটাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে, কোমর দিয়ে বিধুকে একটা ধাক্কা মারলো শামান, সেইসাথে ভারসাম্য হারানো বিধুকে এক হাতে কাঁধ মুচড়ে ধরে কাতানার ডগাটা হালকাভাবে ঢুকিয়ে দিলো তার মুখের ভেতরে।

হাঁপাতে-হাঁপাতে হাসিমুখে শামান জানতে চাইলো, "যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, নাকি আরো কিছু শেখাতে হবে?"

বিস্মিত বিধু তলোয়ারের ডগাটা মুখ থেকে সরিয়ে হেসে উঠে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই ভেসে এলো একজন মেয়ে মানুষের চিৎকার, দুজনেই অবাক হয়ে একে-অপরকে দেখলো, আশেপাশই কোথাও বিপদে পড়েছে কেউ।

অধ্যায় এগারো

বর্তমান সময়

নির্মাণাধীন ল্যাব, শাহী ঈদগাহ, সিলেট

বাতাসে কেমন জানি বিপদের গন্ধ, কথাটা মনে হতে আনমনেই মৃদু হেসে উঠলো তানভীর। অতিরিক্ত থ্রিলার বই পড়ার ফল।

কেয়ারটেকার এসে জানালো তানভীরের জন্যে কামরা প্রস্তুত করা আছে, চাইলে ও সেখানে যেতে পারে। এসআই ইকবাল আর শুটারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তানভীর কেয়ারটেকারের পিছু নিয়ে চলে এলো গেস্ট হাউজে। টানা অনেকগুলো রুম দেখা গেল, তবে বেশিরভাগই এখনো থাকার অনুপযোগী। সেগুলো পার হয়ে কাঠের কারুকাজ করা একটা দরজার সামনে চলে এলো কেয়ারটেকার। এখানে লম্বা ঝুল বারান্দা সমংলগ্ন তিনটে কামরা দেখতে পেল তানভীর। ও অনুমান করলো এই তিনটে কামরাই সম্ভবত মেহমানদের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে।

কামরার সামনে এসে লক খুলতে ব্যস্ত হয়ে গেল কেয়ারটেকার, আর আশেপাশে তাকিয়ে তানভীর দেখতে লাগলো আধূনিক ভবনটা। চতুষ্কোন আকৃতির ভবনটাতে ওপর থেকে স্কাইলাইটের মতো দেখতে একটা জায়গা দিয়ে আলো আসছে। চারপাশে লম্বা-লম্বা খোলা বারান্দা দিয়ে বাইরের সবুজ গাছের সারি চোখে পড়ে। চমৎকার, মনে-মনে ভাবলো ও।

কেয়ারটেকার দরজার তালা খুলে ওকে চাবি বুঝিয়ে দিতেই ভেতরে চলে এলো ও। একজন থাকার মতো সুন্দর একটা কামরা। একপাশে সুন্দর বসার ব্যবস্থা-অন্যপাশে বেডরুম, লাগোয়া ওয়াশ রুম। ওর ব্যাকপ্যাকটাকে দেখতে পেল একটা কাবার্ডের ওপরে রাখা। নিজের পিস্তলটাকে হোলস্টার সহ খুলে টেবিলের ওপরে রাখলো ও। তারপর দ্রুত ফ্রেশ হয়ে কাজ শুরু করে দিলো। পিস্তলের পাশেই রাখলো এই কেসের সাথে সংশ্লিষ্ট ফাইলটাকে। এরপর পেজারটা তুলে নিয়ে বিশেষ একটা সিগন্যাল পাঠালো ঢাকায় পিবিআইয়ের অ্যানালিসিস উইং এ। সিগন্যালটা পাঠানোর একটু পরেই ওর মোবাইলে একটা বিশেষ নম্বর থেকে কল এলো।

এই কলটা ভিন্ন একটা লাইন থেকে করা হয়। সরকারি-বেসরকারি কোন সংস্থা, এমনকি মোবাইল কোম্পানির লোকজনও এটা ট্রেস করতে কিংবা এই লাইনে আড়ি পাততে পারবে না। ও বেশ কিছুক্ষণ কথা বললো অ্যানালিসিস উইঙের প্রধান হাবিব আনোয়ার পাশা স্যারের সাথে। চুপচাপ তানভীরের ব্রিফিং শুনে সে কিছু বিশেষ নির্দেশনা দিলো ওকে। পাশা স্যারের সাথে কথা শেষ করে ও কল দিলো মা’কে। তখন ঠিকমতো কথা

বলতে পারেনি। এবার চেষ্টা করতে হবে মায়ের রাগ ভাঙ্গানোর। কাজে নামার আগে মায়ের মন খারাপ চেহারাটা বার-বার চোখে ভেসে ওঠাতে ভালো লাগছে না ওর। কিন্তু কল করে মায়ের মোবাইল বন্ধ পেল ও।

মোবাইল রেখে এবার কেসের ফাইলগুলো নিয়ে বসলো ও। এই অল্প সময়ে খুব বেশি কিছু দেখা সম্ভব নয়, তবে আসন্ন মিটিঙে আলোচনা করার মতো জরুরি কয়েকটা বিষয় দেখে নিয়ে ওর মোবাইলের নোটপ্যাডে নোট করে নিলো সেগুলো। কাজ শেষ করে দেখলো ওর নির্দেশিত আধা ঘন্টা পুরো হতে আরো কয়েক মিনিট বাকি। তবে মিটিঙের জন্যে সবাই একত্রিত হলে সুলতানই ওকে জানাবে কাজেই তাড়াহুড়ো না করে নিজের গেজেটগুলো পরীক্ষা করে দেখতে বসলো ও।

প্রথমেই জ্যাকেট আর শার্ট খুলে পাটোয়ারীর দেয়া বুলেট প্রুফ ভেস্ট ফিটিং করে নিলো শরীরে। আগের দিনের ভয়ানক ভারি সিসার পাত আটকানো বুলেট প্রুফ ভেস্টের সাথে পলিমারের তৈরী হালকা এই জিনিসটার কোন তুলনাই চলবে না। এটা যেমন হালকা তেমনি কাজেরও বটে। ভেস্টটা ঠিক করে নিয়ে ওপরে শার্ট আর লেদার জ্যাকেটটা পরে নিলো ও। পেজারটা চেক করে বেল্টের একটা বিশেষ খাপের ভেতরে রেখে দিলো, পাটোয়ারীর দেয়া স্টিলেটোটা নিজের পায়ের সাথে আটকানো খাপে ভরে ব্যাকপ্যাকের ভেতর থেকে বের করলো একটা খাকি রঙের প্যাকেট। ওটার ওপরে ওর নাম লেখা। খাকি খামের ওপরে মার্কার দিয়ে খেলা হাতের রেখা দেখেই ও চিনতে পারলো এটা মৌসুমি আপার হাতের লেখা।

মৃদু হাসি দিয়ে প্যাকেটটা খুলতেই ওর হাসি আরেকটু চওড়া হলো। ভেতরে একটা মাল্টি টাস্কিং টুল কিট। জিনিসটা অনেকটা পুরনো দিনের ম্যাকগাইভার টিভি সিরিয়ালে দেখানো মাল্টি টাস্কিং সুইস নাইফের উন্নত ও অধুনিক রূপ। হাসি মুখে ওটাকে চালান করে দিলো লেদার জ্যাকেটের পকেটে।

টেবিলের ওপর থেকে হোলস্টারটা তুলে নিয়ে ওটার ভেতর থেকে ডেজার্ট ঈগল পিস্তলটা বের করে আগে ডার্ক ট্যান রঙের হোলস্টারটাকে সেট করে নিলো লেদার জ্যাকেটের ভেতরে সার্দা শার্টের ওপরে। পিস্তলের একস্ট্রা ক্লিপগুলো ঠিকমতো বসিয়ে নিলো হোলস্টারের সাথে আটকানো ছোট-ছোট খোপের ভেতরে। সবশেষে ও বসলো সিলভার-ব্লু রঙের ডেজার্ট ঈগল পিস্তলটা নিয়ে।

ম্যাগনাম আই-এম-আই ডেজার্ট ঈগল, এল ফাইভ মডেলের এই বিশেষ পিস্তলটা ২০১৬ সালে লঞ্চ করা ম্যাগনাম গান ল্যাবের বিশেষ গবেষণার ফসল। আধুনিকেরও আধুনিক এই পিস্তলকে বলা হয়ে থাকে বাজারে প্রচলিত হ্যান্ডগানগুলোর ভেতরে সেরাগুলোর চেয়েও সেরা। পিস্তলটা হাতে তুলে নিতেই জার্মান পুলিশের বন্দুক বিশেষজ্ঞের কথাগুলো মনে পড়ে গেল ওর। ওদের ট্রেনিঙের একটা বিশেষ অংশ ছিল যেখানে ওদেরকে নানা

ধরণের আর্টিলারির ব্যাপারে ধারণা প্রদান করা হয়েছে। এর ভেতরে হ্যান্ড গান থেকে শুরু করে হেভি আর্টিলারি পর্যন্ত ছিল-যেগুলো প্রচলিত কাজে প্রয়োজন হতে পারে।

পিস্তলটা হাতে তুলে নিতেই দুটো জিনিস নজর কাড়লো তানভীরের। জিনিসটার ওজন, আর রঙ। রঙটা পুরোপুরি কালোও না আবার সিলভারও না। বরং রঙটা অনেকটা নীলচে রূপালি। অন্যদিকে জিনিসটা বানানো হয়েছে বিশেষ এক ধরণের ফর্জিং স্টিল ব্যবহার করে, যে-কারণে ওজনটা আর দশটা সাধারণ পিস্তল কিংবা হ্যান্ড গান থেকে অনেক কম। এই পিস্তলের আরেকটা মজার ব্যাপার হলো, এর ম্যাগজিনকে ম্যাগজিন না বলে বলা হয়ে থাকে বুলেট কেইস। বুলেট কেইসে ষোলটা গুলি ধরে। গুলিগুলোও একটু আলাদা।

পিস্তলটার বুলেট কেইস বের গুলি পরীক্ষা করে চেম্বার থেকে গুলি বের করে এনে দুই তিনবার ট্রিগার চেপে দেখলো তানভীর। সুপার লাইট ট্রিগার। সামান্য চাপেই গুলি বেরিয়ে যায়। আর এর মেশিন কোয়ালিটি টানা প্রায় সাবমেশিনগানের মতো দ্রুত একটার পর একটা বুলেট উগড়ে দিতে পারে। পরীক্ষা শেষ করে গুলি ভরে বিল্ট ইন লেজার এইম আর একস্ট্রা সাইলেন্সারটা পরীক্ষা করে নিলো ও। তারপর ওগুলো খুলে ঢুকিয়ে রাখলো হোলস্টারের বিশেষ খাপে। সবশেষে পিস্তলের সেফটি অন করে হোলস্টারে রেখে উঠে দাঁড়ালো ও।

হাতঘড়িতে সময় দেখলো। চল্লিশ মিনিটের ওপরে হয়ে গেছে। মন ও মস্তিষ্ক দুটোকেই শান্ত করার জন্যে একটু মেডিটেশন করতে মন চাচ্ছে ওর কিন্তু সেটা না করে বরং দুই মিনিট ব্রিদিং করে টেবিলের ওপর থেকে ফাইল তুলে নিয়ে মোবাইলের নোট প্যাডে টুকে রাখা পয়েন্টগুলোতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো তানভীর। এবার কাজে নামতে হবে।

বাইরে বেরিয়ে করিডর ধরে এগিয়ে সেই ব্রিজের কাছাকাছি আসতেই কেয়ারটেকার ছেলেটা এসে জানালো দোতলায় মিটিং রুমে সবাই ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। লেদার জ্যাকেটের চেইন টেনে দিয়ে কেয়ারটেকার ছেলেটার পিছু নিয়ে সেদিকে এগোল তানভীর।

ছেলেটার সাথে ও চলে এলো দোতলার মিটিং রুমে। মিটিং রুমের কাজ এখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি। তবে কাজ চালানোর মতো ব্যবস্থা হয়েছে। চারপাশে কাঁচ ঘেরা রুমটার একপাশে শ্রেণিকক্ষের মতো সাদা একটা বোর্ড লাগানো। তার ঠিক সামনে রুমের মাঝখানে মনে হয় কোন টেবিল বসানো হবে। তবে সেটার কাঠামো বানানো হলেও সেখানে টেবিল বসানো হয়নি এখনো। তার পরিবর্তে কাজ চালানোর জন্যে টেবিলের গোলচে আকৃতি ঘিরে ছোট ছোট ডেস্কের মতো বসানো হয়েছে।

তানভীর দেখেই বুঝতে পারলো, এটা সাময়িক ব্যবস্থা; সম্ভবত আজকের মিটিঙের জন্যেই বসানো হয়েছে। টেবিলের চারপাশে বসানো ডেস্ক ঘিরে এই মুহূর্তে বসে আছে কয়েকজন মানুষ। তাদের ভেতরে শুটার সুলতান অর সুদর্শন এস আই ইকবালকে

দেখতে পেল তানভীর। টেবিলের একপাশে একটা প্রজেক্টর বসানো। সেটার আলো গিয়ে পড়েছে টেবিলের অন্য প্রান্তে থাকা সাদা বোর্ডটার ওপরে। কিন্তু প্রজেক্টরের সামনে কাউকে দেখতে পেল না ও।

তানভীর কামরায় প্রবেশ করতেই ওকে দেখে বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো সবাই। একটু অস্বস্তি লাগতে শুরু করলো তানভীরের। নিজেকে কেমন জানি মাস্টার-মাস্টার মনে হচ্ছে।

"প্লিজ, বসুন আপনারা," বলে ও টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল। দুই পা এগোতেই কাঁচাপাকা দাড়িওয়ালা এলোমেলো চুলের হালকা-পাতলা সুদর্শন একজন মানুষ এসে হাত মেলালো ওর সাথে।

"মিস্টার তানভীর," বলে সে তানভীরের একটা হাত ধরে মৃদু ঝাঁকিয়ে দিলো। "আমি ডক্টর প্রবীর, এই ল্যাবটা আমার অধীনেই নির্মিত হচ্ছে।"

তানভীর খুব অবাক হয়ে সুদর্শন মানুষটাকে দেখলো। ওর অবাক হবার কারণ কাঁচাপাকা চুল দাড়ির এই মানুষটার সাথে ওর খুব প্রিয় একজন স্প্যানিশ অভিনেতা হিউগো সিলভা'র অস্বাভাবিক মিল দেখে। কথাটা বলতে গিয়েও কী মনে করে থেমে গেল ও।

"আমি তানভীর মালিক, সিনিয়র অ্যানালিস্ট। আপাতত এই কেসের দায়িত্বে আছি," বলে ও মৃদু হেসে আরো কিছু যোগ করতে যাচ্ছিলো তার আগেই হঠাৎ টেবিলের নিচ থেকে একটা চড়া কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

"কি ব্যাপার, সবাই দাঁড়িয়ে আছে কেন?" টেবিলের নিচ থেকে উঠে এলো অদ্ভুত দেখতে একজন মানুষ। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকার পরও অস্বাভাবিক জোরে কথা বলছে সে। "যাক প্রজেক্টরের লাইনটা ঠিকমতো লাগাতে পেরেছি। কী যে করে এরা! কোথায় বিল্ট ইন প্রজেক্টর থাকার কথা, সেখানে একটা ভালো মাল্টিপ্লাগ পর্যন্ত দিতে পারেনি। এতো অকর্মা লোকজন জিন্দেগীতেও দেখিনি," বলে সে একটু অবাক হয়ে সবার চেহারা দেখলো। "অহ, কী যেন জানতে চাইছিলাম, সবাই দাঁড়িয়ে আছে কেন?" বলে সে এতোক্ষণে খেয়াল করলো তানভীরকে। ওকে দেখে একগাল হেসে এগিয়ে এলো ওর দিকে।

"আপনি নিশ্চই সিনিয়র অ্যানালিস্ট তানভীর মালিক," বলে একটা হাত এগিয়ে দিলো সে তানভীরের দিকে। তানভীর মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো মানুষটাকে। একেবারেই ছোট-খাট মানুষটার উচ্চতা পাঁচ ফিটের চেয়ে একটু কমই হবে, পরনে অসংখ্য স্মাইলি আঁকা একটা গেঞ্জির কাপড়ের থ্-কোয়ার্টার আর সমুদ্র সৈকতের ছবি আঁকা একটা আকাশি রঙের টি-শার্ট। ছোট-খাট শরীরটার মাঝামাঝি জায়গায় তার সমুদ্র সৈকতের টি-শার্ট ঠেলে বেরিয়ে আছে বেশ উন্নত মানের গোলচে ভুরি। মাথায় আবার পুরনো আমলের ইটালিয়ান নাবিকদের মতো দেখতে টুপি, যে টুপি সত্তরের দশকের পরে মনে হয় বাঙাল

মুল্লুকে আর কেউ পরেনি। মানুষটার নরম তুলতুলে হাতটা ধরে সামান্য ঝাঁকিয়ে দিয়ে তানভীর বলে উঠলো, "হ্যাঁ, আমিই তানভীর। এই কেসের কমান্ডার।"

"অহ, যা ভেবেছিলাম," একটু মেয়েলি ঢঙে বলে উঠলো মানুষটা। "আমি এই কেসের সাইবার সাপোর্ট হিসেবে কাজ করছি। বাই দ্য ওয়ে, আমি টমি, টমি পোদ্দার।"

কিঞ্চিত হাস্যকর দেখতে মানুষটা ততোধিক হাস্যকর নামটা শুনে আরেকটু হলেই ফিক করে হেসে ফেলেছিল তানভীর। কোনমতে হাসি আটকে ও বলে উঠলো, "মিস্টার পো... আই মিন, মিস্টার টমি আপনি কি পিবিআইয়ের হয়ে কাজ করছেন? মানে পাশা স্যার আপনার কথা বলেছিল আমাকে," বলে একটু কাঁধ ঝাঁকালো তানভীর। "আসলে এই কেসের ব্যাপারে অনেককিছুই পরিষ্কার না আমার কাছে। কাজে নামার আগে সব বিষয়ে কথা বলতে হবে। প্রথমেই আমাকে বুঝতে হবে, কে আসলে কার প্রতিনিধিত্ব করছে, কার ফাংশন কি?"

"একদম ঠিক বলেছেন," আবারো অস্বাভাবিক জোরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠে তালি দিয়ে উঠলো টমি পোদ্দার নামের আজব মানুষটা। "এই কাজের জন্যেই আমি আছি এখানে। আমি পিবিআইয়েরও লোক না, আসলে আমি সিলেটে এসেছিলাম এই ল্যাবের সাইবার মেটেরিয়াল সেট করার জন্যে। আপনারা হয়তো জানেন যে সিআইডি-পিবিআই আর হোমিসাইড ডিভিশিন মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশের প্রতিটি বড়-বড় জেলায়-"

একটা হাত তুলে বক-বক করতে থাকা টমি পোদ্দারকে থামিয়ে দিলো তানভীর। "এসব আমি জানি, আমার ধারণা এই কামরার সবাই জানে। আমি কেসের ব্যাপারে জানতে চাই। তার আগে জানতে চাই, এই কেসের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি মানুষকে। কে কার প্রতিনিধিত্ব করছে আর কার ফাংশনই বা কি। কাজে নামার আগে প্রতিটি বিষয়ে বিস্তারিত না জেনে, পরিকল্পনা ঠিক না করে আমি একটা পা-ও ফেলতে আগ্রহি না," বলে ও একটা আঙ্গুল তুললো।

"আরেকটা ব্যাপারে আমি সবাইকে সাবধান করে দিচ্ছি, এই কেসটা নিয়ে এখনো খুব বেশি না জানলেও এটা পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে এই কেসের কাজ শুরু হতে ইতিমধ্যেই খানিকটা দেরি হয়ে গেছে। আরো যতো দেরি হবে আমাদের জন্যে কাজ উদ্ধার করা ততোই কঠিন হবে। কজেই আমাদের এক্ষুণি সব ঠিক করে কাজে নামা উচিত। যতো দেরি, তত ঝামেলা।"

তানভীর একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো সামনের দিকে। ওর লেকচার শুনে সবাই চুপ হয়ে আছে। তবে টমি পোদ্দারের কোন বিকার নেই। সে আরো একবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে উঠলো, "ফেয়ার এনাফ, তাহলে আমিই শুরু করি।"

"নাহ, আপনি শুরু করার আগে আমি রুমে অবস্থিত সবার সাথে পরিচিত হতে চাই। পরিচয় বলতে হয়তো আমি দুয়েকজনকে চিনি, আপনারা হয়তো একে অপরকে চেনেন

কিংবা চেনেন না। কিন্তু আমি চাই একই টিম হিসেবে কাজ করতে হলে, সবাইকে সবার ব্যাপারে অন্তত একটা কমন গ্রাউন্ডে জানা প্রয়োজন, সেইসাথে কার কি ফাংশন সেটাও। সুলতান আপনি শুরু করুন," বলে তানভীর সুলতানের দিকে ফিরে ইশারা করলো।

সুলতান একটা চেয়ার টেনে বসার পায়তারা করছিল তানভীরের কথা শোনামাত্রই রোবটের মতো সটান সোজা হয়ে গেল, রুমে অবস্থানকারী বেশিরভাগ পুরুষের চেয়ে কয়েক ইঞ্চি বেশি উঁচু হবে সে। দুই পা ফাঁক করে দুই হাত পেছনে নিয়ে গেল মিলিটারির ভঙ্গিতে, তারপর ভারি স্বরে বলতে শুরু করলো, "আমি সুলতান, পিবিআইয়ের স্পেশাল স্ট্রাইকিং ফোর্সে ফিল্ড অপারেশন অফিসার। আমি সরাসরি পাশা স্যারের অধীনে কাজ করি। নাইন এমএম ম্যাগনাম থার্টি টু বোরের জোড়া পিস্তল চালানোতে দক্ষতা আছে আমার," সুলতানের এই কথাটা শোনামাত্রই শিস দিয়ে উঠলো টমি পোদ্দার।

তানভীরও চমকে উঠলো সুলতানের এই কথাটা শুনে, ওর চোখে ভেসে উঠলো 'ডার্টি হ্যারি' সিনেমাতে ক্লিন্ট ইস্টউডের হাতে ধরা বিরাট আকারের পিস্তলটা। ওরকম পিস্তল এমনকি শক্তিশালী পুরুষেরাও ব্যবহার করার আগে দুইবার চিন্তা করে।

"এই কেসে কমান্ডার তানভীরকে সার্বিক সহায়তা করা ও তার ব্যাকআপ হিসেব কাজ করার নির্দেশ আছে আমার ওপরে," সুলতানের শেষ কথাটা শুনে তার দিকে তাকিয়ে সামান্য মাথা ঝাঁকালো তানভীর। সুলতানের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল সাব ইন্সপেক্টর ইকবাল। সুলতানের কথা শেষ হতেই সে কথা বলে উঠলো।

"আমি সাব ইন্সপেক্টর ইকবাল, আমি একেবারে শুরু থেকেই এই কেসের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। মূলত এখানে আমি পুলিশ ফোর্সের প্রতিনিধিত্ব করছি। তবে..."

ইকবালের কথার মাঝখানে কথা বলে উঠলো তানভীর। "দুঃখিত, আপনাকে কথার মাঝে থামিয়ে দিলাম। তবে আমার মনে হয় আপনার কাছ থেকে আমরা পরে শুনবো। কারণ আপনার সাথে আরো বিস্তারিত কথা বলতে হবে। আমরা বসে কথা বলতে পারি," সবাইকে বসার ইশারা করে টমিকে নির্দেশ দিলো কথা বলার জন্যে।

"আমি টমি, ইতিমধ্যেই আপনারা প্রায় সবাই আমার পরিচয় জানেন, মূলত আমি এই কেসের যাবতীয় রিসোর্স মেটেরিয়াল অ্যানালিস্ট হিসেবে কাজ করবো। আমি কেসের ব্যাপারে বিস্তারিত সব একটা ফাইলে আপনাদের সবার সামনে রেখে দিয়েছি। আর সেই ফাইলেরই একটা স্লাইড ভার্সন আমি প্রজেক্টরে দেখাবো, যাতে পুরো ব্যাপারটা সবাইকে পরিষ্কার বোঝাতে পারি। তবে আমি প্রেজেন্টেশন শুরু করবো সাব ইন্সপেক্টর ইকবাল প্রাথমিক ব্যাপারগুলো বলার পরে।"

"বাকি রইলাম আমি," বলে দুই হাত একটু ওপরে তুলে হেসে উঠলো কাঁচাপাঁকা চুলের বয়স্ক ডক্টর প্রবীর। "আমি আসলে সরাসরি এই কেসের সাথে সংশ্লিষ্ট না। আমি ল্যাবের কর্মকর্তা," বলে মৃদু হেসে সে যোগ করলো, "মহাপরিচালকও বলতে পারেন। আমার

ওপরে নির্দেশ আছে যদি সম্ভব হয় যেকোন ব্যাপারে কমান্ডার তানভীরের টিমকে সহায়তা করা। আপনারা চাইলে আপনাদের মূল আলোচনায় আমাকে নাও রাখতে পারেন,” বলে সে কাঁচা-পাঁকা চুল নেড়ে সামান্য হেসে উঠলো।

“নাহ, আপনি থাকুন, হয়তো কোন ব্যাপারে আমাদেরকে সরাসরি সাহায্য করতে পারেন,” তানভীরও মানুষটার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে উঠলো। “ঠিক আছে, এবার আমার পরিচয়টা বলছি। আমি তানভীর মালিক, পিবিআইয়ে ক্রিমিনাল অ্যানালিসিস উইংয়ের সিনিয়র অ্যানালিস্ট। ক্রিমিনাল বিহেভিয়রের ওপরে আমার কিছু দক্ষতা আছে। এছাড়াও ফিল্ড অপারেশনের ওপরে বিশেষ ট্রেনিং আছে আমার,” আসলে ফিল্ড লেভেলে এটাই ওর প্রথম কেস সেটা বলতে গিয়েও চেপে গেল। কেন জানি ওর মনে হচ্ছে টিম কন্ট্রোল করতে গেলে নিজের দূর্বলতা বেশি প্রকাশ না করাই ভালো। “যদিও এই অপারেশানে আমি ইমার্জেন্সি অ্যাকশন ফোর্সের প্রতিনিধিত্ব করছি, তবে সেটা শুধুই সাময়িক। তো আমরা কাজের আলোচনায় ফিরে যাবো। আমার মনে হয় আগে আমি সাব ইন্সপেক্টর ইকবালের কাছ থেকে সব শুনবো,” শেষ কথাটা ও সুদর্শন সাব ইন্সপেক্টরের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো।

তানভীরের কথা শেষ হতেই একবার মাথা নেড়ে ইকবাল শুরু করলো। “আমি সিলেট সদর থানায় কর্মরত আছি। আজ থেকে দুইদিন আগে সকালবেলা আমাদের থানায় এক ভদ্রমহিলা কমপ্লেইন নিয়ে আসেন, তার স্বামী নাকি মিসিং,” বলে সে যোগ করলো। “উনিই শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্কিওলজির নিখোঁজ অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডক্টর মিতায়ন আহমেদের স্ত্রী। তো শুরুতে সবকিছু শুনে তার বক্তব্য রেকর্ডে রেখে তাকে জানানো হয়, এই ব্যাপারে খোঁজ-খবর করা হবে,” বলে সে যোগ করলো, “ভদ্রমহিলা ব্যাপারাটা আমাদেরকে অবগত করার কিছুক্ষণ পরেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ থেকে থানায় কল করে জরুরি ভিত্তিতে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলার জন্যে থানাকে অবগত করা হয়। এর একটু পরেই প্রত্নতত্ব অধিদপ্তর থেকে ফোন পাই আমরা। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার নেতৃত্বে একটা দল পাঠানো হয় ব্যাপারটা খতিয়ে দেখার জন্যে। ওখানে গিয়ে কথাবার্তা বলে আমরা যা জানতে পারি সেটা বেশ,” এই পর্যন্ত বলে ইকবাল একবার মাথা ঝাঁকালো। “কি বলা চলে, বেশ গুরুতরই বটে। ডক্টর মিতায়ন আহমেদ-,”

ইকবাল এই পর্যন্ত বলতেই তানভীর একটু থামালো তাকে। “মিতায়ন আহমেদ? উনি কি মুসলিম? নাকি অন্য ধর্মাবলম্বী? কারণ নামটা একটু অন্যরকম লাগছে আমার কানে।”

“এই ব্যাপারে আমি বলতে পারবো,” ইকবাল জবাব দেয়ার আগেই পাশ থেকে টমি পোদ্দার বলে উঠলো। “উনি ট্রাইবাল পরিবার থেকে এসেছেন। আগে বুদ্ধিস্ট ছিলেন পরে মুসলিম হিসেবে কনভার্ট করেন।”

“ঠিক আছে, তার ব্যাপারে পরে শুনবো, আগে পুরো ঘটনাটা শুনে নেই, ইকবাল বলুন প্লিজ।”

“যা বলছিলাম, ডক্টর মিতায়নের কেসটা প্রথমে স্রেফ একটা মিসিং পারসনের কেস ছিল কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যোগাযোগ করার পর আমরা খতিয়ে দেখতে গিয়ে ব্যাপাটা ধরা পড়ে। আসলে উনার কেসটা শুধু একজন ব্যক্তিবিশেষের মিসিং কেস না। ডক্টর মিতায়ন আন্তর্জাতিক একটা সংস্থার সাথে কোলাবরেশনে ভারতের আসামের একটা বিশেষ এলাকায় গত কয়েক বছর ধরে একটা আর্কিওলজিক্যাল এক্সপিডিশন চালাচ্ছিলেন। সূত্রমতে জানা যায়, এই অপারেশনের সাথে আসামিজ কর্তৃপক্ষ জড়িত ছিল। ডক্টর মিতায়ন আর তার টিম মাঝেমাঝেই আসাম গিয়ে নিজেদের কার্যক্রম চালাতেন। এইবারও তারা প্রায় এক মাসের ওরকম একটা অপারেশান শেষ করে মাঝরাতের পর তামাবিল বর্ডার দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। বাংলাদেশে প্রবেশ করার ঘন্টাখানেক পরেই তার স্ত্রী মিসেস মিতায়ন আহমেদের সাথে তার কথা হয়, সে জানায় তার সাথে থাকা বিদেশি অতিথিকে সিলেট এয়ারপোর্টে পৌছে দিয়েই সে বাসায় চলে আসবে সকালের ভেতরে। কিন্তু সে বা তার বিদেশি অতিথি কেউই জায়গামতো পৌছায় নি,” বলে ইকবাল একটু থামলো।

“সত্যি কথা হলো, আমরা এই কেসে শুধুমাত্র ডক্টর মিতায়নের হারিয়ে যাওয়া নিয়ে কাজ করছি না। আসলে সেদিন রাতে তামাবিল বর্ডার দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করার পর শুধুমাত্র ডক্টর মিতায়ন নয় তার পুরো টিমই গায়েব হয়ে গেছে। এমনকি তাদের বাহনটা পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। ডক্টর মিতায়ন, ডক্টর টেড চ্যাঙ ও তাদের টিম মেম্বার বাকি চারজন ও ট্রাক ড্রাইভার সহ পুরো দলটা স্রেফ হাওয়া হয়ে গেছে সেদিন রাতে,” বলে তাজ্জব হয়ে তাকিয়ে থাকা প্রতিটি মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে উঠলো সাব ইন্সপেক্টর ইকবাল।

অধ্যায় বারো

সময়: ১৮০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ

পৃথুরা বনভূমি, কন্নোর, ভারতবর্ষ

বনের ভেতর থেকে ভেসে আসা চিৎকারটা শুনে দুজনারই মুখের হাসি বন্ধ হয়ে গেছে।

ওরা দুজনেই অভিজ্ঞ যোদ্ধা, তাই চিৎকারের শব্দটা কানে এলেও চট করে কেউই নড়ে উঠলো না। বিধুর দিকে তাকিয়ে একবার ইশারা করলো শামান। সাথে-সাথে বিধু মাটি থেকে ধনুকটা তুলে তাতে একটা তীর জুড়ে নিলো চট করে। শামান এগোনোর আগেই তীর-ধনুক বাগিয়ে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেল বিধু, হাতে জোড়া কাতানা নিয়ে সাবধানে তাকে অনুসরণ করলো শামান।

ওরা যেখানে অবস্থান করছে সেখান থেকে উপত্যকা বরাবর জঙ্গল প্রায় পাঁচশো গজের মতো দূরত্বে অবস্থিত। দুজনেই যার-যার অস্ত্র হাতে নীরবে দৌড়ে চললো সেদিকে। জঙ্গলে প্রবেশের আগে কাঁধের কাছে ঝুলতে থাকা পোশাকের বাড়তি একটা অংশ দিয়ে নিজের চুল আর মুখের অর্ধাংশ ঢেকে নিলো শামান। তার বিচিত্র রঙের এই চুল অযথাই মানুষের কৌতুহলের সৃষ্টি করে। আপাতত নিজের প্রকৃত চেহারা কাউকে দেখাতে চাইছে না ও।

ওরা জঙ্গলে প্রবেশ করামাত্র আবারো শোনা গেল চিৎকার। এবার অনেক নিকটে। ওরা চিৎকারের উৎস অনুমান করে সেদিকে দৌড়ে চললো। পাহাড়ি খাড়াইয়ের একেবারে নিচের সমভূমি থেকে শুরু হয়েছে সবুজ বনভূমি, তাই এদিকটায় জঙ্গল তেমন একটা ঘন নয়, চিকন-চিকন গোল পাতলাওয়ালা গাছের সারির ভেতরে লম্বা পাতার বিচিত্র এক উদ্ভিদের জঙ্গল। সেটা মাথার ওপরে ততোধিক বিচিত্র এক চাদোয়ার মতো তৈরী করেছে বড়-বড় গাছ।

গাছপালা ভেদ করে এগিয়ে চললো ওরা সামনের দিকে। হঠাৎ বিধুকে হাতের ইশারায় থামতে বললো শামান। একেবারেই কাছ থেকে মানুষের কথোপকথন আর একজন মহিলার আর্তনাদের শব্দ ভেসে আসছে। ওরা দুজনেই আগের চেয়েও সাবধানে লম্বা পাতার বিচিত্র সেই সবুজ গাছের পাতা সরিয়ে সামনে উঁকি দিলো।

ওদের সামনের জঙ্গল আরো ঘন হয়েছে, তবে তার ফাঁক দিয়ে চলে গেছে ধূসর বালিময় পথ। সেটার ওপরেই ঘোড়ায় টানা ছ্যাকড়া গাড়ি একদিকে কাত হয়ে আছে। গাড়ির সামনে কাউকেই দেখা গেল না। তবে একপাশে তাকাতেই ওরা পরিষ্কার দেখতে পেল, একজন টাকমাথা মোটামতো লোককে মাটিতে ফেলে বেদম প্রহারে রত দুই ষন্ডা,

অন্যদিকে খাটো বাঁকা তলোয়ার একহাতে ধরে অন্যহাতে এক মহিলাকে গাড়ির ভেতর থেকে টেনে বাহিরে নামানোর চেষ্টা করছে মুষকো কালো দেখতে আরেক ষন্ডা।

পরিষ্কার ডাকাতির ঘটনা। সামনের দৃশ্যটাতে একবার চোখ বুলিয়েই শামান বুঝে গেল কী ঘটছে ওখানে। ও পাশ ফিরে বিধুকে নির্দেশনা দিতে যাবে তার আগেই দেখতে পেল ঘোড়া আর দস্যুদলের দিকে তেড়ে চলেছে বিধু, তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে জান্তব সব খিস্তি। আপনমনেই একবার মাথা নেড়ে শামানও এগোতে লাগলো ঘটনাযজ্ঞের দিকে।

বিধু এক দৌড়ে গিয়ে একজনের মাথায় বসিয়ে দিলো তার ধনুকের এক প্রান্ত, তারপর বীরের মতো এগিয়ে গেল মহিলাকে ধরে টানতে থাকা ষন্ডার দিকে। লোকটা বিধুকে এগোতে দেখে মহিলাকে ছেড়ে তার দিকে তলোয়ার তাক করলো, আপন মনে হেসে উঠলো বিধু।

লোকটা তাকে লক্ষ্য করে তলোয়ার চালালো, স্রেফ শরীরটাকে এদিক-সেদিক নাড়িয়েই সেটা এড়িয়ে গিয়ে নিজের ভীম বাহু দিয়ে এক ঘুসি মেরে মাটিতে ফেলে দিলো সে কালুয়াকে।

অন্যদিকে মাটিতে পড়ে থাকা লোকটাকে মারতে থাকা ষন্ডা দুজনে যখন দেখলো তাদের অপর দুই সঙ্গী কাবু হয়ে গেছে, যার যার অস্ত্র বাগিয়ে বিধুর দিকে এগোতে লাগলো তারা, এমন সময়ে তাদের সামনে ঝড়ের মতো আবির্ভূত হলো শামান। পরবর্তী দুই মিনিট কোথায় কী হলো কেউই সঠিক বুঝতে পারলো না, তবে বাকি দুজনকেও মাটিতে শুইয়ে দিয়ে শামান যখন সোজা হলো, বিধু আর ছ্যাকড়া গাড়ির মহিলা দুজনেই ওর দিকে একটু অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

তবে বিধুই সক্রিয় হলো আগে। সে শামানের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে মহিলার দিকে ফিরে তাকাল গদ-গদ ভঙ্গিতে। হাসি মুখে কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুলেছিল সে কিন্তু তার হাসি মুখেই রয়ে গেল। মুখের ওপরেই মহিলার এক লাথি খেয়ে মাটিতে ছিটকে পড়লো সে, হাত থেকে ছুটে গেছে ধনুক। বিধুকে এক লাথিতে মাটিতে ফেলে দিয়েই অনুচ্চ স্বরে শিস বাজালো মহিলা। শামান নড়ে ওঠার আগেই অন্তত দশজন অস্ত্রধারী চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললো ওদেরকে। পুরো ব্যাপারটাই একটা সাজানো ফাঁদ ছিল, আর তাতে বোকার মতো ধরা দিয়েছে ওরা।

অস্ত্রধারীরা সুশৃঙ্খলভাবে ওদেরকে ঘিরে রাখলো। কয়েকজন এসে মাটিতে শুইয়ে হাত বেঁধে ফেললো দুজনার। তারপর টেনে দাঁড় করিয়ে দিলো মুর্তির মতো। অস্ত্রগুলো কেড়ে নিয়েছে আগেই।

ধরা পড়েও বোকার মতো হাসতে থাকা বিধুর দিকে তাকিয়ে রাগে গা জ্বলে উঠলো শামানের। এরকম অবস্থায় ব্যাটা হাসছে কিভাবে? এই মোটুর গাধামির জন্যেই বোকার

মতো ধরা পড়তে হয়েছে ওদের। গাধাটা সকালবেলা উঠেই সোমরস খেয়ে ঝামেলা শুরু করেছিল ওর সাথে। এরপর থেকেই যতো যন্ত্রণার উৎপত্তি। ডাকাতগুলোর কাছে এভাবে ধরা পড়ার পেছনে ওর নিজেরও বোকামি আছে। একজন অভিজ্ঞ যোদ্ধা হবার পরও এমন বোকামি কিভাবে করতে পারলো ও, ভাবতেই রাগের মাত্রা আরো এক ধাপ ওপরে চড়ে গেল।

তীব্র রাগের সাথে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো বিধুকে, তার আগেই ওকে বেঁধে রাখা দড়িতে ধরে টান দিলো মুশকো কালো মতো দেখতে পাহারাদার। ধরা পড়ার আগে ব্যাটার মুখে ঘুসি মেরে নিচের ঠোঁট ফাটিয়ে দিয়েছিল শামান। সেটা দেখে একটু শান্তি লাগলো ওর।

তবে সেই শান্তি পুরোপুরি উপভোগ করার আগেই আবারো ওদেরকে টান মারলো কালুয়া। দুজনারই হাত বাঁধা দড়ির লম্বা অংশ ধরে আছে ঘোড়ায় বসা কালো লোকটা। তার টান খেয়ে আরেকটু হলেই মাটিতে হোঁচট খেয়ে পড়তে যাচ্ছিলো ও, কোনমতে সামলে নিলো নিজেকে। গালি দিয়ে উঠলো জোরে। ব্যাটা বুঝলো কিনা কে জানে তবে ওর দিকে পেছন ফিরে একগাল হেসে মাটিতে একদলা রক্তাক্ত থুতু ফেললো সে। আবারো দড়িতে টান দেয়ার আগেই জোরে পা চালালো শামান।

শুরু হলো জঙ্গলের পথে ওদের যাত্রা। ওদের সামনে চললো ঘোড়ায় বসা লোকগুলো, আর ওরা হেঁটে চললো। ওদের কাফেলাটা জঙ্গলের পথে লম্বা সময় ধরে এগিয়ে চললো। শামানের আন্দাজ যদি ঠিক হয়ে থাকে তবে ওরা জঙ্গলের পথে প্রায় তিন ক্রোশের মতো জায়গা হেঁটে পার হয়ে এসেছে। হাঁটতে-হাঁটতে ক্লান্ত-বিরক্ত শামান আরেকবার মুখ তুলে প্রশ্ন করলো ওদেরকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কারো কোন বিকার নেই। ওদের সাথে থাকা ঘোড়ার গাড়িটা ওদেরকে ছাড়িয়ে চলে গেছে বহু আগেই। এখন ঘোরসওয়ারি আর পায়ে হাঁটা দশ-বারো জনের দলটা একেবারেই নীরবে এগিয়ে চলেছে। দলের অগ্রভাগে মুখ ঢাকা সেই মহিলা।

শামান মনোযোগ দিয়ে লোকগুলোকে খেয়াল করতে লাগলো। এদেরকে দেখেই বোঝা যায় যোদ্ধা, কিন্তু কোন সেনাবাহিনীর অংশ বা অন্তর্ভূক্ত ব'লে মনে হচ্ছে না। কারণ একেকজনের পোশাক একেক রকম, প্রত্যেকেরই পরনে চামড়ার ফালির তৈরী এক ধরণের পাজামা, পায়ে খোলের জুতো, আর উর্ধ্বাঙ্গে ফতুয়ার মতো হাতে কাটা সুতোর তৈরী জামা। প্রত্যেকেই বহন করছে খাটো বাঁকা তলোয়ার আর ছুরি। আর দলের একটা অংশের লোকদের সাথে তীর-ধনুক। তারমানে দলের এই অংশটা তীরন্দাজ।

এই দলটাকে দেখে কয়েকটা ব্যাপার শামানের কাছে খুব অবাক লাগছে। প্রথমত, দলের দুটো অংশের লোকজনের চেহারা একেবারেই দুরকম। দ্বিতীয়ত, দলটা যেভাবে ওদেরকে ধরলো এতে পরিষ্কার বোঝা যায় ওদেরকে ধরাই এদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ওদেরকে

এভাবে ধরলো কেন সেটা পরিষ্কার হচ্ছে না শামানের কাছে, সাধারণ ডাকাত দল এভাবে ওদেরকে ধরার পেছনে কোন কারণ নেই- কারণ ওদের সাথে মূল্যবান কিছু নেই।

তবে ওকে সবচেয়ে বেশি অবাক করছে দলের নেতার ব্যাপারটা। নেতা না বলে আসলে নেত্রি বলাটাই শ্রেয়। এরকম একটা দস্যু দলের নেতা একজন মহিলা, ব্যাপারটা কোথায় যেন ঠিক মিলছে না শামানের কাছে। অবশ্য পাহাড়ি যোদ্ধা শামানের কাছে সমতল উপত্যকার জীবন-যাপন আর ওদের আচার-আচরণ কখনোই পরিষ্কার নয়। ও পাশ ফিরে বিধুকে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই হঠাৎ একটা ব্যাপার মাথায় আসতেই ভেতরে- ভেতরে ভীষণ চমকে উঠলো শামান।

এরা দাস ব্যবসায়ি নয়তো!

অধ্যায় তেরো

বর্তমান সময়

নির্মাণাধীন ল্যাব, শাহী ঈদগাহ, সিলেট

"এর মানে কি?" তানভীর আবাক হয়ে একবার ইন্সপেক্টর ইকবালকে দেখলো, তারপর ফিরে তাকাল সুলতান আর টমির দিকে। "আমি প্রথম থেকে শুনে আসছি কেসটা হলো একজন শিক্ষকের মিসিং কেস। এখন সেটা পুরো দলের মিসিং কেস কিভাবে হলো? আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

সুদর্শন ইন্সপেক্টর ইকবালও একটু অবাক হয়ে গেছে তানভীরের কথা শুনে। নার্ভাস ভঙ্গিতে সে দুই ভ্রুর মাঝের তিলটা ঘসতে-ঘসতে বলে উঠলো, "স্যার, আপনাকে কী ইনফর্ম করা হয়েছে সেটা তো আমি বলতে পারবো না, তবে এই কেসটা শুরু থেকেই পুরো দলের মিসিং কেস। এর সাথে আন্তর্জাতিক দুয়েকটা ব্যাপারও জড়িত আছে, এ-কারণেই কেসটা পুলিশ থেকে ইএএফ'র অধীনে ট্রান্সফার করা হয়। ব্যাপারটা যদি শুধ্ইু একজন শিক্ষকের মিসিং কেস হত তবে সেটা ইএএফকে হস্তান্তর করার কোন কারণ ছিল না।"

"আশ্চর্য ইএএফ থেকে কেসটা নিয়ে ডিল করার জন্যে অ্যানালিসিস উইংকে অনুরোধ করা হলো, অথচ মূল ব্যাপারটাই চেপে গেল ওরা, এ-কেমন কথা?" বলেই তানভীরের মনে পড়লো পাশা স্যার ওকে বলেছিল ডক্টর মিতায়নের সাথে টেড চ্যাঙ ছিল, হয়তো পাশা স্যার সব জানতো কিন্তু ওকে বিস্তারিত বলেনি। অথবা হতে পারে ওর বোঝার ভুল।

ঘটনা যাই ঘটে থাকুক মনে-মনে ও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো, একবার যেহেতু কাজে নেমেছে কাজেই এ-থেকে পেছানোর কোন ইচ্ছে ওর নেই। বরং এই কেসে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ঢেলে দিবে ও। কারণ ট্রেনিঙে যা শিখে এসেছে সেটাকে বাস্তবে প্রয়োগ করার এরচেয়ে ভালো সুযোগ আসলেই আর হবে না, আর তাছাড়া এর সাথে জড়িয়ে আছে অ্যানালিসিস উইং আর পাশা স্যারের ইমেজ। মনে-মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ও ফিরে তাকাল ইকবালের দিকে। "যাই হোক, এরপর কী হলো বলে যান, প্লিজ।"

তানভীরের অনুমতি পেয়ে ইকবাল আবারো শুরু করলো। "ডক্টর মিতায়ন আর তার পুরো টিমই গায়েব হয়ে গেছে এটা জানতে পারার সাথে সাথে কাজে নেমে পড়ি আমরা। প্রথমেই তামাবিল বর্ডারে যোগাযোগ করে তাদের এন্ট্রির সময়টা কনফার্ম করা হয়। ওখানে যোগাযোগ করে জানা যায় ভোর তিনটার দিকে তামাবিল বর্ডার দিয়ে তাদের ট্রাক বাংলাদেশে প্রবেশ করে। যদি অন্যান্য অফিসিয়াল ও ডক্টর মিতায়নের স্ত্রীর ভাষ্য মেলানো হয় তবে সেখান থেকে তাদের সোজা চলে যাবার কথা এয়ারপোর্টে, কিন্তু ভোর হয়ে যাবার পরও তারা এয়ারপোর্টে পৌছায় নি। কিংবা অন্য কোথাও তাদের পাওয়া যায়নি।"

"তারমানে তামাবিল বর্ডার থেকে এয়ারপোর্টে যাবার পথেই কোন একটা জায়গায় গায়েব হয়ে গেছে ডক্টর মিতায়ন আর তার টিম," তানভীর ছোট ছোট নোট লিখে রাখছে ওর মোবাইলের নোট অপশনে। "আচ্ছা, এরপর কী হলো?"

"স্যার, আমরা উনাদের টিমের মিসিং হবার ব্যাপারটা কনফার্ম হওয়া মাত্রই এয়ারপোর্ট, সিলেট রেল স্টেশন, নদী পথ এমনকি প্রতিটি প্রধান সড়ক পথে ডক্টর মিতায়নসহ তার টিমের সবার ছবিসহ সতর্ক পাহারা বসিয়ে দেই।"

"তাদের মিসিং হবার সময় থেকে কতোক্ষণের ভেতরে এই পাহারা বসানো হয়?" তানভীর জানতে চাইলো।

"স্যার, আমর ধারণা তারা মিসিং হবার আট থেকে দশ ঘন্টার ভেতরে," ইকবালের জবাবের সাথে-সাথে ব্যাপারটা টুকে নিলো তানভীর।

"আচ্ছা, এরপর কী করলেন আপনারা?"

"স্যার, এরপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট লোকজনের সাথে কথা বলি আমরা, সেইসাথে এই আর্কিওলজির দলটার সাথে সংশ্লিষ্ট সব জায়গায় অভিযান চালিয়ে তাদের হদিস বের করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কিছুই পাইনি আমরা। এর মধ্যে একদিন পার হয়ে গেছে এমন সময় ওপর মহল থেকে আমাদেরকে জানানো হয় কেস পুলিশ থেকে ইএএফের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। পরে জানানো হয় ইএএফের প্রতিনিধিকে সিলেট পাঠানো হচ্ছে, এরপরেই আপনি আসেন স্যার," বলে ইকবাল মাথা নেড়ে তার কথা শেষ করলো।

"বুঝতে পেরেছি," বলে তানভীর এক মুহূর্ত চিন্তা করলো। "আচ্ছা ডক্টর মিতায়ন আর তার টিমের ব্যাপারে আমি সব জানতে চাই। সেইসাথে তারা যে আর্কিওলজিক্যাল এক্সপিডিশন চালাচ্ছিল সেটার ব্যাপারেও।"

তানভীরের কথা শেষ হবার প্রায় সাথে সাথেই স্কুলের বাচ্চাদের মতো একটা হাত তুললো টমি পোদ্দার। "বস, অনুমতি পেলে এখান থেকে আমি আলোচনা শুরু করতে চাই," পাপেটের মতো মেয়েলি ঢঙে বলে উঠলো সে। তানভীর মাথা নেড়ে অনুমতি দিতেই পুরনো আমলের টুপিটা খুলে সে শিস দিতে-দিতে এগিয়ে গেল টেবিলের ওপরে রাখা ল্যাপটপের দিকে।

"হুম্," মৃদু কাশি দিয়ে শুরু করলো টমি, "গুড মর্নিং, সরি গুড আফটার নুন," ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠলো, "আমি টমি, এখন আমি আপনাদেরকে ব্রিফ করতে যাচ্ছি ডক্টর মিতায়ন, তার টিম আর তাদের আর্কিওলজিক্যাল এক্সপিডিশন মিশনের ব্যাপারে," বলে সে মাউজটা নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করলো। আর তার কথা বলার ধরণ দেখে তানভীরের মনে পড়ে গেল ছোটবেলায় বিটিভিতে দেখা নতুন কুঁড়ি অনুষ্ঠানের কথা। সেখানে ছোট-ছোট উপস্থাপকেরা এইভাবে টেনে-টেনে শিশুতোষ ভঙ্গিতে উপস্থাপনা করতো। নতুন কুঁড়ির পর এভাবে কাউকে কথা বলতে শুনেছে ব'লে মনে পড়ে না তানভীরের।

টমি'র ল্যাপটপে একটা পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড ওপেন করতেই সেখানে একজন মানুষের ছবি দেখা গেল। হালকা মঙ্গলয়েড ধাঁচের চেহারা, বাংলাদেশে সাধারণত এই ধরণের চেহারা দেখা যায় ট্রাইবাল কমিউনিটির লোকজনের। মাথায় ঘন চুল, একটু গোলগাল মুখমন্ডল, ডান চোখের নিচে একটা ছোট কাটা দাগ। কালো চশমা আর ধূসর স্যুট পরা হাসি-খুশি একজন মানুষ।

"ডক্টর মিতায়ন আহমেদ। বয়স প্রায় চল্লিশ, জন্ম, বাংলাদেশেরই বৃহত্তর সিলেটের একটি ট্রাইবাল কমিউনিটিতে। খুব ছোটবেলায় পরিবারের সাথে সে লন্ডনে মাইগ্রেট করে," বলে সে পরের স্লাইডে চলে গেল। সেখানে ডক্টর মিতায়নের ব্যাপারে প্রথমিক সব তথ্য বুলেট পয়েন্ট আকারে লেখা আছে। "শাবিপ্রবির ডাটাবেইজের তথ্যমতে, সেখানেই সে পড়ালেখা করে, স্কুল-কলেজ শেষে গ্র্যাজুয়েশন এরপর ডক্টরেট ও পোস্ট ডক্টরেট। খুবই মেধাবি ছাত্র ছিল। পোস্ট ডক করার পর একটা আন্তর্জাতিক আর্কিওলজিক্যাল সংস্থায় কাজ করতো। আজ থেকে বছর চারেক আগে শাবিপ্রবিতে আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্ট খোলার বছরখানেকের মাথায় সে সেখানে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেব আবেদন করলে তার মতো প্রোফাইলের একজন মানুষকে একরকম লুফে নেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সেখানে জয়েন করার কিছুদিনের ভেতরেই সে একটা প্রজেক্ট নিয়ে আসে। সেটার অধীনেই ভারত বাংলাদেশ মিলে আসামে যৌথ অভিযান চালানো শুরু হয়। "

"তার এই প্রজেক্টের সাথে কি ডিপার্টমেন্টের অন্য কেউ বা কোন শিক্ষক সংযুক্ত ছিল?" তানভীর জানতে চাইলো।

"না, সরাসরি কেউই সংযুক্ত ছিল না। মানে ফিল্ড লেভেলে না। তবে হ্যাঁ, দেশের দুয়েকজন নামকরা আর্কিওলজিস্ট এই প্রজেক্টের উপদেষ্টা ছিল, শাবিপ্রবি আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্টের চেয়ারপারসনও তাদের একজন।"

তানভীর একটা হাত নেড়ে উড়িয়ে দিলো কথাটা। "এসব উপদেষ্টাদের কোন দাম নেই। এরা কিছু জানেও না। এইসব কথাকথিত বুদ্ধিজীবী লোকজনকে এসব প্রজেক্ট রাখতে হয় একরকম বাধ্য হয়ে। এদেরকে না রাখলে প্রজেক্টর ভ্যালু বাড়ে না, সেইসাথে বিভিন্ন ধরণের অনুমতি পেতেও সমস্যা হয়।"

"তবে ফিল্ড লেভেলে তার সাথে সংযুক্ত ছিল ডক্টর মিতায়নের পূর্ববর্তী কাজের ক্ষেত্র-সাউথ এশিয়ান জোনের প্রধান ডক্টর টেড চ্যাঙ," বলে টমি পোদ্দার আরেকটা স্লাইড ওপেন করলো। সেখানে চায়নিজ মতো দেখতে একজন মানুষের ছবি দেখা গেল। পরতে নীল টি-শার্ট, ন্যাড়া মাথা, মুখে সাদা ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি। চোখে কালো সানগ্লাস। "মূলত টেড চ্যাঙ আর ডক্টর মিতায়ন মিলেই এই এক্সপিডিশনটা চালাচ্ছিলো গত দুই বছর ধরে।"

"এক্সপিডিশনটা ছিল কী নিয়ে?"

"ডক্টর মিতায়ন আর তার টিম গায়েব হয়ে যাবার পর তাদের অফিস থেকে পাওয়া নথি থেকে, তাদের ব্লগ থেকে আর সংশ্লিষ্ট লোকজনের সাথে কথা বলে আমরা যা বুঝতে পেরেছি সেটা অনেকটা এরকম; তারা সম্ভবত বৃহত্তর এশিয়ার মেজর কোন ধর্ম সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কিছু একটা খুঁজছিল। খুব বিস্তারিত না হলেও এটুকু জানা গেছে তারা বহু পুরনো কোন এক নথি থেকে এই ব্যাপারে সন্ধান পেয়ে একেবারে নেপাল থেকে শুরু করে এই গোত্রের সন্ধান করে আসামে এসে এদের ট্রেস করার চেষ্টা করছিলেন। যদি তারা এই কাজে সফল হতে পারতো তবে নাকি এই অঞ্চলের ধর্মীয় ইতিহাসের ব্যাপারটা একেবারেই নতুন একটা সংযোগ হবার সম্ভাবনা ছিল। এমনকি তাদের এই আবিষ্কারের ফলে নাকি এশিয়ার এই জোনের রিলিজিয়াস অ্যানথ্রোপলজিক্যাল এভুলুশনের ইতিহাস যেভাবে বর্ণিত আছে তার অনেকটাই বদলে যেতে পারতো।"

"তারমানে তাদের এক্সপিডিশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাদের যে খোঁজ বা আবিষ্কার সেটার কতোটুকু গভীরে যেতে পেরেছিল?"

"এটা সঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না," টমি পোদ্দার মাথা নাড়লো। "প্রফেসরদের যে একাডেমিক লগ, সেটা আমরা তাদের অফিসিয়াল নথিতে পাইনি। সেটা না পেলে কিছুই বলা সম্ভব হচ্ছে না। তবে অন্যদের সাথে কথা বলে এটা বুঝতে পেরেছি তারা গত দুই বছর ধরে টুকরো-টুকরো অভিযান চালালেও গত একবছরে তাদের টুকরো অভিযানের

পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছিল, সেইসাথে এটাও যোগ করা চলে, এইবারের অভিযান ছিল তাদের এযাবৎকালের সবচেয়ে বড় অভিযান। গত দেড় মাস ধরেই তারা আসামে অবস্থান করছিল। এর আগে এতো লম্বা সময় ধরে তারা কখনো অভিযান পরিচালনা করেনি।”

“তারমানে এমনটা হতেই পারে এবারের অভিযানে তারা হয়তো গুরুত্বপূর্ণ কিছু খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশে প্রবেশের পর কেন তারা এভাবে গায়েব হয়ে যাবে, তাও কোন ট্রেস না রেখেই?” তানভীরের মনে অন্য একটা সন্দেহ উঁকি দিতে শুরু করেছে। “আচ্ছা, ডক্টর মিতায়ন আর টেড চ্যাঙের দলে আর কে কে ছিল?”

তানভীরের প্রশ্ন শোনার প্রায় সাথে-সাথে টমি ল্যাটপটের বাটন চাপলো, “রঘুবীর, তাদের ট্রান্সপোর্টের ড্রাইভার,” বলে সে স্লাইডে একজন মোচ ওয়ালা লাল শার্ট পরা লোকের ছবি দেখালো, এই প্রজেক্টের জন্যেই তাকে নিয়োগ দেয়া হয়, আর দুজন গার্ড ও একজন সেক্রেটারি,” বলে সে একে-একে তিনজনের ছবি দেখালো। “এই তিনজনের ভেতরে দুজন ছিল প্রফেশনাল মার্সেনারি, এদেরকে সেই আন্তর্জাতিক সংস্থা সিকিউরিটি পারপাসে নিয়োগ দিয়েছিল। আর শেষজন বাংলাদেশি একজন ইন্টার্ন, সে জাহাঙ্গিরনগরের আর্কিওলজির ছাত্র। সে মূলত লগ মেন্টেইন করা থেকে শুরু করে যাবতীয় বৈজ্ঞানিক কাজে দুই প্রফেসরকে সাহায্য করতো। তবে এবারের অভিযানে সে যেতে পারেনি অসুস্থতার কারণে।”

“ব্যাস, এই ক’জন?” তানভীর একটু অবাক। কারণ এতো গুরুত্বপূর্ণ একটা এক্সপিডিশন আর তাতে মাত্র এই ক’জন ব্যাপারটা খুব অবাক করছে ওকে। “তাদের সাথে অর কোন ছাত্র-ছাত্রী বা ইন্টার্ন ছিল না? এতো ছোট ছিল তাদের টিম?”

“অবশ্যই না,” বলে টমি মৃদু হেসে উঠলো। “তাদের টিম আকারে প্রায় এর দ্বিগুণ ছিল, কিন্তু টিমের বাকি সদস্যরা ছিল আসাম ইউনিভার্সিটির লোকজন। তাদের ব্যাপারে আমরা খুব বিশদ কিছু জানি না। তবে তাদের ব্যাপারে তথ্য চেয়ে পাঠানো হয়েছে ভারতের কাছে,” বলে টমি একবার মাথা নাড়লো।

“এখানে আমার মনে হয়,” হঠাৎ কথা বলে উঠলো সাব-ইন্সপেক্টর ইকবাল। “ভারতের কাছে তথ্য চেয়ে যতোটা না কাজ হবে তারচেয়ে বেশি কাজ হবে সেই আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে তথ্য চাইলে। কারণ ভারতীয় বাংলাদেশি যারাই কাজ করুক না কেন সবাই নিশ্চই তাদের অধীনেই কাজ করেছে,” বলে সে তানভীরের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল।

“অবশ্যই,” তানভীর খুশি হয়ে উঠলো সাব ইন্সপেক্টরের সাজেশনে, লোকটার বুদ্ধি আছে মনে হচ্ছে। “ডক্টর টেড চ্যাঙ যে সংস্থায় কাজ করতো সেটার নাম কি?”

“সাইথ এশিয়ান আর্কিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, সংক্ষেপে ‘সায়া’ নামে পরিচিত সংস্থাটি।”

“হ্যাঁ, তাদের কাছে সবার ব্যাপারে আরো বিস্তারিত তথ্য চেয়ে পাঠান। আরেকটা ব্যাপার, ডক্টর মিতায়নের টিমে যারাই ছিল সবার পরিবার বাড়ি-ঘরে খবর নেয়া হয়েছে?” শেষ প্রশ্নটা তানভীর জানতে চাইলো। “মানে, তারা কেউই বাড়িতে বা অন্য কোথাও পৌছেছে কিনা, অথবা বাড়ির লোকজন বা অন্য কারো সাথে যোগাযোগ করেছে কিনা?”

“সবার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। কেউই ফিরেও যায়নি, কেউই কারো সাথে যোগাযোগও করেনি। ডক্টর মিতায়ন বা তার টিম তাদের পরিবার কিংবা বন্ধু-বান্ধব কারো সাথে যোগাযোগ করা মাত্রই আমরা জানতে পারবো। সেরকমই ব্যবস্থা করা আছে।”

“আচ্ছা, ডক্টর মিতায়নের পরিবারে কে কে আছে?” তানভীর তার মোবাইলের নোট প্যাডে নেয়া ছোট-ছোট নোটগুলো মিলিয়ে ওয়ার্কপ্ল্যান বানানোর চেষ্টা করছে।

টমি পোদ্দার তার সামনে রাখা ফাইলে মিলিয়ে দেখলো, “শুধুমাত্র তার স্ত্রী। মিসেস মিতায়ন। উনিও শাবিপ্রবির শিক্ষক, অ্যানথ্রোপলজি ডিপার্টমেন্টের। উনি শাব্রিপ্রবি ক্যাম্পাসেই আছেন।”

অ্যানথ্রোপলজি ডিপার্টমেন্ট শুব্দটা শুনে তানভীরের বুকের মধ্যে হৃদপিন্ডটা একটা লাফ দিলো। একটু চুপ থেকে সে যোগ করলো, “উনার সাথে আমাকে কথা বলতে হবে। আচ্ছা উনাদের এই প্রজেক্টের কোন অফিস ছিল?”

“জ্বি, জিন্দাবাজর সিলেট মিলেনিয়ামে ‘সায়া’র মানে সাউথ এশিয়ান আর্কিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের একটা টেম্পোরারি অফিস আছে। আর শাবিপ্রবি ‘ডি’ বিল্ডিঙেও ওদের একটা শাখা অফিস আছে, মানে ওখানে ডক্টর মিতায়নের রুমটাকেই টেম্পোরারি অফিস হিসেবে ব্যবহার করা হত।”

“আপনারা কি এই দুটো অফিস চেক করে দেখেছেন?” তানভীর জানতে চাইলো।

“অবশ্যই, সিলেট মিলেনিয়ামে যে অফিসটা আছে সেখান থেকেই মূলত আমরা আজকের আলোচনা করা তথ্যগুলো পেয়েছি। ওখানে আর কিছুই নেই। ওই অফিস পুলিশ সিল করে দিয়েছে। তবে ডক্টর মিতায়নের অফিসটা সেভাবে চেক করা দেখা সম্ভব হয়নি।”

“তাহলে আমরা কাজ শুরু করে দেই। কেসের প্রাথমিক ব্যাপারগুলো খুব ভালোভাবেই বোঝা গেছে। আমার বিশ্বাস এই রুমে অবস্থিত সবাই সেটা বুঝতে পেরেছে। এখন আমার প্রশ্ন হলো, আমার সাথে ফিল্ডে কে-কে থাকছে?” প্রশ্নটা করেই সে প্রথমে ফিরে তাকাল সাব-ইন্সপেক্টর ইকবালের দিকে। “আপনি কি আমার টিমে থাকছেন?”

“জি, স্যার। আমার ওপরে সে-নির্দেশনাই আছে,” ইকবাল মাথা নেড়ে উত্তর দিলো।

“স্যার, আমি আপনার সাথে থাকছি অপারেশনের স্ট্রাইকিং আর ব্যাকআপ ফোর্স হিসেবে,” সুলতান আবারো সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। তানভীর তার দিকে ফিরে একবার মাথা ঝাঁকিয়ে টমির দিকে ফিরে তাকাল প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে।

টমি আবারো তার যথাযথ ভঙ্গিতে দুই হাত তুললো ওপরের দিকে। "আমি হলাম আলফ্রেড," বলে সে হেসে উঠলো।

প্রথমে বুঝতে না পারলেও একটু পরেই তানভীর ধরতে পারলো টমি আসলে কী বলছে।

মৃদু হেসে ও বলে উঠলো। "ব্যাটম্যানের আলফ্রেড, 'ম্যান অন দ্য চেয়ার'। ঠিক আছে আপনি তাহলে আমাদেরকে সব ধরণের আইটি সাপোর্ট, সাইবার ম্যাটেরিয়ালের ব্যাকআপ দিবেন।"

"আমি যদিও আপনাদের কেসের সাথে সংশ্লিষ্ট না, তবুও যেকোন ব্যাপারে আপনারা আমার সহায়তা পাবেন," বলে কাঁচা-পাকা চুল-দাড়ি ডক্টর প্রবীর মৃদু হেসে যোগ করলো। "অবশ্যই আনঅফিসিয়ালি।"

"তাহলে, আমাদের টিমে থাকছি আমি, কমান্ডার অব দ্য অপারেশান, সাব-ইন্সপেক্টর ইকবাল ও সুলতান," বলে একটু থেমে যোগ করলো, "আমাদের কার সাথে কী ধরণের ইক্যুইপমেন্ট থাকছে, আমার জানা দরকার।"

"আমার সাথে স্ট্যান্ডার্ড ইস্যু রিভলভার, আর আমার অফিসিয়াল ওয়াকিটকি," ইকবাল বললো।

"আমার সাথে এগুলো," বলে সুলতান তার ব্লেজারের ভেতর থেকে বের করে আনলো বিরাট আকারের নল লম্বা দুটো পিস্তল। তানভীর অবাক হয়ে পিস্তল দুটো দেখলো এক মুহূর্ত। "ঠিক আছে, চলবে। আমাদের সবাইকে মোবাইল নম্বর এক্সচেঞ্জ করতে হবে, আর কমন কোন কমিউনিকেটিং ডিভাইস দরকার আমাদের," শেষ কথাটা ও বলেছে টমিকে উদ্দেশ্য করে।

"অবশ্যই, আমি ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা করে রেখেছি," বলে সে চেয়ারের ওপরে রাখা তার ব্যাগের ভেতর থেকে বের করে আনলো একটা গয়নার বাক্সের মতো দেখতে চকোলেট রঙের বাক্স। সেটার ভেতর থেকে সে সবাইকে একটা ছোট এয়ার পিস বের করে দিলো। তানভীরের নির্দেশে সবাই সেগুলো পরে নিলো যার-যার কানে। তানভীরের এয়ার পিসটা টমি নিজেই তার কানে পরিয়ে দিয়ে মৃদু হেসে বলে উঠলো, "বেস্ট অব লাক, স্যার।"

তার দিকে একবার নড করে বাকিদের দিকে তাকিয়ে তানভীর বললো, "চলুন, কাজ শুরু করা যাক। দেখা যাক ভাগ্য আমাদের জন্যে কী অপেক্ষা করিয়ে রেখেছে।"

অধ্যায় চোদ্দ

সময়: ১৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ

পৃথুরা বনভূমি, কন্নোর, ভারতবর্ষ

ভাগ্যের ফেরে কি তবে দাস ব্যবসায়িদের খপ্পরে এসে পড়লো ওরা?

কথাটা মনে হতেই যতোটা না চমকে উঠলো শামান তারচেয়ে অনেক বেশি আতঙ্ক গ্রাস করলো ওকে। সর্বনাশ! ডুকপা লামাকে উদ্ধার করতে এসে শেষ পর্যন্ত না নিজেদের স্বাধীনতা হারাতে হয়। ও বিধুকে ডাক দেয়ার জন্যে পাশ ফিরতেই হঠাৎ থেমে গেল দলটা।

শামান সামনে তাকিয়ে দেখলো দলের অগ্রভাগে থাকা মুখ ঢাকা মহিলা একটা হাত তুলে থামতে বলেছে দলটাকে। দলটা থেমে যেতেই অনুচ্চ স্বরে একটা শিস বাজালো মহিলা। শিসের শব্দটা অনেকটা পাখির ডাক আর সম্বর হরিণের ডাকের মাঝামাঝি। মহিলা শিস বাজানোর একটু পরেই অপর দিক থেকেও একইরকম শিসের আওয়াজ ভেসে এলো।

ওরা এখন যেখানে অবস্থান করছে জায়গাটা একেবারেই ঘন জঙ্গল বললেও কম বলা হয়। চারপাশে বড়-বড় গাছপালা উঠে গেছে মাথার ওপরে। সেইসাথে বড়-বড় কাণ্ঠল গাছের ফাঁকে-ফাঁকে ঘন ঝোপ-ঝাড়ের জঙ্গল। অপর পক্ষ থেকে শিসের শব্দ ভেসে আসতেই ঘন জঙ্গলের একটা অংশ যেন হা হয়ে খুলে গেল। শামান অবাক হয়ে খেয়াল করলো ঝোপঝাড়ের একটা অংশ আলগা হয়ে গেছে, সেইসাথে ওগুলোর ভেতর দিয়ে বেশ চওড়া একটা ফোকরের মতো তৈরী হয়েছে।

“ওরে মারে, এইহাত কিলা দেখলাম, জাদু নি?” তাজ্জব হয়ে বলে উঠলো বিধু। শামান নিজেও কম অবাক হয়নি। পাহাড়ি যোদ্ধা ও, পাহাড়ের খোলা-রুক্ষ উপত্যকায় লড়াই করে অভ্যাস ওর। সমতলের এইসব পথ-জঙ্গলের কাজ-কারবার খুবই অবাক লাগছে ওর কাছে।

দলের অগ্রভাগে থাকা মহিলা দলের বাকিদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করে নিজে ঢুকে গেল সেই ফোকরের ভেতরে। একে-একে বাকিরা অনুসরণ করলো ওদেরকে। শামান-আর বিধুকে পোষা গরু-ছাগলের মতো টেনে নিয়ে ঢোকানো হলো ওটার ভেতরে। ফোকরের অন্যপাশেও একইরকম ঘন জঙ্গল। তবে খানিকটা এগোতেই একটা খালের মতো জলের ধারা দেখতে পেল ওরা। সেই জলের ধারার অন্যপাশে যেন ভিন্ন এক জগৎ। অবাক হয়ে দেখতে লাগলো শামান আর বিধু।

“মায়েরে মা, এ কই আইলা?” বিস্ময় প্রকাশ করতে গিয়ে বিধুর গলা দিয়ে মাতৃভাষা বেরিয়ে আসছে।

"অদ্ভুত," শামানও কম অবাক হয়নি।

সরু খালের মতো জায়গাটার অন্যপাশে জঙ্গল অনেকটাই হালকা, এদিকের মতো এতো ঘন নয়। সেটা কি প্রাকৃতিকভাবে নাকি মনুষ্য নির্মিত সেটা ঠিক বুঝতে পারলো না দূর থেকে, তবে এটা বুঝতে পারলো খালের অন্যপাশেই বিরাট একটা বসতি গড়ে উঠেছে খালের কিনারা ধরে। এর কারণটাও বোঝা যায় খুব সহজেই, জলের চাহিদা পূরণের সহজতম উপায়।

খালের অন্যপাশটা বিরাট আকারের তৃণভূমিতে ছাওয়া। খালের এই পাশে যেমন ঝোপঝাড়ে ছাওয়া জঙ্গল, অন্যপাশটাতে একেবারেই সেরকম নয়। অদ্ভুত এক ধরণের লালচে সবুজ ঘাসে ঢেকে আছে পুরো তৃণভূমি। এর মাঝেই একেবারে মাথা ছাড়িয়ে উঠে গেছে বিরাট-বিরাট গাছ। সেই গাছের ফাঁকে ছোট-ছোট কুটিরের মতো। ওগুলো নিশ্চই ওদের বাসস্থান।

কুটিরগুলোও গড়ে উঠেছে একটা নির্দিষ্ট আদলে, মোটেই এলোমেলো নয়। কয়েকটা কুটির থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখলো শামান। বড়-বড় খয়েরি কাষ্ঠল গাছের ফাঁকে ফাঁকে ধূসর কুঠির, নিচে লালচে সবুজ তৃণভূমি, আর মাথার ওপরে বড়-বড় গাছের সবুজে ছাওয়া অঞ্চল- সবমিলিয়ে মনে হয়না সত্যিকারের কিছু। বরং শামানের চোখে মনে হলো কাপড়ের ওপরে সুতো দিয়ে সেলাই করা ছবির মতো। মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলো ও।

"প্রকৃতি মাতার আর্শিবাদ," আনমনেই বলে উঠলো ও।

"শুধু প্রকৃতি মাতার আর্শিবাদ নয়, মানুষের অপরিসীম পরিশ্রমও বটে," বলে উঠে পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল ঘোড়ায় বসা সেই মহিলা। একটু অবাক হয়ে তার দিকে ফিরে তাকাল শামান। এতোক্ষণ ধরে ওরা বিজাতীয় এক ভাষায় কথা বলছিল। এবরই প্রথম বিশুদ্ধ তিব্বতি ভাষায় কথা বলে উঠেছে মহিলা। মহিলা কথাটা বলে উঠেই খাল পাড়ের দিকে এগিয়ে গেল।

আর আনমনেই গালি দিয়ে উঠলো বিধু, "মাতারির মাতারি, এ দেখি হামারি ভাষায় কথা কয়। তাইলে এতোক্ষণ ইতায় কথা কইলি ক্যান?"

কোন জবাব না দিয়ে ওদের দিকে কড়া দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে সামনের দিকে ফিরে তাকাল। তারপর সামনের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে যাবে তার আগেই তীরন্দাজদের একজন কিছু একটা বলে উঠলো। কঠিন গলায় জবাব দিলো মহিলা। দূর থেকে পরিষ্কার বুঝতে না পারলেও এটা বুঝতে পারলো শামান যে দুজনের ভেতরে বেশ উত্তেজিত বাক্য বিনিময় হচ্ছে। এক পর্যায়ে হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলো মহিলা। তারপর খালের দিকে ফিরে ইশারা করলো অদৃশ্য কারো উদ্দেশ্যে। প্রায় সাথে সাথেই ঘড়-ঘড় একটা শব্দ হতেই চমকে উঠলো বিধু আর শামান।

দুজনেই অবাক হয়ে দেখলো ঘড়-ঘড় শব্দটা শুরু হতেই ভেজা গাছের গুড়ি দিয়ে তৈরী একটা পাটাতনের মতো উঠে এলো জলের নিচ থেকে। ঘোড়াসহ ওদের দলের লোকজন সেই পাটাতনের ওপরে উঠে পাড় হয়ে এলো খালটা। অন্যপাশে আসতেই শামান আরো ভালোভাবে দেখতে পেল এপাশের বসতি।

জায়গাটা ছোটখাট একটা গ্রামের মতো। তবে গ্রাম বললে বাড়িয়ে বলা হবে, শামানের কাছে মনে হলো জায়গাটা কোন বিশেষ একটা গোত্রের বড় কোন পল্লী হবে। ওর ভাবনাটা আরো দৃঢ় হলো মানুষজনের চেহারা দেখে। বসতির বেশিরভাগ লোকজনই দেখতে কাছাকাছি। কালো গায়ের রঙ, মাথায় হালকা কোকড়ানো চুল, আকৃতিতে ছোট-খাট তবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই শক্ত সমর্থ। শামান অবাক হয়ে খেয়াল করলো মানুষগুলো দেখতে কালো হলেও কোথায় যেন তাদের চেহারায় পাহাড়ি এলাকার রুক্ষতা নেই, বরং বেশ মায়াময়।

একটা ব্যাপার শামানকে বেশ অবাক করলো, ওদেরকে ধরে নিয়ে এসেছে যে দল সেই দলে দু-ধরণের চেহারা মানুষ দেখেছিল ও। সেই দুই দলের লোকজনের চেহারা এই বসতির লোকদের সাথে বেশ মিলে, বিশেষ করে সেই দলের তলোয়ারধারীদের সাথে, আর দলের অন্য অংশটার সাথে, বিশেষ করে তীরন্দাজদের দলটার সাথে এদের চেহারা কোন মিল নেই।

ওদের দলটা খালের অন্যপাড়ে এসে বসতিকে একপাশে রেখে হাঁটতে লাগলো। বসতির লোকজর ওদেরকে বেশ অবাক হয়ে দেখছে, পুরুষের সংখ্যা খুবই কম। নিশ্চই দিনের এই সময়ে তারা কাজে বেরিয়েছে। বেশিরভাগই মহিলা আর বাচ্চারা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে শুরু করেছে ওদেরকে।

বিশেষ করে বাচ্চাদের দেখে বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে বিধু, সে হাসি মুখে হাত নাড়ছে অবাক হয়ে থাকা বাচ্চাদের দিকে। শামান হাত বাঁধা অবস্থাতেই নিজের মাথার পেছন থেকে কাপড়ের আলগা অংশটা মাথার ওপরে তুলে দিলো, এমনিতেই এই এলাকার লোকজনের তুলনায় অস্বাভাবিক লম্বা ও, তার ওপরে নিজের অদ্ভুত লাল রঙের চুলের কারণে অযাচিত দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে না। এমনিতেই কোন বিপদে পড়েছে, আসলে কী ঘটছে কিছুই বুঝতে পারছে না, তবে যতোই চারপাশটা দেখছে ও, একটা ধারণা মাথায় পোক্ত হচ্ছে। দেখা যাক সামনে কী অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে।

ওদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া দলটা বসতিকে একপাশে রেখে খালের পাড় ধরে এগিয়ে চললো সামনের দিকে। লোকজনের বসবাসের বাড়ি-ঘর পার হয়ে ওরা চলে এলো একটা ফাঁকা মাঠের মতো জায়গায়। তার সামনে বিরাট একটা তৃণভূমির মাঠ, মাঠের পর ছোট একটা সবুজ টিলা। টিলার অন্যপাশ থেকে আবার শুরু হয়েছে ঘন জঙ্গল। বসতির প্রান্তে মাঠের শুরুতেই একটা বিরাট বাড়ি, এতোক্ষণ বসতিতে দেখে আসা বাঁশ কিংবা কাঠের তৈরী ঝুপড়ি ঘরের মতো না এই বাড়িটা, আকারে বিরাট এটা। বাড়িটার সামনেই সবুজ

তৃণভূমির মাঠ। শামান অবাক হয়ে দেখলো মাঠের অন্যপ্রান্তে জঙ্গলের কিনারায় সারি-সারি কাপড়ের তৈরী ঘর, নিশ্চই এগুলো স্থায়িভাবে বসবাসের ঘর না। ওরা পাহাড়ে জঙ্গলে সাময়িকভাবে বসবাস করতে গেলে যে-ধরণের অস্থায়ি চামড়ার ঘর বানিয়ে থাকে, অনেকটা সেরকমই দেখতে ওগুলো, তবে ওরা পাহাড়ে বসবাসের জন্যে ব্যবহার করে চামড়া অথবা চামড়ার ফালি দিয়ে তৈরী খোলের মতো ঘর, আর এদের তৈরী আকৃতিগুলো কাপড়ের তৈরী আর আকারেও ওদের অস্থায়ি নির্মাণের চেয়ে বড়।

ওদের দলটা সেই বিরাট বাড়ি আর সারি-সারি কাপড়ের ঘরের সামনে এসে থেমে গেল। দলের অগ্রভাগে থাকা মহিলা প্রথমেই তীরন্দাজদের একজনকে ডেকে পাঠিয়ে দিলো কাপড়ের ঘরগুলোর দিকে, তারপর তলোয়ারবাজদের দলের একজনকে পাঠিয়ে দিলো সেই বিরাট বাড়িটার দিকে।

"অইতাছেডা কি, কিছুই তো বুজতাছি না," বিধুকে দেখে মনে হচ্ছে এই প্রথমবারের মতো সে একটু চিন্তিত বোধ করছে। তাই তার মুখ দিয়ে সিংহলি আর তিব্বতি ভাষার মিশ্রিত এক রূপ বেরিয়ে আসছে। "এরা আমগোরে এ্যামনে ধইরাই আনলো ক্যান, আর কি করতে চাইচ্ছে?"

"শান্ত থাকো বিধু, অস্থির হবার কিছু নেই," শামানের মুখে ফুটে উঠেছে মৃদু হাসি। বিধু ওর হাসিমুখের দিকে বোকার মতো তাকিয়ে রইলো। শামানের অবস্থা হয়েছে ঠিক উল্টো। এতোক্ষণ সে মনে-মনে অনেক কিছুই হিসেব করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু এই প্রথমবারের মতো কোথায় যেন ও নিজের হিসেবে একটা গরমিল দেখতে পাচ্ছে। বিশেষ করে এই মাঠের কিনারায় আসার পর থেকে ওর মনের একটা অংশ ভিন্ন কিছুর ইঙ্গিত দিচ্ছে। বিধুকে খানিকটা অভয় দেয়ার জন্যেই ও বিধুর দিকে ফিরে তাকিয়ে সামান্য হেসে উঠলো, "আমার মনে হয়..." ওর মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল তার আগেই কেউ একজন ধমকে উঠলো চুপ থাকার জন্যে। শামান মুখ তুলে দেখলো সেই কালো মুশকো, ঘুসি খেয়ে যার নিচের ঠোঁট ফেটে গেছে। "এই চুপ থাক, রাজা মশাই আইছে," বলে সে ওদেরকে টেনে দলের একেবারে অগ্রভাগে নিয়ে এলো।

শামান তাকিয়ে দেখতে পেল সেই বিরাট বাড়িটার ভেতর থেকে ছোট- খাট একটা সৈন্যবাহিনীর মতো দল বেরিয়ে এসেছে। তাদের অগ্রভাগে সাদা কাপড়ের ঘের দেয়া পোশাক পরা কালো দেখতে একজন ছোট-খাট মানুষ। তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে এই দলের নেতা সে। মানুষটার গায়ের রঙ কালো কিন্তু তার বাকি সবকিছু একেবারেই সাদা, পরণের পোশাক, মাথার চুল, মুখের ছাগুলে দাড়ি সব। আর ক্রমাগত হাসতে থাকার কারণে তার মুক্তার মতো সাদা দাঁতও চোখে পড়ছে।

মানুষটা মাঝখানে হাঁটছে, তার সাথে আরো দুয়েকজনকে দেখা গেল কাছাকাছি পোশাক পরণে তারই সাথে হাঁটতে, অন্যদিকে তাদেরকে দুইপাশ থেকে পাহারা দিয়ে নিয়ে আসছে দুই সারিতে সুসজ্জিত তলোয়ারধারী সৈন্যদের দল। মানুষটা আরেকটু এগিয়ে আসতেই

ওদের দলের অগ্রভাগে থাকা সেই মহিলা ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে গেল তার দিকে, মুখ থেকে মুখাবরণ সরিয়ে রাজার সামনে গিয়ে মাথা ঝুকিঁয়ে আভিবাদন করলো। শামান অবাক হয়ে খেয়াল করলো রাজা দুই হাত বাড়িয়ে সেই মহিলার মুখটা ধরে ফেললো। তার বেশ ¯স্নেহের সাথে তার কপালে চুম খেলো। আর তখুনি মহিলা শামানের দিকে ফিরে তাকিয়ে কিছু একটা বলে উঠলো রাজাকে। দূরে থাকায় সেটা শুনতে পেল না শামান। তবে এই প্রথমবারের মতো মহিলার মুখের দিকে তাকাতেই বেশ খানিকটা ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল ও।

সেই জঙ্গলের পথে সাজানো ডাকাতির ঘটনার সময় থেকেই মহিলার মুখ কাপড়ের আবরণে ঢাকা ছিল তাই তার চেহারা দেখতে পায়নি ওরা কেউই। শুধুমাত্র তার গলার স্বর আর ভয়ঙ্কর আগ্রাসি নেতৃত্বই দেখে এসেছে এতোক্ষণ, তাই প্রথমবারের মতো মুখটা দেখতে পেয়ে খুব অবাক হলো শামান।

প্রথমেই মনে হলো, ওর সামনে থাকা মেয়েটার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি হবে না কোনভাবেই। আগের দিনের সন্ধ্যের রান্না করার চুলার ধূসর ছাইয়ের মতো হালকা শ্যামবর্ণের একটা মুখ, তাকে যেন শিল্পীর দক্ষতা নিয়ে বসানো নিখুঁত একটা তিলফুলের মতো নাক, তার দুই পাশে ধবধবে সাদা জমিনে অপূর্ব সুন্দর দু-টুকরো ধূসর চোখের মণিতে যেন প্রকৃতির সমস্ত মায়া আর কাঠিন্য একসাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। শামানের মুগ্ধ দৃষ্টি বেশিক্ষণ স্থির রাখতে পারলো না তার চোখ-মুখের দিকে, তার আগেই মাঠের অন্য প্রান্ত থেকে ভেসে আসা চিৎকার চেঁচামেচির কারণে সেদিকে ফিরে তাকাল ওরা সবাই।

মাঠের অন্য দিকের সেই সারি-সারি কাপড়ের ঘরগুলো থেকে বেরিয়ে এসেছে একদল লোক। হইহল্লা করতে-করতে তারা এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। লোকগুলোকে দেখে শামানের মুখে পুরনো হাসিটা ফিরে এলো। মনে-মনে ও এতোক্ষণ যা হিসেব করছিল সেটা এবার পুরোপুরি মিলতে শুরু করেছে।

অন্যদিক থেকে এগিয়ে আসতে থাকা লোকগুলোর চেহারা-আকৃতি-গায়ের রঙ সবই আগের মানুষদের থেকে একেববারেই ভিন্ন। এরা লম্বা, গায়ের রঙ ঠিক যতোটা পরিষ্কার এদের পোশাক-আশাক ঠিক ততোটাই নোংরা। যারা এগিয়ে আসছে তাদের নেতৃত্বে আছে, লম্বা অল্প বয়স্ক এক লোক, তার সাথে বিশ-পঁচিশজনের একটা দল। প্রত্যেকের হাতে তীর ধনুক। হইহল্লা করতে করতে করতে ওরা এগিয়ে এলো ওদের দিকে। ওদের দলের অগ্রভাবে অবস্থানরত সেই সাদা পোশাকের কালো রাজার সামনে এসে থেমে গেল দলটা। দুইদলের ভেতরে অভিবাদন বিনিময় হতে দেখলো শামান। সামান্য কথোপকথনের পর দুইদলের লোকজনই ফিরে তাকাল ওদের দিকে।

বহুক্ষণ চুপচাপ থাকলেও এতোক্ষণে নিজের ধৈর্য হারালো শামান। জোর কদমে এগিয়ে যেতে শুরু করলো সামনের দিকে। ওকে বেঁধে রাখা দড়িটা যার হাতে ছিল, সে ওটা

টেনে ধরতেই গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে একটা চপেটাঘাত বসিয়ে দিলো তার মুখে, চড় খেয়ে তাজ্জব হয়ে থাকা লোকটার হাত থেকে দড়িটা ছুটিয়ে নিয়ে ও এগিয়ে গেল সামনের দিকে। দুই বাহিনীর লোকজনই সচকিত হয়ে উঠতেই সেই ধূসর সুন্দরি একটা হাত তুলে থামতে বললো সবাইকে।

ওদের সামনে গিয়ে একবার মাথা নেড়ে ও রাজাকে উদ্দেশ্য করে। "হ্যাঁ, ওদেরকে থামতে বলাই সবার জন্যে ভালো হবে, কারণ যথেষ্ট ধৈর্য ধরেছি আমি। আপনাদের এলাকায় মেহমানকে এভাবেই আপ্যায়ন করেন নাকি আপনারা?" বলে ও একে-একে দুই বাহিনীর প্রধানের দিকে দেখলো তারপর ফিরে তাকাল সেই ধূসর সুন্দরির দিকে।

মেয়েটা চিবিয়ে-চিবিয়ে বলে উঠলো, "তুমি মেহমান! কে বলেছে-"

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে কথা বলে উঠলো শামান, "আমার যদি ভুল না হয় তবে আপনি," বলে ও সেই সাদা রাজাকে দেখালো, "থারু বংশীয় গোত্রের প্রধান, আর আপনি," বলে সে দ্বিতীয় বাহিনীর প্রধান লম্বা লোকটাকে দেখিয়ে বলে উঠলো, "আপনি হলেন বৌদ্ধ বংশভুত শাক্য গোত্রের প্রধান। আপনাদের খোঁজেই আমি আর বিধু," বলে সে বিধুকে দেখালো। "আমরা লামা নোরবুর নির্দেশে ডুকপা লামাকে খুঁজে বের করতে এসেছি। ঠিক কিনা?"

ওর প্রশ্নের জবাব দিলো না কেউই। শামানই বলতে লাগলো আবারো, "কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমরা এসেছি আপনাদের সাহায্য করতে তবে এই ছল-চাতুরির কী দরকার ছিল? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, থারু আর শাক্য দুই শত্রু গোত্র একসাথে হলো কিভাবে?"

দুইদলের সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে শামানের দিকে। আর শামান মনে-মনে আশা করছে ওর অনুমান ঠিক হলেই হয়। মুহূর্তের জন্যে সব স্থবির হয়ে রইলো। তারপর সেই সাদা রাজা হেসে উঠলো, একবার ধূসর সুন্দরি আর তীরন্দাজ বাহিনীর প্রধানের দিকে তাকিয়ে সে ফিরে তাকাল শামানের দিকে। "আমার ধারণা আমাদের অনেক কিছু আলোচনা করতে হবে। তাই যতো দ্রুত শুরু করবো আমরা ততোই ভালো," বলে সে মুক্তোর মতো সাদা দাঁত দেখিয়ে আবারো হেসে উঠলো কিন্তু তার হাসিতে যোগ দিতে পারলো না শামান।

অধ্যায় পনেরো

বর্তমান সময়

সুনামগঞ্জ রোড, আখালিয়া, সিলেট

বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার পথে পুরনো স্মৃতিগুলো রোমন্থন করতে-করতে আনমনেই হেসে উঠছিল তানভীর।

তবে স্মৃতিকাতরতার বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে; তিক্ত-মিষ্টি-গভীর-হালকা। কিন্তু তানভীরের কাছে এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে ওর স্মৃতিকাতরতা অত্যন্ত মিশ্র প্রকৃতির। ওদের গাড়িটা আম্বরখানা থেকে রওনা দিয়ে এখন আখালিয়া বিডিআর ক্যাম্প পার হচ্ছে।

মাইক্রোর জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে তানভীরের বার-বার শুধু স্মৃতির ঝাঁপি উপচে উঠতে চাইছে। দীর্ঘ পাঁচ বছরের বেশি সময় আম্বরখানা থেকে ভার্সিটি গেট পর্যন্ত কত অসংখ্যবার যাতায়াত করতে হয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। কতো অসংখ্য স্মৃতির পসরা সাজানো আছে এই রাস্তার প্রতিটি মোড়ে-মোড়ে। সুবিদ বাজার, মদিনা মার্কেট, সুরমা এসব এলাকাগুলোতে কখনো আড্ডা কখনো ক্লাসের প্রয়োজনে ছুটতে থাকা, কখনো রেস্টুরেন্টে খাওয়া কতো-কতো স্মৃতি। একেকটা এলাকা পার হচ্ছে আর একেক ধরণের স্মৃতির ঝাঁপি খুলে যাচ্ছে।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তেই ও আনমনে হেসে উঠলো। ও যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে তখন কোন এক সিনিয়র ভাই বলেছিল; বিশ্ববিদ্যালয় জীবন হলো রাজার জীবন। পৃথিবীতে সত্যিকার অর্থে যদি কোন রাজার জীবন থেকে থাকে তবে সেটা হলো বিশ্ববিদ্যালয় জীবন। এই জীবনের মতো এরকম আনলিমিটেড স্বাধীনতা আর কোথাও নেই। চাইলে এ-থেকে একজন মানুষের পক্ষে পৃথিবীর সর্Ÿোচ্চ লেভেলে যাওয়া যেমন সম্ভব, আবার চাইলে সর্বনিম্ন লেভেলেও নামা সম্ভব। কে কোনটা বেছে নিবে, সেই সিদ্ধান্ত তার।

কথাটা মনে পড়তেই তানভীর মৃদু হেসে উঠলো। ও কোথায় গেছে আর কোথায় যাচ্ছে নিজেও জানে না। মাঝে মাঝে ভাবলে মনে হয় কোন এক তাড়নার স্রোতে যেন অসীমের পানে ছুটে চলেছে প্রতিনিয়ত। তিক্ত এক ঘটনায় সেই যে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়লো তারপর থেকেই যেন শুরু হয়েছে সেই দাবড়ানি। এর শেষ কোথায় কে জানে। মিষ্টি-মধুর স্মৃতিগুলোকে হটিয়ে দিয়ে সেই তিক্ত স্মৃতি যেন ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে ওর ওপরে। পাশ ফিরে তাকাল তানভীর।

লম্বা সিল্কি চুলগুলো টেনে পেছনে বেঁধে সেগুলোর ওপরে একটা কালো সানগ্লাস চাপিয়েছে সুলতান। গাঢ় সানগ্লাসের ভেতরে তার চোখ যে আসলে কোনদিকে তাকিয়ে আছে, আর কী ভাবছে সেটা বোঝার কোন উপায়। ঠিক আগের মতোই মেরুদন্ড সোজা আর মাথা উঁচু করে বসে আছে সে।

নিজের তিক্ত স্মৃতিগুলোকে দূর করার জন্যেই হঠাৎ কথা বলে উঠলো তানভীর। "সুলতান, কিছু মনে না করলে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি।"

"স্যার, আপনি আমার অথরিটি। অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন," চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে তানভীরের দিকে ফিরে তাকাল। মেয়েটার চোখের রঙ হালকা পিঙ্গল এই প্রথমবারের মতো খেয়াল করলো তানভীর। তার চোখের দিকে তাকিয়েই ও জানতে চাইলো, "না মানে, ঠিক প্রফেশনাল কোন প্রশ্ন নয়।"

"বলুন স্যার। কোন সমস্যা নেই।"

"আপনি, মানে আপনার নাম সুলতান। একজন মেয়ের জন্যে খুবই অদ্ভুত নাম এটা। তার ওপরে আপনি ফোর্সের একজন প্রফেশনাল শ্যুটার। এই ব্যাপারটাও খুবই আনইউজুয়াল, মানে আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে," তানভীর একটু অস্বস্তির সাথে বললো কথাগুলো।

"স্যার, আপনার প্রশ্নটা?" সুলতানের চোখে কোন ভাব নেই। কোন অস্বস্তিও নেই। সে খুবই স্বাভাবিক গলায় তার পয়েন্টে ফোকাস করার চেষ্টা করছে।

"না মানে, আপনি এই লাইনে এলেন কিভাবে?" সুলতানের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তানভীরের মনে হলো ও যেন দু-টুকরো পিঙ্গল রঙের পাথরের দিকে তাকিয়ে আছে।

একটু ব্যক্তিগত প্রশ্ন বলেই কিনা কে জানে সুলতান একবার কাঁধ ঝাঁকালো উত্তর দেয়ার আগে। কিন্তু সে যখন কথা বলতে শুরু করলো গলায় কোন ভাব নেই।

"স্যার, আমার নামটা পাশা স্যারের দেয়া। আমার পুরো নাম আসলে ফারজানা বিনতে সুলতান। আমার বাবা আর মায়ের মধ্যে প্রেম ছিল। তারা দুজনে বাড়ি থেকে পালিয়ে বিয়ে করে। মূলত আমার মা-ই বাবার ডাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল। আমার মাকে বাড়ি থেকে বের করে এনে বিয়ে করে কিছুদিন সংসার করে আমার বাপ," বাক্যের শেষ শব্দটা উচ্চারণের সময়ে তার গলা শক্ত শোনালো। "তারপর একদিন আমার মাকে দেশের সবচেয়ে বড় পতিতা পল্লী টানবাজারে বিক্রি করে দেয়। আসলে এটাই ছিল আমার বাবার পেশা। বিভিন্ন জায়গা থেকে সহজ-সরল মেয়েদেরকে ফুঁসলিয়ে এনে পতিতা পল্লীতে বিক্রি করতো সে। টান বাজারের পতিতা পল্লীতেই আমার জন্ম, ওখানেই বেড়ে ওঠা। আমার বয়স যখন দশ তখন পতিতা পল্লীতে একদিন নিজের দল নিয়ে রেইড দিতে আসেন এক পুলিশ অফিসার। আমি তাকে বলি আমি এই নরকে থাকতে চাইনা। আমাকে ওখান থেকে বের করার জন্যে হাতে-পায়ে ধরি তার। কারণ আমি বুঝতে পারছিলাম অরেকটু বড় হলেই আমাকেও দেহ ব্যবসায় নামতে হত," সুলতান একেবারেই আবেগহীন গলায় বলে চলেছে।

এই পর্যন্ত বলে সুলতান একবার মাথা নাড়লো। "কোন এক অদ্ভুত কারণে সেই অফিসার আমাকে তার সাথে নিয়ে যান। ওখান থেকে নিয়ে আমাকে নতুন নাম-নতুন পরিচয় দিয়ে

নিজের বাসাতেই আমাকে থাকার ব্যবস্থা করে দেন," সুলতান মৃদু হসলো। "জন্মের পর থেকে আমি মানুষের কদর্য চেহারাটাই শুধু দেখেছি। এই মানুষটার সংস্পর্শে এসে জানতে পারলাম মানুষের আদলে দেবতারা আসলে এই মর্তের পৃথিবীতেই বাস করে। কিছুদিন পর সেই মানুষটা আমাকে একটা বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। আমার সব খরচও উনিই চালাতেন।"

"তবে আমি পড়ালেখায় মোটেই ভালো ছিলাম না। খুবই খারাপ রেজাল্ট নিয়ে কোনমতে এইচএসপি পাশ করার পর এই মানুষটাই আমাকে পুলিশে ঢুকিয়ে দেন। সেখানে ঢুকে আমি এক নতুন নিজেকে আবিষ্কার করি। পিস্তল আর বন্দুক হাতে পেলে আমি যেন পাগল হয়ে যাই। গুলি চালানোতে আমার প্রতিভা অপরিসীম। এই প্রতিভাকে অনুশীলন করতে করতে আমি রীতিমতো শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যাই। ওখান থেকেই আমার প্রমোশন হয়। বিদেশে শুটিঙের ওপরে ট্রেনিং নেই কয়েক দফা। সেই অফিসার যিনি আমাকে ওই নর্দমা থেকে তুলে এনেছিলেন উনার সাথে একবার এক অপারেশনে গেলে উনি খুব আহত হন। আমরা ভেবেছিলাম উনি মারাই যাবেন। তীব্র আহত অবস্থায় আমরা যখন তাকে মেডিকেল সেন্টারে নিয়ে যাচ্ছিলাম তখন উনিই আমাকে জানান কেন উনি সেদিন আমাকে সেই নরক থেকে তুলে এনেছিলেন। উনার আপন বড় ভাই আর ভাতিজি ছিল। যারা বিদেশে অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। আমি নাকি দেখতে অনেকটা উনার ভাতিজির মতো। উনার ভাতিজির নাম ছিল ফারজানা আর উনার ভাইয়ের নাম ছিল সুলতান। তাই উনি সেদিন ওখান থেকে আমাকে তুলে এনে উনার ভাই আর ভাতিজির নাম দিয়ে আমাকে এক নতুন জীবন দিয়েছিলেন। উনার কারণেই আমি আজ এখানে," সুলতানের শুষ্ক গলায় কি খানিকটা আবেগের আভাস কিনা ঠিক বুঝতে পারলো না তানভীর।

"মানুষটা নিশ্চই পাশা স্যার?" তানভীর বলে উঠলো। "মানে সেই অফিসার?"

সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালো সুলতান।

"আপনি আর ওখানে কখনো ফিরে যাননি, মানে আপনার মায়ের কাছে?" ইচ্ছে করেই জায়গাটার নাম উহ্য রাখলো তানভীর।

"আপনি টান বাজারের কথা বলছেন?" সুলতান সরাসরি তানভীরের চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো। তানভীর আলতো মাথা নাড়লো।

"পুলিশ হবার পর প্রথমেই আমি ওখানে গিয়েছিলাম, আমার মায়ের খোঁজ করতে। গিয়ে জানতে পারি এর আগের বছর উনি জরায়ুর ক্যান্সারে মারা গেছে। তবে ওখানে গিয়ে বিরাট একটা উপকার হয়েছে। আমার তথাকথিত বাপের একটা পুরনো ছবি খুঁজে পেয়েছি। এখন তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি। কোনদিন খুঁজে পেলে আমার এই দুই ঘোড়া পিস্তল দিয়ে," বলে সে নিজের হোলস্টারে রাখা বিরাট আকারের পিস্তলদুটো দেখালো। "ব্যাটার দুটো বিচিই উড়িয়ে দিবো," বলে সে একটু থেমে যোগ করলো। "সরি স্যার, বাজে ভাষা ব্যবহার করার জন্যে। কিছু মনে করবেন না, ব্যক্তিগত কথা বলতে-বলতে

অনেক বেশি বলে ফেলেছি,” কথা শেষ করে সে আবারো সানগ্লাস চোখে পড়ে নিয়ে সামনে ফিরে তাকাল।

তানভীর হাত নেড়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই সামনে ড্রাইভারের পাশের সিট থেকে সাব-ইন্সপেক্টর ইকবাল বলে উঠলো, “স্যার ভার্সিটি গেটের কাছাকাছি চলে এসেছি। আমরা কি সোজা ভার্সিটির ভেতরে চলে যাবো?”

তানভীর জানালার কাঁচ নামিয়ে দিলো। সেই ভার্সিটি গেট; কতো আন্দোলন, কতো ঝগড়া, ভালোবাসা আর আড্ডার পসরা। ও মনোযোগ দিয়ে দেখলো ভার্সিটি গেটে ওর জুনিয়রেরা মিলে একটা ক্যাফে দিয়েছিল। নাম ছিল ‘জাহাজি’। শিরোনামহীনের বিখ্যাত গান ‘জাহাজি’ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ক্যাফেটার নাম দিয়েছিল ওরা। এখনো ওটা আছে কিনা দেখার জন্যে জায়গাটার দিকে ফিরে তাকাল ও। কোন ক্যাফে চোখে পড়লো না বরং আর দশটা ভাতের হোটেলের আদলে একটা রেস্টুরেন্ট চোখে পড়লো। তবে জাহাজি লেখা সেই সাইনবোর্ডটা এখনো আছে।

সময়ের স্রোত বড়ই খারাপ জিনিস। এই স্রোতে পড়ে জাহাজিরা হয়ে যায় কর্পোরেট অফিসার, আর ক্যাফে হয়ে যায় ভাতের হোটেল। সাপ্লাই আর ডিমান্ডের এই পৃথিবীতে ‘জাহাজি’দের আবেগের স্থান নেই কোথাও। “গাড়ি ভার্সিটির ভেতরে নিয়ে যাও। আমরা সোজা ডি বিল্ডিঙে যাবো। আগে ডক্টর মিতায়নের অফিসটা সার্চ করতে হবে।”

গাড়ি ভার্সিটি গেটের কাছে স্লো করেছিল, ও নির্দেশনা দিতেই ওটাকে ঘুরিয়ে ভার্সিটি গেটের ভেতর দিয়ে এক কিলো পথে প্রবেশ করলো ওদের মাইক্রো।

শাবিপ্রবি গেট থেকে ভার্সিটির ভেতরের গোল চত্বর পর্যন্ত রাস্তাটা ঠিক এক কিলোমিটার। আর এ-কারণেই এটাকে বলে ‘এক কিলো পথ’।

বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব একটা কালচারাল অ্যাসেট থাকে। যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে টিএসসি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শাটল ট্রেন, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ক্যাম্পাসের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ব্রহ্মপুত্র নদী। ঠিক তেমন শাবিপ্রবির অন্যতম অ্যাসেট এই এক কিলোমিটার পথ। শাবি ক্যাম্পাসে প্রতি মুহূর্তে হাজারো গল্প রচিত হয়ে চলেছে সবুজে ঘেরা অনিন্দ্য সুন্দর এই এক কিলো পথে। সুখের গল্প, দুঃখের গল্প, বন্ধুত্বের গল্প, হাজারো ভালোলাগা-মন্দ লাগা আর প্রেমের গল্প। আজ থেকে বেশ ক’বছর আগে এই এক কিলো পথেই তেমনি একটা গল্প রচিত হয়েছিল তানভীরের জীবনে।

অধ্যায় ষোল

সময়: ১৮০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ

পৃত্থুরা বনভূমি, কন্নোর, ভারতবর্ষ

হাতের লাল হয়ে ওঠা জায়গাটা ডলতে-ডলতে শামান ভাবছে, কাহিনী কি এদের ভেতরে?

কি দড়ি দিয়ে বেঁধেছিল ব্যাটারা কে জানে জায়গাটা কেমন জানি চুলকাচ্ছে ওর। পাশ ফিরে তাকাল বিধুর দিকে। ও ভেবেছিল বিধুও মনে হয় বিরক্ত হয়েছে ওরই মতো কিন্তু অবাক হয়ে দেখলো এসব বিরক্তি-ব্যথা কোনদিকেই বিধুর খেয়াল নেই, সে বরং পরম মমতার সাথে হাত বুলাচ্ছে নিজের ধনুকের গায়ে। শামান হাতটা ডলে সামনে ছোট একটা চারপায়ার ওপরে রাখা নিজের তলোয়ার আর ছুরিটা তুলে নিয়ে সেটা নিজের পিঠে চড়িয়ে দিয়ে রাগের সাথে সপাটে টেনে লাগিয়ে নিলো ওটার বন্ধনি। জোড়া তলোয়ারটা পিঠের ওপরে আর ছুরিটা কোমরে গুঁজে নিতেই নিজেরে পুরনো বল যেন ফিরে এলো আগের মতো।

ওরা এই মুহূর্তে অবস্থান করছে থারু রাজা মানরুর বাড়ির সামনে সেই তৃণভূমির কিনারে বেশ সুন্দর একটা সাজানো বাগানের ভেতরে। একদিকে থারু রাজা বসেছে, তার সাথেই অবস্থান করছে তার বাহিনীর লোকজন। সেই ধূসর চোখের সুন্দরিও দাঁড়িয়ে আছে ওদের সাথেই, শামান আড়চোখে রাগের সাথে একবার দেখলো তাকে।

ওদের বিপরীত দিকে বসেছে শাক্যদের রাজা শঙ্করাদিত্য, তার সাথেও অবস্থান করছে তার বাহিনীর ছোট একটা দল। আর দুই দলেরই একরকম বলতে গেলে মধ্যমণি হয়ে অবস্থান করছে শামান আর বিধু।

একটু আগে ওদেরকে এখানে নিয়ে আসার প্রায় সাথে-সাথেই শামান যখন থারু আর শাক্যদের ব্যাপারে কথা বলে ওঠে সেই ধূসর চোখের সুন্দরি রাগের সাথে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই সাদা পোশাক পরা বয়স্ক থারু রাজা হেসে উঠে ওদেরকে অভিবাদন জানায়। প্রায় সাথে সাথেই তার নির্দেশে ওদের বাঁধন খুলে দিয়ে ওদের সবাই এনে বসানো হয় সেই তৃণভূমি আর রাজার বাসভবন সংলগ্ন বাগানে। ওরা বসার সাথে সাথেই ওদের অস্ত্র ফিরিয়ে দেয়া হয়। অস্ত্রটা তুলে নিয়েই শামান প্রশ্ন করে জানতে চায় তাদের সাথে এমনটা কেন করা হলো। “কি ব্যাপার সবাই চুপ কেন? জবাব দিন, মেহমানদের সাথে কি আপনারা সবসময়ই এমন ব্যবহার করেন নাকি?”

“মেহমান যে আদৌ মেহমান সেটা তো আগে বুঝতে হবে নাকি?” অন্য কেউ শামানের জবাব দেয়ার আগেই কড়া গলায় কথা বলে উঠলো ধূসর সুন্দরি। শামান মুখ ফিরিয়ে

তাকাল তার দিকে। "মেহমানকে যথাযথ সম্মান দিতে না পারলে তাকে আমন্ত্রণ জানানোই উচিত নয়, কি বলেন? আর আপনারা..."

"কিসের মেহমান কিসের প্রয়োজন, আপনারা নিজেদের এলাকা ছেড়ে আমাদের এখানে পাড়ি জমিয়েছেন নিজেদের প্রয়োজনে, মোটেই..."

"সবাই চুপ," বেশ জোরেই দুই হাত তুলে ধমকে উঠলো থারু রাজা মানরু। মানুষটা ছোট-খাট হলেও তার গলায় বেশ জোর, কথা বলার ধরণও খুবই কৃর্তত্ব পরায়ণ। সবাইকে থামিয়ে দিয়ে সে বলে উঠলো, "আমরা সবাই এখানে যার-যার প্রয়োজনেই এসেছি, তবে," বলে সে আবারো একটা হাত তুললো। "আমাদের মূল উদ্দেশ্য নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি অন্যদের সাহায্য করা," বলেই সে একটু থেমে যোগ করলো, "আমাদের উদ্দেশ্য হবে যতো দ্রুত সম্ভব এই এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনা।"

"বাবা, আমরা চিরকাল সে-চেষ্টাই করেছি, কিন্তু সবাই আসলে শান্তি চায়না," ধূসর সুন্দরির কথা শুনে একটু অবাক হয়েই তার দিকে ফিরে তাকাল শামান। সে ভেবেছিল এই মেয়েটা রাজা মানরুর যোদ্ধা বাহিনীর অংশ তবে সে যে রাজার মেয়ে হতে পারে সেটা ওর চিন্তা-ভাবনায় একবারও আসেনি। ধূসর সুন্দরি একইরকম ঝাঁঝের সাথে বলে চলেছে। "কিছু মানুষ আছে যারা আসলে শান্তির ধর্ম পালন করলেও বাস্তব জীবনে শান্তির পথে চলতে একেবারেই নারাজ। এসব মানুষেরা শান্তিকে ভয় পায়। আর তাই-"

"কালন্তি, চুপ। মেহমানদের সাথে এভাবে কথা বলতে নেই," রাজা মানরু ধমকে উঠলো ধূসর সুন্দরিকে। "অন্যরা যা খুশি করুক আমরা শান্তি চাই, সেটাই সবচেয়ে বড় কথা। আর এই জনপদে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে যা-যা করা প্রয়োজন আমি সেটা করতে চাই, এবং করবোই।"

"রাজা মানরু," অন্যপাশ থেকে খুব ভারি গলায় বলে উঠলো সেই তীরন্দাজ বাহিনীর প্রধান। "আমরা আপনার সাহায্য প্রার্থী সেটা ঠিক আছে কিন্তু এভাবে কথায়-কথায় যদি আমাদের পুরনো ইতিহাস টেনে এনে আমাদেরকে হেনস্থা করা হয় তবে ব্যাপারটা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়," বলে সে একটা আঙ্গুল তুললো। "রাজা মানরু, আপনি ও আপনার গোত্রের লোকদেরকে একটা ব্যাপার বুঝতে হবে যে আমাদের ভেতরে একটা চুক্তি হয়েছে। সেই চুক্তির সম্মান যদি আমরা বা আপনারা ভঙ্গ করি-"

"কিসের চুক্তি?" হঠাৎ নিজের অবস্থান থেকে সামনে এগিয়ে এসে কোমর বন্ধনির সাথে আটকানো চাবুকটা খুলে শূণ্যের ওপরে দুইবার সাঁই-সাঁই করে চালিয়ে দিলো সেই ধূসর সুন্দরি। তার চাবুকের ডগাটা আরেকটু হলে শাক্য রাজার মুখে গিয়ে লাগতো। "খুনিদের সাথে আবার চুক্তি কিসের। আমরা চুক্তি করলেই সেটা যে তোমাদের মতো খুনির দল ভঙ্গ করবে না-" বলে সে আবারো চাবুক চালাতে যাচ্ছিলো তার আগেই শামান ধমকে উঠলো।

“সবাই চুপ,” নিজের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে শামান। “একদম চুপ। যার-যার জায়গায় বসুন। যদি নিজের অতিথিদের প্রতি বিন্দুমাত্র সম্মান থেকে থাকে তবে এইবারের মতো অন্তত আমার কথা শুনুন। আপনারা যা-ই বলেন এখন পর্যন্ত বহু রাজার অধীনে যুদ্ধ করেছি আমি ও আমার বাহিনী। আজ পর্যন্ত শুধুমাত্র তাদেরকেই বিজয়ী হতে দেখেছি যারা নিজেদের সহযাত্রিদের সাথে একমত ছিল। বিভক্ত মানুষেরা কখনোই বিজয়ী হতে পারে না। বিশ্বাস করুন কথাটা আমি জেনে-বুঝে বলছি। যদিও আমি এখনো পরিষ্কার জানি না এখানে আসলে কী হয়েছে আর কী হচ্ছে, তবে এটা বলে দিতে পারি; সঠিক পরিকল্পনা আর দক্ষ পরিচালনা দ্বারা অসম্ভব কোন কাজ নেই পৃথিবীতে। কাজেই আগে আমাকে বলুন এখানে আসলে কী হয়েছে। তবে তার আগে আমার মনে হয় আমাদের প্রত্যেকের নিজেদের পরিচয় বিনিময় করা উচিত।”

বলে শামান একটু থেমে যোগ করলো, “আমি শামান, তিব্বতের লাপাঙ গোত্রের যোদ্ধা, যদিও এখন আমি নিজের দল পরিচালনা করি, তবে আমার প্রাথমিক যুদ্ধ অভিজ্ঞতা লাপাঙদের সাথেই ছিল। আর ও বিধু, দক্ষ তীরন্দাজ, আসাম-ত্রিপুরা আর সিংহল রাজার সেনাবাহিনীতে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে ওর। তবে এই মুহূর্তে আমার সাথে আছে ও। আমরা দুজনেই তিব্বতের শান্তির মঠের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শ্রমণ লামা নোরবুর অনুরোধে ডুকপা লামাকে খুঁজতে এসেছি।”

“আপনাদের পরিচয় নিয়ে আমাদের আর কোন সংশয় নেই, বিশেষ করে আপনার ওই লাল চুলই আপনার পরিচয় প্রকাশ করছে। লাল চুলের তিব্বতি যোদ্ধা আর তার দলের নাম শোনেনি এমন কেউ নেই এই অঞ্চলে। তবে আমার প্রশ্ন হলো, স্রেফ আপনারা দুজন এসেছেন?” রাজা মানরু সরু চোখে প্রশ্ন করলো।

“হ্যাঁ, আমরা দুজনেই এসেছি। কিন্তু একটা ব্যাপারে প্রশ্ন না করলে আমার মনের অস্বস্তি দূর হচ্ছে না, আপনারা যদি আমাদের পরিচয়ের ব্যাপারে এতোই নিশ্চিত হন তবে আমাদেরকে এভাবে ফাঁদ পেতে ধরলেন কেন? অতিথিদের সাথে এ-কেমন ব্যবহার, তাও আবার যে-অতিথি আপনাদেরকে সাহায্য করতে এসেছে।”

“সত্যি কথা হলো, আপনারা সমতলে অবগাহন করার পর-পরই আমরা আপনাদের ওপরে নজর রাখতে শুরু করি কিন্তু এমনকি আপনার লাল চুল দেখার পরও আমরা আপনাদের পরিচয় নিয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছিলাম না। কারণ লামা নোরবু আমাদেরকে যে-খবর পাঠিয়েছিলেন তাতে বলা হয়েছিল দক্ষ ও সুসজ্জিত যোদ্ধাদের একটি দল আসবে ডুকপা লামাকে উদ্ধার করতে, যার নেতৃত্বে থাকবে লাল চুলের এক যোদ্ধা। কিন্তু আপনারা সমতলে নামার পর স্রেফ দুজনকে দেখে আমরা খুবই অবাক হয়ে যাই। সে-কারণেই আপনাদের পরিচয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হবার প্রয়োজন ছিল।”

“এ-কেমন ব্যাখ্যা হলো! আমি বুঝলাম না। তবে আপনাদের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী এই কারণে যে আমার পক্ষে আসলে পুরো দল নিয়ে এখানে আসাটা সম্ভব ছিল না। কারণ

লামা নোরবু আমাকে যখন খবর পাঠায় তখন শুধু আমাকে দেখা করার নির্দেশ দিয়েছিল সে। আর নোরবুর নির্দেশে এখানে আসার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর আমার পক্ষে দলকে খবর পাঠিয়ে নিয়ে আসাটা সম্ভব ছিল না। কারণ তাতে অনেক দেরি হয়ে যেত। আমি যতো দ্রুত সম্ভব এখানে পৌছে পরিস্থিতি বুঝতে চাচ্ছিলাম। যেটা আপনারা এখনো আমাকে ব্যাখ্যা করেননি।”

রাজা মানরু একবার তার মেয়ের দিকে তাকাল। ধূসর সুন্দরি কাঁধ ঝাঁকালো একবার। রাজা ফিরে তাকাল শাক্য বাহিনীর প্রধানের দিকে। শাক্যদের প্রধানও তার দিকে সামান্য মাথা নাড়লো। তারপর সেই প্রথম শুরু করলো। “আমার নাম শঙ্করাদিত্য, বর্তমানে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বি শাক্য গ্রোত্রের ভারপ্রাপ্ত প্রধান আমি। ও জাথুরিয়া, বলে সে তার তীরন্দাজ বাহিনীর অগ্রভাগে থাকা শুকনো লম্বা কালো পোশাক পরা একজনকে দেখালো। “জাথুরিয়া, শাক্যদের প্রধান সেনাপতি হিসেবে কর্মরত আছে এই মুহূর্তে।”

“আমি তো নিজের পরিচয় আগেই দিয়েছি এক দফা, তাও বলছি, আমি রাজা মানরু, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বি থারু গোত্রের প্রধান। আমার দ্বিতীয় সেনাপতি কালন্তি, পারিবারিক সম্পর্কে ও আমার মেয়ে,” বলে সে ধূসর চোখের সুন্দরি কালন্তির দিকে ইশারা করে দেখালো। কালন্তি কিছুই বললো না, সে ঠিক যেভাবে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল শামান আর বিধুর দিকে, সেভাবেই তাকিয়ে রইলো।

“আমি একটা ব্যাপার এখনো বুঝতে পারছি না, থারু আর শাক্যরা বংশ পরম্পরায় জাত শত্রু। তবে তারা এখানে একসাথে হলো কিভাবে?” বলে মাঠের অন্য প্রান্তে খাটানো সারি-সারি তাবুগুলো দেখালো। “আর এগুলোরই বা ব্যাখ্যা কি?”

“সবই ব্যাখ্যা করা হবে, তবে তার আগে আপনাকে পুরো পরিস্থিতি খুলে বলতে হবে। গত কয়েকদিনে আসলে কি ঘটেছে সেটা ব্যাখ্যা করে বললেই আপনি বুঝতে পারবেন আসলে এখানে হচ্ছেটা কি,” বলে থারু রাজা মানরু শাক্য প্রধানের দিকে ইশারা করলো। “আমার মনে হয়, শঙ্করাদিত্য আপনি সেটা বিশদ বললেই সবচেয়ে ভালো হয়। কারণ কাহিনীর একটা অংশ আমরা জানি কিন্তু একমাত্র আপনি আর আপনার লোকেরাই পুরো ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখেছেন। কাজেই আপনিই শুরু করুন।”

শাক্য প্রধান শঙ্করাদিত্য একবার চারপাশে তাকিয়ে সবাইকে দেখে নিয়ে তার দৃষ্টি এসে স্থির হলো শামানের ওপরে। মনে-মনে সে কথাগুলো গুছিয়ে নিয়ে তার চোখের নিচে চুলকাতে লাগলো। শামান ভালোভাবে খেয়াল করে দেখলো মানুষটার চোখের নিচে লম্বা একটা কাটা দাগ। সেই দাগটা চুলকে নিয়ে সে শুরু করলো।

“আগেই বলেছি আমার নাম শঙ্করাদিত্য, এই মুহূর্তে আমিই শাক্যদের গোত্র প্রধানের ভূমিকা পালন করলেও, প্রকৃতপক্ষে শাক্য গোত্র ও এই অত্র এলাকার রাজা আসলে আমার বড় ভাই বিক্রমাদিত্য। আমরা প্রায় শতবর্ষ ধরে এই কন্নোর এলাকা শাসন করে

আসছি,” শঙ্করাদিত্য এই পর্যন্ত বলতেই কালন্তি চট করে বলে বসলো, “ধোঁকাবাজি, অন্যায় আর খুন-জখমের মাধ্যমে, তাইনা?”

দেখা হবার পর থেকে প্রতিটি মানুষকে অত্যন্ত ভালোভাবে খেয়াল করে আসছিল শামান। শঙ্করাদিত্যকে তার মনে হয়েছে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথার মানুষ। কিন্তু কথার মাঝখানে কালন্তির ফোড়ন শুনে হঠাৎ সে উত্তেজিত হয়ে উঠলো। চট করে সে বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো। “রাজা মানরু, আমি আগেও বলেছি...”

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে রাজা মানরুও উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলো তার কাছে, “আমি দুঃখিত, শঙ্করাদিত্য,” বলেই সে ফিরে তাকাল নিজের মেয়ের দিকে। একটা হাত তুলে পরিষ্কার নির্দেশ করলো কালন্তিকে ক্ষমা প্রার্থনার জন্যে। কালন্তি আরো তেজের সাথে কিছু একটা বলার চেষ্টা করতেই রাজা আবারো ধমকে উঠলো। ক্ষমা তো চাইলোই না উল্টো কালন্তি তেজের সাথে বিড়-বিড় করতে-করতে প্রস্থান করলো সেখান থেকে।

অধ্যায় সতেরো

সময়: ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ

শাবিপ্রবি ক্যাম্পাস, সিলেট

রিক্সাওয়ালার ভাব দেখে বিরক্তির সাথে ডি বিল্ডিঙের সামনে থেকে সরে এলো তানভীর।

মধ্যদুপুরের এই সময়টাতে ক্যাম্পাসে রিকসা-গাড়ি পাওয়াটা দুরূহ ব্যাপার। বিশেষ করে দুপুরবেলার শেষ বাসটা ক্যম্পাস ছেড়ে যাবার পর হাঁটা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। দুয়েকটা রিক্সা যাও থাকে তারা তখন প্রেসিডেন্ট বুশের চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান।

হাঁটতে-হাঁটতে লাইব্রেরি বিল্ডিঙের সামনে এসে আফসোসের সাথে মাথা নাড়লো তানভীর। এই সময়ে বাস মিস করলে মহা বিপদ। গেট পর্যন্ত যেতে হলে হেঁটেই যেতে হবে। ওর ব্যাকপ্যাকটা একদিকে আটকানো ছিল, সেটার ভেতরে দুই হাত গলিয়ে দিয়ে, কানে হেডফোন লাগিয়ে মনে-মনে ভাবলো হাঁটাই যখন নিয়তি তবে সেটা যতো দ্রুত শুরু করা যায় ততোই ভালো।

লাইব্রেরি বিল্ডিঙের সামনে থেকে গোল চত্বর পর্যন্ত এসে একটু হলেও খুশি হয়ে উঠলো ও। কারণ দুপুর বেলা হলেও রোদের তাপ বলতে গেলে একেবারেই নেই। তবে আকাশ দেখে মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা আছে। দ্রুত পা চালাতে শুরু করলো ও। খানিকটা এগিয়ে ভিসি ভবন পার হয়ে শিক্ষকদের ডরমেটরির অংশটা পার হচ্ছে এমন সময় রাস্তার অন্যপাশে চোখে পড়লো লম্বা এক জোড়া পা।

শাবিপ্রবি ক্যাম্পাসে জিন্স আর শার্ট পরা মেয়ে বলতে গেলে খুবই কম, তাই এই বিশেষ পোশাকধারী মেয়েটাকে চিনতে না পারার কোন কারণ নেই- সেই র্যাগওয়ালি-ব্যান্ডের গায়িকা। পেছনে ব্যাকপ্যাক, খুলে দেয়া সিল্কি চুল ঝড়ো বাতাসে উড়ছে আর কানে মোবাইল। তবে তানভীর বেশি অবাক হলো তাকে একা দেখে। মেয়েটাকে ক্যাম্পাসের এখানে ওখানে যতোদিন দেখেছে সর্বক্ষণই তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে থাকে একদল বান্ধবি। আজ একা কেন ঠিক বুঝতে পারলো না ও।

মেয়েটা হাঁটতে-হাঁটতে মোবাইলে কথা বলছে। হঠাৎ ওর দিকে চোখ পড়লো তার। সাথে-সাথেই অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে জোরে পা চালালো তানভীর। খানিকটা এগিয়ে আড়চোখে একবার দেখে নেয়ার জন্যে চোখ ফেরাতেই ধরা পড়ে গেল সে। মেয়েটা রাস্তা পার হয়ে একেবারেই ওর পেছন-পেছন হাঁটছিল। ও সামান্য ফিরে তাকাতেই হেসে ফেললো। মাথা নেড়ে শাসনের ভঙ্গিতে কিছু একটা বললো, কিন্তু কানে হেডফোন থাকাতে শুনতে পেল না তানভীর।

“সরি, কিছু বলছিলেন?” তানভীর একটু দ্বিধান্বিত, আসলে কী বলবে বুঝতে পারছে না।

মেয়েটা কিছু না বলে লম্বা পা ফেলে আরেকটু এগিয়ে এলো ওর দিকে। “অবশ্যই বলছিলাম,” বলে সে হেসে ফেললো। আর হাসিটা দেখার সাথে সাথে তানভীর অনুভব করতে পারলো, কেন এই মেয়ের জন্যে পুরো ক্যাম্পাস পাগল। “বলছিলাম, আড়চোখে আমাকে দেখা হচ্ছিলো, তাইনা?”

“ক্কী, মানে...” এভাবে ধরা পড়ে যাবে কল্পনাতেও অনুমান করতে পারেনি তানভীর। “আমি আপনাকে দেখবো কেন?” কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবার পরেও তানভীর অনুধাবন করলো কতোটা বোকার মতো হয়েছে সেটা।

ওর সামনে দাঁড়ানো মেয়েটার মুখ মুহূর্তের ভেতরে গম্ভীর হয়ে গেল, পরমুহূর্তে গলা কাঁপিয়ে হেসে উঠলো সে। “মানে কী বলতে চাচ্ছো, আমি দেখার যোগ্য না?” হাসিটা শেষ করেই সে আবারো আগের মতো কৃত্রিম গম্ভীর হয়ে গেল। তার চোখ জোড়া এখনো হাসছে।

“না-না, আমি সেটা বলিনি,” প্রায় আঁতকে ওঠার মতো বলে উঠলো তানভীর।

“আর বলতে হবে না, চলো হাঁটি, পেটের ভেতরে ইঁদুর দৌড়াচ্ছে ক্ষুধায়,” বলে হাঁটতে শুরু করে দিলো। তানভীরও পা মেলালো তার সাথে।

“আজকে আপনি একা যে?” তানভীর জানতে চাইলো। “সবসময় তো দেখি...”

“তারমানে তুমি সবসময় আমাকে দেখো?” দুষ্টামি ভরা তীব্র চোখে ফিরে তাকাল সে তানভীরের দিকে।

“না মানে , আমি সেটা বলিনি, বলেছি...” তানভীরের ভেতরে পুরনো অস্বস্তিটা ফিরে-ফিরে আসছে। এই মেয়েটা এমন কেন, যেমন চোখের চাহনি, তেমনি কথার তেজ। “বলেছি, যখনি দেখি সবসময় আপনার সাথে একদল বান্ধবি থাকে। আজ একা যে?”

“ইয়া,” বলে সে মাথার সিল্কি চুল দোলালো। “তুমি যদি দেখতে ভালো হও, তার ওপরে আবার নানা-বিধ গুণ সম্পন্ন হও তাহলে দেখবে তোমার চারপাশে মানুষজনের কোন অভাব হচ্ছে না। তবে তাই বলে তারা সবাই তোমার শুভাকাঙ্খি না,” বলেই সে চট করে একটু এগিয়ে এলো তানভীরের দিকে। “বাহ, তুমি কি সর্বক্ষণই গান শোনো নাকি?” বলে সে তানভীরের এক কান থেকে খুলে রাখা হেডফোনটা নিজের কানে লাগাতে-লাগাতে বলে উঠলো।

“আজ কী শুনছো? ওয়াও, স্টেয়ারওয়ে টু হ্যাভেন, লেড জ্যাপলিন,” মেয়েটার কথার দিকে কোন মনোযোগ নেই তানভীরের। এক কিলো পথের সবুজে ছাওয়া পথে বয়ে যাওয়া বাতাসের ঝলকে মেয়েটার সিল্কি চুল এসে বাড়ি খেলো ওর মুখে। “বাহ্, তোমার গানের চয়েজ সত্যি অসাধারণ,” হেডফোন নামিয়ে রেখে আবারো হাঁটতে শুরু করলো সে।

"স্টেয়ারওয়ে টু হ্যাভেন!" নিজেকে একটু সামলে নিয়ে টিটিকিরি সুলভ ভঙ্গিতে বলতে লাগলো তানভীর। "একটা রিকশা পেলাম না গোল চত্বর টু গেট, 'স্টেয়ারওয়ে টু হ্যাভেন' শুনে কী হবে?"

প্রায় খিল-খিল করে হেসে উঠলো মেয়েটা। "তাতে তো ভালোই হলো, তোমার সাথে দেখা হয়ে গেল, এই যে আমরা কথা বলতে বলতে যাচ্ছি," বলে মেয়েটা কাঁধ ঝাঁকালো। "আসলে হলে যেতে খুব বিরক্ত লাগছিল। হলের বিরক্তিকর খাবার খেয়ে-খেয়ে অসহ্য হয়ে গেছি। তাই ভাবলাম গেটে গিয়ে ভিন্ন কিছু খাওয়া যায় কিনা। ভালোই হয়েছে তোমার সথে আলাপ হয়ে গেল। আচ্ছা তুমি কি গান-টান করো নাকি? সর্বক্ষণ এতো ভালো ভালো গান শোনো। কই তোমাকে তো সাস্টের দুটো ব্যান্ড ক্লাবের একটাতেও দেখলাম না।"

"না-না, আমি গান-টান পারি না, আমি গান গেলে মনে হয় মরচে পড়া লোহার ওপরে কেউ শিরিষ কাগজ ঘসছে-" হেসে উঠলো তানভীর।

"তাহলে ভবিষ্যতে মিউজিক করার ইচ্ছে আছে নাকি?" এক কিলো পথের মাতাল বাতাসে পাগলের মতো উড়ে বেড়াচ্ছে মেয়েটার চুল। চোখ সরিয়ে নিলো তানভীর। কিছু সৌন্দর্য আছে চোখে আরাম দেয়, আর কিছু সৌন্দর্য যেন আগুন ধরিয়ে দেয় চোখে। মায়াভরা এক কিলোতে এই জ্বালা ধরা সৌন্দর্য বেশিক্ষণ সহ্য করতে না পেরে বার-বার চোখ সরিয়ে নিচ্ছে তানভীর।

"নাহ, মিউজিকের মানুষ আমি না," বলে তানভীর একটু থেমে যোগ করলো। "আমি লেখালেখির মানুষ। ভবিষ্যতে রাইটার হতে চাই। এইজন্যেই ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হয়েছি।"

"ওহ রাইটার, না? কুল, আচ্ছা তুমি তাহলে ইংরেজিতে পড়ো," বলে মুখটাকে ভিন্ন একটা ভঙ্গি করে বলে উঠলো, "দেখ তো অবস্থা, তোমার সাথে সেই কখন থেকে কথা বলছি, তোমার নাম, ইয়ার কিছুই জানা হলো না।"

"তানভীর, এখন টু-টুতে আছি।"

"সেকেন্ড ইয়ার, সেকেন্ড সেমিস্টার, এই ছেলে তুমি তাহলে আমার জুনিয়র। তুমি আমাকে আপু ডাকছো না কেন?" বলে হেসে উঠলো সে। তানভীরও হেসে উঠলো।

"আমি লায়লা, লায়লা ফেরদৌস," বলে সে রহস্যময় একটা হাসি দিয়ে যোগ করলো। "এরিক ক্ল্যাপটনের 'ল্যায়লা' গানটা কেন এতো প্রিয় এখন বুঝতে পারছো তো?"

তানভীর মৃদু হেসে রহস্যময় একটা ভঙ্গি করে বলে উঠলো, "আপনি জানেন কিনা জানি না, এরিক ক্ল্যাপটন যখন এই গানটার নাম ঠিক করে সে কিন্তু লায়লা-মজনুর সেই বিখ্যাত প্রেম কাহিনী দ্বারা ইন্সপায়ার্ড ছিল।"

“তাই নাকি,” অবাক চোখে রায়লা ফিরে তাকাল তানভীরের দিকে। “এটা তো জানতাম না। ওহ যাক, গেট এসেছে অবশেষে।”

ওরা এক কিলা পথ পার হয়ে গেটের বাইরে চলে এসেছে। তানভীরের দিকে তাকিয়ে লায়লা বলে উঠলো, “তুমি বয়সে ছোট হলেও বহুত ট্যটনা। আরেকদিন সময় করে তোমার সাথে আড্ডা দিতে হবে। আজকের মতো বিদায় নেই।”

হঠাৎ তানভীরের কী হলো কে জানে। “আজো আড্ডা দেয়া যায়,” বলে ও কাঁধ ঝাঁকালো। “মানে যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে। আমিও এখনো লাঞ্চ করিনি। বাগবাড়িতে আমি দারুন একটা রেস্টুরেন্ট চিনি। চমৎকার টাকি মাছের ভর্তা আর পুদিনা পাতা দেয়া ডাল পাওয়া যায়। যদি আপনার দেশি খাবার ভালো লাগে আরকি।”

মুহূর্তখানেক তানভীরের দিকে তাকিয়ে রইলো লায়লা ফেরদৌস। দুজনেই স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে একে-অপরের চোখের দিকে। ধীরে-ধীরে লায়লার মুখে ফুটে উঠলো এক টুকরো হাসি। “সত্যি কথা হলো, হলের খাবারে বিরক্ত হয়ে দেশি খাবারের জন্যেই আমি বাইরে এসেছিলাম,” বলে সে রিকসার দিকে ইশারা করলো। “দারুণ হবে, বহুদিন টাকি মাছের ভর্তা খাইনা। আচ্ছা তুমি তো আমাকে বললে না কী ধরণের লেখালেখি করো তুমি?”

“এখনো করি না, পরিকল্পনা করছি, নভেল লেখার,” রিকশায় উঠতে উঠতে জবাব দিলো তানভীর। মনে-মনে অনুভব করতে পারছে ওর জীবনের সেরা রিকশা-ভ্রমণ হতে যাচ্ছে এটা।

***

“স্যার, আমরা চলে এসেছি,” সামনে থেকে ইকবালের কথা শুনে সচকিত হয়ে উঠলো তানভীর। ওদের মাইক্রো শাবিপ্রবি ক্যাম্পাসের গোলচত্বর ঘুরে লাইব্রেরির সামনে দিয়ে অ্যাকাডেমিক ভবন ‘ডি’ এর দিকে এগিয়ে চলেছে। আনমনেই তানভীরের চোখ চলে গেল বহু বছর পর ফিরে আসা নিজের ক্যাম্পাসের চারপাশে।

কতোদিন? প্রায় এক দশক পর ফিরে এলো সে নিজের প্রাণের ক্যাম্পাসে। কতোকিছু বদলে গেছে, তবে অনেক কিছুই রয়ে গেছে একেবারে আগের মতো। আগের চেয়ে অনেক বেশি জমজমাট হয়েছে ক্যাম্পাস, চারপাশে প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী দেখা যাচ্ছে। ওরা যখন পড়তো তখন দুপুরের সময়ে এতো ছাত্রছাত্রী থাকতো না, তবে সবচেয়ে বেশি অবাক করলো ওকে ক্যাম্পাসের ভেতরে চলতে থাকা প্রচুর অটো রিকশা বা টমটম। আগে ক্যম্পাসের ভেতরে একটা নির্দিষ্ট সময়ে কিছুই ঠিকমতো পাওয়া যেত না। এখন অটো রিকশায় করে হরদম যাতায়াত করছে লোকজন।

মাইক্রো ডি বিল্ডিঙের সামনে এসে থামতেই মাইক্রো থেকে নেমে এলো ওরা। ড্রাইভার রসুল মিয়াকে মাইক্রো পার্ক করে অপেক্ষা করতে বলে তানভীর সুলতান আর ইকবালকে

নিয়ে ডি বিল্ডিঙের ভেতরের দিকে এগোল। লোকজন কৌতুহলি চোখ তাকাচ্ছে ওদের দিকে। বিশেষ ক'রে পুলিশের পোশাক পরা সাব ইন্সপেক্টর ইকবালকে দেখে অনেকেই তাকিয়ে আছে। ডি বিল্ডিঙের ভেতরে প্রবেশ করে ওরা সোজা চলে এলো আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্টে। ডিপার্টমেন্টের কেরানির সাথে কথা বলে ওরা ডক্টর মিতায়নের রুমটা খুলে দিতে বললো।

তানভীর জানতে চাইলো ডিপার্টমেন্টের চেয়ারপারসন আছেন কিনা। কারণ ওর কাছে মনে হচ্ছে তার সাথে কথা বলা উচিত। কিন্তু সেটা আর করা হলো না। কারণ সে ছুটিতে আছে। ডিপার্টমেন্টের আর কোন শিক্ষকও এই প্রজেক্টের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল না, তাই অন্য কারো সাথে কথা বলে লাভ নেই। বরং ওরা চলে এলো ডক্টর মিতায়নের রুমে।

সাধারণ আর দশটা শিক্ষকদের কামরার মতোই। তবে একটু পার্থক্য আছে। কারণ এটাতে একপাশে বসার সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সাথে অন্যপাশে আলাদা একটা অংশ আছে সেখানে কয়েকজন বসে আলাদা করে আলাপ করার জন্যে কয়েকটা চেয়ার আর একটা ওয়ার্কিং টেবিল রাখা। সাথে আলাদা দুটো কেবিনেট। ডিপার্টমেন্টের কেরানি এসে দেখিয়ে যেতেই ওরা কাজে নেমে পড়লো। সুলতান আর ইকবালকে ক্যাবিনেট থেকে ফাইলপত্র বের করতে বলে ও চলে এলো ডক্টর মিতায়নের ডেস্কের কাছে। টেবিলের ওপরে খুবই সাধারণ জিনিসপত্র। আর দশজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের টেবিলে যেরকম থাকে ওরকমই। খাতা-পত্রের ফাইল, কলমদানিতে এক গাদা মার্কার, পেপারওয়েট। পাশের দেয়ালে লাগানো সাপ্তাহিক ক্লাশের রুটিন, পরীক্ষার শিডিউল।

টেবিলের ওপরে একদফা চোখ বুলিয়ে নিয়ে ও একটার পর একটা ড্রয়ার টেনে দেখতে লাগলো, কিছুই নেই কোথাও। চলে আসতে যাবে হঠাৎ টেবিলের ওপরে একটা জিনিস চোখে পড়লো। পেপারওয়েট। হাতে তুলে নিয়ে দেখতে লাগলো। কাঁচের একটা পেপারওয়েট, ভেতরে স্বচ্ছ তরলের ভেতরে সাদা বরফে ঢাকা পাহাড়, তার সামনে ছোট একটা ফলকে লেখা 'ওয়েলকাম টু নেপাল'। জিনিসটা মনোযোগ দিয়ে দেখছিল, কামরার অন্য প্রান্ত থেকে ইকবাল ডাক দিয়ে উঠলো, "স্যার, এখানে সব কাগজ নামানো হয়েছে।

"আসছি," বলে জিনিসটা রেখে ও চলে এলো টেবিলের কাছে এসে একটু অবাক হয়ে গেল। "এই?" ও ভেবেছিল টেবিলের ওপরে কাগজ আর ফাইলের স্তুপ দেখে মাথা ঘুরে যাবে। মাথা সত্যি ঘুরে গেছে তবে সেটা কাগজপত্রের পরিমাণের স্বল্পতা দেখে। "এতো অল্প কাগজপত্র!"

"স্যার, ক্যাবিনেটের চারটে ড্রয়ারের মধ্যে দুটো একেবারেই খালি একটাতে সব পরীক্ষার খাতা আর একটাতে এই কয়টা ফাইল পেলাম," সাব ইন্সপেক্টর ইকবাল অনেকটা অসহায়ের মতো বলে উঠলো।

চিন্তিত মুখে কাগগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো তানভীর। মনের ভেতরে ওর হিসেব মিলছে না। কোথাও কোন ঝামেলা অবশ্যই আছে। "চেক করে দেখেন কাগজগুলো।

যদিও আমার মনে হয় না এখানে কিছু আছে," বল ও একটা আঙ্গুল তুললো। "এগুলো দেখে নিয়ে কেরানির কাছে জিজ্ঞেস করেন ডক্টর মিতায়নের ওয়াইফ কোন রুমে বসে। শুনেছিলাম উনিও এখানকারই টিচার। সম্ভবত অ্যানথ্রপলজি ডিপার্টমেন্টের। "কাগজগুলো চেক করে উনাকে খুঁজে বের করেন। আমি উনার সাথে কথা বলতে চাই। আমি বাইরেই আছি, আপনাদের কাজ শেষে উনাকে খুঁজে পেলে আমাকে টকিতে জানাবেন," বলে ও বাইরে চলে এলো।

ডি বিল্ডিঙের বাইরে এসে নিঃশ্বাস নিলো বুক ভরে। আহ্, কতোদিন পর ক্যাম্পাসের বাতাস। একটা সময় ছিল যখন এই বাতাস প্রতিদিন না নিলে কেমন জানি দম বন্ধ লাগতো। সপ্তাহে দুই দিন; শুক্রবার আর শনিবার ক্লাশ হত না। দুই দিন ক্যাম্পাসে যাবো না, ভাবাই যেত না। আর এখন, দীর্ঘ প্রায় এক দশক পর ফিরে এলো প্রাণের ক্যাম্পাসে।

সামনে হাঁটতে-হাঁটতে ডি বিল্ডিঙের রাস্তার বিপরীতে এ বিল্ডিঙে যাবার পথে হঠাৎ অর্জুন তলাটা চোখে পড়লো ওর। বুকের ভেতরে হৃদপিন্ডটা একটা বিট মিস করলো যেন। তীব্র কষ্টের একটা স্রোত বুকের গভীর থেকে উঠে আসার চেষ্টা করতেই সেটাকে প্রাণপনে দমিয়ে অইদিকে তাকিয়ে লাইব্রেরি বিল্ডিঙের সামনে চলে এলো ও। এই অর্জুন তলাতেই ঘটেছিল ওর জীবনের কুৎসিততম ঘটনা। মাস্টার্স ফার্স্ট সেমিস্টারের ফাইনাল পরীক্ষার রুটিন পেয়েছিল সেদিন, আজো পরিষ্কার মনে পড়ে। তারপরে, আবারো ভাবতেই সেই ভয়ঙ্কর কষ্টের স্রোতটার সাথে তীব্র যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল নিজের ভেতরে। হাঁটতে-হাঁটতে কখন ফুডকোর্টের কাছে চলে এসেছে খেয়ালই করেনি ও।

ফুডকোর্টের সামনে পেতে রাখা একটা বেঞ্চের ওপরে বসে পড়লো ও। সজনে গাছের হালকা ছায়ার নিচে পেতে রাখা বেঞ্চে বসতেই খোলা ক্যাম্পাসের ঠান্ডা বাতাসে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। যদিও শীত লাগছে তবুও নিজের ক্যাম্পাসের বাতাস বলেই কিনা কে জানে খুব শান্তি লাগছে ওর।

ওর উল্টোদিকের একটা বেঞ্চে বসে আছে এক জোড়া ছেলেমেয়ে। দুইজন বসেছে বেঞ্চের দুই মাথায়। মাঝখানে একগাদা কাগজপত্র ছড়ানো। সেদিকে দুজনার কারোরই খেয়াল নেই। মহা আনন্দে সেলফি তুলছে দুজনে। ছেলে-মেয়ে দুজনার দিকে তাকিয়ে আনমনেই একবার মাথা নাড়লো তানভীর।

এটাই ক্যাম্পাস জীবন। বন্ধু-আড্ডা-ক্লাস, ডিপার্টমেন্ট আর টিচারদেরকে অভিশম্পাত, সবশেষে প্রেম-পরিণতি আর ক্যারিয়ার। যে যতোই চেষ্টা করুক এর হাত থেকে মুক্তি নেই। সবাইকেই চক্রের ভেতরে আসতে হবে, বৃহত্তর প্রক্রিয়ার অংশ হতেই হবে। যারা পারবে না, হয় তারা হবে জিনিয়াস আর না হয় ব্যর্থ।

সবুজ ক্যাম্পাসের দিকে একবার তাকিয়ে আনমনেই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো তানভীরের বুক থেকে। আফসোস লাগে সেইসব হারানো দিনগুলোর জন্যে, যেগুলো আর কোনদিনই ফিরে আসবে না। একটা সময় ছিল যখন এই ক্যাম্পাসের গেট দিয়ে ঢুকে 'ই'

বিল্ডিঙের সামনে পর্যন্ত যেতে-যেতে একটাও অপরিচিত চেহারা ছিল না। আর আজ কয়েক বছরের ব্যবধানে পুরো ক্যাম্পাস ঘুরে একটা পরিচিত মুখও চোখ পড়লো না। নিজেকে মনে হচ্ছে বহিরাগত। এই ক্যাম্পাসে এখনো হাসি-আনন্দ, দুঃখ-বেদনা, প্রেম-পরিণয়ের গল্প রচিত হয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। কিন্তু ও নিজে আর সেই প্রক্রিয়ার অংশ নেই। নতুনদের জায়গা দিতে সরে পড়তে হয়েছে পুরনোদের। এসেছে হাজারো নতুন মুখ, রচিত হয়ে চলেছে নতুন-নতুন সব গল্প। নতুনদের ভিড়ে পুরনোদের সরে পড়াই নিয়ম। আনমনেই আরেকটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে পকেট থেকে একটা মিন্ট ফ্লেভারের চিউয়িঙ গাম বের করলো। বহুদিন পরে নিজের ক্যাম্পাসে ফিরে এসে সিগারেটের নেশা যেন চেগিয়ে উঠেছে।

"দুধের স্বাদ কি আর মিল্ক ক্যান্ডি দিয়ে মেটে রে পাগলা?" হঠাৎ পেছন থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বরটা শুনে একটু চমকে উঠলো তানভীর। ফিরে তাকাতেই হাস্যোজ্জ্বল একটা মুখ দেখতে পেল।

"তোর এখন এইটা দরকার," বলেই মানুষটা কিছু একটা ছুঁড়ে দিলো ওর দিকে।

খপ করে জিনিসটা ধরে ফেললো তানভীর। একটা সিগারেট। একটু অবাক হয়েই ও ফিরে তাকাল মানুষটার দিকে। লম্বা দাড়িওয়ালা, ঢিলা প্যান্ট আর হাফ-হাতা শার্ট পরিহিত পান চিবুতে থাকা হাসিমুখের মানুষটাকে চিনতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগলো ওর।

"সবুজ ভাই, তুমি!" নিজের বেঞ্চ থেকে উঠে গিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো মানুষটাকে। মানুষটার গায়ে হালকা জর্দার গন্ধ। "তুমি এই সময়ে এখানে ক্যামনে? আর একি! তুমি তো দেখি পুরোপুরিই বদলে গেছো।"

"হা-হা, আগে ছাড়, দম বন্ধ হয়া যাইবে তো," সবুজ ভাই তানভীরের শক্ত আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দুই হাতে শক্ত করে ওর দুই কাঁধ চেপে ধরলো।

"সর্বনাশ! কতো বছর পর, না," বলে সে মনে-মনে হিসেব করলো, "প্রায় এগারো বছর। তুই তো পুরা নায়ক হয়া গেছোস, হা-হা।"

"আমি কোনদিন নায়কের চেয়ে কম ছিলাম দেখতে?" বলে তানভীরও হেসে উঠলো। "তোমার কথা বলো, তুমি তো পুরো বদলে গেছো। আর তুমি এই সময়ে এখানে?" প্রশ্নটা করেই মনে পড়লো সবুজ ভাই সম্ভবত এখানেই অ্যাডমিন্সট্রেশন বিল্ডিঙে অফিসার হিসেবে কাজ করে।

"ঠিকই ভাবছোস, আমি এইখানেই অ্যাসিসটেন্ট রেজিস্টার হিসেবে কাজ করতাছি," বলে হেসে উঠে যোগ করলো, আমার লেবাজ নিয়া কিছু বলবি না? পেইন দিবি না?" সবুজ ভাইয়ের চোখে-মুখে কৌতুক।

"আরে, না ভাই। তবে এখনো ঠিক মেনে নিতে পারছি না, সর্বক্ষণ পিঠে গিটার ঝোলানো লম্বা চুলের সেই রকস্টার সবুজ ভাইকে এইরকম মেনে নেওয়াটা একটু কঠিন বটে,"

বলে ও সিগারেটটা সামনে তুলে ধরলো।

“কতোদিন হয় ছাড়ছোস?” সবুজ ভাই জানতে চাইলো।

“ক্যাম্পস ছাড়ার পর আর খাইনি,” তানভীর আনমনেই বলে উঠলো। জানে ধীরে-ধীরে ওই প্রসঙ্গ আসবেই।

কিন্তু সবুজ ভাই সে নিয়ে কিছু বললো না, বরং ফুড কোর্টের একটা ছেলেকে ডাক দিয়ে ওকে ম্যাচ দিতে বললো। “এহনো রক্তের মধ্যে নিকোটিনের টান আগের মতোই অনুভব করোস, তাই না? তরে দেইখাই আমি বুঝছি।”

সিগারেটটা ধরাতে-ধরাতে হেসে উঠলো তানভীর, “হা-হা তুমি তো বুঝবাই। তোমারে দেইখাইতো মনে হইতাছে তুমি সিগারেট ছেড়ে পান ধরছো।”

তানভীরের কথা শুনে মুহূর্তখানেক তাকিয়ে রইলো সবুজ ভাই তারপর উচ্চস্বরে হেসে উঠলো সে। “হারামজাদা, তুই আগের মতোই বুদ্ধিমান আছিস,” বলে সে তানভীরের দিকে ফিরে তাকাল। “সময় ক্যামনে যায় তাইনা। কতো সময় আমরা কাটাইছি এইসব জায়গাতে আড্ডা মেরে। কতো দিন রুমমেট ছিলাম আমরা?”

“প্রায় চার বছর ভাই,” আনমনেই বলে উঠলো তানভীর। “কী সব দিন ছিল, তাইনা?”

সবুজ ভাই কিছু না বলে তাকিয়ে রইলো। “তানভীর, তুই কি কাজটা ঠিক করেছিলি?” বলে সবুজ ভাই উত্তেজিত হয়ে উঠলো। “একটা... যাই হোক এইজন্যে তুই এইভাবে আমগো সবাইরে ছাইরা চইলা যাবি। গেলি তো গেলি আর...”

“ভাই, বাদ দাও না,” তানভীর হেসে উঠে পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে চাইলো। “ভাবি কেমন আছে? বাচ্চারা?”

“‘বাচ্চারা’ না গাধা ‘বাচ্চাটা’,” বলে হেসে উঠলো সবুজ ভাই। “একটাই মেয়ে আমার। তিন বছর বয়স। আন্টি কেমন আছে? আঙ্কেল তো...”

“হ্যাঁ, আব্বু মারা গেছে বেশ কয়েক বছর প্রায় হয়ে গেছে। মা ভাল আছে কিন্তু বয়স বেড়েছে একা হয়ে গেছে, আর আমি তো সময় দিতেই পারি না,” মা’র কথা মনে হতেই তানভীরের মনটা আবার একটু আর্দ্র হয়ে গেল।

“হুম, যে একখান পোলা তার, আগে বইপত্র আর গান ছাড়া কিছুই বুঝতো না। আর এহন নিশ্চই কাজ ছাড়া কিছুই বোঝে না,” বলে সে হেসে উঠলো। “তানভীর, তোর সব খবর আমার কাছে থাকে। তোর কাজে- তোর সাফল্যে আমি খুব খুশি। তা হঠাৎ সিলেটে?”

“ভাই কাজে আসছি,” তানভীর সিগারেটটা ধরালেও এখনো ঠিকমতো টান দেয়নি। এবার জোর একটা টান দিতেই কাশি চলে এলো। কতোদিন পর টানছে। কাশি সামলে ও সবুজ

ভাইয়ের দিকে ফিরে বললো, “ভাই, ঝামেলায় আছি। তুমি জানো কিনা, আমি কাজ করি ক্রিমিনাল অ্যানালিসিস সেকশনে কিন্তু এইবারই প্রথম আমাকে ফিল্ডে পাঠালো তাও অন্য অথরিটির আন্ডারে। আর্কিওলজির এক টিচার হারিয়ে গেছে।”

“ডক্টর মিতায়ন?” সবুজ ভাই চিন্তিত মুখে জানতে চাইলো। “এই কেসের কামে তোরে পাঠাইছে?” একটু অবাক হয়েই যেন প্রশ্ন করলো সে।

“হ্যাঁ, ভাই তুমি কিছু জানো নাকি?’ প্রশ্নটা করতেই সবুজ ভাইয়ের চেহারাটা যেন আরো অন্ধকার হয়ে গেল।

“হুম্, কিছু ঝামেলা আছে এইটা জানি, কিন্তু সেইটা যে আসলে কি সেইটা জানি না। ডক্টর মিতায়ন এই ক্যাম্পাসের সবচেয়ে শান্ত-শিষ্ট মানুষদের একজন,” বলে সে দুই হাত তুললো, “মানে, আমি যতোটুকু জানি আরকি। নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতো। তার আন্তর্জাতিক কানেকশন নাকি সেইরকম। তবে...” বলে সে তানভীরের দিকে ফিরে তাকাল। ওর কোমরে গুঁজে রাখা টকিতে খর-খর করছে। তানভীর টকিতে সুলতানের সাথে কথা বলা শেষ করে ফিরে তাকাল সবুজ ভাইয়ের দিকে। “ভাই তোমার নম্বর দাও,” বলে দুজনে নিজেদের ভেতরে নম্বর বিনিময় করে নিয়ে তানভীর জড়িয়ে ধরলো সবুজ ভাইকে।

“যাক ভাই, তুমি থাকাতে অন্তত একজন পরিচিত মানুষকে তো দেখলাম। আমি কাজ শেষ করি, তারপর তোমার সাথে দেখা করে আড্ডা দিবে। ভালো থাকো।

“তানভীর, আমি তেমন কিছু জানি না, তবে তোরে একটা কথা বলতে চাই,” সবুজ ভাইকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। “তোর কি এই কেস থেকে সইরা যাবার কোন উপায় আছে?”

মাথা নাড়লো তানভীর। “আর কোন উপায় নেই ভাই, কোন সমস্যা? তুমি কি কিছু জানো?”

সবুজ ভাই এখনো একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তানভীরের দিকে। “এইখানেই তো সমস্যা রে ছোট ভাই। তেমন কিছু জানি না দেইখাই তো তোরে বলতাছি। যাই হোক, কাম কর এহন। ফ্রি হইলে আমারে একটা কল দিস। আমি সুবিদ বাজারে একটা ভাড়া বাসায় থাকি।”

সবুজ ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে টকিতে কথা বলতে-বলতে ও লাইব্রেরি বিল্ডিঙের সামনে এসে দেখলো ওরা মাইক্রো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। “কি ব্যাপার, কাজ হয়েছে?”

“স্যার,” সুলতান কথা বলার সময়ে আনমনেই তার মেরুদন্ড আর মাথা সোজা হয়ে যায়। “ডক্টর মিতায়নের ক্যাবিনেটে পাওয়া ফাইলগুলোর ভেতরে গুরুত্বপূর্ণ তেমন কিছুই ছিল না। আর উনার স্ত্রী এখন ছুটিতে আছেন। তবে ভদ্রমহিলা সিলেটেই আছেন। উনারা আখালিয়া সুরমা এলাকায় একটা বাসায় ভাড়া থাকেন। আমরা ডিপার্টমেন্ট থেকে ঠিকানা

দিয়ে জানানো হলো, মহিলা এখন তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে ওই বাড়িতেই আছেন। স্যার আমরা উনার সাথে কথা বলতে চাইলে ওখানে যেতে হবে।"

"চলো, আমার মনে হয় না এখানে এরচেয়ে বেশি কাজের কিছু পাওয়া যাবে। তারচেয়ে মহিলার সাথে কথা বলাটা বেশি জরুরি মনে হচ্ছে আমার কাছে। ওরা আবারো মাইক্রোতে উঠে বসতেই বয়স্ক ড্রাইভার মাইক্রো ছেড়ে দিলো। ভার্সিটি থেকে সুরমা এলাকা একেবারেই কাছে। যেতে বেশিক্ষণ লাগলো না। কিন্তু পুরোটা পথ তানভীর রীতিমতো চিন্তা ভারাক্রান্ত হয়ে রইলো। প্রথমেই মনে মনে গুছিয়ে নিলো কোন-কোন বিষয়ে ডক্টর মিতায়নের স্ত্রীর সাথে কথা বলতে হবে।

তারপর পুরো পরিস্থিতি নিয়ে ভাবতে বসলো। ওকে সবচেয়ে বেশি অবাক করছে যে ব্যাপারটা, ডক্টর মিতায়ন এতো বড় একটা আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে কাজ করতো, এতো বড় একটা প্রজেক্ট চালাচ্ছিলো তারা দীর্ঘদিন ধরে তাহলে সিলেট মিলেনিয়ামের অফিসে আর ভার্সিটির রুমে এ-নিয়ে তেমন কোন কাগজপত্র নেই কেন। এতো বড় প্রজেক্ট, কিছু না হলেও অন্তত বস্তা ভর্তি অ্যাকাডেমিক পেপার থাকার কথা। ডক্টর মিতায়ন আর টিম আসলে কী নিয়ে কাজ করছিল। নাকি ওরা আসার আগেই কেউ কাগজপত্র সব সরিয়ে ফেলেছে।

"ইকবাল, আপনি তো এই কেসের শুরু থেকেই সাথে ছিলেন। এদের অফিসে কে আর কোন কাগজপত্র ছিল নাকি অন্য কেউ এসে সরিয়ে ফেলেনি তো?"

"মনে হয় না স্যার। কারণ দুটো অফিসেই আমরাই প্রথম ঢুকেছি, এই এই রাখো," বলে সে জানালা দিয়ে মুখ বের করে এক দোকানদারের কাছে জানতে চাইলো চারশো আটষট্টি নম্বর বাসাটা কোন দিকে। "একেবারে শেষ মাথায় গিয়ে মসজিদ থেকে বামে। ঠিক আছে। চলো," বলে সে তানভীরের দিকে ফিরে বলে উঠলো। "স্যার, একেবারে শেষ মাথায় বাসাটা।"

আখালিয়া সুরমা এলাকাটা ছোট তবে সিলেটের সুন্দরতম এলাকাগুলোর একটি। মূল রাস্তা থেকে বেরিয়ে সরু লম্বা পথ মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। দুই পাশে সমান্তরালে বেরিয়েছে ছোট ছোট রোড। বাড়িগুলো দেখার মতো সুন্দর।

ওদের মাইক্রো একটার পর একটা ছোট ছোট রোড পার হয়ে চলে এলো সুরমার একেবারে শেষ মাথায়। রাস্তাটার শেষ প্রান্তে মসজিদটাকে ডানে রেখে বামে একটা ইট বিছানো রাস্তায় নেমে এলো ওদের মাইক্রো। কিছুদূর এগিয়ে বাংলোমতো দেখতে একটা বাড়ির সামনে থেমে গেল গাড়ি। বাংলোর গেটের অন্যপাশে একটা কালো জিপ দাঁড়িয়ে আছে। তানভীর দেখলো বাংলোর গেটের বাইরে ছোট একটা প্লেটে বাড়ির নম্বর লেখা চারশো আটষট্টি। "এটাই," ঘোষণার সুরে বলে উঠলো ও। "চলো।"

বাংলোমতো বাড়িটা সবুজ রঙের, একেবারেই ছায়াঘেরা জায়গাটা। মূল এলাকা থেকে বেশ দূরে। বাংলোর ওপরে লাল টালির ছাদ। "চমৎকার বাড়ি," তানভীর শুনতে পেল ওর পাশ থেকে সুলতান বলে উঠলো। ওরা গেট দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে মূল বাড়িটার দিকে এগোল।

"আপনারা কি আগে এখানে এসেছিলেন?" হাঁটতে হাঁটতেই তানভীর প্রশ্ন করলো ইকবালকে।

"না স্যার," ইকবাল জবাব দিলো। "ডক্টর মিতায়নের স্ত্রীর সাথে আমার দেখা হয়নি। পুলিশ এখানে এসেছিল তবে সেই টিমে আমি ছিলাম না।" বাড়িটার সামনে তিন ধাপ সিঁড়ি উঠে গেছে। একপাশে একটা ছাউনির নিচে আকাশি রঙের একটা গাড়ি রাখা। তানভীর অনুমান করলো এটা ডক্টর মিতায়নের গাড়ি।

আশপাশ দেখে নিয়ে সুলতানের দিকে ফিরে ও বললো, "কি ব্যাপার, নক করেন, সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকবো নাকি?"

"জি, স্যার," বলে সে নক করার জন্যে দরজায় টোকা দিতেই সেটা হা হয়ে খুলে গেল। "স্যার, দরজা তো খোলা। আমি-" সুলতান কথা শেষ করার আগেই বাজ পড়ার মতো তীক্ষ্ণ একটা শব্দ ভেসে এলো বাংলোর ভেতর থেকে। সেইসাথে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলো একটা নারী কণ্ঠ। মুহূর্তের মধ্যে তানভীর নিজের অস্ত্র বের করে আনলো। ও দেখলো সুলতানও তার পিস্তল বের করে ফেলেছে। ইকবাল তার পিস্তল বের করার জন্যে টানা-টানি করছে। তিনজনেই একে অপরকে দেখলো।

তিনজনেরই মনে একই ভাবনা, ভেতরে বিপদে পড়েছে কেউ।

অধ্যায় আঠারো

সময়: ১৮০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ

পৃথুরা বনভূমি, কন্নোর, ভারতবর্ষ

পুরো ব্যাপারটাই শামানের কাছে ধাঁধার মতো লাগছে। বিশেষ করে কালন্তির অস্বাভাবিক রাগ করার ব্যাপারটা নিয়ে পরে অনুসন্ধান করতে হবে- বিষয়টা মনের ভেতরে টুকে রাখলো ও।

"যা ঘটে গেল তার জন্যে আমি আবারো ক্ষমা প্রার্থনা করছি। শঙ্কর, আপনি শুরু করুন," রাজা মানরুর ক্ষমা প্রার্থনা শেষ হতেই একবার মাথা নেড়ে শঙ্করাদিত্য বলতে শুরু করলো।

"তো যা বলছিলাম, প্রায় শতবর্ষ ধরে আমরা এই কন্নোর এলাকা শাসন করে আসছি। শাক্য গোত্রের মাঝে দুটো ভাগ বিদ্যমান। শাক্যরা প্রকৃতপক্ষে আদি মাথুরা ধর্মাবলম্বি ছিল কিন্তু রাজা অশোকের সময় থেকে এই উপমহাদেশে যখন বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার শুরু হয় তখন শাক্যদের মাঝে দুটো ভাগ হয়ে যায়। তৎকালীন শাক্য রাজা আদিত্য মহারাজ নিজে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন সেইসাথে নিজের গোত্রের লোকজনকে আদেশ করেন এই ধর্মের অনুসারি হবার জন্যে। কিন্তু শাক্যদের সকলে এই নির্দেশ মানতে নারাজ হলে শাক্যদের একটা অংশ ভিন্ন ধর্মের অনুসারিই রয়ে যায়। শাক্যদের এই অংশটি আকারে বেশ ছোট ছিল সেই সময়ে, তবে এরা প্রকৃতিগতভাবে বেশ হিংস্র তাছাড়া এরা ধর্মীয়ভাবে অত্যন্ত গোড়া। শাক্যদের এই অংশটি শাসকদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কন্নোর জলাভূমির ওদিকে নিজেদের বসতি স্থাপন করে। ওই জায়গাটা ওরা নিজেরাই বেছে নিয়েছিল। কিন্তু দিন-দিন তাদের উন্নতি না হয়ে আরো অবনতি হতে থাকে, এরা প্রায় সময়ই জলাভূমি এলাকা ও বনভূমিতে ডাকাতি করতে শুরু করে। এর ফলে আদিত্য মহারাজের পরবর্তী শাসকদের প্রায় সবাইকেই শাক্যদের এই অংশ নিয়ে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে।"

"এরাই কি লিচ্ছবী নামে পরিচিত?" হঠাৎ শামান জানতে চাইলো।

"হ্যাঁ, এরাই," শঙ্করাদিত্য মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। "এদেরকেই ডাকা হয় লিচ্ছবী। কিন্তু পরবর্তী সময়ে জাতিগতভাবে পুরোপুরি রাহাজানি-ছিনতাই আর অন্যায়ের বশবর্তী হবার কারণে লিচ্ছবী বলতে মূলত ডাকাতদেরই বোঝানো হয়ে থাকে। তো এসব অনেক আগের ঘটনা। আমি এসব ইতিহাস লম্বা না করে বর্তমান সময়ে কী ঘটেছে সে-প্রসঙ্গে বলছি। গত একমাস ধরে সাঁচির স্তুপে প্রস্তুতি চলছিল ডুকপা লামার দ্বি-বার্ষিক ভ্রমণের। কারণ বৌদ্ধ প্রধান এলাকায় ডুকপা লামার দ্বি-বার্ষিক সফরটা সবাই খুবই আগ্রহ নিয়ে

অপেক্ষা করে। এমন সময় পাটলিপুত্রে ঘটে সেই ঘটনা। ব্রাক্ষ্মণ শুঙ্গ সেনাপতি পুশ্যমিত্র মৌর্য রাজা বৃহদ্রথকে খুন করে রাজ্য দখল করে, সেইসাথে মৌর্য বংশের বিলুপ্তি ঘোষণা করে সে প্রতিষ্ঠা করে শুঙ্গ সাম্রাজ্য। এরই সাথে পুরো ভারতবর্ষ জুড়ে শুরু হয় বৌদ্ধ গণহত্যা। জ্বালিয়ে দেয়া হয় হাজারো মঠ, ধ্বংস করা হয় শত-শত স্তুপ। হত্যা করা হয় হাজারো শ্রমণ, ভিক্ষু আর বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের," শঙ্করাদিত্য বলে চলেছে। তবে তার চোখ দেখে মনে হচ্ছে সে যেন এখানে নেই। দৃষ্টি চলে গেছে বহুদূরে।

"তবে ভারত জুড়ে এসব শুরু হলেও আমরা কন্নোরের মানুষেরা এসব নিয়ে খুব একটা চিন্তিত ছিলাম না। কারণ একে তো আমাদের এলাকা একেবারেই বৌদ্ধ অধ্যুষিত এলাকা, তার ওপরে পুরো ভারত জুড়ে মারামারি-কাটাকাটি চলছিল হিন্দু আর বৌদ্ধদের ভেতরে। আমাদের এখানে হিন্দু বলতে গেলে প্রায় নেই। তবে আমার বড়ভাই মহারাজ বিক্রমাদিত্য ডুকপা লামার কাছে দূত পাঠিয়ে ভারতের পরিস্থিতির ব্যাপারে অবগত করে জানতে চান উনি কি এমতাবস্থায় নিজের সফর পরিচালনা করবেন? নাকি এবারের মতো আসবেন না? প্রতিউত্তরে আমরা জানতে পারি উনি ইতিমধ্যেই উনার সফরে বেরিয়ে পড়েছেন। কাজেই কন্নোরের সফর বাতিল করার কোন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। কাজেই আমরা সব ভাবনা বাদ দিয়ে উনার দ্বি-বার্ষিক সফরের প্রস্তুতি পুরোদমে চালিয়ে যেতে থাকি। ডুকপা লামা সঠিক সময়েই এসে পৌছান। উনাকে বিশ্রাম করার জন্যে যথেষ্ট সময় দিয়ে আমরা একদিন বাদে বার্ষিক আয়োজন সম্পন্ন করার জন্যে রাজা বিক্রমসহ ডুকপা লামাকে নিয়ে সাঁচির স্তুপে পৌছাই। যজ্ঞের শুরু হয়েছে মাত্র এমন সময় সেখানে আক্রমণ হয়," বলে সে একটু থামলো।

"কারা আক্রমণ করে?" খুব শান্ত স্বরে জানতে চাইলো শামান। যদিও পরিস্থিতি কোনদিকে যাচ্ছে ও ঠিকই বুঝতে পারছে তবুও জানতে চাইলো। "লিচ্ছবীদের দল?"

"হ্যাঁ," বলে শঙ্করাদিত্য বলে চললো। "কারণ আক্রমণের আগ্রভাগে ওরাই ছিল। তবে ওরাই একমাত্র আক্রমণকারী ছিল না। ওদের পেছনেই ছিল পাশ্ববর্তী মহিষদহ রাজ্যের লিচ্ছবীরা। লিচ্ছবীদের বহুদিন যাবৎ নজর ছিল আমাদের রাজ্যের ওপরে। আগেই বলেছি বহুবার লিচ্ছবীদের সাথে আমাদের টক্করও লেগেছে কিন্তু প্রতিবারই লেজ গুটিয়ে পালাতে হয়েছে ওদের। জাদুবিদ্যায় পারদর্শী লিচ্ছবীরা খুবই চতুর আর বিশ্বাসঘাতক ধরণের জাতি। বার বার ওরা পেছন থেকে আমাদের ওপরে হামলা করতে চেয়েছে কিন্তু কোনবারই সুবিধে করে উঠতে পারেনি। তাই এবার পুরো ভারতবর্ষের গন্ডগোলের সুযোগ নিয়ে চতুর লিচ্ছবীরা সুযোগ নিয়েছে," বলে একটু থামলো সে। একজনকে ইশারা করলো জল দিয়ে যেতে। টানা কথা বলে নিশ্চই গলা শুকিয়ে গেছে তার।

"ব্রাক্ষ্মণ শুঙ্গরা ভারতবর্ষে কব্জা করার পর পর থেকেই তাদের সাথে একজোট ঘোষণা করে নিচু বর্ণের লিচ্ছবীরা। তারা বুঝতে পারছিল বৌদ্ধ শাসিত কন্নোরকে কব্জা করার এটাই সুযোগ। তাই আমরা যখন নিশ্চিন্তে ডুকপা লামার দ্বি-বার্ষিক সফরের আয়োজন সম্পন্ন করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম এই সময়ে লিচ্ছবীদের সব গোত্র মিলে বিরাট এক বাহিনী

গঠন করে তক্কে-তক্কে ছিল। দ্বি-বার্ষিক সফরের যজ্ঞ শুরু হতেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের ওপরে।”

“আপনাদের রাজমহল আর সেনাবাহিনী তখন কি করছিল?” শামান জানতে চাইলো।

“আমি তো কথা শেষ করিনি, লিচ্ছবীদের এই যৌথ বাহিনী শুধু সাঁচির স্তুপেই আক্রমণ করেনি বরং ওরা একযোগ তিন জায়গায় আক্রমণ করে,” শাক্যপ্রধান আফসোসের সাথে মাথা নেড়ে বলে উঠলো।

“তারমানে ওদের পুরো আক্রমণটাই অত্যন্ত পরিকল্পিত ছিল,” শামান মাঝখানে বলে উঠলো। ওর খুব ধোঁয়া টানতে মন চাইছে কিন্তু এখানে টানা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছে না।

শাক্য প্রধান মুখ তুলে তাকাল শামানের দিকে, “আমি বললাম কি? এটা লিচ্ছবীদের বহু বছরের উদ্দেশ্য ছিল। আর তাই সুযোগ পেতেই কাজে নেমে যায়। আমরাদের লোকেরা যখন দ্বি-বার্ষিক যজ্ঞের আয়োজনে ব্যস্ত ওরা তখুনি সম্পূর্ণ পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলে। আর তাই সুযোগ বুঝেই আক্রমণ করে বসে আমাদের ওপরে। ওদের বাহিনীর বড় একটা অংশ আমাদের দুর্গে আক্রমণ করে প্রায় বিনা আয়াসেই বিধোরীর দুর্গ দখল করে ফেলে, একই সময়ে ওদের বাহিনীর আরেকটা অংশ রাজ্য সরকারের তহশিলখানা আর সামরিক দপ্তরে আক্রমণ করে। ওখানেও বলতে গেলে প্রায় কেউ ছিলই না, তাই বিনা আয়াসেই তারা তহশিলখানা থেকে শুরু করে ব্যারাক পর্যন্ত দখল করে নেয়। দুর্গে আর তহশিলখানায় যারাই ছিল একটা অংশকে বন্দি করা হয় পরিবারসহ। অন্য অংশটাকে একেবারে কচুকাটা করে ফেলা হয়।”

“আপনাদের সৈন্যবাহিনী কোথায় ছিল তখন?”

“সৈন্যবাহিনীর বড় একটা অংশ বিধোরীর দুর্গে ছিল। ওরা এখনো সেখানেই বন্দি অবস্থায় আছে। বাকি ছোট একটা অংশ তখন সাঁচির স্তুপয় রাজা বিক্রমের সাথে ছিল আর অন্য অংশটাকে নিয়ে আমি জঙ্গুলে এলাকায় টহলে ছিলাম। আমার সাথে থাকা ওই অংশটাই মূলত এখন দেখছেন আপনারা, এছাড়া বলতে গেলে বাকি সবই তো ধ্বংস হয়েছে। তো যাই হোক ওরা এই দুই জায়গা দখল করার প্রায় সাথে-সাথেই তিন সম্মিলিত বাহিনীর সবচেয়ে শক্তিশালী অংশটা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁচির স্তুপে। ওখানে নাকি তখন উৎসবের আমেজ চলছিল। একরকম বলতে গেলে অপ্রস্তুত অবস্থাতেই ওদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে লিচ্ছবীদের সম্মিলিত বাহিনী। রাজা বিক্রমের সেনাবাহিনীর একটা অংশ প্রাথমিকভাবে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রথম ধাক্কাতেই তার ওদের সেনাপ্রধান মারা যাওয়াতে পুরো বাহিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। লিচ্ছবীদের সম্মিলিত বাহিনীর সামনে শাক্য সেনাবাহিনী কচুকাটা হয়ে যায়।”

“রাজা বিক্রম, উনার ভাগ্যে কি ঘটে? আর ডুকপা লামা?” প্রশ্নের শেষ অংশটা উচ্চারণ করতে গিয়ে শামানের গলা কেঁপে উঠলো।

“যজ্ঞের দিনে আমি সেনাবাহিনীর একটা অংশ নিয়ে জঙ্গলে কেন টহল দিতে গেছিলাম, জানেন? আমাদের কাছে খবর ছিল ওদিক থেকে নাকি আমাদের রাজ্যে আক্রমণ হতে পারে। রাজা বিক্রমের জীবন সংশয় দেখা দিয়েছে। আর সত্যিকার অর্থে হয়েছে উল্টো,” শঙ্করাদিত্য দুঃখের হাসি হেসে উঠলো।

“তো যাই হোক। টহলের মাঝামাঝি আছি এমন সময় আমাদের কাছে খবর এসে পৌছায় আমাদের দুর্গ, সামরিক আখড়া আর সাঁচির স্তূপে আক্রমণ হয়েছে। আমরা সোজা সেখান থেকে সাঁচির স্তূপে পৌছানোর চেষ্টা করি। মাঝপথে আমাদের সাথে সাঁচি থেকে পলায়নরত বিচ্ছিন্ন বাহিনীর একটা অংশের সাথে দেখা হয়ে যায়। ওদের কাছে জানতে পারি সাঁচিতে আসলে কী ঘটেছে। ওদের কাছেই জানতে পারি যাদেরকে ওরা পেয়েছে মেরে ফেলেছে। ওরাই আমাদের জানায় রাজা বিক্রম আর ডুকপা লামাকে ওরা ধরে নিয়ে যেতে দেখেছে।”

“এরপর...মানে এরপর কী করলেন আপনারা?” শামানের গলায় একটু হলেও স্বস্তি। ও আড়চোখে দেখলো শাক্যপ্রধানের শেষ কথাটা শুনে ওর পাশ থেকে বিধুও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

“ওরা আমাদেরকে সাঁচিতে যেতে মানা করে, কারণ সেখানে নাকি বিরাট বাহিনী আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে, আর দূর থেকেই আমরা আকাশে কালো হয়ে ওঠা ধোঁয়া আর আগুন দেখতে পাই। আগুনের মাত্রা দেখে সহজেই অনুমান করতে পারি স্তূপে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আমরা জঙ্গল থেকে না বেরিয়ে বরং জঙ্গলের আরো গভীরে প্রবেশ করে ধীরে-ধীরে উত্তরের দিকে সরতে থাকি,” বলে সে মুখ তুলে তাকাল থারু রাজা মানরুর দিকে। “আর সেখানেই রাজা মানরুর বাহিনীর সাথে দেখা হয় আমাদের।”

“কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, সাপ আর নেউলের শত্রুতা থারু আর শাক্যদের মাঝে, তো সাপ আর নেউল একসাথে হলো কী করে?” শামান জানতে জানতে চাইলো।

“সেটা রাজা মানরুর মহানুভবতা, শত্রু হবার পরও উনি আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন,” শঙ্করাদিত্য মাথা নিচু করে বলে উঠলো।

রাজা মানরু আনমনেই মাথা নাড়লো, “এর মধ্যে মহানুভবতার কিছু নেই। আমরা শত্রু হতে পারি কিন্তু অমানুষ নই যে অসহায় শত্রুর ওপরে নিজেদের পুরনো রাগ মেটাবো। বরং যতোই পুরনো শত্রুতা থাক আমি রাজা হবার পর থেকেই চেষ্টা করে আসছি এই উপত্যকায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে। একটা ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে দিয়েও সেটা করা যায় তবেই বা খারাপ কি?”

“রাজা মানরুর বাহিনীর সাথে আমাদের দেখা হবার পর প্রথমে আমরা ভয় পেয়ে যাই। কিন্তু উনি আমাদের কোন ক্ষতি না করে বরং একটা শান্তি প্রস্তাব দেন। উনারা আমাদেরকে নিজেদের আয়ত্বের ভেতরে আশ্রয় দেবেন, প্রয়োজনে রাজ্য ফিরে পেতে সহায়তাও করবেন কিন্তু এর বিনিময়ে যদি আমরা রাজ্য ফিরে পাই তবে পুরনো শত্রুতা ভুলে গিয়ে তাদের সাথে সন্ধি করতে হবে সেইসাথে রাজ্য ফিরে পাবার পর উভয় গোত্রের ভেতরে রাজ্যের সুষম বন্টন করতে হবে।”

“ঠিক, যদিও আমার নিজের গোত্রের ভেতরেই অনেকে এটা মেনে নিতে নারাজ কিন্তু আমার কাছে এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত মনে হয়েছে,” বলে থারু রাজা আশেপাশে তাকাল। শামান অনুমান করলো সে নিজের মেয়ের খোঁজ করছে। কিন্তু কালন্তিকে কোথাও দেখা গেল না।

“আমারা রাজা মানরুর আশ্রয় গ্রহণ করার পর অস্থায়িভাবে নিজেদের বাসস্থান ঠিক করে রাজা মানরুর সাথে বসে আমাদের পরবর্তী করণীয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করছি এমন সময়ে উত্তর থেকে, মানে তিব্বত থেকে খবর আসে লামা নোরবুর অনুরোধে লাল চুলের যোদ্ধা তার বাহিনী নিয়ে ডুকপা লামার খোঁজ করতে উপত্যকায় আসছে। আমরা খুশি হয়ে যাই খবর শুনে। কারণ সত্যি কথা হলো, থারুরা শান্তিপ্রিয় জাতি, আর আমি সেনাবাহিনীর একটা অংশের দায়িত্বে থাকলেও সেভাবে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নেই আমার। আর তাছাড়া লিচ্ছবীরা খুবই হিংস্র জাতি। ওদের বাহিনীর সম্মিলিত পদচারণে আমাদের রাজ্যের অবস্থা এখন এতোটাই সংকীর্ণ যে আমরা আসলে কী করবো বুঝেই উঠতে পারছিলাম না। এমন সময়ে অভিজ্ঞ একদল যোদ্ধার সহায়তা পেলে হয়তো আমাদের জন্যে অনেক কিছুই খুব সহজ হয়ে যাবে। তাই আমরা অপেক্ষা করতে থাকি আপনাদের জন্যে।”

“কিন্তু আপনারা দুজনে উপত্যকায় আসার পর আমরা দ্বিধান্বিত হয়ে যাই। কারণ যেখানে একটা সুসজ্জিত বাহিনী আসার কথা সেখানে এসেছে মাত্র দুজন। তাও আবার লাল চুলের যোদ্ধার ব্যাপারে যে ধারণা আমরা করেছিলাম সেটাও মিলছিল না। তাই...”

“ফাঁদ পেতে আমাদেরকে পরখ করার চেষ্টা করেন,” আনমনেই হেসে উঠলো শামান। কোমরের ঝোলা থেকে বাঁশি বের করে সেটার মুখে একটা ছোট পাথর বসিয়ে এক টুকরো আকরিক লোহা দিয়ে টান মারলো ও, একবার দুবার তিনবারের সময়ে আগুন ধরে গেল বাঁশির মাথায় বসানো গুঁড়োতে। দুটান দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছাড়লো ও শূণ্যে। সাথে-সাথে অবাক হয়ে দেখলো ওর সামনে উপবিষ্ট সবাই খুব অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। শামান একটু অবাক হলো, কারণ ও বুঝতে পারছে না এরা কি কাউকে ধোঁয়া টানতে দেখেনি নাকি এই এলাকার লোকেরা অন্যভাবে ধোঁয়া টানে। মনে-মনে ও একটু খুশিও হলো। কারণ এদেরকে একটু অবাক করতে না পারলে খুব সহজে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না ও। যেটা এই মুহূর্তে ওর জন্যে খুবই দরকার।

“শুনুন, আমি দুঃখিত যে আমার বাহিনী নিয়ে আসতে পারিনি, তবে এটাও ঠিক যে এখানে পরিস্থিতি যা বুঝতে পারছি তাতে বাহিনী যতোটা না গুরুত্বপূর্ণ তারচেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞ নেতৃত্ব। বিশ্বাস করুন সেটা দেয়ার যোগ্যতা আমার আছে। যদি আপনারা ভরসা করতে পারেন তবে আমার একটা পরিকল্পনা আছে। তবে সেটা করতে হলে আগে আমার একটা শক্তিশালী সাহসি দল দরকার। আমি তলোয়ারবাজ, আর বিধু দক্ষ তীরন্দাজ,” শামান এই পর্যন্ত বলতেই আনন্দের সাথে একটা হাত তুলে নিজের উপস্থিতি জানান দিলো বিধু। শামান বলেই চললো।

“তবে আমরা যথেষ্ট নই। আমাদের আরো লোক লাগবে। যেমন এই এলাকা খুব ভালো চেনে এমন একজনকে দরকার। এছাড়া আমি আর বিধু দুজনেই এখানকার ভাষা মোটামুটি জানলেও এই এলাকার সব ভাষা খুব ভালো জানে তেমন কাউকে দরকার আমাদের। সেইসাথে অত্র এলাকার বসতির ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব স্তরে বিচরণ আছে এমন একজন লোকও লাগবে,” বলে ও থারু রাজা শাক্য প্রধানের দিকে দেখলো একবার। “কি মনে হয় পারবেন এমন লোকজন দিতে?”

“না পারার কিছু নেই,” বলে সে একবার শাক্য রাজার দিকে দেখলো তারপর ফিরে তাকাল নিজের বাহিনীর লোকদের দিকে। তার তলোয়ার বাহিনীর ভেতর থেকে বেশ লম্বা-চওড়া গোলগাল দেখতে একজনকে ডেকে পাঠালো। রাজার নির্দেশ পাওয়া মাত্রই লোকটা নিজের দলের ভেতর থেকে এক পা এগিয়ে এলো ওদের দিকে।

শামান মনোযোগ দিয়ে দেখলো মানুষটাকে, তার পরনে দলের অন্য পুরুষদের মতোই ধূতি জাতীয় পোশাক, উর্দ্ধাঙ্গে কালো ফতুয়ার মতো, কোমরে একটা বড় ছুড়ি আর পিঠের ওপরে খাটো বাঁকা ভারি তলোয়ার। শামান খুব মজার সাথে খেয়াল করলো লোকটার শরীরটা একেবারে দড়ির মতো পাকানো পেশীবহুল, কিন্তু তার মুখটা একেবারেই বাচ্চাদের মতো গোলগাল। শরীর আর চেহারার মধ্যে এরকম বিসদৃশ মানুষ এর আগে ও খুব কমই দেখেছে।

“ওর নাম ধোয়ী, আমার বাহিনীর সেরা তলোয়ারবাজদের একজন। তবে এটাই ওরা সেরা গুণ নয়, ওর সেরা গুণ হলো ও এই অত্র কন্নোর এলাকার সমস্ত জায়গা হাতের তালুর মতোই চেনে। ওর ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে কন্নোর এলাকার পথ-ঘাট, গলি-ঘুপচি বটেই এমনকি এই এলাকার প্রতিটি জলাশয়ের মাছ আর গাছের পাতাও ও চিনতে পারে,” রাজার কথা শেষ হতেই শামানের দিকে তাকিয়ে ছোট করে একবার মাথা ঝাঁকালো শিশু-শিশু চেহারার লোকটা।

রাজা তখনো বলেই চলেছে। “ঘোষিত,” বলে রাজা ডাক দিতেই হঠাৎ সুরুৎ করে সারি দিয়ে দাঁড়ানো তলোয়ারবাজ দের পাশে অবস্থানরত কেউ একজন চট করে তাদের পেছনে চলে গেল। “ঘোষিত, আমি ডাকলাম না,” রাজা ধমকে উঠতেই দলটার পেছন থেকে মাথা নিচু করে বেরিয়ে এলো কালো মুশকো দেখতে একজন মানুষ। দেখার সাথে

সাথেই চিনতে পারলো শামান, একটু আগে এই লোকটাই ওকে আর বিধুকে ছাগলের মতো দড়ি ধরে টেনে-টেনে নিয়ে এসেছে পুরো পথ। এবার রাজা ওদের সাথে কাজ কারার নির্দেশ দিতেই সে লুকানোর চেষ্টা করছিল।

“ও হচ্ছে ঘোষিতরাম- পিচ্চি থেকে বুড়ো এই এলাকাতে এমন কোন মানুষ নেই যার সাথে সোমরস টানেনি ও। কাজেই ওই আপনাদেরকে যেকোন খবর সংগ্রহের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারবে। আপনার কোন আপত্তি নেই তো?”

শামান হাসিমুখে একবার ঘোষিতকে দেখলো পরমূহুর্তে সে ফিরে তাকাল বিধুর দিকে। চরম আপত্তির সাথে মানা নাড়তে-নাড়তে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই সম্মতি জানিয়ে দিলো শামান। “আমার কোন আপত্তি নেই,” পাশ থেকে জোর কাশি দিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো বিধু তাকে চোখের ইশারায় তাকে চুপ থাকতে বললো শামান।

“আমার মনে হয়, এখানে আমার বাহিনী থেকেও কারো থাকা উচিত,” হঠাৎ বলে উঠলো শাক্য প্রধান শঙ্করাদিত্য। “কারণ লিচ্ছবীদের দখল করে রাখা দুর্গগুলোর ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো জানে আমার লোকেরাই,” বলে সে শামান আর রাজা মানরুকে দেখতে লাগলো। দুজনেই সম্মতি জানাতেই সে নিজের সেনাপ্রধান জাথুরিয়াকে বললো ওদের সাথে যোগ দিতে।

“আমিও থাকতে চাই এই দলে,” হঠাৎ পাশ থেকে নতুন গলা শুনে সবাই একটু অবাক হয়ে ফিরে তাকাল। “আমার মনে হয় দুই দলেরই সার্বিক ততা¡বধানে এখানকার নেতৃস্থানীয় কারো থাকা উচিত, তা-না হলে সমস্যা হবে,” বলে রাজা মানরুর মেয়ে কালন্তি পেছন থেকে সামনে এসে ওদের বসে থাকা গোল চক্রের একেবারে কেন্দ্রে দাঁড়ালো। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শামানের দিকে। শামানও রহস্যময় সেই ধূসর জোড়া চোখের মণির গভীরে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে কী রহস্য লুকিয়ে আছে সেখানে।

“কিন্তু কালন্তি তুমি...” রাজা মানরু কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই শামান কথা বলে উঠলো।

“মাফ করবেন রাজাসাহেব,” বলে সে ধূসর মণি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ফিরে তাকাল রাজার দিকে। “আমারও মনে হয় আমার এই বিশেষ দলে এখানকার নেতৃস্থানীয় কেউ থাকলে বরং ভালোই হবে,” বলে সে আবারো দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলো ধূসর মণি জোড়াতে। “ডুকপা লামাকে খুঁজে বের করতে হলে আমাকে আগে বুঝতে হবে এখানে আসলে হচ্ছেটা কি,” বলে ও দলের বাকিদেরকে একে একে দেখলো। দলকে নিজের মতো কাজে লাগাতে হলে আগে দলের মানুষদের বুঝতে হবে, প্রত্যেকের দূর্বলতাকে ছাপিয়ে অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারলেই যেকোন দলকে সফলভাবে কাজে লাগানো সম্ভব। অন্তত ওর অভিজ্ঞতা তাই বলে।

“কথা অনেক হয়েছে, আমার মনে হয় আমরা যতো দ্রুত কাজে নামবো ততোই ভালো হবে আমাদের জন্যে,” বলে ও একটু থেমে যোগ করলো, “একমাত্র মাঠে নামলেই বোঝা যাবে প্রকৃত পরিস্থিতি।”

অধ্যায় উনিশ

বর্তমান সময়

সুরমা এলাকা, আখালিয়া, সিলেট

পরিস্থিতি হঠাৎ ঘোলাটে হয়ে উঠলেও তানভীর মাথা ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করলো ।

ডক্টর মিতায়নের বাড়ির ভেতর থেকে ভেসে আসা চিৎকারটা শোনা মাত্রই সবাই যার-যার অস্ত্র বের করে এনেছে। মূল দরজাটার একপাশে দাঁড়িয়ে আছে তানভীর, আর অন্যপাশে সুলতান আর ইকবাল। হাতের আঙ্গুল দিয়ে তিনবার ইশারা করলো তানভীর।

এক... দুই... তিন...

তৃতীয় নম্বর আঙ্গুলটা শূণ্যে উঠে আসা মাত্রই সুলতানের হাতের ধাক্কায় খুলে গেল মূল দরজা। খোলা দরজা দিয়ে এক গড়ান দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো তানভীর। দরজার ভেতরে রুমটাকে প্রায় অন্ধকারই বলা চলে। অন্যপাশের একটা আধখোলা জানালা দিয়ে হালকা আলো ভেসে আসছে, সেই আলোতে দেখা গেল দরজার অন্যপাশে ছোট একটা করিডরের মতো, সেই করিডরটা সংযুক্ত করেছে একটা খোলা বসার ঘর আর অন্যপাশে একটা খাবার কামরাকে। একবার চোখ বুলিয়ে তানভীর নিশ্চিত হয়ে গেল ভেতরে কেউ নেই। অন্যদেরকে ভেতরে ঢোকার জন্যে ইশারা করলো ও।

প্রায় একই সময়ে ওকে কভার করে ওর ঠিক পেছনে ভেতরে ঢুকলো সুলতান অর ইকবাল। সুলতানের হাতে বিরাট আকারের পয়েন্ট ফোর্টি ফাইভ বোরের পিস্তল। ওরা ভেতরে ঢুকতেই সোজা হয়ে দাঁড়ালো তানভীর সুলতানের দিকে ফিরে বলে উঠলো, "মনে হচ্ছে-" ওর কথা শেষ হবার আগেই এক চিৎকারের সাথে ওর দিকে উড়ে এলো সুলতান। ওকে নিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল, আর সাথে সাথেই তানভীর যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানকার পেছনের দরজাটায় পর পর তিনটে গর্ত হয়ে গেল, গুলির শব্দে কেঁপে উঠলো চারপাশ। একহাতে তানভীরকে ধরে প্রায় টেনে-হিঁচড়ে ওকে একটা জুতোর র্যাকের আড়ালে সরিয়ে আনলো সুলতান।

"সর্বনাশ! আরেকটু হলে..."

"ইকবালের কী হলো কে জানে," যেদিক থেকে সরে এসেছে ওরা ওদিকে তাকিয়ে ইকবালের খোঁজ করাতেই দেখতে পেলো সে একটা শোকেসের পেছনে আড়াল নিয়েছে। ইকবালকে দেখার জন্যে জন্যে মাথা বের করতেই ধাম-ধাম অরো দুটো গুলি ভেসে এসে দেয়ালের প্লাস্টার খসিয়ে দিলো। সুলতান মাথা সরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু এই জুতোর র্যাক

মোটেই নিরাপদ না। যেকোন সময় গুলির তোড়ে ভেঙে পড়তে পারে বা ওটা ভেদ করে গুলি এসে লাগতে পারে ওদের গায়ে।

"সুলতান," নিজের পিস্তল যদিও ধরে আছে শক্ত হাতে কিন্তু তানভীর দেখলো ওর পিস্তল ধরা হাত কাঁপছে।

"স্যার?" সুলতানের নিষ্কম্প গলায় বলে উঠলো।

"আমাদেরকে দ্রুত অ্যাকশনে যেতে হবে। কারণ খেয়াল করেছো একবারে একটা একটা গুলি ভেসে আসছে। এর মানে একজন গুলি করছে অন্যপাশ থেকে। আমার মনে হয়, শত্রু যারাই হোক ওরা একজনকে দিয়ে আমাদেরকে ঠেকিয়ে রেখে অন্যকিছু করছে। তাই ইমিডিয়েট অ্যাকশনে না গেলে আমরা সোর্স হারাতে পারি-"

তানভীর কথা শেষ করার আগেই অন্যপাশ থেকে দুই বার গুলি হলো সেইসাথে কাঁচ ভেঙে পড়ার শব্দ হলো। অন্যপাশের শো-কেসের আড়ালে এতোক্ষণে ইকবালকে দেখতে পেল। "স্যার, আমার মনে হয়," সুলতান কথা বলতে শুরু করার প্রায় সাথে সাথেই ওদের পাশে থাকা জুতোর র্যাকটা মড়-মড় করে উঠলো। মনে হচ্ছে যেকোন সময় ভেঙে পড়বে ওটা।

"জলদি সুলতান," তানভীরের মনে হচ্ছে র্যাকটা ভেঙে পড়লেই ওরা শেষ।

"স্যার আমি ইকবালকে নির্দেশনা দিচ্ছি, ও কোনভাবে শ্যুটারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেই আমি উঠে দাঁড়িয়ে গুলি চালাবো, আর আপনাকে ওদিকে দিয়ে," সে করিডরের একপাশে দেখালো। "আপনি ওই পর্যন্ত পৌছাতে পারবেন?"

ইকবালকে টকিতে কথাগুলো বুঝিয়ে বলতেই সে সে শো-কেসের আড়াল থেকে একদিক থেকে আরেক দিয়ে গড়ান দিলো, প্রায় সাথে সাথেই গুলি ছুটে এলো তার দিকে। এই সুযোগে সুলতান উঠে দাঁড়িয়ে টানা গুলি করতে শুরু করলো। একইসাথে তানভীর একটা গড়ান দিয়ে সরে গেল কার্পেটের ওপর দিয়ে, তারপর ঝেড়ে দৌড় দিলো শ্যুটারের দিকে। সুলতান গুলি থামিয়ে দিয়েছে তানভীরকে জায়গা করে দেয়ার জন্যে।

তানভীর শ্যুটারের কাছ পর্যন্ত পৌছাতে আর কয়েক ফিট দূরত্বে আছে এমন সময়ে দরজার আড়ালে কাউকে নড়তে দেখলো, সেইসাথে দেখতে পেলো একটা অস্ত্রের নল ঘুরে যাচ্ছে ওর দিকে। তানভীর দৌড়রত অবস্থা থেকেই লাফ দিলো শূণ্যে। শ্যুটারের বেরিয়ে আসা নলটা একহাতে ধরে ওপরের দিকে তুলে দিলো সেইসাথে ওর ছুটন্ত দেহটা বাড়ি খেল শ্যুটারের দেহের সাথে। দুজনেই ছিটকে পড়লো মাটিতে।

মাটিতে পড়েই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো ও। দেখলো মাটিতেই পড়ে আছে শ্যুটারের অস্ত্রটা। আর মুখ বাঁধা লোকটা ওকে উঠে দাঁড়াতে দেখে হামাগুড়ি দিয়ে একটা দরজার আড়ালে চলে গেল। নিজের অস্ত্র বের করে সাবধানে সেদিকে এগোল তানভীর। সেইসাথে

সুলতান আর ইকবালকে এগোনোর নির্দেশ দিলো। পাশের রুমটা একটা বেডরুম। লন্ডভন্ড রুমটাতে   কেউই নেই।

ব্যাপার কি, ব্যাটা গেল কই? ভাবতেই ভাবতেই আশেপাশে কোথাও থেকে হুটোপুটি আর মৃদু চিৎকার শুনতে পেলো। ওদের দুজনকে এগোতে ইশারা করে ও এগিয়ে গেল শব্দ লক্ষ্য করে।

বেডরুমের সাথেই লাগোয়া একটা বারান্দা। সেটার পেছনের গ্রিলের সাথে ছোট একটা দরজা এই মুহূর্তে হাট হয়ে খোলা। সেটার সামনে একটু আগের সেই শ্যুটার লোকটা দাঁড়িয়ে, তার পেছনে মুখ বাঁধা একজন মহিলাকে টানতে-টানতে দরজা দিয়ে বের করার চেষ্টা করছে অন্য একজন। তানভীরকে বারান্দায় দেখা মাত্রই একটু আগের শ্যুটার লোকটা মহিলার গলার কাছে জামা খামচে ধরে তাকে টেনে নিয়ে এলো নিজের সামনে। তানভীর পিস্তল তোলা মাত্রই তাকে ঠেলে দিলো তানভীরের দিকে।

কোনমতে নিজের অস্ত্র সামলে নিলো ও। আরেকটু হলেই পিস্তলের ট্রিগারের চাপে মহিলার মাথাটা গুড়িয়ে দিতে যাচ্ছিলো ও। তবে অস্ত্র সামলে নিতে পারলেও নিজেকে সামলাতে পারলো না ও, গায়ের ওপরে চলে আসা মহিলাকে নিয়ে উল্টে পড়ে গেল মাটিতে।

তানভীর মহিলাকে নিয়ে মাটিতে পড়েছে আর ঠিক সেইসময়েই বারান্দার এসে ঢুকলো সুলতান। গ্রিলের অন্যপাশের মানুষদের একজন বাড়ির পেছনের দেয়ার টপকে অন্যপাশে চলে গেছে, অপরজন চড়ে বসেছে দেয়ালের ওপরে। সুলতান বারান্দায় ঢুকেই সোজা গুলি করলো দেয়ালের ওপরে বসে থাকা লোকটাকে। গুলি খেয়েই হোক আর আগে লাফ দেবার কারণেই হোক লোকটা দেয়ালের অন্যপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল। সুলতান লাফিয়ে বেরিয়ে গেল গ্রিলের দরজাটার ফাঁক দিয়ে। তানভীর সোজা করে বসালো মহিলাকে। ওর সাথে এসে হাত লাগালো ইকবাল।

মহিলার মুখের আবরণ সরিয়ে দিতেই সে টেনে-টেনে শ্বাস নিতে লাগলো। মহিলার মুখের আবরণটা সরিয়েই তানভীর প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলো ভদ্রমহিলা ঠিক আছে কিনা কিন্তু তার আগেই মহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে গা গুলিয়ে উঠলো ওর। ইকবালের দিকে স্রেফ একবার তাকিয়ে কোনমতে উঠে দাঁড়ালো ও। যেই সদর দরজা দিয়ে বাড়িটাতে প্রবেশ করেছে একটু আগে সেটা দিয়ে প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে এলো বাইরে। ড্রাইভওয়ের পাশে দাঁড়িয়ে কয়েকবার মনে হলো পেটের সব উগড়ে দিবে ও। অবশেষে কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে সোজা হলো।

"বস, আপনি ঠিক আছেন?" সদ্যই সুলতান বেরিয়ে এসেছে বাংলোর ভেতর থেকে।

তানভীর একবার হাতের ইশারা করলো শুধু। "বস জল লাগবে? আপনার..." আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো সুলতান আবারো তানভীরের হাতের ইশারায় থেমে গেল।

বড়-বড় ক’রে দম নিয়ে খানিকটা স্থির হলো তানভীর। পিস্তলটা এতোক্ষণ হাতেই ধরে রেখেছে খেয়াল করেনি ও। ওটাকে হোলস্টারে ঢুকিয়ে সোজা হলো ও। আরো কয়েকবার ফ্রি স্টাইলে ব্রিদিঙের মতো করে দম নিয়ে সুলতানকে নিয়ে ফিরে এলো বাংলোর ভেতরে। তানভীরের চেহারা দেখে চুপ হয়ে আছে সুলতান। ওরা সোজা চলে এলো বাংলোর শোবার ঘরে।

ইকবাল সেই মহিলাকে বিছানায় বসিয়ে তাকে জল খেতে দিয়েছে। তানভীর সোজা এগিয়ে গেল তার দিকে। হতবিহ্বল মহিলা ওদরেকে দেখে ফিরে তাকাল। তার মুখ লাল হয়ে আছে, আর চোখ দুটো আগেই ভয়ে বড় বড় হয়ে ছিল আরো বড় হয়ে গেল খানিকটা।

তানভীর তার সামনে গিয়ে বহুকষ্টে ভাবলেশহীন গলায় বলে উঠলো, “হ্যালো, লায়লা। নাকি আমার বলা উচিত মিসেস মিতায়ন?”

লায়লার হাতে ধরা জলের গ্লাশটা টাইলস করা মেঝের ওপরে পড়ে ঠাস করে ভেঙে গেল।

অধ্যায় বিশ

সময়: ১৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ

পৃথুরা বনভূমি, কন্নোর, ভারতবর্ষ

“অনুসন্ধান-আলোকপাত-কার্যকরণ; পরিকল্পনা খুবই সহজ, আমি আগের দিনই বলেছি,” বলে শামান চোখ তুলে রাজা মানরু আর শাক্য প্রধান শঙ্করাদিত্যকে দেখে নিয়ে নিজের দলের দিকে ফিরে তাকাল। ওর নির্দেশ অনুযায়ীই প্রত্যেকে একেবারে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু নিজের দলের এই পূর্ণ প্রস্তুতি দেখেও শামানের মনের ভেতরে শান্তি নেই। ও জানে একটা দলের প্রস্তুতি আসলে তাদের অস্ত্র আর পোশাকের ওপরে নির্ভর করে না। একটা দলের সত্যিকারের প্রস্তুতি হলো, নিজেদের ভেতরে সম্প্রীতি, যেটার কোন ছায়াও এখনো এই দলের ভেতরে পড়েনি। যাই হোক, সেটা নিয়ে এখন কিছু করার নেই, আপাতত এই নিয়েই কাজে নামতে হবে।

“কিন্তু আমরা এখানে এইভাবে কাজ করি না,” শাক্য প্রধান শঙ্করাদিত্য বলে উঠলো।

শামান না চাইতেও হেসে উঠলো তার মুখের ওপরে। “আপনার কি মনে হয়, আপনারা যেখানে যেভাবে কাজ করেন এই মুহূর্তে আপনাদের এলাকায় স্বাভাবিক পদ্ধতিতে কাজ করার উপায় আছে?” বলে ও নিজের দল আর রাজা মানরুর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, “একটা ব্যাপার মনে রাখতে হবে, যদি আমরা পুরো পরিস্থিতি বিবেচনা করি তবে আমারা খুবই নাজুক অবস্থায় আছি। আমরা জানি না সঠিকভাবে আমাদের শত্রু কারা, তাদের সংখ্যা কতো, তারা আমাদের বন্দিদের কোথায় রেখেছে, সর্বোপরি তারা আসলে আমাদের ব্যাপারে কী জানে। তবে এটা মেনে বা বুঝে নিতে পারি যে শত্রুরা নামে-বেনামে-সংখ্যায়-শক্তিতে সব দিক থেকেই আমাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।”

“সে-হিসেবে বলতে গেলে এই মুহূর্তে আমাদের সবচেয়ে বড় দূর্বলতা হলো, আমাদের হাতে তথ্য নেই। সঠিক তথ্য নেই। যে-পর্যন্ত আমরা প্রয়োজনীয় তথ্য না জানতে পারছি সে-পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারছি না, কোন ব্যাপারটাতে আমাদের আসলে বেশি মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। আর সেটা না করা পর্যন্ত আমাদের সঠিক করণীয় ঠিক করাটা অসম্ভব,” বলে সে আবারো সবাইকে দেখে নিয়ে যোগ করলো, “এ-কারণেই যজ্ঞ বাবার কাছ থেকে তথ্য পাবার যে-সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে সেই ব্যাপারটা আমাদের খতিয়ে দেখা উচিত। সেটা অন্তত এভাবে চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে অনেক বেশি কাজের হবে ব'লে আমি বিশ্বাস করি,” শামানের কথা শেষ হবার পরও সবাই চুপ-চাপ বসে রইলো।

শামান আর বিধু থারুদের মাঝে আসার পর একদিন অতিবাহিত হয়েছে। প্রথম দিনই শামান নিজের দলের আর গোত্র প্রধানদের মাঝে নিজের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করে দুই গোত্র প্রধানকে অনুরোধ করে চারপাশে নিজেদের 'খবরি' বা 'গুপ্তচর' লাগানোর জন্যে। কারণ ও পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে যে চারপাশে আসলে কী হচ্ছে এটা দুই গোত্র প্রধানের কাছেও সেটা পরিষ্কার না। এরা হয়তো টুকরো-টুকরো কিছু ব্যাপারে জানে কিন্তু সম্পূর্ণ চিত্রটার ব্যাপারে কারোরই পরিষ্কার ধারণা নেই।

কাজেই ওদেরকে করণীয় ঠিক করতে হলে আগে সার্বিক পরিস্থিতি বুঝতে হবে। আর সে-জন্যেই ওদের খবর দরকার। শামানের কথা অনুযায়ী দুই গোত্র প্রধানেই নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী চারপাশে লোক লাগানোর পর প্রথম দিন কোন খবর এসে পৌছায় নি। একদিন অতিবাহিত হবার পর আজ সকালে রাজা মানরুর এক লোক খবর নিয়ে আসে, যজ্ঞ বাবা নমে এক ব্রাহ্মণ সাধু নাকি খবর পাঠিয়েছে; তার কাছে কিছু তথ্য আছে, রাজা মানরু যদি নিজের বিশ্বস্ত লোক পাঠায় তবে সে আলোচনা করতে রাজি হয়েছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে ওদেরকে যজ্ঞবাবার আস্তানায় যেতে হবে। এটা জানতে পেরে দুই গোত্র প্রধানের মধ্যে দ্বিধা দেখা দিয়েছে।

কারণ তারা বুঝতে পারছে না যজ্ঞ বাবাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করাটা ঠিক হবে কিনা। অন্যদিকে শামান এই ব্যাপারে খোঁজ-খবর করতে আগ্রহি। কারণ ও জানে ঝুঁকি না নিলে এইরকম বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ওরা কিছুই বের করতে পারবে না। আর সঠিক খবর জানতে না পারলে কিছুই করা সম্ভব নয়। আর এ-কারণেই দুই গোত্র প্রধানকে ডেকে ও নিজের সিদ্ধান্ত জানানোর পাশাপাশি নিজের পরিকল্পনার গুরুত্বটাও সবাইকে বুঝিয়ে বলেছে। এখন দেখা যাক গোত্র প্রধানেরা কী সিদ্ধান্ত নেয়।

শামানের কথা শেষ হবার পর এখনো সবাই চুপ হয়ে আছে। শামান তাকিয়ে আছে রাজা মানরুর দিকে। রাজা কিছুক্ষণ চুপ থেকে অবশেষে একটা হাত তুললো। এমনিতেই সবাই চুপ হয়েই ছিল, তাকে হাত তুলতে দেখে আরো চুপ হয়ে গেল বাকিরা।

"আমার মনে হয় লাল চুলের যোদ্ধা ঠিকই বলছে। এভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে কিছুই হবে না, বিপদ দিনে-দিনে কমবে না বরং বাড়বে। কাজেই এখনি মাঠে নামা উচিত, এমনকি ঝুঁকি থাকলেও।"

"কিন্তু..." রাজা মানরুকে কথা শেষ করতে না দিয়ে শঙ্করাদিত্য কিছু বলতে যাচ্ছিলো, তার আগেই রাজা আবারো হাত তুলে শাক্য প্রধানকে থামিয়ে দিলো।

"তারচেয়ে বড় কথা, লাল চুলের যোদ্ধা আমাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে, তাকে আমরা ডেকে এনেছি নাকি সে নিজের ইচ্ছায় এসেছে সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হলো আমাদের বিপদকে সে নিজের ব'লে মনে করছে। ঠিক যেমনটি আমি থারু হবার পরও শাক্যদের বিপদকে নিজের বিপদ মনে করছি। মানুষ হিসেবে আমাদের এটাই তো দায়িত্ব," বলে সে একটু থেমে আবারো বলতে লাগলো।

"আমার কথা হলো, লাল যোদ্ধা যদি নিজে থেকে আমাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে থাকে তবে আমাদেরও উচিত তাকে তার মতো করে কাজ করতে দেয়া। আমরা তার নিকট সাহায্য চেয়ে যদি তার হাত-পা বেঁধে দেই তবে সেই সুযোগ সে কোনভাবেই কাজে লাগাতে পারবে না। অন্তত আমার বিবেচনা তাই বলে। এছাড়া যজ্ঞবাবা ভিন্ন গোত্রের হলেও বহু বছর ধরে সে আমাদের মিত্র। কাজেই দেখা যাক সে আসলে কি বলতে চায়। তার কাছ থেকে যদি মূল্যবান কিছু আমরা উদ্ধার করতে পারি তবে সেটা আখেরে ভালোই হবে," বলে সে শামানের দিকে তাকিয়ে ইশারা করে বললো, "যোদ্ধা, আপনি নিজের মতো কাজ শুরু করুন। যেকোন প্রয়োজনে আমরা পাশে আছি। এখন থেকে আপনার দল আপনার নির্দেশেই পরিচালিত হবে।"

শামান মাথা নেড়ে তাকে ধন্যবাদ জানালো। সে দৃষ্টি উঁচু করে নিজের দলের দিকে ফিরে তাকাতে যাচ্ছিলো তার আগেই দেখতে পেল রাজার বেশ অনেকটা পেছন থেকে একটা ছায়া সরে গেল। যদিও শামান চেহারা দেখতে পায়নি তবুও ও পরিষ্কার বুঝতে পারলো মানুষটা কে। এখানকার অনেক কিছুই ও বুঝতে পারছে না, তার ওপরে আরেক রহস্য যোগ হয়েছে এই কালন্তি রহস্য। সেদিন নিজ থেকেই ওর দলে আসতে চাইলো সে, এরপর থেকেই আর কোন খবর নেই, একেবারে গায়েব। সে আসলে এমন করছে কেন, কী চায় কিছুই বুঝতে পারছে না শামান। অতো ভেবে লাভ নেই।

নিজের দলটাকে নিয়ে রাজা মানরুর বাগানের বাইরে চলে এলো ও। ওখানে ওদের যাত্রার জন্যে সারি দিয়ে ঘোড়া সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

যোদ্ধা হিসেবে বহু বছরের যাত্রায় বহু ধরণের মানুষের সাথে নানা ধরণের অভিজ্ঞতা হয়েছে ওর। তবে এবারের মতো এতোটা অসহায় এর আগে লাগেনি কখনো। অচেনা জায়গা, অচেনা মানুষ, অচেনা-অজ্ঞাত শত্রু, কার্যকরণ তো দূরে থাক, কী করবে সেটাই বুঝতে পারছে না। তার ওপরে একদল একেবারেই অচেনা মানুষকে পরিচালিত করতে হবে ওর। নিজের দলের প্রতিটা মানুষকে দেখলো ও মনোযোগ দিয়ে।

বিধু-ওর নিজের মিত্র, কিন্তু এরকম পাগলাটে মানুষ জীবনে খুব কমই দেখেছে ও। তবে তীরন্দাজ হিসেবে তার ওপরে ভরসা রাখা যায়। একদিকে থারু রাজা মানরুর লোকেরা; বাচ্চা-বাচ্চা চেহারার পাকানো শরীরের তলোয়ারবাজ- ধোয়ী, কালো মুশকো - ঘোষিতরাম, শাক্য বাহিনী থেকে আছে শঙ্করাদিত্যের খাস লোক জাথুরিয়া, জাথুরিয়ার সাথে আরেকজন হালতা-পাতলা চেহারার যুবক। সেই ধূসর সুন্দরি কালন্তি এখানে নেই, তার কথা ভেবেও লাভ নেই।

নিজের দলটাকে একবার দেখে নিলো শামান। ও যা করতে চাইছে- মানে রাজা বিক্রম আর ডুকপা লামাকে উদ্ধার করতে হলে এই দলটার ওপরে ভরসা রাখতে হবে ওর। তবে তার আগে দলটার ভরসা অর্জন করতে হবে নেতা হিসেবে, এদের প্রত্যেককে

বুঝতে হবে, জানতে হবে। আবিষ্কার করতে হবে এদের শক্তি, স্মরণে রাখতে হবে প্রত্যেকের দূর্বলতা।

“সবাইকে বলছি,” সবাইকে দেখে নিয়ে কথা শুরু করলো ও, কিছু নির্দেশনা দিতে হবে। “আমরা সবাই হয় আমাদের জন্যে শিরোধার্যদের আদেশে এখানে এসেছি, আর না হয় নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে এসেছি। হয়তো আমরা এখনে পরস্পরকে চিনি-না জানি না, তবে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কথা হলো, আমরা যদি আমাদের প্রত্যেকের লক্ষ্যে পৌছাতে চাই, তবে আমাদেরকে একসাথে কাজ করতে হবে। আমরা কে-কোন গোত্র, কে-কোথা থেকে এসেছি সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হলো, আমাদের লক্ষ্য এক, আর সেই লক্ষ্য আমাদেরকে পূরণ করতে হবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে। আমরা যদি-”

“এই যে নেতাসাহেব, আপনার মূল্যবান বক্তব্য শেষ হয়ে থাকলে আমরা কি রওনা দিতে পারি?” কালন্তি একটা সাদা ঘোড়ায় চেপে ওদের দলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সবাই ফিরে তাকাল তার দিকে। “বেলা দুপুরের ভেতরে যজ্ঞবাবার ওখানে না পৌছাতে পারলে আমাদের বিপদ আরো বাড়বে। কাজেই চলো।”

শামান কিছু না বলে একবার তাকে দেখে সবাইকে যার-যার পছন্দমতো ঘোড়া বেছে নিয়ে উঠে পড়ার জন্যে নির্দেশনা দিলো। ও নিজে পছন্দ করলো একটা কাঠালি রঙের ঘোড়া। ঘোড়াটার পিঠে চড়ে ওটার সাথে মানিয়ে নিতে নিতে ওরা সেই জলের ধারার কাছে চলে এলো। আজো ওরা জলের ধারাটার কাছে এসে দাঁড়াতেই ধীরে-ধীরে অদ্ভুত ঘড়ঘড় শব্দ করতে-করতে সেই কাঠের ভেলার মতো দেখতে পাটাতনটা উঠে এলো জলের নিচ থেকে।

শামান ঘোড়া নিয়ে বিধুর পাশে এসে দাঁড়ালো। উঠে আসতে থাকা পাটাতনটা দেখে বিধু বাচ্চা ছেলেদের মতো খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠলো। প্রত্যেকেই একে-একে পার হচ্ছে কাঠের পাটাতনটা, বিধুকে হাতের ইশারায় একটু পরে যেতে বললো শামান। অন্যরা একটু এগিয়ে যেতেই প্রথমে বিধুকে পার হতে বললো ওটা, তারপর নিজে পার হয়ে এলো শামান। “বিধু, তোর সাথে কথা আছে,” ওদের মধ্যে সম্পর্কটা এখন তুমি থেকে তুইতে নেমে এসেছে।

“বলো ওস্তাদ,” বিধুকে দেখে মনে হচ্ছে না সে খুব একটা দুঃশ্চিন্তায় আছে কিংবা পরিস্থিতি নিয়ে খুব একটা ভাবছে।

“তুই কি পরিস্থিতি বুঝতে পারছিস?” শামান আশেপাশে একবার দেখে নিলো। ওদের ঘোড়াগুলো থারুদের বসতি থেকে বেরিয়ে এসে জঙ্গলের পথ ধরে সারি দিয়ে এগোচ্ছে। ওরা দুজনেই সবার পেছনে তাই অন্য কারো শোনার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। “তুই কি বুঝতে পারছিস, আমরা কী ধরণের ঝামেলায় আছি?”

"নাহ গুরু, এক্কেরেই না," হাসিমুখে বলে উঠলো বিধু। "আমি বুঝতে পারতাছি না, বোঝার চেষ্টাও করতাছি না। কারণ একে তো এতো জটিল পরিস্থিতি বোঝার মতোন বুদ্ধি আমার নাই। আর আমি বুইঝে কী করাম, এইসব বুঝার লাইগা তুমিই তো আছো। তুমি নির্দেশ দিবা আমি ঝাঁপায়া পড়বো। তুমারে একবার গুরু মানছি, এহন তুমি মরতে কইলে হেইটা করতেও আমার আপত্তি নাই," শামানের দিকে তাকিয়ে আবারো দাঁত কেলানো একটা হাসি দিলো সে।

আনমনেই মাথা নাড়লো শামান। যোদ্ধা হিসেবে বিধু যতোটা নির্ভরযোগ্য সহজাত সঙ্গী হিসেবে ঠিক ততোটাই মূর্খ। আর এটা সে অস্বীকারও করে না। ও হলো পাগলা ঘোড়ার মতো, একবার পথ দেখিয়ে দিলে সর্বোচ্চ গতিতে ছুটতে পারবে। কিন্তু ওকে পথটা দেখাতে হবে। শামান মনে-মনে ভাবছে, ও নিজেই তো বুঝতে পারছে না আসলে পথ কোনটা আর কি করতে হবে। বিধুকে দেখাবে কি।

"ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি, তুই মাথা ঘামাতে পারবি না, তবে আমার কথা শোন," বলে ও নিজের ঘোড়াটাকে বিধুর আরেকটু কাছে নিয়ে এলো। "কয়েকটা ব্যাপার নিয়ে আমি চিন্তিত সেগুলো তোরও জেনে রাখা উচিত। কারণ কার কখন কী হয় কে জানে। মনে রাখিস আমাদের দুজনার কারো কিছু হলে ডুকপা লামাকে উদ্ধার করার দায়িত্ব অপরজনের ওপর এসে পড়বে, কাজেই তোরও কিছু ব্যাপার জেনে রাখা দরকার। বুঝতে পেরেছিস?"

বিধু হালকা মাথা চুলকে নিয়ে বলে উঠলো, "হুম, কথা ঠিক আছে।"

"প্রথম সমস্যা হলো, আমরা যেহেতু দুইজন, কাজেই আমি তোর ব্যাপারে খেয়াল রাখবো, তুই আমার ব্যাপারে রাখবি। মানে আমরা একজন আরেকজনের পিঠের দিকে খেয়াল রাখবো। মনে রাখিস তোর তীর আর আমার তলোয়ার দিয়ে আমাদের একে অপরকে পাহারা দিতে হবে।"

"হ্যাঁ, এইটা ঠিক বলছো, গুরু," বলে সে পিঠের ওপর থেকে বিরাট ধনুকটা নামিয়ে আনতে লাগলো।

একটা হাত দিয়ে তাকে থামালো শামান, "আরে গাধা এখনকার কথা বলিনি, সবসময়ের কথা বলেছি," বলেই শামান সামনে দেখলো। ঘন জঙ্গলের ভেতর দিকে বয়ে যাওয়া পথটা সামনে বাঁক নিয়েছে। দলের সামনের ভাগে সেই কালো মুশকো ঘোষিতরাম ওদেরকে কোনদিকে এগোতে হবে সেটা দেখিয়ে সামনে এগোনোর ইশারা করলো।

"এরপরের গুরুতর ব্যাপারটা হলো; কে যে আসলে আমাদের শত্রু আমরা জানি না। থারুদেরকে আমার ভালোই মনে হচ্ছে শুধু ওই মেয়েটা বাদে, কিন্তু এই ব্যাটা শাক্যদের কোন ভরসা নেই। এরা বিপদে পড়ে থারুদের সাহায্য নিয়েছে কিন্তু এরা বিশ্বাসযোগ্য না, আর এদের ভেতরেও কোন ব্যাপার আছে, এইটা আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। তার

ওপরে মনে রাখবি, প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে আমরা এদের নিজেদের ভেতরের ঝামেলায় জড়াচ্ছি কিন্তু আমাদের মূল কাজ হলো ডুকপা লামাকে উদ্ধার করা, মানে যদি উনি বেঁচে থাকেন। তারমানে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো?"

"কি?" শামানের এতো জটিল কথায় বিধুর মাথা আউলা হয়ে গেছে।

"মানে হলো, এদের সাথে আমরা যৌথভাবে বাজ করছি কারণ ডুকপা লামার ব্যাপারে খোঁজ করতে হলে এদের সাহায্য আমাদের প্রয়োজন। অন্যদিকে ওরা আমাদেরকে নিজেদের দলের ভেতরে ঢুকতে দিয়েছে কারণ আমাদেরকে ওদের প্রয়োজন, তারমানে একদিকে আমরা পরষ্পরকে সাহায্য করছি, আবার দু-দলের কেউই আমরা বন্ধু নই। তারমানে কি?" শামান থেমে যোগ করলো। "আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে। বুঝেছিস?"

আনমনেই সম্মতিসূচক মাথা নাড়লে বিধু। কতোটুকু বুঝতে পেরেছে কে জানে। "তুই ধীরে-ধীরেই এগোতে থাক," বলে ও ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দলের একেবারে সামনের ভাগে চলে এলো।

কালন্তি দলের সামনে মাথা উঁচু করে ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। তার কাছাকাছি ঘোড়াটাকে নিয়ে গেল শামান। ফিরেও তাকাল না মেয়েটা। আরেকটু কাছে গিয়ে একবার কাশি দিলো ও। কোন ভ্রƒক্ষেপ নেই। আবারো কাশি দিতে যাবে তার আগেই ওর দিকে না তাকিয়েই সে বলে উঠলো, "আমি কথা বলতে আগ্রহি নই।"

"কিন্তু আমাদের কথা বলা দরকার," শামান ওর ঘোড়াটাকে কালন্তির আরেকটু কাছাকাছি নিয়ে গেল। "বিশেষ করে যদি আমরা একসাথে কাজ করতে চাই তবে..."

"কিসের একসাথে কাজ!" শামানকে কথা শেষ করতে না দিয়ে ঝট করে ওর দিকে ফিরে তাকাল কালন্তি। "শুনুন, আমি কারো সাথেই কাজ করছি না। না কোন বেঈমান গোষ্ঠির সাথে-যারা সারাজীবন শুধু বেঈমানি করে গেছে- না কোন অচেনা যোদ্ধার সাথে-যুদ্ধ করে বেঁচে থাকাই যার পেশা," বলে সে নিজের ঘোড়াটাকে রাস্তার একপাশে সরিয়ে এনে দলটাকে সামনে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিলো। শামানও নিজের ঘোড়া একপাশে সরিয়ে আনলো। মেয়েটা রাগ দেখালেও ওর কথা শুনতে হবে ওকে, পরিস্থিতি বুঝতে হবে।

"শুনুন, শাক্যরা ক্ষমতায় যাবার পর থেকে এই এলাকায় নরক নেমে এসেছে, এমন এক নরক যা চোখে দেখা যায় না। এই কন্নোর উপত্যকায় শুধু একটা সময়েই আক্ষরিক অর্থে শান্তির হাওয়া বইতো যখন দুই বছর পর পর ডুকপা লামা এই এলাকায় পা রাখতো। তার প্রতি ভালোবাসা থেকেই আমি এখানে এসেছি। অন্য কারো জন্যে নয়।"

"আপনার বাবাই তো শাক্যদেরকে-"

"ভুল করছেন," বলে সে শামারে দিকে ঘোড়া নিয়ে এক ধাপ এগিয়ে এলো। "বাপু ভুল করছেন, আপনি এই এলাকার ইতিহাস জানেন না। আপনি জানেন না ওরা আমাদের সাথে কী করেছে।"

"কিন্তু আপনার বাবাকে আমার মোটেই বোকা মনে হয়নি, এতোবড় ভুল উনি করবেন, এটা আমার ঠিক বিশ্বাস হয়না যদি না কোন নির্দিষ্ট কারণ..." কালন্তি এগিয়ে এসে খপ করে শামানের ঘোড়ার রাশটা চেপে ধরলো তারপর একেবারে সরাসরি শামানের চোখে নিজের দৃষ্টি স্থাপন করে বলে উঠলো। "আচ্ছা আমাকে একটা কথা বলুন, এই বিশাল কন্নোর এলাকায় আমরা থারুরা সেই জঙ্গলের গভীরে গিয়ে কেন বসতি স্থাপন করেছি?"

শামান কিছু না বলে কালন্তির ধূসর দৃষ্টির গভীরে তাকিয়ে আছে। এর আগে কারো চোখের গভীরে তাকিয়ে শূণ্যে পতনের অনুভূতি হয়নি ওর কখনো। তাও এ এমন এক পতন যার কোন শেষ নেই। ধূসর অন্ধকার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলো ও। মেয়েটার প্রশ্নের জবাবে একবার স্রেফ কাঁধ ঝাঁকালো। "সেটা তো আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।"

"একই ধর্মাবলম্বি হওয়া সত্বেও বিগত বিশ বছর ধরে এই কন্নোরে শাক্যরা হলো আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু, আমাদের এমন কোন ক্ষতি নেই যা ওরা করেনি, এমনকি... যাই হোক," বলে মেয়েটা ওর ঘোড়ার রাশ ধরে টান দিয়ে সামনের দিকে এগোনোর নির্দেশ করলো। দুজনেই সামনে এগোতে শুরু করলো দুলকি চালে। মেয়েটা নিজেকে সামলে নিয়ে আবারো বলতে লাগলো, "সেই শাক্যরা বিপদে পড়া মাত্রই ওদের রঙ বদলাতে এক মুহূর্ত সময় লাগলো না।"

"তাহলে আপনার বাপু, মানে রাজা মানরু কেন মেনে নিলেন ওদের?" কিছু ব্যাপার খানিকটা পরিষ্কার হতে শুরু করেছে শামানের কাছে, তবে এখনো অনেক কিছুই ঘোলাটে। "আপনি ওনার মেয়ে হয়ে যা বুঝতে পারছেন, উনি রাজা হয়ে কি সেটা বুঝতে পারছেন না?"

"বাপু ভিন্ন এক দিক থেকে বিষয়টাকে বিবেচনা করেছে। বাপুর মতে আগে যা হয়েছে হয়েছে, কিন্তু এখন সময় পাল্টেছে। সময় এসেছে এই রক্তক্ষয়ী শত্রুতা ভুলে এক হবার, আর সেটার জন্যে বাপু এই সময়টা কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। কারণ তার মতে এই বিপদে শাক্যদের সাহায্য করার বিনিময়ে যদি তারা আবার নিজেদের সাম্রাজ্য ফিরে পেতে পারে, তবে সেই সময়ে উপত্যকায় শান্তি ফিরে আসবে। তবে আমি জানি বাপুর এই হিসেব ভুল কারণ-"

"উনি সঠিকও তো হতে পারেন, তাইনা?" শামান ঘোড়াটাকে সাবধানে সামলালো। ওরা জঙ্গুলে পথে উঁচু ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করেছে। "আপনার বাবার চিন্তাধারাটা আমি ধরতে পেরেছি। এক অর্থে উনি ঠিকই আছেন, কারণ শত্রুতার কোন শেষ নেই। শাক্যদের এই দূর্বল সময়ে তাদের সাহায্য করার বিনিময়ে যদি এই উপত্যকায় শান্তি ফিরে আসে তবে খারাপ কি?"

শামানের কথা পুরোপুরি শেষ হবার আগেই আবারো ঝলকে উঠলো কালন্তি। “কোনদিনই না। আমি ওদেরকে ভালোভাবে চিনি। ওরা দুই মুখো সাপের শরীরের মতো। লেজে ছুঁলেও কামড়াবে, মাথায় ছুঁলেও কামড়াবে, এদেরকে সামলানোর একমাত্র সমাধান ওদের মাথা কেটে ফেলা। বাপুর মতে এই বিপদে ওদেরকে সাহায্য করে এই উপত্যকায় শান্তি ফিরিয়ে আনা উচিত। আর আমার মতে এই বিপদে ওদেরকে ঝাড়ে-বংশে ধ্বংস করে এই উপত্যকায় শান্তি ফিরিয়ে আনা উচিত। আর সময় পেলে আমি সেটাই করবো,” কোন মেয়েকে এর আগে এতেটা হিংস্রভাবে হিস-হিস করে উঠতে দেখেছে কিনা শামানের মনে পড়লো না। ও আবারো মেয়েটার চোখের মণির গভীরে তাকাতেই সেই পাহাড়ের চূড়া থেকে পতনের অনুভূতিটা ফিরে এলো। সেটাকে সামলে নিয়ে ও আনমনেই বলে উঠলো, “আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না আপনি কেন এতোটা...”

“হুঁশ্,” হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলো মেয়েটা। শামান কিছু বলার চেষ্টা করতেই তাকে থামিয়ে দিলো হাতের ইশারায়।

পুরো দলটাই থেমে গেছে কোন এক অজানা কারণে। “কি ব্যাপার, হচ্ছেটা-” শামান প্রশ্ন শেষ করার আগেই এবার নিজেই শব্দটা শুনতে পেল। ঘোড়ার খুরের শব্দ, একটা-দুটো না অসংখ্য। আর শব্দটা ভেসে আসছে পাহাড়ি ঢালের অন্যপাশ থেকে। শব্দটা পরিষ্কার হতেই কালন্তি অনুচ্চ স্বরে শিস দিয়ে উঠলো। আর শামান সবাইকে ইশারা করলো ঢাল বেয়ে আবার নিচে নেমে আসতে। সবাই ঢালের এপাশে নেমে আসার প্রায় সাথে সাথেই নিজের ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে এলো শামান। ঢাল বেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করলো ওপরের অংশের দিকে।

সাপের মতো একেবেঁকে ও উঠে এলো ঢালের ওপরে। মরা পাতা আর ঝোপের দঙ্গল সরিয়ে উঁকি দিলো জঙ্গলের নিচু অংশের দিকে। ঢালটা ওদের সামনে ঢালু হয়ে নেমে গেছে নিচের দিকে। সেটার নিচু অংশের সাথেই একটা পায়ে চলা পথ। সেটার ওপরে একদল ঘোড়সওয়ার দাঁড়িয়ে আছে, পুরো দলটার দৃষ্টি তাদের ডান দিকে। ঠিক তাদের বিপরীত দিক থেকে ভেসে আসছে ঘোড়ার খুরের শব্দ- যেটা শুনে ওরা সচকিত হয়ে উঠেছিল। শামান উঁকি দেবার একটু পরেই বিপরীত দিকে থেকে অন্য দলটা এসে দাঁড়িয়ে গেল প্রথম দলটার সামনে। এই নতুন দলটা আগের দলটার ঠিক বিপরীত। আগের দলটার প্রত্যেকের পরনে ভালো পোশাক। প্রত্যেকের সাথে তলোয়ার আর বর্শা, কয়েকজনের সাথে তীর-ধনুক। এদের পায়ের পাতা থেকে শুরু করে মাথা পর্যন্ত পরিষ্কার-মজবুত আর পরিপাটি পোশাক।

আর বিপরীত দিক থেকে আসা দলটার এসবের কোন বালাই নেই। ঘোড়ায় চড়ে থাকলেও শামান দেখলো বেশিরভাগের খালি গা, নিম্নাঙ্গে ধূতি জাতীয় কিছু একটা পরনে। তবে প্রত্যেকের সাথে খাটো তলোয়ার আর তীর ধনুক। এদের চেহারাও নোংরা, প্রায় প্রত্যেক পুরুষের এলোমেলো নোংরা চুল-দাড়ি বাতাসে উড়ছে।

"লিচ্ছবী।"

নিজের পাশে থেকে ভেসে আসা ফিসফিসে গলা শুনে ফিরে তাকাল শামান। ওর মতোই নিঃশব্দে ঢাল বেয়ে উঠে এসেছে আরো কয়েকজন। ওর পাশ থেকে কালন্তি কথা বলে উঠেছে। তার কথা শুনে আরেকবার সামনে ফিরে তাকাল ও। এরাই তাহলে শাক্যদের বিদ্রোহী জাত ভাই লিচ্ছবী। কিন্তু দুই দল দুইরকম কেন? বেশি ভাবতে হলো না, তার আগেই পাশ থেকে ফিসফিস করে জবাব দিলো কালন্তি।

"লিচ্ছবীদের দুই গোত্র, একটা সরাসরি রাজা হেমচন্দ্রের বাহিনী, অন্যটা আলাদা গোত্র।"

ঢালের নিচ থেকে বিধুরা কৌতুহল নিয়ে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। ইশারায় ওদেরকে চুপ থাকতে বলে ও আবারো ফিরে তাকাল সামনের দিকে।

দুইদলের ভেতরে কথোপকথন চলছে। পরিচ্ছন্ন বাহিনীর সামনে থাকা মানুষটা লিচ্ছবীদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করলো। আর লিচ্ছবীদের প্রধান জবাবে হেসে উঠে টানা কথা বলে গেল কিছুক্ষণ। তারপর দুই দলই রাস্তাটা ধরে ফিরে চললো যেদিক থেকে এসেছে তার বিপরীত দিকে। ওরা চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত আরো কিছুক্ষণ চুপ-চাপ পড়ে রইলো ওরা। তারপর নেমে এলো ঢাল বেয়ে। শামানের মনের ভেতরে ঝড় বইছে।

শামান, কালন্তি আর জাথুরিয়া পাশাপাশি নেমে আসছিল হঠাৎ শামানের পাশ থেকে ওর একটা হাত চেপে ধরলো কালন্তি। চমকে উঠে তার দিকে ফিরে তাকাল শামান। "কি ব্যাপার...?"

"সর্বনাশ হয়ে গেছে," থেমে দাঁড়িয়েছে কালন্তি।

"কেন, কি ব্যাপার?" যদিও প্রশ্নটা করলো শামান তবে দলের প্রায় সবাই কৌতুহল নিয়ে তাকিয়ে আছে কালন্তির দিকে।

কেমন জানি উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে ছিল মেয়েটা, সে ফিরে তাকাল শামানের দিকে। "ওরা, মানে যাদেরকে এইমাত্র দেখলাম আমরা। ওরা কোনদিক থেকে এসে কোনদিকে গেল? মানে আমরা তো একটু পরে ঢালের ওপরে উঠেছি, আপনি কি দেখেছেন?"

"হ্যাঁ, দেখেছি," শামান বুঝতে পারছে না, মেয়েটা হঠাৎ এমন করছে কেন। "ওদের একটা দল দাঁড়িয়ে ছিল রাস্তার ওপরে। আর অন্য দলটা এলো ডান দিক থেকে," বলে ও হাতের ইশারায় দেখালো কোনদিক থেকে এসেছিল ওরা। "ওদিক থেকে এসে যোগ দেয় অন্যদের সাথে।"

"সর্বনাশ!" কালন্তি কিছু বলার আগেই অন্যদিক থেকে মুশকো ঘোষিত বলে উঠলো। "ওদিকেই তো যজ্ঞবাবার ডেরা।"

“তারমানে,” শামান বুঝে ফেলেছে কে-কী বলতে চাইছে। “এক্ষুণি সবাই ঘোড়ায় উঠে বসো। আপনি পথ দেখান কোনদিকে যেতে হবে। আমরা যতোটা সম্ভব দ্রুত এগোব কিন্তু সবাই সাবধান।”

সবাই ঘোড়ায় চড়ে বসতেই ওদের দলটা দ্রুত এগোল ঘোষিতরামের দেখানো পথে। এবার আর সরাসরি ঢালের ওপরে না উঠে বরং ঢালটাকে বামে সমান্তরালে রেখে ওরা দ্রুত এগোল যজ্ঞবাবার ডেরার দিকে। মাইল দেড়েক চলার পর কালন্তি ওদেরকে ঘোড়া নিয়ে ঢালের ওপরে উঠার নির্দেশ দিলো। সারি দিয়ে ওরা এঁকে-বেঁকে উঠে এলো ঢালের ওপরে। ঢালের অন্যপাশে বিস্তৃত বনভূমি। জঙ্গলের মাঝে বয়ে যাওয়া জলধারার তীরে মানুষের হাতে তৈরী কয়েকটা বাড়ি-ঘর আর মন্দিরের মতো স্থাপনা চোখে পড়লো।

“এটাই, যজ্ঞবাবার ডেরা,” ওরা ঢালের ওপরে চড়ে বসতেই কালন্তি ঘোষণার সুরে বলে উঠলো।

শামান দেখতে পেল জঙ্গুলে এলাকার ভেতরে পায়ে চলা পথটার পাশেই চমৎকার মাঠের মতো একটা জায়গা সেটার পাশেই কয়েকটা বাড়িÑঘর-মন্দির। যদিও ছোট-ছোট ঘর কিন্তু দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে অবস্থা বেশ ভালোই ওগুলোর। “যজ্ঞবাবা তো বেশ ভালোই সুখে থাকে মনে হয়,” বলে ও নিজের ঘোড়াটাকে সাবধানে এগিয়ে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলো। অন্যরাও পিছু নিলো ওর।

ঢাল বেয়ে ওরা নেমে এলো পথের ওপরে। পথটা ধরে এগোতে শুরু করতেই পেছন থেকে শিসের শব্দ শুনে ফিরে তাকাল শামান, সেই শিশু চেহারার পাকানো দড়ির মতো শরীরের লোকটা, নামটা মনে পড়ে গেল ওর, ধোয়ী। সে শিস দিয়ে উঠেছে। শামান ফিরে তাকিয়েই দেখলো ধোয়ী পথের ওপরে ঘোড়া থেকে মাটিতে নেমে কিছু একটা দেখছে। শামান তার কাছে এগিয়ে যেতেই সে একটা হাত তুলে বলে উঠলো, “দুই দল সৈন্য এগিয়ে গেছে এই পথে।”

“সেটা তোমার বের করার দরকার কি, আমরাই তো দেখলাম,” শামান কিছু বলার আগেই পেছন থেকে বলে উঠলো কালন্তি। “চলো সবাই,” দলের সবাইকে নিয়ে নিয়ে মূল পথ থেকে নেমে যজ্ঞবাবার বাড়ির পথের দিকে এগিয়ে গেল। শামানও মনে-মনে অস্থির হয়ে উঠেছে কোন একটা খবর পাবার জন্যে। ও দলের বাকিদের পেছনে এগোতে শুরু করলো। ওর পাশে চলে এলো ধোয়ী। “কিছু একটা বুঝলাম না,” বলে সে বিড়-বিড় করতে করতে পথের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করলো।

ওদের ঘোড়ার সারি যজ্ঞবাবার বাড়ির প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে এমন সময় দূর থেকে কাউকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। ঝট করে সেদিকে ফিরে মুহূর্তের ভেতরে ধনুক টেনে একটা তীর তাক করে ফেললো বিধু। তবে তার তীরটা এক হাত দিয়ে নামিয়ে দিলো কালন্তি। “ও আমাদের পরিচিত মানুষ, যজ্ঞবাবার লোক,” বলে সে লোকটার দিকে একটা হাত নাড়লো। লোকটা এখনো একইভাবে এগিয়ে আসছে।

“সবাই সাবধান,” চিৎকার না করলেও মৃদু কিন্তু দৃঢ়স্বরে বলে উঠলো শামান।

“কেন কি ব্যাপার...” কালন্তি ওর দিকে পেছন ফিরে জানতে চাইলো তবে তাকে পাত্তা না দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল শামান। “লোকটা মোটেই স্বাভাবিকভাবে হাঁটছে না,” বলেই ও ঘোড়া ছোটালো। ওর পেছনে বাকিরা। মানুষটার কাছাকাছি পৌছে প্রায় পিছলে নেমে এলো ও ঘোড়া থেকে।

এগিয়ে আসতে থাকা মানুষটা এমনিতেই টলোমলো পায়ে হাঁটছিল, ওদেরকে দেখে কিছু একটা বলার চেষ্টা করেই উল্টো হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আর সাথে-সাথেই শিউরে উঠলো ওরা।

লোকটার পিঠে অন্তত তিনটে তীর বিঁধে আছে।

অধ্যায় একুশ

সময়: ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

অর্জুন তলা, শাবিপ্রবি ক্যাম্পাস, সিলেট

"বাহ্, এই পিলারগুলো স্থায়িভাবে এখানে রেখে দিলেই পারে," লায়লার মুখে খুশি যেন উপচে পড়ছে।

"হুম্, রাখবে তোমার জন্যে!" বলে তানভীর অ্যাডাডেমিক ভবন 'এ' রেনোভেশন চলতে থাকা অংশের দিকে দেখালো। "এগুলো বিল্ডিঙের কাজের জন্যে এনেছে। কাজ শেষ হলেই নেই," বলে তানভীর লায়লার দিকে তাকিয়ে একটা হাসি দিলো। নির্মাণাধীন ক্যাফেটেরিয়াতে শুরু, তারপরে এক কিলো পথের সেই কথোপকথনে যে মৃদু হাওয়া বইতে শুরু করেছিল সেই থেকে তিন বছরের ওপরে হতে চললো ওদের প্রেম। একটা সময় ওদের অসম প্রেম শাবিপ্রবি ক্যাম্পাসে বেশ আলোড়ন তুলেছিল কিন্তু সেটাও এখন স্তিমিত। নতুন-নতুন মুখ এসেছে, তাদের সাথে-সাথে এসেছে নতুন নতুন মুখরোচক গল্প। তানভীর অনার্স শেষ করে মাস্টার্সে ভর্তি হয়েছে, আর লায়লা অনার্স-মাস্টার্স দুটোই শেষ করে সিলেটেই একটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করছে এখন।

"তোমার ভাইভা কেমন হয়েছে?" যদিও উত্তরটা ওর জানা তবুও আরেকবার জানতে চাইলো। সদ্যই গ্রীষ্মকালীন ছুটি শেষ হয়ে গতকাল ভার্সিটি খুলেছে। খোলার প্রথম দিনই লায়লার ভাইভা ছিল ডিপার্টমেন্টের লেকচারার হিসেবে। ভাইভা কেমন হয়েছে সেই উত্তরটা শুধু তানভীর নয় পুরো শাবিপ্রবি ক্যাম্পাসই জানে। কারণ রেকর্ড রেজাল্টধারী লায়লার শিক্ষক হওয়াটা স্রেফ সময়ের ব্যাপার। তাছাড়া ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে ক্যাম্পাস পর্যন্ত সবখানে লায়লাকে চেনে না এমন কেউ নেই, একভাবে বলতে গেলে শাবিপ্রবি ক্যাম্পাসে লায়লার জনপ্রিয়তা তুঙ্গে।

অন্যদিকে তানভীর একেবারেই উল্টো। ও সর্বক্ষণ আছে নিজের বইপত্র-নিজের সার্কেল আর আড্ডা নিয়ে। কিছুদিন সাংবাদিকতা করেছে, তারপর ভালো না লাগাতে ছেড়ে দিয়ে এখন নিজের মতো থাকে। শাবি ক্যাম্পাসে সবাই লায়লাকে চেনে ট্যালেন্টেড-ক্যারিয়ারিস্ট হিসেবে। আর তানভীরের ইমেজ অনেকটাই বোহেমিয়ান ধাঁচের।

লায়লা মোবাইলে কী যেন ঘাঁটছে। শাড়ি পরে এসেছে সে আজ, লাল পাড় দেয়া হালকা সবুজ রঙের জামদানি শাড়ি, ম্যাচ করা চুরি আর কপালে টিপ। মোবাইল ঘাঁটতে-ঘাঁটতেই সে ফিরে তাকাল তানভীরের দিকে। কপালের পাশ থেকে এক গোছা চুল সরিয়ে হেসে দিলো ওর দিকে তাকিয়ে। মুগ্ধ হয়ে দেখছিল তানভীর। আনমনেই ও বলে উঠলো, "তুমি অনেক পাল্টে গেছ লায়লা। সেই বুট আর জিন্স পরা রক মিউজিশিয়ান লায়লা কখন যেন পাল্টে গেল বুঝতেই পারলাম না।"

ওর দিকে তাকিয়ে ভ্রু নাচিয়ে সে জানতে চাইলো, "এটা কি ভালো নাকি খারাপ?"

"ভালো দেখেই তো আজো একইরকম ভালোবাসি," বলে তানভীর একটা হাত ধরলো ওর। "বললে না, পরীক্ষা কেমন হলো?"

আনমনেই কাঁধ ঝাঁকালো লায়লা। "পরীক্ষা যেমন হবার ছিল তেমনই হয়েছে," বলেই সে তানভীরের ধরে থাকা হাতটা আরো জোরে চেপে ধরলো। "পরীক্ষা নিয়ে আমি মোটেই উত্তেজিত নই, তারচেয়ে অন্য ব্যাপার নিয়ে আমি বেশি উত্তেজিত," বলে সে তানভীরের দিকে কৌতুহলি দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে উঠলো, "আগে বলো তোমার মিটিং কেমন হলো?"

"কিসের মিটিং?" তানভীর একটু অবাক হয়েই প্রশ্ন করলো। প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেই ওর মনে পড়লো এবারের গ্রীষ্মের ছুটিতে একজন প্রকাশকের সাথে ঢাকায় দেখা করার কথা ছিল ওর। মনের ভেতরের এতোদিনের বাসনা অবশেষে পরিপূর্ণ রূপ নিতে শুরু করেছে। লেখালেখি নিয়ে সিরিয়াসলি ভাবতে শুরু করেছে ও। সেই সূত্রেই একজন প্রকাশকের সাথে কথা বলতে গেছিল। তবে ভুলেই গেছিল ব্যাপারটা। লায়লা জানতে চাওয়াতে এখন মনে পড়লো। "ওহ্, ভুলেই গেছিলাম। মিটিং ভালো হয়েছে। সত্যি কথা হলো, আমি স্রেফ কথা বলতে গেছিলাম। যে বইটা লিখতে চাচ্ছি সেটার ব্যাপারে আলোচনা হলো। ভাবছি কয়েকদিনের ভেতরেই কাজটা শুরু করে দিবো।"

"দারুণ," বলে লায়লা নিজের নতুন কেনা ব্ল্যাকবেরি সেটটা ঘাঁটতে লাগলো। "আমিও দারুণ একটা ছুটি কাটিয়েছি," দুর্দান্ত উচ্ছ্বাসের সাথে বলে উঠলো সে। "আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর একটা ঘটে গেছে এবার।"

"তাই নাকি, কি সেটা?" তানভীর একটু অবাক হয়েই জানতে চাইলো। লায়লার জীবনে কী এমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেল যে জানতেই পারলো না। "ছুটির শেষ দিকে ক'দিন টানা তোমার মোবাইল বন্ধ ছিল," এমনিতেই বলে উঠলো ও।

"হ্যাঁ, তখুনি ঘটেছে ব্যাপারটা," বলে ও তানভীরের ধরে থাকতা হাতটা আরো জোরে চেপে ধরে আরো কাছে বসালো তানভীরকে। "তোমাকে বলিনি সারপ্রাইজ দেবো বলে। আর সারপ্রাইজটা সরাসরি দেখাবো," বলে সে নতুন কেনা সেটটা তানভীরের হাতে ধরিয়ে দিলো। "দেখো," বলে সে একটা ইমেজ ফাইল ওপেন করে দেখালো।

তানভীর ব্ল্যাকবেরীর স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে দেখলো দারুণ সাজগোজ করা লায়লাকে দেখা যাচ্ছে ছবিতে। ছবিটা দেখে তানভীরের খুশি হবার কথা কিন্তু তার পরিবর্তে কেন জানি গলা শুকিয়ে এলো ওর। কোনমতে বললো, "বাহ্, সুন্দর তো। কোথায় তুলেছো এটা?"

"আরে, আগে সবগুলো দেখো তো," বলে সে পর পর আরো কয়েকটা ছবি দেখালো। মঞ্চের ওপরে বসে আছে লায়লা কখনো একা কখনো, বান্ধবি আর কাজিনদের মাঝে। ওর সাজগোজের ধরণটা একেবারেই আলাদা। এরকম সাজগোজ মানুষ একটা ক্ষেত্রেই

করে। "কী ব্যাপার কোন বিয়েতে অ্যাটেন্ড করতে গেছিলে নাকি? জানতাম না তো," লায়লার চোখের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো তানভীর। কোথায় যেন ব্যাপারটা গোলমেলে লাগছে ওর কাছে।

এতোক্ষণ হাসি-খুশি থাকা লায়লা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলো। "তানভীর আমি কোন বিয়ে অ্যাটেন্ড করতে যাইনি। আমি বিয়ে করে ফেলেছি," বলে সে আরেকটা ছবি দেখালো। সেটাতে বরের পোশাক পরা একজন পুরুষের সাথে বসে আছে লায়লা, দেখেই বোঝা যায় বিয়ের ছবি, দুজনেই হাসি-খুশি।

লাফ দিয়ে বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো তানভীর। মোবাইল টিপে একটার পর একটা ছবি দেখতে লাগলো। সবই বিয়ের ছবি দেখলেই বোঝা যায়। "এটা কী ধরণের ফাজলামো, লায়লা? তুমি জানো আমি এরকম দুষ্টামি..."

"এটা ফাজলামো না, তানভীর," লায়লাও উঠে দাঁড়িয়েছে। "দেখ তানভীর, আমি তোমাকে পছন্দ করি কিন্তু তুমি আমার থেকে বয়সে ছোট। আমি ভার্সিটির টিচার হয়ে যাচ্ছি, আর তুমি এখনো এই প্রতিষ্ঠানেরই ছাত্র, ক্যারিয়ার নিয়ে তোমার কোন চিন্তা-ভাবনা নেই, সারাক্ষণ বই নিয়ে পড়ে থাকো..."

"প্লিজ লায়লা, বলো যা বলছো এগুলো ফাজলামো, মিথ্যে," তানভীর এগিয়ে এসে লায়লার দুইহাত একসাথে ধরে ফেললো। "প্লিজ।"

লায়লার লেন্স পরা নীল চোখের মনি পাথরের চেয়েও বেশি শক্ত। "না তানভীর, আমি সরি, আসলে বাসা থেকে চাপ দিচ্ছিলো আর আমিও..." লায়লা বলে চলেছে তানভীরের কানে কিছুই ঢুকছে না। ও ঝাপসা চোখে দেখতে পাচ্ছে ধীরে-ধীরে ওর জলতে ঢোলাটে হয়ে আসছে চোখের দৃষ্টি, সেইসাথে একটু-একটু ক'রে ঝাপসা হয়ে আসছে লায়লা।

হাতের মোবাইলটাকে সর্বশক্তিতে একটু আগে বসে থাকা কংক্রিটের ওপরে আছড়ে ফেলে ঘুরে দাঁড়ালো ও। পাগলের মতো দৌড়াতে লাগলো গোল চত্ত¡রের দিকে, গোল চত্বর পার হয়ে এক কিলো পথ ধরে দৌড়ে চললো ও।

***

বর্তমান সময়

সুরমা, আখালিয়া, সিলেট

"স্যার আপনি জানতেন, তাইনা?" তানভীর খুব শুষ্ক গলায় প্রশ্নটা করলো।

অপর প্রান্তে হাবিব আনোয়ার পাশা কোনরকম দ্বিধা ছাড়ই বলে উঠলো, "কি জানতাম আমি, তানভীর?" মুঠোফোনের অপর প্রান্ত থেকে ভেসে আসা গলা ইস্পাতের চেয়েও

কঠিন আর শীতল।

সদা-হাস্যোজ্জ্বল পাশা স্যারের এতো শীতল গলা শুনে একটু থমকে গেল তানভীর। “স্যার, লায়লা ফেরদৌস, মানে আমার... মানে সে যে ডক্টর মিতায়নের স্ত্রী, এটা আপনি জানতেন, তাই না স্যার?”

“হ্যাঁ, আমি জানতাম বললেও পুরোপুরি সত্য বলা হয়না আবার আমি জানতাম না বললেও মিথ্যে বলা হবে,” আনোয়ার পাশার গলায় খানিকটা শৈথিল্য। “এই কেসে ওপর মহল থেকে প্রথমে যখন তোমাকে ডেকে পাঠানো হয় তখন আমি কিছুই জানতাম না কিন্তু পরে আমি জানতে পারি ব্যাপারটা। কিন্তু তখন আমি বললেও তোমাকে এই কেস থেকে সরানো হত না।”

“স্যার, আপনি জানতেন এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি কতোটা... কতোটা...” তানভীরের গলা বুজে আসছে কষ্টের তীব্রতায়। “স্যার আমি, আমি আমি এই কেসে কাজ করতে পারবো না, প্রয়োজনে আমি চাকরি...”

“সাট-আপ, ইউ স্টুপিড বয়,” প্রায় আক্রোশের সাথে চেঁচিয়ে উঠলো আনোয়ার পাশা। “ইউ ফুল, তোমাকে নিয়ে আমি কতো বড়-বড় পরিকল্পনা করছি আর তুমি কিনা বোকার মতো একটা মেয়ের জন্যে নিজের জীবনের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে চাইছো। গাধা কোথাকার,” সত্যিকারের অভিভাবকের মতো ধমকে উঠলো অনোয়ার পাশা।

“তবে সত্যি কথা শোন, প্রথমে না জানলেও আমি পরে যখন জানতে পারি এই কেসে লায়লা মেয়েটা ইনভলভড আছে, আমি ইচ্ছে করেই তোমাকে জানাইনি, যাতে তুমি নিজে ব্যাপারটা আবিষ্কার করে সেটা ফেস করতে পারো। ট্রেনিং- ট্রেনিং খেলা অনেক হয়েছে। এবার মাঠে নামো। আরেকটা কথা মনে রাখবে, এই মেয়েটা একবার অল্পের জন্যে তোমার জীবনটা ধ্বংস করতে বসেছিল, তাকে আবার সেই সুযোগ দিয়ো না। এখন নাকি-কান্না বন্ধ করে নিজের কাজে লাগো। এই বিষয়ে আমি আর কোন কথা শুনতে চাইনা।”

“স্যার...” তানভীর ভীষণ আকুতির সাথে কিছু একটা বলতে চাইছিল তার আগেই কথা বলে উঠলো পাশা স্যার।

“গ্রো আপ, বয়। এখন সময় এসেছে ব্যক্তিগত ব্যাপার পাশে সরিয়ে সত্যিকারের প্রফেশনালিজম দেখানোর। কাজেই সত্যিকারের কাজ দেখাও আমাকে। মনে রাখবে তোমার ওপরে আমি অনেক বড় বাজি ধরেছি। গুড বাই,” তানভীর কিছু বলার আগেই পাশা স্যার কল কেটে দিলো ওপার থেকে।

তানভীরের মনে হলো রাগের সাথে মোবাইলটা আছড়ে ফেলে। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে জানে সেটা করে কোন লাভ নেই। ভীষণ বিরক্ত লাগছে ওর। বাংলো বাড়িটার প্রবেশ

পথের কাছে এই মুহূর্তে বেশ কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ফরেনসিক, পিবিআই আর পুলিশের গাড়ি।

কালো রঙের একটা ফরেকনিকের গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল ও, কথা শেষ হতেই মনে হলো গাড়িটার টায়ারে দুটো রাগের সাথে লাথি মারে। কিন্তু সেটাও করলো না। বরং বুক ভরে দম নিয়ে ব্রিদিং করতে-করতে গাড়ির পাশেই পায়চারি করতে শুরু করলো। নিজের ভেতরের যুদ্ধটাকে থামানোর চেষ্টা করছে। গাড়িটার অন্য পাশে আসতেই দেখলো গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ড্রাইভার সিগারেট টানছে। ওকে দেখে সিগারেট সামলাতে গেল লোকটা, তানভীর হাত নেড়ে তাকে মানা করে বরং তার হাত থেকে সিগারেটটা নিয়ে কষে দুটো টান দিলো ওটাতে। ড্রাইভারের অবাক দৃষ্টির সামনেই সিগারেটটা হাতে নিয়ে চলো এলো ও বাংলোর প্রবেশ পথের অন্যদিকে।

কমদামি সিগারেটে কষে আরেকটা টান দিতেই এবার আর নিজেকে সামলাতে পারলো না। বুক ফেটে কাশি বেরিয়ে এলো। কিছুক্ষণ কেশে একটু সুস্থির অনুভব করলো। নিজেকে একটু স্বাভাবিক লাগছে। ভেতরের রাগ আর কাশি পরস্পরের সাথে যুদ্ধ করে ওকে খানিকটা সুস্থির করে তুলেছে। সিগারেটের মোথাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো ও।

একদিকে রাগের সাথে শরীরটা জ্বলছে, আরেকদিকে মনের ভেতরে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। যে-মানুষটার সাথে ওকে এই মুহূর্তে ডিল করতে হবে সেই মানুষটা একসময় চূড়ান্ত আঘাত দিয়ে ওর জীবনটা তছনছ করে দিয়েছিল, এমনকি সেই মানুষটার জন্যেই নিজের মাস্টার্স ডিগ্রী শেষ না করে বাড়ি ফিরে গেছিল ও। এমনকি এই মানুষটার জন্যেই আর কখনো ফিরে অসেনি সিলেট। আর এখন কিনা সেই মানুষটার সাথেই কাজ করতে হবে। একবার ভাবলো সব ছেড়েছুড়ে চাকরির মায়া না করে চলে যাবে, কিন্তু পরমুহূর্তে নিজের বিবেক আর কর্তব্যবোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। গত আটটা বছর ধরে রাতদিন পরিশ্রম, ডিপার্টমেন্টের আস্থা অর্জন, সবকিছু এভাবে জলে ফেলতে পারবে না ও একজন বিশ্বাসঘাতক মানুষের জন্যে।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়াতে মৃদু হেসে উঠলো ও, এ-কারণেই তাহলে ক্যাম্পাসে সবুজ ভাই ওকে সাবধান করে দিয়েছিল এই কেসের সাথে সংশ্লিষ্ট না থাকার জন্যে।

"স্যার, আপনি ঠিক আছেন?" পাশ থেকে কেউ একজন প্রশ্ন করলো।

তানভীর ফিরে দেখলো সুলতান দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখেমুখে কৌতুহল, সেইসাথে খানিকটা উদ্বিগ্নতাও যেন, তবে নিশ্চিত হতে পারলো না ও।

"আমি..." বলে ও একটু থেমে যোগ করলো। "আমি একদম ঠিক আছি। চলেন ভেতরে যাই, মেলা কাজ বাকি এখনো। এগুলো সব সারতে হবে," ও সুলতানের সাথে সাথে দৃষ্টি না মিলিয়েই বাংলোর ভেতরের দিকে রওনা দিলো। "তারচেয়ে বড় কথা, অনেকগুলো

ঘটনা ঘটেছে, যেগুলো আসলে কিভাবে অ্যানালিসিস করা হচ্ছে তার ওপরে নির্ভর করছে বেশ কিছু ব্যাপার।”

“জি, স্যার,” সুলতানের চোখের কৌতুহলি দৃষ্টি পরিবর্তন হয়ে সেখানে যেন রহস্যের ছায়া। “স্যার, ফরেনসিক টিম কাজ অনেকটাই গুছিয়ে এনেছে। ওরা যা-যা পাবে সেই ভিত্তিতে আমাদেরকে একটা রিপোর্ট দিয়ে দিবে। ওদেরকে তদারকি করার জন্যে টমি স্যারও এসেছেন।”

“আর কিছু,” ওরা প্রায় বারান্দায় চলে এসেছে। তানভীর হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থেমে গিয়ে ফিরে তাকাল সুলতানের দিকে। এভাবে দৃষ্টি চুরি করার ব্যাপারটা ওর ঠিক পছন্দ হচ্ছিলো না। ওকে ফিরে তাকাতে দেখে সুলতানও থেমে গেল। তার চোখে আবারো ফিরে এসেছে সেই পুরনো কৌতুহল। তানভীর কিছু না বলে তাকিয়ে রইলো, সুলতানও তাই।

“স্যার, আমি আপনাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই,” সুলতানই প্রথম অস্বস্তিকর নিরবতা ভেঙে বলে উঠলো।

“কোন ব্যাপারে?”

“স্যার, ভেতরে চলেন দেখাচ্ছি,” দুজনেই আবারো বাংলোর ভেতরে এসে ঢুকলো।

বাড়ির ভেতরের অবস্থা যাচ্ছে-তাই। এবারই প্রথম তানভীর ভালোভাবে তাকিয়ে দেখলো ভেতরে। এভাবে বিধ্বস্ত হবার আগে বাড়িটা খুবই সুন্দর আর সাজানো গোছানো ছিল নিশ্চই। ভেতরে ঢুকে তানভীর দেখতে পেল ক্রাইম সিন অ্যানালিসিস ডিভিশন আর ফরেনসিকের লোকেরা কাজ করছে।

“আরে, তানভীর স্যার। আবারো দেখা হয়ে গেল আপনার সাথে,” হাস্যোজ্জ্বল মুখে ওদের দিকে এগিয়ে এলো ছোটখাট একজন মানুষ। পিঠে বিশাল আকারের একটা ব্যাগ। পরনে থৃ-কোয়ার্টার আর কালো টি-শার্ট, পায়ে সাদা কনভার্স। টি-শার্টের ওপরে ‘গেইম অব থ্রোন্স’ সিরিজের লেখক জর্জ আর-আর মার্টিনের বিরাট একটা ছবি। ছবিতে মার্টিনের চোখ জোড়া আগুনের গোলার মতো জ্বলছে, ঠিক তার নিচেই লেখা, ‘আই অ্যাম দ্য রিয়েল ইভিল’।

“টমি পোদ্দার,” শেষ শব্দটা একটু বেশিই জোর দিয়ে উচ্চারণ করলো তানভীর। “কাজ কেমন চলছে?”

“ভালোই চলছে, এখনো তেমন কিছু উদ্ধার করতে পারিনি, তবে আধা ঘন্টার ভেতরে বাকি কাজটুকু শেষ করতে পারলে আশা করি দেখানোর মতো কিছু একটা পাবো আমরা,” টমি এতো আনন্দের সাথে ব্যাপারটা বলছে তানভীরের মনে হচ্ছে দিনের সবচেয়ে মজার ঘটনা ব্যাখ্যা করছে সে।

এরকম আনন্দের সাথে কেউ কথা বললে তার সাথে বেশিক্ষণ মুখ গোমড়া করে থাকা যায় না। তানভীরও মৃদু হাসি দিয়ে বলে উঠলো, "কাজ করেন তাহলে," বলে সুলতানের দিকে ইশারা করলো, কী দেখাতে চায় সে।

তানভীরের ইশারা দেখতে পেয়ে সুলতান টমির দিকে ফিরে জানতে চাইলো, "জিনিসটা কোথায় রেখেছেন?"

"অহ, ওইটা এভিডেন্স বাক্সে রাখা হয়েছে মনে হয়। আপনি ওই রুমে গিয়ে ছেলেটাকে বললেই দেখাবে," সুলতানের দিকে ফিরে কথাগুলো বলে টমি তার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেল।

আর তানভীরকে নিয়ে সুলতান চলে এলো পাশের রুমে। একটু আগে এখানেই সেই শ্যুটারকে আরেকটু হলে ধরে ফেলেছিল তানভীর। শ্যুটারের ওপরে লাফিয়ে পড়ার সেই স্মৃতিটা মনে পড়তেই একটু শিউরে উঠলো ও।

"স্যার, এই দেখুন জিনিসটা," প্লাস্টিকের এভিডেন্স ব্যাগের ভেতরে একটা পেটমোটা হ্যান্ডগান রাখা। সম্ভবত এই বন্দুকটা দিয়েই সেই শ্যুটার গুলি করছিল। "এটা কি সেই লোকটার বন্দুক নাকি, একটু আগে গুলি করছিল যে?"

"জি, স্যার, একটা মজার জিনিস দেখাই," বলে সে প্যাকেট খুলে জিনিসটা বের করে আনলো। জিনিসটা বন্দুক আর পিস্তলের মাঝামাঝি একটা অস্ত্র। "স্যার, এটা একটা বিশুদ্ধ হ্যান্ডগান।"

"মানে কি?" কেউ একজন ওর দিকে এক জোড়া প্লাস্টিকের গ্লাভ এগিয়ে দিতে, সেগুলো পরে নিয়ে জিনিসটা হাতে নিলো ও। জিনিসটাতে ছোট একটা হাতল ছিল একসময় সেটা কেটে ফেলা হয়েছে, সম্ভবত নলটাও বেশ লম্বা ছিল, সেটাও কেটে ছোট করা হয়েছে। ট্রিগার ম্যাকানিজম সবই ঠিক আছে কিন্তু সেটার সাথে আবার আলগা দেখতে পেটমোটা কিছু একটা লাগানো হয়েছে। "এটা এমন কেন?"

সুলতানকে দেখে মনে হচ্ছে তানভীরের প্রশ্নটা শুনে সে খুশি হয়ে উঠলো। "জি স্যার, আমিও ঠিক এই জিনিসটাই বলতে চাচ্ছিলাম। স্যার, এখন তো মানুষ মিউজিক শোনে ইউটিউবে আর বেশিরভাগই ব্যবহার করে দোকান থেকে কেনা স্পিকার আর হেডফোন। কিন্তু আপনার মনে আছে কিনা জানি না একটা সময় মিউজিক ছিল মানুষের কাছে নেশার মতো। যারা মিউজিকের ব্যাপারে শৌখিন ছিল তারা নিজেদের স্পিকার-মানে ডেক সেট নিজেরা বানিয়ে নিতো, তাতে অ্যামপ্লিফায়ার, সাউন্ড মিক্সার বসাতো, তার ওপরে গানের ক্যাসেটের কালেকশন ইত্যাদি- ইত্যাদি মিলিয়ে এলাহি কারবার আরকি। আমি যেটা বলতে চাইছি, একটা হলো মানুষের কাজ চলার মতো জিনিস, আরেকটা হলো শখের সাথে কাজের জিনিসকে একেবারেই নিজের মতো করে গড়ে নেয়া," বলে সে তানভীরের হাতে ধরা জিনিসটা দেখালো। "স্যার, এই জিনিসটা এরকম একজন মানুষের

শখের জিনিস। দেখুন, এটা কয়েকটা অস্ত্র মিলিয়ে বানানো হয়েছে। কাজটা যে করেছে সে অপরিসীম দক্ষ এই কাজে, কারণ কাজটা হাতে করা হয়েছে।"

"হাতে! আর ইউ শিওর?" তানভীর একটু অবাক হয়েই জানতে চাইলো।

"জি, স্যার, আমি এই লাইনেরই মানুষ। আমার কথার ওপরে ভরসা রাখতে পারেন, স্যার। অস্ত্রের বাট মানে হাতল কেটে ছোট করা হয়েছে, সেইসাথে নলটাও। আমার ধারণা ভুল না হলে এই দুটো জিনিস ছিল পুরনো আমলের একটা দোনলা বন্দুকের বডি। সেটাতে যোগ করা হয়েছে এই আলগা ম্যাগজিন," পেটমোটা জিনিসটা দেখালো সুলতান। "এটা অনেকটা পিস্তল বন্দুক আর সাব মেশিনগানের মাঝামাঝি একটা জিনিস। ক্লোজ রেঞ্জ গান ফাইটের জন্যে দুনিয়ার সেরা অস্ত্র বলা হয় নলকাটা শটগানকে। বিশ্বাস করেন স্যার, এই অস্ত্রটা নলকাটা শটগানের বাপ।"

"এই কারণেই একটু আগে একজন মানুষ একটা অস্ত্র দিয়ে তিনজনকেই আরেকটু হলে কাবু করে ফেলেছিল শ্যুটার," আনমনেই বলে উঠলো তানভীর। "সুলতান, আপনি আমাকে এতোকিছু কেন বললেন?"

"স্যার, আমার মনে হয় এইরকম স্পেসিফিকেশন মডেলের অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে এরকম মানুষ খুব কমই আছে। ঠিকমতো খোঁজ নিতে পারলে আমরা এখান থেকে একটা লিড পেতে পারি।"

"একদম ঠিক," সুলতানের আইডিয়াটা ভালো লাগলো তানভীরের। "টমিকে বলা এই ব্যাপারে খোঁজ লাগাতে।"

"কি ব্যাপার, কে খুঁজে আমাকে?" টমির তুলতুলে গলা ভেসে এলো পাশ থেকে। "স্যার, আমরা এখানকার ক্রাইম সিনের ব্যাপারগুলো প্রায় ঠিক করে ফেলেছি। আপনি চাইলে ডেমো দেখাতে পারি।"

"তার আগে আমাদের মিসেস মিতায়নের সাথে কথা বলা উচিত," সুলতান বলে উঠলো।

"পরে," তানভীর প্রায় সাথে সাথেই তাকে থামিয়ে দিলো। "আমি আগে ডেমোটা দেখে নেই, তাহলে লা... মিসেস মিতায়নের সাথে কথা বলতে সুবিধে হবে আমাদের জন্যে," কথাটা বলেই ও সুলতানের সাথে দৃষ্টি না মিলিয়েই রওনা দিলো টমির পিছু। সুলতান এক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থেকে পিছু নিয়ে চলে এলো সেই বিধ্বস্ত ডায়নিং রুমে।

ফরেনসিক টিমের বাকিদেরকে গাড়িতে অপেক্ষা করতে বলে টমি ডায়নিং টেবিলের ওপরে নিজের ল্যাপটপটা রেখে খুশিতে একবার তালি দিয়ে উঠলো, "ওক্কে, ওয়েলকাম টু..."

"টমি, সংক্ষেপে বলবে। সময় কম," তানভীর আগেই তাকে ধমক দিয়ে উঠলো একবার।

“ও,” বলে সে বেজার মুখে ল্যাপটপের বাটন টিপে কিছু একটা দেখে নিয়ে শুরু করলো। “ওকে,” বলে সে শুরু করলো। “আমি যা বলছি সেটার কিছুটা মিসেস মিতায়নের কাছ থেকে শোনা, কিছুটা ফরেনসিক আর ক্রাইম সিন অ্যানালিসস থেকে দাঁড় করার হাইপোথিসিস,” বলে সে একবার ঘড়ি দেখলো। “কয়েকদিন আগে ডক্টর মিতায়ন গায়েব হবার পর থেকেই মিসেস মিতায়ন এই বাড়িতেই অবস্থান করছিল। ডক্টর মিতায়নের অন্তর্ধান হবার একদিন পরেই মিসেস মিতায়নের ছোট ভাই আর মা এসে তার সাথে থাকা শুরু করে। তারও একদিন পর তার ছোটবোন এসে যোগ দেয় তাদের সাথে। আজ বেলা আনুমানিক দুইটার দিকে মিসেস মিতায়নের ছোট ভাই ঢাকা যাবার জন্যে বাড়ি থেকে বের হয়। তার সাথে মিসেস মিতায়নের ছোট বোন আর মাও বের হন কিছু কেনাকাটা করার জন্যে।”

তানভীর এই ব্যাপারটা নোট করে নিলো। একটা ব্যাপার ওর খটকা লাগছিল, এতো সময় থাকতে ঠিক ওরা আসার আগ দিয়েই কেন এই বাড়িতে আক্রমণ হলো সেটার একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। “তারমানে ডক্টর মিতায়ন হারিয়ে যাবার পর এই প্রথমবারের মতো মিসেস মিতায়ন একা ছিল? ঠিক?”

“একদম ঠিক, বস। তারা বেরিয়ে যাবার একটু পরেই দরজায় নক হয়। মিসেস মিতায়ন ভেবেছিল হয়তো কোন কারণে তার পরিবারের কেউ ফিরে এসেছে। সে দরজা খুলতেই কালো মুখোশধারী তিনজন মানুষ বাড়িতে ঢুকে পড়ে। অনুপ্রবেশকারীদের একজন ভদ্র মহিলাকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে বেডরুমে নিয়ে যায়। অন্য দুজন বাড়ি সার্চ করছিল এমন সময় বাংলোর বাইরে গাড়ির শব্দ শুনে সবাই সচকিত হয়ে ওঠে। অন্য দুজন মুখোশধারী দৌড়ে বেডরুমে প্রবেশ করে। তাদের একজন মিসেস মিতায়নকে আটকে রাখা লোকটাকে কিছু বলে। সাথে-সাথে জোর করে তার হা-পা-মুখ বেঁধে ফেলতে উদ্যত হয় দুজনে মিলে। অন্য লোকটা বেরিয়ে যায় বেডরুম থেকে। এই লোকটাই ডায়নিং রুম থেকে অস্ত্র হাতে আপনাদেরকে আটকে রাখে। অন্য দুজনে মিসেস মিতায়নকে বেঁধে ফেলতে উদ্যত হতেই উনি একজনের অস্ত্র ধরা হাতে লাথি মারলে তার অস্ত্র থেকে গুলি বেরিয়ে যায়।”

“মনে হয় এই গুলির শব্দটাই আমরা বাইরে থেকে শুনেছিলাম,” ইকবাল যোগ করলো।

“ঠিক। তো সেই লোক আপনাদেরকে আটকে রাখে আর এদিকে তারা মহিলাকে বেঁধে ফেলে তাকে নিয়ে পেছনের বারান্দা দিয়ে বের করে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। এরপরেরটুকু তো আপনারা জানেন,” টমি তার কথা শেষ করলো।

“ওরা এখান থেকে পালালো কিভাবে?” তানভীর মনে-মনে পুরো ব্যাপারটা অ্যানালিসিস করার চেষ্টা করছে।

“সম্ভবত বাংলোর বাইরেই তাদের জন্যে কোন গাড়ি অপেক্ষা করছিল,” টমির কথার সাথে-সাথে তানভীরের মনে পড়ে গেল বাংলোতে প্রবেশ করার সময়ে ও একটা কালো

রঙের গাড়িকে বাংলোর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল।

"কালো রঙের একটা গাড়ি," যোগ করলো তানভীর।

"হতে পারে। আপনাদের সাথে না পেরে ওরা বাংলোর পেছন দিয়ে উল্টোপাশের রাস্তায় নেমে পড়ে। সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে তারা ঢুকে পড়ে মার্লিন বিল্ডার্সের নির্মাণাধীর এলাকার ভেতরে। সেখান দিয়ে তারা আখালিয়া মেইন রোডেও যেতে পারে আবার বাগবাড়ির দিকেও যেতে পারে বাইপাস রাস্তায়। সঠিক কোনদিকে গেছে সেটা এখন বের করা খুবই কঠিন।"

"ওপাশের পুলিশ পেট্রোলকে সতর্ক কর হয়েছে গাড়িটার ব্যাপারে?" তানভীর জানতে চাইলো।

"অবশ্যই, ঘটনা ঘটার সাথে সাথেই আমি সতর্ক করে দিয়েছি," ইকবাল বলে উঠলো।

"গুড," বলে এক মুহূর্ত ভাবলো তানভীর। "আমি পরবর্তী করণীয়গুলো ঠিক করে দিচ্ছি সবাই যার-যার মতো কাজে নেমে পড়ো। প্রথমেই টমি, তুমি দুটো কাজ করবে। এই বাংলো সংশ্লিষ্ট আশেপাশের কোন বাড়িতে সিসি টিভি থাকে তবে চেক করে দেখো ওই কালো গাড়ি'র কোন ছবি বা নম্বর পাওয়া যায় কিনা। আর তুমি, সুলতানের সাথে বসে একটা অস্ত্রের ব্যাপারে খোজ করবে। সুলতান তুমি এই ব্যাপারে টমিকে ব্রিফ করো, ইন্টারনাল আর এক্সটারনাল ওয়েবে সার্চ দিয়ে বের করো ওই ব্যাপারে কিছু জানা যায় কিনা। ইকবাল," বলে সে ইকবালের দিকে ফিরে যোগ করলো।

"আপনি ফোর্সে যোগাযোগ করেন কালো গাড়ির কোন হদিস পাওয়া যায় কিনা। সেইসাথে মিসেস মিতায়ন ও তার পরিবারের জন্যে পুলিশ প্রটেকশনের ব্যবস্থা করেন," বলে ও উঠে দাঁড়ালো। "সবাই যার-যার কাজে নেমে পড়ো। আমি...আমি মিসেস মিতায়নের সাথে কথা বলতে চাই।"

"উনি, বেডরুমে আছেন, ফরেনসিকের একজন ডিউটি ডাক্তার আর নার্স তাকে পরীক্ষা করে দেখছে," টমি বলে উঠলো। তানভীর দেখলো সুলতান আর টমি ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

ওরা কি কিছু টের পেয়েছে? সুলতান অবশ্যই কিছু বুঝতে পেরেছে। ওদের কারো সাথেই ঠিকমতো দৃষ্টি না মিলিয়েই ও রুম থেকে বেরিয়ে এলো।

পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজগুলোর একটা করতে হবে ওকে এই মুহূর্তে।

অধ্যায় বাইশ

সময়: ১৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ

যজ্ঞবাবার ডেরা, কন্নোর, ভারতবর্ষ

কারো মৃত্যু অবলোকন করা সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ। এ-মুহূর্তে সেটাই করতে হচ্ছে শামানদের।

দাঁড়ানো অবস্থা থেকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া মানুষটাকে ভালোভাবে শুইয়ে দিলো শামান। বিধু এগিয়ে এসে লোকটার পিঠ থেকে টান দিয়ে একটা তীর খুলে নিলো। "এ কেমন তীর," ছোট আকারের কালো তীরটা ওদের ব্যবহৃত তীর থেকে একেবারেই আলাদা।

বিধুর কথাকে পাত্তা না দিয়ে কালন্তির দিকে ফিরে শামান জানতে চাইলো, "কে এই লোকটা? তোমরা চিনতে?"

"হ্যাঁ," কালন্তিকে কেমন জানি বিহ্বল দেখাচ্ছে। সে একবার শামানকে দেখলো সেই সাথে যজ্ঞবাবার ডেরার দিকে দেখলো। "যজ্ঞবাবার খাস লোক ও। আমরা যতোবার এখানে কোন না কোন প্রয়োজনে এসেছি প্রতিবার এই লোকটাই আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে আসতো।"

বিধু আর ঘোষিতরাম কিছু একটা বলছিল, ওদেরকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিলো শামান। উঠে দাঁড়িয়েই খাপ থেকে বের করে আনলো কাতানা। "সবাই সাবধান, ঘোড়াগুলোকে এখানেই রেখে আমরা সামনে এগোব," বলে ও যজ্ঞবাবার ডেরার দিকে দেখালো। "ওখানে আসলে কী ঘটেছে এখনো জানি না আমরা। কাজেই খুবই সাবধানে এগোবে সবাই। আমি দলের মাঝখানে অবস্থান করবো। আমার সর্ববামে থাকবে তীরন্দাজ জাথুরিয়া, আর সর্বডানে বিধু," দুই তীরন্দাজকে দলের দুই পাশে রেখে বাকিদের অবস্থান বুঝিয়ে দিয়ে ওরা ধীর পায়ে সাবধানে এগোতে লাগলো সামনের দিকে।

ডেরার আরেকটু কাছাকাছি আসতেই ওরা পরিষ্কার দেখতে পেল ডেরার এখানে-ওখানে ছোটখাট ধ্বংসযজ্ঞের চিহ্ন, দুয়েকটা পোড়া জায়গা থেকে ধোঁয়াও উঠতে দেখা গেল। কিন্তু কোথাও কোন মানুষ নেই।

"ব্যাপার কি, কোন মানুষ নাই কেরে?" ওদের ডান থেকে বিধু বলে উঠলো।

"কথা কম। কালন্তি, যজ্ঞবাবার ঘর কোনটা?" শামান জিজ্ঞেস করতেই কিছু না বলে ডেরার মাঝামাঝি ঘরের সারির ভেতরে একটা বড় ঘরের দিকে নির্দেশ করলো কালন্তি।

“যেভাবে বলেছি সেভাবে,” বলে দলের সবাইকে একবার দেখে নিয়ে সামনের দিকে এগোতে শুরু করলো শামান। বাকিরা ওর দুই পাশে, একজনের থেকে আরেকজন খানিকটা পিছিয়ে, একে অপরের দিকে নজর রাখছে, যাতে বিপদ ঘটলে সাহায্য করতে পারে। ওরা তিনটে বাড়ির মাঝখানের অপেক্ষাকৃত বড় বাড়িটার দেউরি পার হয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো, এটা আসলে ঘরের আদলে বানানো খোলা একটা মন্দির। ওরা বড় কামরাটা পার হয়ে পেছনে চলে এলো। যতো এগোচ্ছে বাড়ির ভেতরের দিকে, পেছন থেকে জলধারার কুল-কুল শব্দ ভেসে আসছে।

বড় কামরাটা পার হয়ে বাড়ির পেছনে চলে এলো ওরা। এখানে বড় একটা বেদির ওপরে কিম্ভুত দেখতে একটা মুর্তি, সেটার পাদদেশে ফুল আর অর্ঘ সাজানো। “গোমুখি,” আনমনেই বলে উঠলো জাথুরিয়া। “যজ্ঞবাবা তাহলে গোমুখি দেবীর পূজারি ছিল,” জাথুরিয়ার দিকে কেউই খেয়াল করলো না বরং বেদির নিচের লাল রঙের পাটতন ততোধিক লাল করে দিয়ে তার ওপরে পড়ে আছে প্রায় উলঙ্গ দেখতে খাটো চুল আর লম্বা দাড়িওয়ালা একজন মানুষ।

তাকে দেখেই অস্ফুট শব্দ করে সেদিকে এগিয়ে গেল কালন্তি। “যজ্ঞবাবা,” পাটাতনের ওপরে পড়ে থাকা মানুষটাকে সোজা করে শুইয়ে দিলো সে। শামান পায়ে-পায়ে এড়িয়ে গেল সেদিকে। নিজের কাতানা খাপে ঢুকিয়ে বসে পড়লো মানুষটার কাছে। বয়স্ক মোটাসোটা একজন মানুষ কপালে তিলক আঁকা। মানুষটাকে ইচ্ছেমতো প্রহার করা হয়েছে। নাক-মুখ তো বটেই শরীরের অনেক জায়গায় বড়-বড় ক্ষতচিহ্ন। এরকম ক্ষত নিয়ে কেউ বেঁচে থাকতে পারে না।

“কেউ একজন জল নিয়ে এসো,” রীতিমতো চিৎকার করে উঠলো কালন্তি। যজ্ঞবাবার নাকের কাছে আঙ্গুল নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলো শামান। পুরোপুর নিশ্চিত না হলেও ওর কছে মনে হলো বেঁচে নেই মানুষটা। ও কিছু বলতে যাবে তার আগেই একটা নারকেলের মালায় করে জল নিয়ে এলো ধোয়ী। নাকে-মুখে জল ছিটিয়ে দিলো কালন্তি। পরপর কয়েকবার জল ছিটানো হলেও কোন কাজ হলো না। কালন্তি বার বার জল ছিটিয়ে দিয়ে হতাশ হয়ে পড়েছে এমন সময় শামান দেখলো বাবার বুকের ডানপাশে কিছু একটা আটকে আছে। বুকের কাছের কাপড় সরিয়ে দেখলো ছোট একটা চাকুর মতো কিছু বিঁধে আছে ওখানে। একটা হাত বাবার বুকের ওপরে রেখে অন্য হাতে একটানে বের করে আনলো জিনিসটা।

ও ভুল ভেবেছিল, জিনিসটা আসলে চাকু না, ছোট একটা গোল চাতকির মতো। সেটার চারপাশে খাঁজ কাটা। জিনিসটা থেকে রক্ত মুছে নিয়ে ভালোভাবে দেখবে তার আগেই খক-খক করে কেশে উঠলো বাবা। প্রায় সাথে সাথে তার মাথাটা তুলে ধরলো কালন্তি। বাবা চোখ মেলে ওকে দেখলো, চিনতে পেরেছে কিনা বোঝা গেল না। বারবার নাম ধরে তাকে ডাকতে লাগলো কালন্তি। আনমনেই বিড়-বিড় করে উঠলো বাবা।

সে কী বলছে শোনার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেও পুরোপুরি বুঝতে পারলো না কালন্তি। বাবাকে আরেকবার জল খাওয়ানোর চেষ্টা করতেই সে সামনের দিকে একটা হাত তুলে দেখালো। তারপর বেশ জোরেই বলে উঠলো।

"কাল বাদে পরশু।"

উপস্থিত সবাই শুনেছে কথাটা। কালন্তিই বাবার কানের কাছে মুখ নিয়ে জানতে চাইলো, "কাল বাদে পরশু কি?"

বিড়-বিড় করতে-করতেই মাথাটা ঢলে পড়লো তার। বিহŸলের মতো একে অপরকে দেখলো শামান আর কালন্তি। "কাল বাদে পরশু কি?" এবার শামান জানতে চাইলো, কিন্তু জবাব না দিয়ে ওর হাতের দিকে তাকিয়ে রইলো কালন্তি। "ওটা কি তোমার হাতে?"

"এটা যজ্ঞবাবার বুকে বিঁধে ছিল," বলে জিনিসটা এগিয়ে দিলো ও মেয়েটার দিকে। গোল চাকতিটার মাঝখানে একটা চিহ্ন আঁকা, দুটো চোখের মতো, তার নিচে বাঁকা দুটো চোখা দাঁত। "এটাতো সাপের মুখ মনে হচ্ছে," আনমনেই বলে উঠলো শামান।

"দেখি-দেখি," বলে ওদের দিকে এগিয়ে এলো বিধু। তার হাতে ধরা সেই ছোট কালো তীরটা। সেটা সে এগিয়ে দিলো কালন্তির দিকে। ওটার কাঠের মসৃণ গায়েও একই চিহ্ন আঁকা। জিনিসটা দেখে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো কালন্তি। সাথে সাথে ডাক দিলো ধোঁয়ী আর ঘোষিতকে। দুজনকেই জিনিসটা দেখিয়ে প্রশ্ন করলো, "বুঝতে পেরেছো কিছু?"

"উরগ, এইটা তো উরগদের চিহ্ন, ওরা এইখানে আসবে কোত্থেকে?" ধোয়ীকে দেখে মনে হচ্ছে সে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছে হঠাৎ।

"হচ্ছেটা কি এখানে? কথা পরিষ্কার না করলে কিভাবে হবে?" শামান রাগের সাথে চেঁচিয়ে উঠলো। ওদের এই ফুসুর-ফুসুর কথা ওর ভালো লাগছে না।

"শামান, এই চাকতি আর তীরের গায়ে, উরগদের চিহ্ন আঁকা," কালন্তিকে দেখে মনে হচ্ছে সেও খুব দ্বিধায় ভুগছে।

কালন্তির শেষ কথাটা শুনে ওদের দিকে এক পা এগিয়ে এলো জাথুরিয়া। "তারমানে রাস্তার ওপরে অন্য দলটা আসলে লিচ্ছবীদের ভিন্ন কোন গোত্র ছিল না বরং..."

"তো কি হয়েছে, এই উরগ কারা?" শামান অবাক হয়ে জানতে চাইলো।

"উরগ বা উরঙ্গও বলা হয় এগোরে," ঘোষিত বলে উঠলো। "এরা সাপের দেবীর পূজা করে। এরা খুব ভয়ঙ্কর। আমরা জানতাম উরগরা দুনিয়া থাইক্কা হারায়া গেছে বহুত আগে। তাইলে এইহানে এই চিহ্ন ক্যান?"

“যদি উরগরা এখানে এসে থাকে তবে-” কথা শেষ না করে কালন্তি ছুটে গেল বাবার দিকে। বাবাকে উল্টে দিয়ে একটানে ছিঁড়ে ফেললো পিঠের পোশাক। মানুষটার সাদা পিঠের চামড়া পুড়িয়ে বিরাট একটা সাপের মাথা আঁকা হয়েছে।

“উরগরা এইহানেই আছে, এহনো,” হঠাৎ ধোয়ী ঘোষণার মতো বলে উঠলো। “পথের উপরে পায়ের ছাপ দেইহা আমার কেমন জানি উল্টাপাল্টা লাগতাছিল। এহন বুজতাছি আসলে আইছিল তিনদল ফিইরা গেছে দুই দল। ওরা এইহানেই আছে,” বলে সে একটানে বের করে আনলো নিজের তলোয়ার। “সবাই সাবধান।”

সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। শামান এগিয়ে গেল তার দিকে। “ধোয়ী তুমি কি নিশ্চিত?”

ওর প্রশ্নের জবাবে সে তলোয়ার উঠিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই কিছু একটা ছুটে এসে বিচিত্র শব্দ তুলে বিঁধে গেল শামানের পিঠে। শামানের মনে হলো হঠাৎ ওর পিঠে জোরে কিল মেরেছে কেউ। বুঝে ওঠার আগেই দেখলো সবাই তাকিয়ে আছে ওর পিঠের দিকে। একটা হাত দিয়ে টান দিয়ে জিনিসটা পিঠের বর্মের মতো বোনা লোহার জালের ওপর থেকে খুলে আনতেই দেখলো ছোট একটা তীর। সাথে-সাথে ও বুঝতে পারলো আসলে কী ঘটছে। ও সাবধান করে দেবার আগেই আশেপাশে আরো কয়েকটা তীর বিঁধে গেল।

চিৎকার করে সবাইকে সাবধান করে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো ও আর কালন্তি। দুজনেই কয়েক গড়ান দিয়ে সেই মুর্তির বেদীর আড়ালে চলে এলো। শামানের চোখের দিকে তাকিয়ে কালন্তি বলে উঠলো, “আমরা ফাঁদে পড়ে গেছি।”

প্রথমবারের মতো কালন্তির পরিবর্তে রাগ দেখালো শামান।

বেশ ঝাঁঝের সাথে ও বলে উঠলো, “সেটা না বললেও চলবে।”

অধ্যায় তেইশ

বর্তমান সময়

সুরমা আবাসিক এলাকা, আখালিয়া, সিলেট

শোবার ঘরের সামনে এসে বড় ক'রে দম নিলো তানভীর। শার্ট আর জ্যাকেট টেনে ঠিক করে নিলো। একবার মোবাইল বের করে দেখলো। বাস বা প্লেন জার্নির সময়ে অনেক সময় তীব্র বমি গলার কাছে এসে ঠেকে থাকলে যেরকম গা গুলাতে শুরু করে, অনেকটা সেরকম অনুভূতি হচ্ছে ওর। আনমনেই একবার ঢোক গিলে ভেতরে প্রবেশ করলো ও। কিন্তু ভেতরে কেউই নেই।

বেশ অবাক হয়েই আশেপাশে তাকাল ও, যদিও মানুষের গলার স্বর ভেসে আসছে কিন্তু বেডরুমে কেউ নেই। শব্দের উৎস অনুসন্ধান করার চেষ্টা করলো ও। সম্ভবত বেডরুমের সাথে লাগোয়া বারান্দায় আছে কেউ। বেডরুমের সাথে লাগোয়া সামনের দিকে একটা বারান্দা আছে সেটায় চলে এলো ও। বৈকালিক চা পানের জন্যে বারান্দায় টেবিল-চেয়ার পাতা। সেটাতে এই মুহূর্তে বসে আছে তিনজন মানুষ। একজন ডাক্তার, তার সাথেই নার্স আর তাদের উল্টোদিকে গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে বসে আছে মিসেস মিতায়ন ওরফে লায়লা।

বারান্দায় প্রবেশ করে ডক্টর আর নার্সের উদ্দেশ্যে সামান্য মাথা নেড়ে একটা বেতের চেয়ার টেনে বসে পড়লো তানভীর। সরাসরি লায়লার চোখের দিকে তাকিয়ে সামান্য মাথা নেড়ে যথাসম্ভব ভাবলেশহীন গলায় বলে উঠলো, "মিসেস মিতায়ন, আপনি ঠিক আছেন?"

তানভীরের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সে বলে উঠলো, "হ্যালো, তানভীর।" একদৃষ্টিতে তানভীরের দিকে তাকিয়ে আছে সে। তানভীরও তার দিকে একইরকম ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। লায়লার চোখ দুটো গর্তে বসা, বেশ শুকনো লাগছে তাকে, চেহারা যেন খানিকটা লাল। সম্ভবত একটু আগের ধাক্কা এখনো পুরোপুরি সামলাতে পারেনি সে।

"মিসেস মিতায়ন, আপনার কাছে আমার কিছু প্রশ্ন আছে," তানভীর নিজের মোবাইলের নোটপ্যাড বের করলো। "আমি তানভীর মালিক, ইমার্জেন্সি অ্যাকশন ফোর্সের মুখপাত্র হিসেবে ডক্টর মিতায়ন অন্তর্ধান কেসের তদন্ত কর্মকর্তা। আপনার হাজবেন্ড ডক্টর মিতায়ন..."

"কেমন আছো, তানভীর?" লায়লা তার হাতে ধরা পানীয়ের গ্লাসটা টেবিলের ওপরে নামিয়ে রাখলো।

কোন জবাব না দিয়ে তানভীর কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো লায়লার দিকে। যদিও তাকে এই মুহূর্তে বিধ্বস্ত লাগছে তবু এই বিধ্বস্ততার আড়ালে চাপা পড়া তার আগের সেই সৌন্দর্য এতোটুকু মলিন হয়নি। মুহূর্তের জন্যে পুরনো সব স্মৃতি ওর মাথার ভেতরে তীব্র গরমে ঠান্ডা বাতাসের ঝলকের মতো বয়ে গেল। নিজেকে সামলে নিয়ে তানভীর কঠিন গলায় বলে উঠলো, “মিসেস মিতায়ন, আমি এখানে এসেছি আমার প্রফেশনাল কাজের সূত্রে। কাজেই সব ধরণের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ব্যাপারগুলো বাদ দিয়ে কাজের কথা...”

“কাট দ্য বুলশিট, তানভীর...” ঝামটে উঠলো লায়লা। “আমি জানি তুমি আমার ওপর কী পরিমাণ রেগে আছো। কাজেই...”

“কোন রাগারাগি নেই,” তানভীরও সমান ঝাঁঝের সাথে জবাব দিলো। “মানুষ রাগ করে মানুষের ওপরে। অমানুষের সাথে আবার রাগ কিসের?” বলে ও লায়লাকে দেখলো। রাগে লাল দেখাচ্ছে তার চোখ-মুখ। ডাক্তার আর নার্স পরস্পরের ম্যধ্যে অবাক দৃষ্টি বিনিময় করছে। ওরা মনে হয় বুঝতে পারছে না আসলে কী ঘটছে এখানে।

“প্রয়োজন শেষ তো প্রিয়জন শেষ, এইতো তোমার পলিসি ছিল তাইনা?” তানভীর চেয়ার টেনে এক ধাপ এগিয়ে গেল ওর দিকে। “আমি, একটা বেকার ছেলে, নিজের পড়ালেখার ঠিক নেই, আর তখন তুমি বিশ্ববিদ্যলয়ের শিক্ষক হতে চলেছো। আমার সাথে সম্পর্ক রাখাটা তোমার জন্যে ছিল ডিসক্রেডিট, ইমেজের ব্যাপার তাইনা?” বলে ও ঝট করে উঠে দাঁড়ালো। দাঁড়ানো অবস্থায় দুইহাত টেবিলের ওপরে রেখে খানিকটা ঝুঁকে এলো লায়লার দিকে। “একবারও ভেবে দেখেছিল তোমার বেঈমানি মানুষ হিসেবে আমার ওপরে কতোটা...কতোটা বাজে প্রভাব ফেলতে পারে...”

“তানভীর তুমি একবারও কি...” লায়লা কিছু একটা বলার চেষ্টা করলো।

কিন্তু তাকে কথা শেষ করতে দিলো না তানভীর। “তুমি আমাকে স্রেফ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলে লায়লা। ময়লা আবর্জনার মতো। আমি এক বছর ঘুমাতে পারিনি। আমার নিজেকে স্রেফ এক টুকরো আবর্জনা-বাতিল জিনিস ছাড়া আর কিছু মনে হত না। কখনো ভেবে দেখেছো, নিজেকে এক টুকরো আবর্জনা মনে হলে কেমন লাগে? নিজেকে এক টুকরো ময়লা ন্যাকড়ার চেয়ে মূল্যহীন মনে হত আমার কাছে, স্রেফ ব্যবহার করে ফেলে দেয়া এক টুকরো ময়লা ন্যাকড়া...” তানভীর উঠে দাঁড়িয়ে বারান্দার গ্রিলের কাছে চলে এসেছে। “কোন মানুষের এতোটা নিচে নামা উচিত না, কোন মানুষের উচিত না কাউকে এতোটা নিচু করা...” আবেগে গলা বুজে আসছে তানভীরের। ক্ষোভ আর আবেগের জমাট বাঁধা এক বোমা মনে হচ্ছে নিজেকে। যেকোন সময় বিস্ফোরিত হতে পারে এমন এক বোমা।

“তানভীর তুমি কি কখনো আমার দিকটা ভেবে দেখেছো, কখনো কি মনে হয়েছে আমাকেও আত্মপক্ষ...” তানভীর ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলো লায়লার চোখে জল। ডাক্তার আর

নার্স বারান্দার দুজনেই অবাক চোখে দেখছে ওদের এই ইমোশনাল যুদ্ধ, সুলতান অর টমিকেও ও দেখতে পেল বারান্দার দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

“কোনই প্রয়োজন নেই,” তানভীর বলে উঠলো। “কোন দরকার নেই পুরনো বিষয় ঘাঁটাঘাটি করার। আমরা এখানে কাজে এসেছি, আর সেটাই করা উচিত আমাদের। আমি দুঃখিত,” বলে ও হাতের ইশারায় সুলতান আর টমিকে ভেতরে আসতে বললো। সুলতান ভেতরে এসে ডাক্তার আর নার্সকে পাশের রুমে অপেক্ষা করতে বলে দুজনে দুটো চেয়ার টেনে বসে পড়লো।

ওদের দিকে তাকিয়ে তানভীর বলে উঠলো, “আমি মিসেস মিতায়নের ডিটেইল ইন্টারভিউ চাই। টমি নোট রাখবে,” বলে আগের মতোই কঠিন চোখে ফিরে তাকাল লায়লার দিকে। তার ভেজা চোখদুটো ওর ভেতরে আবেগের এক ঝড় তৈরী করার চেষ্টা করতেই সেটাকে ঠেলে নিজের ভেতরে চাপিয়ে কাজে মনোযোগ দিলো ও। “মিসেস মিতায়ন-”

“লায়লা আহমেদ। ওটাই আমার নাম, আর সেটা ব্যবহার করাটাই বেটার হবে,” লায়লাও নিজেকে যথাসম্ভব আবেগহীর করার চেষ্টা করছে। টেবিলের ওপরে রাখা টিস্যু পেপার দিয়ে চোখ-মুখ মুছে নিলো সে।

“আমরা আপনার হাজবেন্ডের ব্যাপারে জানতে চাই,” তানভীরের পাশে বসা সুলতান প্রশ্ন করলো। “একেবারে ডিটেইল বললে ভালো হয়। আপনাদের পরিচয়-সম্পর্ক এসব থেকে শুরু করে উনি কেমন মানুষ, কী কাজ করতেন সেইসাথে অবশ্যই উনার অন্তর্ধানের ব্যাপারে যতোটা বিস্তারিত বলা সম্ভব।”

“আজ থেকে তিন বছরের কিছু সময় আগে এই ক্যাম্পাসেই মিতায়নের সাথে আমার পরিচয়। তখন সাস্টে আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্ট মাত্র খুলেছে। ডিপার্টমেন্ট খোলার কিছুদিন পরেই ডক্টর মিতায়ন এসে জয়েন করে ডিপার্টমেন্টে। নতুন খোলা ডিপার্টমেন্ট হিসেবে আর্কিওলজি তখন অনেক ব্যাপারেই কোলাবোরেটলি কাজ করতো অ্যানথ্রোপলজি ডিপার্টমেন্টের সাথে। আর সেই কোলাবোরেশনের দায়িত্বে ছিলাম আমি। ডক্টর মিতায়নের সাথে ওভাবেই আমার পরিচয়। বয়সে আমার থেকে বেশ বড় হলেও তার ব্যক্তিত্ব, সফলতা, অ্যাকাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড ইত্যাদি দেখে আমিই প্রথম মুগ্ধ হই বলতে দ্বিধা নেই। তার সাথে পরিচয়ের ছয় মাস পরে আমরা বিয়ে করি, সেটা আজ থেকে বছর তিনেকের কিছু কম সময় আগে হবে,” লায়লা বলে চলেছে।

লায়লার কথা শুনছিল আর একটু-একটু করে কুঁচকে উঠছিল তানভীরের ভ্রু।

“এরপর আপনারা...”

সুলতান কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তাকে থামিয়ে দিলো তানভীর। “এটা আপনার দ্বিতীয় বিয়ে?” আচমকাই প্রশ্ন করলো তানভীর।

হঠাৎ করে তানভীরের দিকে ফিরে তাকাল লায়লা, কিছু একটা যেন ধরতে পারছে সে, কোথায় যেন বড় একটা ভুল করে ফেলেছে। একটু চুপ থেকে অন্যদিকে ফিরে অনেকটা যেন আনমনেই বলে উঠলো, "না, এইটাই আমার প্রথম বিয়ে।"

কথাটা শোনার সাথে-সাথে কোন প্রতিক্রিয়া হলো না তানভীরের ভেতরে। সময় যেন খানিকটা স্লো-মোশনের মতো বয়ে যেতে লাগলো কিছুক্ষণ, তারপর ঝট করে উঠে দাঁড়ালো ও। এতেটাই জোরে যে ওর পায়ের সাথে ধাক্কা লেগে বেতের চেয়ারটা ছিটকে গিয়ে দেয়ালে বাড়ি খেলো, থর-থর করে কেঁপে উঠলো ওর সামনের টেবিলটা। সবাই তাজ্জব হয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কিন্তু লায়লার কোন বিকার নেই, সে তাকিয়ে আছে বারান্দার বাইরে।

তানভীর যখন কথা বলে উঠলো, ওর কণ্ঠস্বর শোনালো প্রায় ফিসফিসে। "তারমানে আজ থেকে প্রায় আট বছর আগে যখন তুমি আমাকে বলেছিলে তুমি ছুটির সময় বাড়িতে গিয়ে বিয়ে করে এসেছো, সেটা মিথ্যে ছিল!"

লায়লা ফিরে তাকাল তানভীরের দিকে, তার দুই চোখের মণি দু-টুকরো ঘোলাটে শ্যাওলা পড়া পাথরের মতো। সেই পাথর থেকে গড়িয়ে পড়লো জলের ধারা। কিছু না বলে সে তাকিয়ে রইলো সে তানভীরের দিকে।

"তুমি কাজটা ইচ্ছে করে করেছিলে, কারণ তুমি আমার সাথে আর সম্পর্ক রাখতে চাইছিলে না," চট করে সামনে এগিয়ে এলো ও। "তুমি আমাকে ঝেড়ে ফেলার জন্যে মিথ্যে বিয়ের ছবি দেখিয়েছিলে," চট করে এগিয়ে এসে টেবিলের ওপরে রাখা জলের গ্লাসটা তুলে নিয়ে সেটা বারান্দার দেয়ালে সর্বশক্তিতে ছুঁড়ে মারলো তানভীর।

অধ্যায় চব্বিশ

সময়: ১৮০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ

যজ্ঞ বাবার ডেরা, কন্নোর, ভারতবর্ষ

বারান্দার দিকে ছুটে আসা জিনিসগুলো কোনমতে এড়িয়ে গেল শামান।

স্রেফ হিসেবে গড়মিলের কারণে আরেকটু হলেই ওর মাথাটা ভর্তা হয়ে যেত। উরগরা নদী পাড়ের কোনদিকে অবস্থান নিয়ে ওদেরকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করছে সেটা বোঝার জন্যেই মুর্তির পেছন থেকে মাথাটা বের করেছিল ও।

নিজেতো কিছু দেখতে পায়ইনি বরং নিশ্চিত সে ধরা পড়ে গেছে ওদের চোখে। ওর মাথাটা মুর্তির আড়াল থেকে বেরুনো মাত্র খটাখট কয়েকটা ছোট ছোট তীর এসে বিঁধেছে মুর্তিটার চারপাশে। সাথে-সাথে মাথা সরিয়ে নেয় শামান কিন্তু উরগদের তীর লেগে দেবী মুর্তির একটা অংশ ভেঙে পড়ে ঠিক যেখানে শামানের মাথাটা ছিল সেখানে। কিন্তু ওটাকে ভেঙে পড়তে দেখে শামানকে টান দিয়ে সরিয়ে নেয় কালন্তি।

"চোখের মাথা খেয়েছো নাকি, যোদ্ধা?" মুখ ঝামটা দিয়ে বলে ওঠে সে। শামান কিছু না বলে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ মাথা নাড়ে একবার স্রেফ। উঁকি দিয়ে উরগদের দেখা না পেলেও নিজের লোকেরা কে-কোথায় লুকিয়ে আছে এটা দেখতে পেরেছে ও। মনে-মনে হিসেব করে দেখলো, ধোয়ী আর ঘোষিতকে ও দেখেছে বারান্দার একটা ভেঙে পড়া দোলনার অড়ালে লুকিয়ে আছে, অন্যদিকে বিধু, জাথুরিয়া আর জাথুরিয়ার দলের অন্য লোকটাকে দেখেছে বারান্দায় পড়ে থাকা একটা জলচৌকি উল্টে সেটার আড়ালে লুকিয়েছে।

"আমরা এখন কি করাম?" ওপাশ থেকে বিধুর চিৎকারের সাথে সাথে খটাখট শব্দ ভেসে এলো। ওরা কথা বলে উঠতেই আবারো তীর এসে লেগেছে ওরা যে চৌকির আড়ালে লুকিয়ে আছে সেটাতে। শামান দ্রুত চিন্তা করছে। উরগরা আছে জলাধারের দিকে, এই বারান্দায় ওরা নড়লেও তারা তীর মারছে। তারমানে ওদেরকে এখানে আটকে রাখতে চাইছে ওরা। উরগরা যদি ওদেরকে এখানে আটকে রাখতে চায় তবে অবশ্যই এর পেছনে কোন কারণ আছে।

তারমানে উরগরা যে উদ্দেশ্যেই ওদেরকে এখানে আটকে রাখুক না কেন দ্রুত এই বলয় থেকে বেরুতে না পারলে খবর আছে। শামান মুর্তির বেদীর আড়াল থেকে সামান্য উঁকি দিয়ে বারান্দা আর জলাধারের দিকে চোখ বুলালো। এখান থেকে বেরুবার পথ আছে দুটো। যে দরজা দিয়ে ওরা প্রবেশ করেছে সেটা, আরেকটা হলো জলাধারের দিকে। জলাধারের দিকে উরগরা আছে, আর যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছে সেটা নিশ্চই ওরা

তীরের নিশানা দিয়ে আগলে রেখেছে। তারমানে এখান থেকে বেরুতে হলে উরগদের দৃষ্টি সরাতে হবে। আর সেটা খুব সহজ হবে না।

পুরো বারান্দা আর জলাধারের দিকটা হালকা চোখ বুলিয়ে শামান চিৎকার করে বিধুকে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই জলাধারের দিক থেকে কিছু একটা উড়ে এসে বিঁধে গেল বারান্দার মাঝামাঝি থামের ওপরে। প্রায় একই সময়ে আরেকটা একইরকম জিনিস উড়ে এসে বিঁধলো ওরা যে-দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিল সেটাতে। দুটো বর্শাই জায়গামতো বিঁধার সাথে সাথে ওটা থেকে কিছু একটা খুলে মাটিতে পড়ে ফেটে গেল।

জিনিসটা ফাটতেই বিশ্রী গন্ধ ভক করে বাড়ি মারলো ওদের নাকে। শামান ভালো করে দেখার জন্যে বেদীর আড়াল থেকে উঁকি দিলো, ওর পাশ থেকে উঁকি দিলো কালন্তি।

দুজনেই দেখতে পেল বর্শার গায়ে লেগে থাকা যে জিনিসটা মাটিতে পড়েছিল সেটা যেখানে মাটিতে পড়ে ভেঙেছে জায়গাটা থেকে মৃদু ধোঁয়ার সাথে বিশ্রী গন্ধটা বেরিয়ে আসছে। আর ধোঁয়ার ছোট কুন্ডলির ভেতরে নড়াচড়া করছে জীবন্ত কিছু। "এগুলো-" শামান কথা শেষ করার আগেই দেখলো ধোঁয়ার কুন্ডলির ভেতর থেকে হিল-হিল করে বেরিয়ে আসতে শুরু করলো সরু-সরু কালো রঙের কতোগুলো প্রাণী।

"সর্বনাশ! উরগদের আসল অস্ত্র, সাপ," আনমনেই বলে উঠলো কালন্তি।

"বলো কি! কী সাপ এগুলো?" শামান দেখলো দেড় হাত দুই হাত লম্বা সাপের দল ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে বারান্দা জুড়ে।

"রাজ, রাজবোড়া," কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠলো ধূসরি। "এই সাপে এক কামড় দিলে আর দেখতে হবে না।"

"ওস্তাদ, সাপ," বিধুর আতঙ্কিত গলা ভেসে এলো।

"সবাই চুপ, নড়াচড়া করোনা," শামান মুখে বললেও ও নিজেই ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠেছে। দ্রুত কিছু করতে না পারলে হয় সাপের কামড়ে মরতে হবে, আর না হয় উরগদের তীর কিংবা বর্শার আঘাতে। হঠাৎই সমাধানটা চোখে পড়লো ওর। কিন্তু ঝুঁকিটা ভয়ঙ্কর।

ক্ষণিকের জন্যে বারান্দা জরিপ করে নিলো ও। সাপগুলো দুইদিক থেকে বারান্দায় ছড়িয়ে পড়ছে। "বিধু, তীর প্রস্তুত রাখ," জোরে বলে উঠে কালন্তির দিকে ফিরে বললো, "আমি উরগদের নজর অন্যদিকে ফেরানোর চেষ্টা করবো, তুমি বাকিদের সাথে ওই দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে, বুঝেছো?" বলেই কালন্তির উত্তরের অপেক্ষা না করে বেদীর আড়াল থেকে গড়িয়ে বেরিয়ে এলো ও। যতো দ্রুত সম্ভব আরেক গড়ান দিয়ে চলে এলো বেদীর সামনের দিকে, বেদীর একেবারে সামনের দিকে মুর্তির পায়ের কাছে জ্বলতে থাকা একটা তেলের প্রদীপ তুলে ছুঁড়ে দিয়েই ও চেঁচিয়ে উঠলো, "বিধু।"

জ্বলন্ত প্রদীপটা দরজার দিকে ছুঁটে যাচ্ছে, নিখুঁত লক্ষ্যে বিধুর তীর সেটাকে বিদ্ধ করতেই খান-খান হয়ে ছড়িয়ে পড়লো দরজার আশেপাশে, প্রায় সাথে সাথেই আগুন ধরে গেল দরজার এখানে-ওখানে। সাথে সাথে আরেকটা প্রদীপ ছুঁড়ে দিলো ও, সেইসাথে আরেকটা। প্রতিটা প্রদীপ নিখুঁত লক্ষ্যে একটার পর একটা প্রদীপ ভেঙে খান-খান করে আগুন আর তেল ছড়িয়ে পড়লো বারান্দার এখানে-ওখানে। সেইসাথে কিল-বিল করে এগোতে থাকা সাপগুলোর কয়েকটার গায়েও আগুন ধরে গেল।

শামান মাটিতে শুয়ে একটার পর একটা প্রদীপ ছুঁড়েছে তাই উরগদের ছোড়া তীর কিছু করতে পারেনি কিন্তু কাজ শেষ হতেই দেখলো ওর হাতে গায়ে সাপ উঠে পড়েছে, প্রায় লাফিয়ে উঠে বসে কোমর থেকে একটা সাপ ঝেড়ে ফেলতেই দেখলো হাতে উঠে এসেছে একটা। ওটাকে অন্য হাত দিয়ে ছাড়াতে যাবে তার আগেই একটা ছোট তীর এসে বিঁধলো ওর হাতে। সাপটা সহ তীরটা গেঁথে রইলো কব্জির একটু ওপরে। ব্যথার চোটে আনমনেই হাত ঝাড়া দিলো ও। বারান্দার ওপরে সাপ আর আগুন মিলে এলাহি অবস্থা। চিৎকার করে বাকিদেরকে দরজার দিকে এগোতে বললো। কিন্তু উরগদের দৃষ্টি অন্য দিকে সরাতে না পারলে কয়েকজনের সমাধি রেখে যেতে হবে এখানে।

"সবাই দরজার দিকে এগোও," বলেই অন্যদের দিকে তাকিয়ে ও বলে উঠলো, "রাজা মানরু আর অন্যদেরকে গিয়ে জানাও কাল বাদে পরশু কিছু একটা হতে যাচ্ছে," বলে শামান একহাতে নিজের কাতানা বের করে অন্যহাতে বেদীর সামনে নিবেদনের জন্যে রাখা একটা কাঠের থালা তুলে ঝেড়ে দৌড় দিলো বারান্দার বাইরের দিকে।

ঝুঁকিটা অনেক বেশি কিন্তু উরগদের সাথে সরাসরি মোকাবেলা করতে হলে এছাড়া আর উপায় নেই। লাফিয়ে মাটিতে নেমেই একটা বড় ঝোপের আড়ালে নিজেকে আড়াল করে ফেললো ও। সেইসাথে চোখ বুলালো জলাধারের পাড়ে। একটা বড় ঝোপ আর কয়েকটা বড়-বড় গাছের দঙ্গলের মতো আছে। উরগরা এদিকেই কোথাও লুকিয়ে আছে। আরেকটু ভালোভাবে দেখার জন্যে উঁকি দিতেই ধপ করে অরেকটা তীর এসে লাগলো ওর বুকের লোহার জালের বর্মের ওপরে। কিন্তু, ও দেখে ফেলেছে ঝোপের ওদিক থেকে এসেছে তীরটা। আর লুকিয়ে লাভ নেই বরং নিজের সঙ্গীদেরকে নিরাপদে পার হবার মতো সুযোগ দিতে হলে উরগদের দৃষ্টি সরাতে হবে।

কাঠের থালাটা দিয়ে শরীরের অরক্ষিত অংশটা আড়াল করে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে একটু আগে তীরটা যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে দৌড় দিলো শামান। খটাখট তীর এসে লাগছে কাঠার থালায়। পরোয়া না করে দৌড়ের গতি বাড়িয়ে দিলো ও। হঠাৎ শক্ত ধাক্কার সাথে থমকে উঠলো ও। হাতের কাঠের থালাটা ভেঙে টুকরো হয়ে পড়েছে একটা বর্শার আঘাতে। দৌড়াতে দৌড়াতেই ওটাকে ফেলে দিয়ে সামনে ঝোপের আড়ালে তিনটে ছায়া দেখতে পেল ও।

প্রাণের পরোয়া না করে একটু এগিয়েই লাফ দিয় একেবারে উরগদের ওপরে গিয়ে পড়লো। শামানকে ছুটে আসতে দেখে একজন সরে গেছিল, আর বাকি দুজনকে নিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল ও। মাটিতে পড়ে থাকা একজন খাটো পাতলা একটা তলোয়ার বের করে বসিয়ে দিতে যাচ্ছিলো ওর বুকে, সেটাকে ঠেকিয়ে দিয়ে কালো মুখোশ পরা লোকটার গলা দু-ফাঁক করে দিলো ও নিজের কাতানা দিয়ে। ঘুরে দাঁড়ানোর আগেই অন্য একজনের ছুঁড়ে দেয়া ছুরি এসে বিঁধলো বুকের লোহার জালের ওপরে। শামানের মনে হলো ওর বুকের ওপরে হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মেরেছে কেউ। পড়ে গেলেই মরতে হবে এখন। ছুড়িটা খুলে লোকটার দিকেই ছুঁড়ে মারলো ও। মানুষটা মনে হয় এতো দ্রুত প্রতিরোধ আশা করেনি, আর না হয় সে ভেবেছিল ছুরিতেই কাজ হয়ে যাবে, শামানের ছুরিটা তার হাতে গিয়ে লাগলো। তার দিকে এগোতে যাবার আগেই বিপরীত দিকে দাঁড়ানো মানুষটা কিছু একটা ছুঁড়ে মারলো ওর দিকে। ও প্রস্তুত হবার আগেই পিচ্ছিল জিনিসটা এসে ওর গলায় পেঁচিয়ে গেল।

ওটাকে ছাড়ানোর চেষ্টা করার আগেই দেখলো, সাপ ছুঁড়ে দেয়া মানুষটা খাটো ধনুকে তীর জুড়ে ছুঁড়তে যাচ্ছে ওর দিকে। গলায় পেঁচানো সাপ, আহত বুক-হাত কোন কিছুরই পরোয়া না করে কাতানা ফেলে সোজা ছুটে গেল ও লোকটার দিকে। ধনুকে তীর জুড়ে শামানের দিকে তাক করতে যাচ্ছিলো সে, তার আগেই শামান সরাসরি তার ওপরে এসে পড়লো। দৌড়ে এসে মানুষটাকে জড়িয়ে ধরে একেবারে গড়িয়ে পড়লো নদীর তীরে, সেখান থেকে জলতে।

ঘোলাটে খরস্রোতা জল সরাসরি গিলে নিলো দুজনকে। তীব্র আতঙ্কের সাথে শামান অনুভব করলো বরফের মতো ঠান্ডা জলতে মারাত্মক স্রোত। দু'জনে জড়াজড়ি করে জলতে পড়তেই স্রোতের টানে এগিয়ে গেল অনেকটা। একদিকে গায়ে ভারি পোশাক, তার ওপরে সাঁতার জানলেও জলতে একেবারেই অভ্যস্ত না শামান। সবচেয়ে বড় কথা ওর জড়িয়ে ধরা লোকটা লোহার মতো বজ্রমুষ্ঠিতে ধরে রেখেছে ওর গলা। বরফ ঠান্ডা জলতে খড়কুটোর মতো ভেসে যেতে-যেতে দুজনের লড়াই তুঙ্গে উঠলো।

শামান লোকটাকে ছেড়ে দিলেও সে শামানের গলা সে এমনভাবে ধরেছে মনে হচ্ছে কণ্ঠার হাড় খুলে না আনা পর্যন্ত কিছুতেই ছাড়বে না। শামান নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে লোকটার মুখ ঘুসি মারার চেষ্টা করলো, সেটা লাগলো না। অন্যহাতে পেটে ঘুসি মেরে নিজেই ব্যথা পেল, লোকটাও ওর মতোই কিছু একটা পরে আছে পোশাকের নিচে। ছুরি বা তলোয়ারেও কাজ হবে না বুঝতে পারলো শামান। আর ওগুলো ব্যবহারও করতে পারবে না ও এই অবস্থায়। আর ব্যবহার করবে কি, গলায় লোকটার হাতের চাপে মনে হচ্ছে যেকোন সময়ে কণ্ঠার হাড় ছিড়ে যেতে পারে। জলের টানে মুখের মুখোশ খুলে গেছে, কালো মতোন দেখতে একজন মানুষ, ঝকঝকে সাদা দাঁত বের হয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে ওর প্রাণ না নিয়ে দুই হাতে ধরে থাকা গলা ছাড়বে না।

শামান নিজের দুই হাত দুদিকে ছড়িয়ে দিলো, তারপর দুইহাত একসাথে কাছে এনে লোকটা দুই কানে থাবা মারলো দুই দিক থেকে। জলতে থাকার কারণে বেশি জোরদার হলো না, কিন্তু লোকটা যেন চমকে উঠলো, একটু আলগা হয়ে গেল গলার বাঁধান। শামান আবারো দুই হাত এক করে থাবা মারতে যাবে ওরা জলতে ভেসে যেতে যেতে একটা আলগা গাছের গুড়ির সাথে বাড়ি খেল। বিরাট গাছের গুড়িটা একেবারে সোজা এসে বাড়ি মারলো শামানের পিঠে। ওর মনে হলো মেরুদন্ড ভেঙে গেছে। এই সুযোগে লোকটা ওর গলায় চাপ আরো বড়িয়ে দিলো।

মানুষের যখন অন্তিম সময় উপস্থিত হয় মানুষ নাকি বুঝতে পারে। শামানের কাছে মনে হলো তেমন কিছু একটাই হতে যাচ্ছে। সারা জীবনে দেখা ভালো কিছু দৃশ্য মনে করার চেষ্টা করলো ও কিন্তু কাজ হলো না, শুধু কালো উরগটার বিকৃত চেহারাই চোখে ভাসছে। হঠাৎ আলগা হয়ে গেল লোকটার হাত, জলতে হালকা লালচে মেঘ দেখে শামান ভেবেছিল ওর গলার হাড় ভেঙে বুঝি রক্ত বেরিয়ে আসছে কিন্তু এখন মনে হচ্ছে রক্তটা আসলে লোকটার। প্রায় ঝটকা দিয়ে সে শামানের গলা থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিলো। শামান দেখলো লোকটার হাতে কালো কিছু একটা ঝুলে আছে।

হঠাৎ বুঝতে পারলো জলতে পড়ার আগে লোকটা ওর গলায় একটা সাপ ছুঁড়ে মেরেছিল, সেটা এতোক্ষণ নিশ্চই লোকটার হাতের চাপে পিষ্ট হচ্ছিলো, কিন্তু মারা যাবার আগে সুযোগ পেতেই ছোবল বসিয়ে দিয়েছে মানুষটার হাতে। বেশি কিছু ভাবার সময় নেই।

লোকটা নিজের হাত ছড়িয়ে নিলেও শামান একহাতে ভাসমান লোকটার পোশাক ধরে ফেললো, অন্যহাতে নিজের বাম হাতে বিঁধে থাকা তীরটা খুলে নিয়ে বসিয়ে দিলো লোকটার গলায়। শামানের দেহটা এসে বাড়ি খেল খরস্রোতা নদীর একপাশে ভেসে থাকা একটা পাথরের ওপরে। ওর মনে হলো শরীরের হাড় বুঝি সব গুঁড়িয়ে গেছে। ছুরি ফেলে দিয়ে পাথরটাকে আকড়ে ধরার চেষ্টা করলো। কিন্তু আহত বিধ্বস্ত শরীর পিচ্ছিল পাথর আর তীব্র ¯্রােত্রের সাথে বেশিক্ষণ লড়াই করতে পারলো না। ধীরে-ধীরে ডুবে যেতে শুরু করলো ও। একটা হাত বাড়িয়ে পাথরের এক কিনারা ধরার চেষ্টা করলো কিন্তু হাতটা ছুটে যাচ্ছে মনে হলো ওর কাছে। পুরোপুরি ছুটে যাবার আগেই ও অনুভব করলো সাপের মতো পিচ্ছিল কিছু একটা জড়িয়ে যাচ্ছে ওর হাতে, চোখ দুটো অন্ধকার হতে-হতে মনে মনে হেসে উঠলো ও।

সাপটা তাহলে মরেনি, নিশ্চই পাথরের ওপরে এসে পড়েছিল স্রোতের টানে, এখন ওকে শেষ করতে এসেছে। কিন্তু তার দরকার হবে না, এমনিতেই শেষ হতে যাচ্ছে ও। কব্জির ওপরে চেপে বসা তীক্ষ্ণ ব্যথাটা পুরোপুরি টের পাবার আগেই সব অন্ধকার হয়ে গেল ওর চোখের সামনে।

অধ্যায় পঁচিশ

বর্তমান সময়

সুরমা আবাসিক এলাকা, আখালিয়া, সিলেট

রাগের সাথে গট-গট করে হেঁটে বারান্দা থেকে বেরিয়ে এলো তানভীর। সোজা হেঁটে ও একটু আগের বিধ্বস্ত সেই ড্রইংরুমের সোফায় এসে ধপ করে বসে পড়লো।

চিন্তা-ভাবনা সব এলোমেলো লাগছে। কিছুক্ষণ দুই হাতে মুখ চেপে বসে রইলো। মন-মস্তিষ্ক কোনকিছুই ঠিক-ঠাক মতো কাজ করছে না। মুখ ঢেকে চুপ-চাপ বসে কিছুক্ষণ ব্রিদিং এক্সারসাইজ করলো ও। নিজেকে শান্ত করার জন্যে এরচেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না। কিছুক্ষণ পর অনেকটাই শান্ত হয়ে এলো উত্তপ্ত মস্তিষ্ক। আর সাথে সাথে প্রথমেই নিজেকে ধমক লাগালো ও এরকম পাগলামি করার জন্যে। সেইসাথে নিজের ভেতরের সত্তা ওকে ভৎসনা করলো এতোগুলো বছর এরকম একটা স্বার্থপর একটা অমানুষের জন্যে নিজেকে কষ্ট দেয়ার কারণে।

“স্যার, আপনি ঠিক আছেন?” ওর পাশ থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বরটা যেকোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশি কোমল। “স্যার, মিসেস মিতায়নই আপনার সেই পুরনো প্রেমিকা তাইনা?” সুলতানের প্রশ্ন শুনে তার দিকে চোখ তুলে তাকাল তানভীর। বসা অবস্থাতেই তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে উঠলো ও।

উঠে দাঁড়িয়ে সুলতানের কাঁধে একটা হাত রাখলো, তারপর আরেকটু হেসে যোগ করলো, “হ্যাঁ, ছিল। কিন্তু এখন সেটা আর কোন ব্যাপার না। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে, চলো কাজে নামি,” বলে ও এগোতে গিয়েও থেমে গেল। “আচ্ছা আমি অনেকক্ষণ ধরেই মনে হয় তোমাকে আর টমিকে তুমি বলে ডাকছি তোমাদের কোন সমস্যা নেই তো?”

সুলতানের পাথরের মতো চেহারায় যেন একটু ফাটল দেখা দিলো, অনেকে সেটাকে হাসি বলে ধরে নিতে পারে। “না, স্যার। আমার কোন সমস্যা নেই আর আমার মনে হয় না টমিরও কোন সমস্যা আছে। কারণ আমিও তাকে টমি স্যার বাদ দিয়ে টমি ডাকি।”

মৃদু হেসেই ওকে নিয়ে বারান্দায় প্রবেশ করলো তানভীর। কেউ একজন জলের গ্লাসের ভাঙা টুকরো আর জল পরিষ্কার করেছে। টমি আর লায়লা বসে কথা বলছিল, ওকে দেখে থেমে গেল। দুজনেই ফিরে তাকাল ওর দিকে। টমির চোখে-মুখে কৌতুহল। আর লায়লার চোখে যেন আবেগে সাথে খানিকটা ভয়ও দেখতে পেল তানভীর।

দুজনার দিকে তাকিয়েই মৃদু হেসে ও জানালো। “আমি এক্সট্রিমলি সরি ফর মাই বিহেভিওর। আমার মনে হয় আমরা কাজে ফিরে যেতে পারি। মিসেস লায়লা আপনি

আবার শুরু করুন প্লিজ, টমি তুমি নোট নাও।”

লায়লা একটু অবাক হয়েই তাকিয়ে আছে তানভীরের দিকে। তানভীরের হঠাৎ এই অতি-স্বাভাবিক আচরণ তার কাছে খুবই অস্বাভাবিক লাগছে। “মিতায়নের সাথে আমার পরিচয় ইত্যাদি তো বললাম, আপনারা নির্দিষ্টভাবে আর কী জানতে চাচ্ছেন একটু হিন্টস দিলে আমার জন্যে বলতে সুবিধে হবে,” লায়লা এখনো তানভীরের দিকেই তাকিয়ে আছে। সম্ভবত বোঝার চেষ্টা করছে ওর মানসিক অবস্থা।

“আসামে উনাদের প্রজেক্ট নিয়ে বলুন প্লিজ, সেইসাথে উনার হারিয়ে যাবার সময়টার ব্যাপারে যদি...” টমি নির্দিষ্ট পয়েন্টের দিকে এগোনোর চেষ্টা করছিল কিন্তু তার আগেই তানভীর একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলো।

“তার আগে আমি আপনাদের ব্যাপারে জানতে চাই, আপনাদের ভেতরে কেমন সম্পর্ক ছিল, ব্যক্তি হিসেবে ডক্টর মিতায়ন কেমন ছিলেন, এসব ব্যাপারে আমার মনে হয় একটু ধারণা থাকা উচিত, কারণ আপনি উনার স্ত্রী, আপনিই তাকে সবচেয়ে কাছ থেকে দেখেছেন,” বলে ও যোগ করলো। “আমি যতোটুকু শুনেছি আপনার সাথে বিয়ে হবার আগে উনি অন্য ধর্ম থেকে কনভার্ট করেন।”

লায়লা সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো। “হ্যাঁ, এটা সত্যি। ও আমাকে বিয়ে করার আগে অন্য ধর্ম থেকে কনভার্ট করে। আমাদের ভেতরে সম্পর্ক হবার পর বিয়ের আগে এটাই ছিল সবচেয়ে বড় বাধা। মিতায়ন অবশ্য ধর্ম-টর্ম ইত্যাদি নিয়ে নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাতো না কিন্তু আমি একেবারে গোঁ ধরে ছিলাম ও কনভার্ট না করলে বিয়ে করবো না। কাজেই আমাকে বিয়ে করতে হলে ওর জন্যে এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।”

“একটা প্রশ্ন,” বলে তানভীর টমির দিকে তাকিয়ে নোট নিতে বললো। “তারমানে আপনি বলতে চাইছেন ডক্টর মিতায়ন কনভার্ট করেন ঠিকই কিন্তু এই ব্যাপারটা নিয়ে খুব একটা সুখী ছিলেন না?”

“মোটেই আমি সেটা বলিনি,” লায়লার চোখ একটু বড় হয়ে গেছে। “আমি বলেছি আমিই বিয়ের আগে ওকে শর্ত দিয়েছিলাম আমাকে বিয়ে করতে হলে ওকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে,” বলে সে একটু যেন আনমনা হয়ে উঠলো। “আর সত্যি কথা হলো, এই ব্যাপারটা নিয়ে সুখী-দুঃখি তো পরে, এটা নিয়ে আমার মনে হয় মিতায়ন কোনদিন ভাবেওনি। স্বামী হিসেবে মিতায়ন খুবই কর্তব্য পরায়ণ, কোন ব্যাপারেই আমাকে কখনো বাধা দেয়নি, আমার কোন চাহিদাই অপূর্ণ রাখেনি, আর তাছাড়া ওর টাকা পয়সার কোন অভাব নেই, কাজেই সেদিক থেকে আমাদের কখনোই সমস্যা হয়নি কিন্তু,” বলে সে একটু থেমে গেল। কথা বলতে যেন একটু অস্বস্তি বোধ করছে। সম্ভবত পারিবারিক ব্যাপার বলেই কিনা হয়তো বলার আগে ভাবছে। ভাবারই কথা, বিশেষ করে পুরনো প্রেমিকের সামনে বর্তমান স্বামীর কোন নেতিবাচক দিক আলোচনা করতে গেলে যেকেউ দ্বিধা করবে।

“কিন্তু কি, মিসেস মিতায়ন?” তানভীর জানতে চাইলো। “শুনুন, আমরা এখানে এসেছি একেবারেই প্রফেশনাল কাজে,” সে মহিলার চোখের একেবারে গভীরে তাকাল সেই পুরনো দিনের মতো। মানুষ একই আছে, চাহনিও একই আছে, বদলে গেছে শুধু দুই চাহনির অন্তর্নিহিতি অর্থ। “আপনাকে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি আপনি আমাদের সাথে যা শেয়ার করবেন সেটা পুরোপুরি গোপন রাখা হবে। আর সেইসাথে এটাও জানিয়ে দিচ্ছি আপনার দেয়া কোন তথ্য ব্যক্তিগত কোন কাজে বা কোন কারণে আপনার বা আপনার স্বামীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে না। আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন আমার কথা?”

লায়লা মাথা নাড়লো। “বুঝতে পেরেছি। না, আমি যা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা খুব গোপন বা ব্যক্তিগত কিছু না। আসলে,” বলে সে একবার অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকালো। “মিতায়ন, মানে আমার হাজবেন্ড একেবারেই ভিন্ন ধরণের মানুষ। আমি আর কী বলবো, এটা এখন পুরো সাস্ট ক্যাম্পাস জানে। বিয়ের আগে ওকে আমার যেমন মনে হত বিয়ের পরে আমি দেখলাম ও একেবারেই ভিন্ন একজন মানুষ,” বলে সে খানিকটা হাসলো। তানভীরের মনে হলো যেন তার হাসিতে অল্প হলেও অভিমানের ক্লেশ মিশে আছে।

“আপনি একটু আগে বললেন না আমি তার স্ত্রী আমি তাকে সবচেয়ে কাছ থেকে দেখেছি, আসলে ব্যাপারটা উল্টো। আমার মনে হয় আমার চেয়ে তার কাজের লোকজন তাকে আরো অনেক বেশি কাছ থেকে দেখেছে। বিয়ের পর থেকে আমি দেখে আসছি পারিবারিক দায়িত্ব সব পালন করলেও সে পরিবারের চেয়ে তার প্রজেক্ট, তার গবেষণা এসব নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকে।”

“বুঝতে পেরেছি,” তানভীর আনমনেই মাথা নাড়লো। “এই চিত্র কি গত তিন বছর ধরে একই রকম?”

“নাহ,” মাথা নাড়লো লায়লা। “আমাদের বিয়ের প্রথম বছরে ও এতোটা ব্যস্ত ছিল না। কিন্তু দিন গেছে ওর আসামের প্রজেক্টে ব্যস্ততা বেড়েছে। আর গত এক বছর ধরে তো বলতে গেলে ও প্রায় বাসাতেই থাকতো না। বেশিরভাগ সময় ভারতেই ছিল। আর যতোদিন দেশে থাকতো তার বেশিরভাগ সময় পড়ে থাকতো কাজের জায়গায়।”

তানভীর আপনাতেই একবার সুলতানের দিকে তাকাল। সুলতানও ওর দিকে তাকিয়ে আছে। দুজনের মধ্যে চোখে-চোখে কথা হলো। তানভীর নিজের মোবাইলের টেক্সট বক্সে একটা কথা লিখে এগিয়ে দিলো সুলতানের দিকে। সুলতান সেটা পড়ে নিয়ে একবার মাথা নেড়ে লায়লার দিকে ফিরে প্রশ্ন করলো, “আমরা মনে হয় ব্যাপারটা অনুধাবন করতে পেরেছি। আপনি বলতে চাইছেন ডক্টর মিতায়ন নিজের পরিবারের চেয়ে সবসময় নিজের কাজকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিতেন, তাইতো?”

“ব্যাপারটা আসলে ঠিক তেমনও নয়। মিতায়ন এতোটাই কাজের মধ্যে ডুবে থাকতো যে আমি ওর স্ত্রী হবার পরও আমাদের মধ্যে কোথায় যেন অদৃশ্য একটা দেয়াল দাঁড় করানো

ছিল। আমি চাইলেও মিতায়নের সেই বলয়ের ভেতরে প্রবেশ করতে পারতাম না," বলে সে একটু থেমে যোগ করলো। "কিন্তু ও চাইলেও আমার যেকোন ব্যাপার নিজের মতো করে নিতে পারতো। দিন-দিন এই ব্যাপারটা যেন বাড়ছিল।"

"আচ্ছা, ওই সময়ের ব্যাপারটা বলেন," এবার তানভীর প্রশ্ন করলো। "মানে উনি যখন থেকে হারিয়ে গেলেন আরকি," বলে ও আবারো ফিরে তাকাল সুলতানের দিকে। "কি ঘটেছিল, কিভাবে ঘটেছিল, বিস্তারিত জানালে খুব ভালো হয়।"

"আশা করি আপনারা পুলিশকে দেয়া আমার বয়ান পড়েছেন বা জেনেছেন-"

লায়লার কথা শেষ করার আগেই টমি যোগ করলো, "হ্যাঁ, সেটা রেকর্ডে আছে। আপনি যা যা বলেছেন সবই খতিয়ে দেখা হয়েছে, তবে আমার মনে হয় আরেকবার আমাদের সামনে বললে আমাদের জন্যে সুবিধে হবে। সেইসাথে আরেকটু বিস্তারিত যদি বলা যায় তাহলে আরো ভালো হয় কারণ পুলিশকে আপনি কী বলেছিলেন সেটা আমি জানি না কিন্তু বয়ানে যেটা লেখা আছে সেটা খুবই সংক্ষিপ্ত।"

"ঠিক আছে, সমস্যা নেই। আমি আবারো বিস্তিারত বলছি। আপনাদেরকে আগেই বলেছি মিতায়ন গত এক বছর ধরেই বেশ ব্যস্ত ছিল আসামের ওই প্রজেক্ট নিয়ে। আমাকেও বেশিকিছু বলতো না ওই ব্যাপারে। তবে আমি এটুকু জানতাম যে এই প্রজেক্টের সাথে আন্তর্জাতিক বেশ কিছু সংস্থা জড়িত সেইসাথে এর পেছনে প্রচুর ফান্ডিংও হয়ে গেছে। ওরা যে-কাজের পেছনে ছুটছিল সেটা হলে সম্ভবত বেশ বড় কোন আবিষ্কার হত। যাই হোক, আমি মিতায়নের কাজের ধরণ দেখে এটা বুঝতে পারছিলাম, ওরা সম্ভবত কাজের একেবারে শেষ দিকে চলে গেছে। এর আগে প্রায় দুই মাস আসামে থেকে এসে পনেরো দিনের মতো দেশে ছিল। এরপরই আবার এক মাসের জন্যে ওরা চলে যায় যায় ভারতে। ভারতে গেলে ওরা সাধারণত কবে থেকে কবে পর্যন্ত থাকবে এরকম একটা সময় বা তারিখ আমাকে মিতায়ন জানিয়ে যেত। গত কয়েকবারের অভিযানেই এই ডেট বার-বার ডিলে হয়েছে। কাজেই এবার যখন ওর ফিরে আসার তারিখ পার হয়ে গেলেও আমি খুব একটা চিন্তিত ছিলাম না।"

"তাহলে কখন বুঝত পারলেন যে ডক্টর আসলে হারিয়ে গেছেন বা উনার কোন ক্ষতি হয়েছে?" তানভীর জানতে চাইলো।

প্রতিবারই তানভীর যখন কোন প্রশ্ন করছে লায়লা একবারও সরাসরি ওর দিকে তাকাচ্ছে না, এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। তানভীর প্রশ্ন করার প্রায় সাথে সাথেই সে আনমনে একবার অন্যদিকে তাকিয়ে দেখলো একবার তারপর তানভীর আর সুলতানের মাঝামাঝি তাকিয়ে বলতে শুরু করলো। "হ্যাঁ, সত্যি কথা যে মিতায়নের ফিরে আসার তারিখ পার হয়ে যাবার পরেও খুব একটা চিন্তিত ছিলাম না আমি। তবে যেদিন ও হারিয়ে গেল সেদিন প্রায় মাঝরাতে আমি একটা ফোন কল পাই। কলটা করেছিল মিতায়ন। যদিও ওটা মিতায়নের নম্বর ছিল না।"

“এই কলটা কি ট্রেস করা হয়েছে?” টমির দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো তানভীর।

টমি ল্যাপটপে এটা-ওটা নাড়া-চাড়া করে ওর দিকে ফিরে বলে উঠলো। “না, স্যার আমি ব্যবস্থা করছি।”

“আচ্ছা, আপনি বলুন প্লিজ,” লায়লার দিকে ফিরে বলে উঠলো তানভীর।

“কলটা পেয়ে আমি একটু অবাক হই। অবাক হয়েছিলাম কারণ মিতায়ন সাধারণত কখনোই এই সময়ে দেশে ফেরে না। আর দেশে ফিরলেও এভাবে কল করে না। তো যাই হোক, ও জানায় ওরা তামাবিল বর্ডার দিয়ে দেশে প্রবেশ করেছে। এটাও একটু ব্যতিক্রম। কারণ এই রুটে আমি কখনো ওদেরকে যাতায়াত করতে শুনিনি। আরো অবাক হই ও আমাকে অনুরোধ করে যেন আমি সকালে ঘুম থেকে উঠে ব্যাগ-ট্যাগ গুছিয়ে রাখি। কারণ ও আমাকে নিয়ে বাইরে বেড়াতে যাবে,” বলে সে একটু থেমে যোগ করলো। “আমাকে যদি কেউ বলতো ভূমিকম্পে পুরো সিলেট ধ্বংস হয়ে গেছে তাও বোধহয় আমি এতোটা অবাক হতাম না। কারণ বিয়ের পর মিতায়ন আমাকে নিয়ে কোথাও ঘুরতে যাওয়া তো দূরে থাক এমনকি হানিমুনেও যাইনি আমরা। সেই ও কিনা নিজে থেকে আমাকে বলছে বেড়াতে যাবে, অবাক করার মতোই। আসলে তখন এতো খুশি লাগছিল তাই এতোকিছু ভাবিনি।”

“ফোনে কথা বলার সময়ে আপনার কাছে ডক্টর মিতায়নকে কি খুশি লাগছিল নাকি অন্যরকম? মানে আপনার কি কিছু মনে পড়ে?” তানভীর প্রশ্ন করলো।

“হ্যাঁ, খুবই আনন্দিত মনে হচ্ছিলো ওকে। ও হ্যাঁ, আরেকটা ব্যাপার, ও আমাকে বলেছিল ওদের আসামের প্রজেক্ট ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছে।”

তানভীর ব্যাপারটা নোট প্যাডে টুকে নিলো। “এরপর কি হলো? আপনি কখন বুঝতে পারলেন যে ডক্টরের কোন ক্ষতি বা সমস্যা হয়েছে?”

“কথোপকথনের ওই পর্যায়ে আমাকে ব্যাগ-ট্যাগ রেডি করতে বলে ও জানালো, ওরা তামাবিল থেকে সোজা এয়ারপোর্টে যাবে, সেখানে বিদেশি অতিথিদের জন্যে চার্টার করা প্লেন রেডি করা আছে, সেখানে গিয়ে তাদেরকে প্লেনে উঠিয়ে ও একবার নিজের অফিসে যাবে, সেখান থেকে বাসায় এসে সকালের নাস্তা করার কথা দুজনের একসাথে। আমি সকালে উঠে সব রেডি করে ব্যাগ পর্যন্ত গুছিয়ে রাখলাম, কিন্তু বেলা গড়াতে থাকলো ওর খবর নেই। ভোর থেকে সকাল, সকাল থেকে দুপুর কিন্তু কোন খবর এলো না। দুপুরের পর দিয়ে আমি অস্থির হয়ে উঠি, ডিপার্টমেন্টে যোগাযোগ করি, ওর অফিসে যোগোযোগ করার চেষ্টা করেও ওকে পাইনি। আর হ্যাঁ, বার-বার ওর মোবাইলে চেষ্টা করেও পাইনি। মোবাইল নম্বর বন্ধ ছিল। এরপরে আরো বেলা বাড়লে বিকেল দিকে আমি ডিপার্টমেন্টের সাথে কথা বলে ভার্সিটির প্রক্টরের সাথে কথা বলি, উনিই আমাকে পরামর্শ দেন থানায় যোগাযোগ করতে। এর পরেরটুকু তো আপনারা জানেন। ওইদিন রাতেই আমার

পরিবারের লোকেরা ঢাকা থেকে আমার সাথে এসে থাকতে শুরু করে, আজ একটু আগে বেরিয়ে যাবার পরেই তো," এইপর্যন্ত বলে লায়লা শিউড়ে উঠলো।

"আচ্ছা, তো বিষয় এখন পর্যন্ত দাঁড়ালো। ডক্টর মিতায়ন আর তার টিম সফলভাবে আসামের প্রজেক্ট সমাপ্ত করে বাংলাদেশে প্রবেশ করার পর তারা যা-যা করার কথা ছিল সেগুলোর কোনটাই করেনি বরং তারা মাঝপথেই হারিয়ে যায়," এইটুকু বলে তানভীর টমির দিকে ফিরে বলে উঠলো। "টমি, তুমি আমার সাথে নোট মেলাও," বলে ও নোট প্যাড থেকে পড়তে শুরু করলো। "প্রথমেই তামাবিল বর্ডারের ব্যাপারটা কনফার্ম করা দরকার, ডক্টর মিতায়ন আর তার টিম কি ওইদিক দিয়ে ওই সময়ে প্রবেশ করেছিলেন কিনা?"

"স্যার, এটা চেক করা হয়েছে, ভোর তিনটার একটু সময় পরে তামাবিল দিয়ে প্রবেশ করে তারা," দরজার কাছ থেকে ইকবাল বলে উঠলো। তাবে ইশারায় একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বললো তানভীর। "ইকবাল ভালো হয়েছে আপনি এসেছেন। টমির সাথে সাথে আপনিও মেলাবেন আমার নোটগুলো। মিসেস মিতায়নের কাছে যে কল এসেছিল সেটা কি ট্রেস করা হয়েছে?"

টমি আর ইকবাল দুজনেই মাথা নাড়লো। করা হয়নি।

"এটার ব্যবস্থা করেন। মিসেস মিতায়নের কথা থেকে বুঝলাম বিদেশি অতিথিদের বিদায় দেয়ার জন্যে সিলেট এয়ারেপোর্টে একটা ভাড়া করা প্লেন থাকার কথা ছিল। সেটার ব্যাপারে কোন খোঁজ নেয়া হয়েছে?"

ইকবালকে দেখে মনে হলো এইমাত্র সে এই ব্যাপারে জানতে পারলো। অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করলো তানভীর। এরকম গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার কেউই ধরতে পারলো না, এ-কেমন কথা। "ওটার ব্যাপারে জলদি খোঁজ নেয়ার ব্যবস্থা করেন," বলে ও আরেকটু ভেবে যোগ করলো। "খোঁজ নিবেন, ওই প্লেন কোন কোম্পানি থেকে ভাড়া করা হয়েছিল, ওটাতে কেউ ফ্লাই করেছে কিনা। বলে ও লায়লার দিকে ফিরে জানতে চাইলো, "আচ্ছা লায়লা," বলেই ও আনমনে জিভ কাটলো। "মিসেস মিতায়ন, আপনি বললেন ডক্টর মিতায়ন আপনাকে বলেছিল উনি বিদেশি মেহমানদের বিদায় দিয়ে উনার অফিসে যাবেন, সেখান থেকে কিছু কাজ সেরে বাসায় ফিরবেন, উনি কি নির্দিষ্ট করে বলেছিলেন কোন অফিসে যাবেন? মানে ডিপার্টমেন্টের অফিসে নাকি সিলেট মিলেনিয়ামে যে অফিস ছিল সেটাতে?"

লায়লাকে দেখে বেশ অবাক মনে হলো। "দুটোর একটাতেও না। ইনফ্যাক্ট সিলেট মিলেনিয়ামে তাদের যে একটা অফিস আছে সেটাই তো আমি জানতাম না। ওদের এই প্রজেক্টের মূল অফিস বলতে তো আমি জানতাম লাক্কাতুরা টি-এস্টেটে যে অফিস আছে সেটার কথা। আমি তো জানি লাক্কাতুরার বাংলোতে ওরা যে-অফিস বসিয়েছে সেটাই

ওদের এই কাজের মূল অফিস। আর বিদেশি গেস্টরা এলেও মূলত সেখানেই অবস্থান করতো।”

টমি ইকবাল আর তানভীর তিনজনেই প্রায় একই সময়ে লায়লার দিকে ফিরে তাকাল। তারপর অনেকটা রোবটের মতোই একে-অপরকে দেখলো। সবারই চোখে জিজ্ঞাসা।

“মানে কি?” তানভীর অবাক হয়ে লায়লার দিকে ফিরে জানতে চাইলো। “লাক্কাতুরার অফিস মানে? ডক্টর মিতায়নের সমস্ত কাগজপত্র আর ডিপার্টমেন্টে তো এন্ট্রি দেয়া আছে ডিপার্টমেন্টের অফিস আর সিলেট মিলেনিয়াম মার্কেটের চতুর্থ তলায় একটা ডাবল রুমের অফিসের, লাক্কাতুরার কোন অফিসের কথা তো কোথাও বলা হয়নি।”

এবায় লায়লার অবাক হবার পালা। “কি বলছেন এসব! আমি তো জানতাম লাক্কাতুরার অফিসটাই ওদের মূল অফিস।”

“মিসেস মিতায়ন, আপনি নিশ্চিত এই ব্যাপারে?” টমি খুব অবাক হয়ে জানতে চাইলো। “কারণ আমি ডক্টরের প্রজেক্টের সমস্ত কাগজ ঘেঁটেও কোথাও এই ব্যাপারে কোন উল্লেখ পাইনি।”

“অবশ্যই আমি নিশ্চিত। আমি এমনকি গেছিও ওখানে একবার,” লায়লা জোর গলায় বলে উঠলো। “আমার মনে হয় আপনারা কোথাও ভুল করছেন,” লায়লা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। “আপনারা আমার হারিয়ে যাওয়া স্বামীকে খুঁজে বের করার জন্যে কাজ করছেন আর এখনো তার মূল অফিসটা কোথায় সেটাই জানেন না, এ-কেমন কথা?”

তানভীর ফিরে তাকাল টমি আর ইকবালের দিকে। সাথে সাথে টমি মাথা নাড়লো, সে কিছু জানে না। ইকবালকে একটু বোকা-বোকা দেখাচ্ছে। “স্যার, আমি নিশ্চিত এখন পর্যন্ত কোথাও কোন ডকুমেন্টে কিংবা কারো মুখে এই কথা শুনিনি আমরা কেউই।”

“আমি ইকবালের বক্তব্য সমর্থন করি,” টমি তার ল্যাপটপ ঘাঁটতে-ঘাঁটতে বলে উঠলো। “কারণ কোন ডক্যুমেন্টেই এই অফিসের কথা লেখা নেই।”

“এমনকি ডিপার্টমেন্টেরও কেউই এই অফিসের কথা জানে না,” টমির সমর্থন পেয়ে ইকবাল একটু ভরসা পেয়েছে, তাই তার গলার জোরও বেড়েছে খানিকটা।

“ঠিক আছে,” তানভীর বলে উঠলো। “মিসেস মিতায়ন, আপনি আমাদেরকে বলতে পারবেন ডক্টর মিতায়নের এই অফিসটা কোথায়?”

তানভীরের প্রশ্নটা শুনে লায়লা আনমনেই একটু মাথা নাড়লো। “আমি সঠিকভাবে আপনাদের বলতে পারবো না। তবে, ওটা লাক্কাতুরা টি-এস্টেটের আশেপাশে,” লায়লা মনে-মনে জায়গাটা সঠিক অবস্থান মনে করার চেষ্টা করছে।

“মানে, কি এয়ারপোর্ট রোডে?” তানভীর লায়লার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করতেই সে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। সাথে-সাথে তানভীর টমির দিকে তাকিয়ে ইশারা করলো ম্যাপে

ওটার অবস্থার বের করার জন্যে।

"এয়ারপোর্ট রোডেই," লায়লা বলে চলেছে। "সম্ভবত সিলেট স্টেডিয়াম পার হয়ে লাক্কাতুরা টি-এস্টেট যেখানে শেষ হয়েছে সেখানেই কোথায়," বলেই সে একটু ভেবেই প্রায় চিৎকার করে উঠলো। "মনে পড়েছে। জায়গাটা লাক্কাতুরা টি-এস্টেট আর আর মালিনীছড়া টি-এস্টেটের মাঝামাঝি কাতিয়া নামক একটা জায়গায়।"

টমি বেশ দ্রুতই তার ল্যাপটপ ঘেঁটে চলেছে। কিছুক্ষণ পর সে তানভীরের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলে উঠলো, "বস, কাজ হলো না। লাক্কাতুরা আর মালিনীছড়ার এন্ট্রি দেয়া আছে কিন্তু কাতিয়া নামক কোন জায়গা এখানে শো করছে না। না গুগল ম্যাপে, না আমাদের নিজস্ব ম্যাপে।"

তানভীর অবাক হয়ে একবার টমিকে দেখলো, এরপর ফিরে তাকাল লায়লার দিকে, নিজেদের ম্যাপ, গুগল ম্যাপ কোথাও উল্লেখ নেই জায়গাটার, এ-কেমন কথা!

অধ্যায় ছাব্বিশ

সময়: ১৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ

যজ্ঞবাবার ডেরা, কন্নোর, ভারতবর্ষ

"আমাগো এইখানে অপেক্ষা করা এক্কেরেই ঠিক হবো না," জাথুরিয়া কথাটা বলে সে অন্যদিকে ফিরে তাকাল সমর্থনের আশায়। প্রায় সবাই নিস্তব্ধ হয়ে আছে।

বিধু, ঘোষিত আর ধোয়ী অস্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দাউ-দাউ করে জ্বলতে থাকা যজ্ঞবাবার বাড়িটার দিকে। "আমি ওস্তাদরে না নিয়া যাবো না," গোয়াড়ের মতোই বলে উঠলো সে। "যা খুশি তাই হোউক, যার মন চায় যা..." তার কথা শেষ হবার আগেই খর-মর শব্দ তুলে বাড়িটা ভেঙে পড়লো চোখের সামনে। ছিটকে উঠলো আগুনের ফুলকি, আগুনে বাতাসের ঝাপটা এসে ধাক্কা দিলো সবাইকে।

"এইখানে আর এক পলকও থাকুন যাইবে না। যেকুনো সময় লিচ্ছবী রাজা হেমচন্দ্রের লোকেরা আইসলে কুচকাটা অইতে হবে। তারচেয়ে যা জানছি আমরা সেইটা রাজা মানরু আর শঙ্করের কানে পৌছাইতে হবে," জাথুরিয়া আবারো বলে উঠলো। "তা-না হলে দুজনার মৃত্যুই বৃথা যাবে।"

কথাটা বলে সে আর অপেক্ষা করলো না, ঘোড়া ঘুড়িয়ে টিলা বেয়ে উঠতে শুরু করলো। বাকিরাও ধীরে-ধীরে অনুসরণ করতে শুরু করলো তাকে। শুধু বিধু-ঘোষিত আর তলোয়ারবাজ ধোয়ী তাকিয়ে আছে ধ্বসে পড়া বাড়িটার দিকে। কিছুক্ষণ পরে ধোয়ী বলে উঠলো, "ওরা ঠিকই কইছে। আমাগো ফিরে যাওয়া উচিত, এইখানে থাকলে বিপদ হবে।"

অনিচ্ছা স্বত্বেও তিনজনেই ঘোড়া নিয়ে রওনা দিলো উল্টোদিকে।

***

বেশ সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখছিল ও। একেবারে সবুজ একটা পাহাড়ি উপত্যকা। অদ্ভুত সুন্দর একটা নদী বয়ে চলেছে উপত্যকার ঠিক মাঝ বরাবর। নদীর একপাশের তীরে বিরাট একটা গাছ, কী গাছ ঠিক বুঝতে পারলো না ও কিন্তু গাছটাতে একেবারেই অন্যরকম এক গোলাপি ফুল ফুটে আছে। সেই গাছটাকে ঘিরে ছোট-ছোট অনেকগুলো অদ্ভুত দেখতে বাড়ি। এরকম বাড়ি এর আগে কখনো দেখেনি ও। সেই গাছের নিচে সবুজ ঘাসের ওপরে বসে আছে ও, ওর চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে অনেকগুলো মানুষ। ছোট-ছোট বাচ্চারা খেলছে, মহিলারা ঘর-কন্না করছে। পুরুষেরা কাঁধে বিভিন্ন জিনিস

নিয়ে কাজে চলেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হলো, প্রতিটি মানুষ ওর মতো দেখতে, প্রত্যেকের মাথায় মরচে পড়া লোহার মতো লালচে চুল, প্রতিটি নারী-পুরুষ হালতা-পাতলা লম্বা আর সুন্দর দেখতে। হঠাৎ লম্বা লাল চুলের একজন মহিলা ওর দিকে ফিরে ডেকে উঠলো, 'শামান, শামান'।

"যোদ্ধা, যোদ্ধা..."

কানের কাছে একটানা শব্দ আর সাথে কড়া রোদ চোখের ওপরে পড়াতে চোখ খুলতে বাধ্য হলো শামান। তারপর ঝট করে উঠে বসার চেষ্টা করলো ও। বসার চেষ্টা করার সাথে-সাথেই ওর একটা হাত চলে গেল শরীরের মাঝ বরারবর। কারণ ওখানে ভারি কিছু একটা আটকানো মনে হচ্ছে ওর কাছে।

চোখ খুলতেই একটা নারী মুর্তি চোখে পড়লো, ওর উপরে ঝুঁকে আছে। প্রথমে শামানের মনে হলো ও এখনো স্বপ্নের ভেতরেই আছে, তাই আবার শুয়ে চোখ বন্ধ করলো। কিন্তু প্রায় সাথে সাথেই আবার চোখ খুললো, কারণ বিসদৃশ কিছু একটা ধরা পড়েছে ওর চোখে। স্বপ্নের নারীমুর্তির চুল ছিল ওর মতো লালচে, আর চোখ নীল। কিন্তু এই নারী মুর্তির চুল কালো আর চোখ ধূসর রঙের। ও চোখ খুলে উঠে বসলো।

"উফ্, যোদ্ধা তুমি ভারি চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলে," বলে কালন্তি একেবারে কাছ থেকে ওকে একবার পরখ করে নিয়ে ওর পাশেই একটা পাথরের ওপরে গিয়ে বসে পড়লো।

"তুমি, তুমি, এখানে কিভাবে এলে? আর আমরাই বা কোথায়?" বলেই ও আশেপাশে চোখ বুলালো। ওরা নদীর পাড়ে সবুজে ছাওয়া ছোট এক টুকরো জমিতে অবস্থান করছে এই মুহূর্তে। ত্রিভুজ আকৃতির জায়গাটার একদিকে উঠে গেছে একটা টিলা, অন্যদিকে জঙ্গল আর ওটাকে একপাশে রেখে বয়ে চলেছে খরস্রোতা নদী। "আ... আমরা এখানে এলাম কিভাবে?" জ্ঞান হারাবার আগে শেষবারের স্মৃতি মনে পড়লো, শক্ত কিছু একটা পেঁচিয়ে গেছিল হাতে, আর জলতে ডুবতে শুরু করেছিল ও। তুমি আমার কাপড় কী করেছো?" শামান আতঙ্কিত হয়ে জানতে চাইলো। ওর গায়ে একটা সুতোও নেই, শুধু লোহার জালটা ওর শরীরের মাঝামাঝি প্যাঁচানো।

"এতো চিন্তার কিছু নেই," কালন্তি হালকা চালে বলে উঠলো। সে ছুরি দিয়ে একটা গাছের মোটা ডালের মাথা চোখা করতে ব্যস্ত। "তোমার কাপড় ভিজে একাকার হয়ে গেছিল, আর তুমিও ঠান্ডায় জমে একেবারে নীল হয়ে গেছিলে, তাই তোমার কাপড় আর তোমাকেও রোদে দিতে হয়েছে। অন্য বিপদ আপাতত কেটে গেছে, তবে তোমার জ্ঞান ফিরে না আসাতে আমি বেশ ভয় পাচ্ছিলাম।"

শামান দেখলো পাশেই একটা বড় পাথরের ওপরে ওর কাপড় সব রোদে দেয়া। বাম হাতের কব্জিতে আর শরীরের কয়েক জায়গায় পাতার মতো কী যেন লাগানো। আনমনেই গলার কাছে একটা হাত চলে এলো। কণ্ঠার হাড়টা আরেকটু হলেই ভেঙে দিয়েছিল ব্যাটা

উরগের বাচ্চা। গলায় হাত লাগতেই জ্বলে উঠলো জায়গাটা। শামান কালন্তির দিকে ফিরে বলে উঠলো, “তুমি এখানে কিভাবে এলে? ওদের সাথে বের হওনি কেন?”

“নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দাও যোদ্ধা, যে আমি ওদের সাথে বের হইনি,” বলে সে কাঁধ ঝাকালো। “আসলে বের হতে পারিনি। তুমি আগুন ধরিয়ে সবাইকে বের হতে বললে আমি দেখতে পাই বিধু-ধোয়ী ওরা সবাই বেরিয়ে যাচ্ছে, আমি ছিলাম বেদীর পেছনে তাই একটু সময় লাগে আমার বেরুতে, আমি যখন বের হই ততোক্ষণে ওরা তো বেরিয়ে গেছে, আমি দরজার কাছে পৌছে দেখি আগুনে পুড়ে চৌকাঠ সহ ওটা ভেঙে পড়েছে। ওদিক দিয়ে বেরুনো যাবে না দেখে আমি বারান্দা দিয়ে জলাধারের কাছে নেমে পড়ি। দেখতে পাই তুমি উরগদের সাথে মারামারি করছো।”

“এক উরগকে মেরে অন্যটাকে ঘায়েল করে একটাকে নিয়ে জলতে পড়ে গেলে। আমি দৌড়ে নদী তীরের কাছে গিয়ে দেখি তোমার একটা তলোয়ার পড়ে আছে, ওটা তুলে নিয়ে আহত উরগকে নিকেশ করে আমি নদীর তীর ধরে দৌড়াতে থাকি। একসময় দেখি তুমি ওকে মেরে একটা পাথরের ওপরে পড়ে ধীরে-ধীরে ডুবে যাচ্ছো। তখন আমার চাবুক ছুঁড়ে তোমার কব্জিতে আটকে ফেলে বহু কষ্টে তোমাকে টেনে তুলি এখানে,” বলে সে যোগ করলো। “তোমাকে ধন্যবাদ।”

কালন্তির কথা শুনে কব্জি ডলতে লাগলো শামান। হাতে পিচ্ছিল যে-জিনিসটা জড়িয়ে ধরেছিল, ওটা তাহলে সাপ ছিল না, চাবুক ছিল। এটার কারণেই বেঁচে গেছে ও আজ। “বুঝলাম না,” বলে ও তারের জালটা একহাতে ধরে উঠে বসার চেষ্টা করলো। “প্রাণে বাঁচালে তুমি আমাকে, আর তুমি আমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছো”

ডালটা চোখা করার কাজ শেষ করে সে ছুরিটা একটা পাতা দিয়ে দুবার ঘসে নিয়ে কোমরের খাপে রেখে দিলো। “তুমি তখন ওরকম প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে উরগদের ওপরে ঝাঁপিয়ে না পড়লে আজ সবাইকে মরতে হত। আমি এর আগে কখনো উরগদের মোকাবেলা করিনি কিন্তু আমার বাবার মুখে শুনেছি ওরা কী ভয়ঙ্কর হিংস্র হতে পারে। সত্যি কথা হলো, তুমি আমাদের সবাইকে বাঁচিয়েছো আজ।”

শামান তারের জালটাকে সাবধানে ধরে উঠে বসলো, দাঁড়াতে গিয়ে আরেকটু হলে মাথা ঘুরিয়ে পড়েই যাচ্ছিলো, হাত থেকেও ছুটে যাচ্ছিলো জালটা, সেটাকে সামলে নিয়ে সোজা হলো ও। “ব্যাপার না, এইটাই আমার কাজ। তবে তুমি ওভাবে না বাঁচালে আমিও আজ শেষ হতাম, কপাল ভালো যে গলায় প্যাঁচানো সাপটা আমাকে না কামড়ে ওই ব্যটাকে কামড়েছিল, না হলে তো,” বলে ও চলে এলো পাথরের ওপরে রাখা নিজের পোশাকের কাছে। প্রায় শুকিয়ে এসেছে। “তুমি একটু অন্যদিকে ঘুরবে?”

শামানের প্রশ্ন শুনে কালন্তি মাথা উঁচু করে তাকাল, তারপর ওর প্রশ্নটা বুঝতে পেরে নিমিষে ফিরে তাকাল অন্যদিকে। শামান ধীরে-ধীরে শরীরের বিভিন্ন জায়গার ব্যথা অগ্রাহ্য করে পোশাকগুলো পরে নিতে শুরু করলো।

কালন্তি অন্যদিকে তাকিয়ে বলে চলেছে, “একটা ব্যাপার বুঝলাম না, লিচ্ছবী আর উরগরা এক হলো কিভাবে?”

“কেন এক হতে সমস্যা কোথায়?” শামান পোশাক পরে নিতে নিতে শরীরের ক্ষতগুলো পরীক্ষা করে নিলো। কোনটাই মারাত্মক নয়। তবে সবগুলো মিলিয়ে অনেক কাহিল লাগছে ওর। লোহার জালের ফতুয়ার মতো জিনিসটা গায়ে চাপিয়ে নিয়ে তার ওপরে পোশাক পরে নিয়ে পিঠে তলোয়ার চাপাতে গিয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল ওর। উরগদের সাথে যুদ্ধের সময়ে একটা কাতানা হারিয়ে এসেছে। বিশেষ এই জিনিসটা হারানোর চেয়ে নিজের একটা চোখ হারালেও এতোটা কষ্ট লাগতো না ওর। বিরক্ত মুখে কালন্তির সামনে এসে দাঁড়ালো ও, “উরগদের সাথে এক হতে লিচ্ছবীদের সমস্যা কি?” আবারো জানতে চাইলো।

“সমস্যা আছে,” কালন্তি মুখ তুলে তাকাল শামানের দিকে। “উরগরা ভয়ঙ্কর, ওরা মূলত এক ধরণের বেদে জাতীয় গোত্র। এই মুল্লুকে ওদেরকে সবাই চেনে কালো জাদু আর সাপের পূজো করার জন্যে। ওদের ভয়ঙ্কর এক ওঝা আছে সে নাকি মৃতদেরকেও জীবিত করতে পারে। উরগরা হলো কালো জাদুর ওস্তাদ। তাই ওদেরকে কেউ ঘাঁটায়না আবার ওদের সাথে কেউ খুব বেশি লাগতেও যায়না। মূলত ওদেরকে সবাই এড়িয়ে চলে। লিচ্ছবীরা যদি উরগদের সাথে যোগসাজশ করে থাকে তবে পুরো ব্যাপারটাতে বিরাট কোন গোলমাল আছে।”

“হুম, বুঝেছি,” বলে শামান কোনমতে পা সামলে নিয়ে কালন্তির সামনে একটা পাথরের ওপরে হাত-পা ছাড়িয়ে বসলো। “আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, কিছু মনে করো না, হাজার হলেও তুমি রাজকুমারি।”

কালন্তি হেসে উঠলো। “আমি রাজার মেয়ে হলেও রাজকুমারি নই,” বলে সে বেশ রহস্য করে হেসে উঠলো। এই প্রথম শামান খেয়াল করলো, হাসলে মেয়েটাকে অসম্ভব রহস্যময়ী লাগে। ও বিভিন্ন ধরণের মানুষর নানা ধরণের হাসি দেখেছে কিন্তু হাসলে কোন মানুষকে এতোটা রহস্যময় লাগতে পারে কখনো ভাবেনি। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিল ও, তবে মেয়েটা খেয়াল করছে দেখে দৃষ্টি সরিয়ে নিলো।

“মনটা খারাপ লাগছে, আমার জোড়া তলোয়ারটা আমার জন্যে বিশেষ কিছু ছিল, ওটা হারিয়ে...”

“হারায়নি তো,” বলে কালন্তি যে পাথরের ওপরে বসে ছিল সেটার পাশে ঘাসের ওপর থেকে কাতানা তুলে শামানের দিকে বাড়িয়ে দিলো। রক্ত আর কাঁদা লেগে আছে ওটাতে। জিনিসটা দেখে বাচ্চাদের মতো খুশি হয়ে উঠলো শামান।

“তুমি এটা কোথায় পেলে?” জিনিসটাকে পরিষ্কার করতে করতে আনন্দের সাথে জানতে চাইলো ও।

"উরগদের সাথে যেখানে তোমার মারামারি হয়েছিল সেখানেই মাটির ওপরে পড়ে ছিল। এটা দিয়েই আমি আহত দ্বিতীয় উরগকে নিকেশ করেছি। ছোট বাচ্চারা মিষ্টির দলা পেলে যেরকম খুশি হয়ে ওঠে তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে এটা পেয়ে তুমি তারচেয়ে বেশি খুশি হয়ে গেছ," কালন্তিকে দেখে মনে হচ্ছে শামানের খুশি তার ভেতরেও খানিকটা প্রবাহিত হচ্ছে।

"তুমি জানো না এটা আমার জন্যে কি?" জিনিসটা পরিষ্কার করে কালন্তির দিকে বাড়িয়ে ধরলো। "দেখো," বলে কালো রঙের কাতানাটার সোনালি রঙের কিনারায় একটা ঝিলিক দিয়ে উঠলো।

"বাহ, জিনিসটা দেখি রঙ পরিবর্তন হয়।"

"হ্যাঁ, এই তলোয়ার পৃথিবীতে খুব কমই আছে। বিশেষ একটা উল্কাপিন্ড থেকে সংগ্রহ করা ধাতু থেকে বানানো তলোয়ারটাতে নাকি স্বয়ং বুদ্ধের আর্শিবাদ আছে।"

"তাই নাকি?" কালন্তি আগ্রহের সাথে বলে উঠলো। "আচ্ছা যোদ্ধা, তোমার ব্যাপারটা আসলে কি বলোতো? তুমি এতোটা ঝুঁকি নিয়ে এই অচেনা-অজানা দেশে চলে এলে ডুকপা লামাকে উদ্ধার করতে, নিশ্চই অনেককিছু পাচ্ছো এর বিনিময়ে?"

তলোয়ারটাকে খাপে ঢুকিয়ে পিঠের ওপরে ভালোভাবে বসিয়ে নিলো ও। "একটা মুদ্রাও না," বলে ও কালন্তির দিকে ফিরে বলে উঠলো। "আমি ভাড়ার টাকায় যুদ্ধ করার জন্যে এখানে আসিনি।"

"কিন্তু আমি তো জানতাম লাল চুলের যোদ্ধা আর তার দল স্বর্ণমুদ্রা ছাড়া একটা পা ও ফেলে না," বলে সে প্রশ্নের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো শামানের দিকে।

কালন্তির দিকে তাকিয়ে সামান্য হেসে উঠলো শামান। "ঠিকই শুনেছো তোমরা। তবে সব ক্ষেত্রে সেটা ঠিক নয়। ডুকপা লামা আমার পরিবারের মতো। আমাকে দেখে হয়তো বুঝতে পেরেছো, আমি একেবারেই অন্যরকম দেখতে। আমি আসলে জানি না আমি এমন কেন, আমার পরিবার কারা, আমি কোত্থেকে এসেছি। ছোটবেলায় ডুকপা লামা আমাকে এক পাহাড়ের পাদদেশ থেকে উদ্ধার করেন। উনিই আমাকে শান্তির মঠে নিয়ে শ্রমণ হবার জন্যে দীক্ষা দিতে শুরু করেন। উনিই আমাকে একটা পরিবার দেন। তবে আমি সেটা রক্ষা করতে পারিনি, শ্রমণ না হয়ে আমি হয়েছি যোদ্ধা। কিন্তু তার প্রতি আমার ভালোবাসা এতোটুক কমেনি। তাই তার এই বিপদে এগিয়ে আসাটা আমার কর্তব্য। তবে এখানে আরো একটা ব্যাপার আছে," বলে শামান একটা ছোট পাথর তুলে নিয়ে জলতে ছুঁড়ে দিলো।

"শান্তির মঠের বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত শ্রমণ লামা নোরবু আমাকে এই অভিযানে আসার আগে একটা কথা জানান, যেটা আমি আগে জানতাম না। ডুকপা লামা আমাকে উদ্ধার করার সময়ে আমার গলায় নাকি একটা চামড়ার তঞ্জুরের মতো ছিল। সেটার ভেতরে

বিচিত্র এক ভাষায় লেখা অনেকগুলো দস্তাবেজ ছিল। ডুকপা লামা নিজে বহুবছর সেগুলো নিয়ে গবেষণা করেছেন, কিন্তু ওগুলোর কোন মানে উদ্ধার করতে পারেন নি। হয়তো ওগুলোতে লেখা আছে আমি কে, আমি কোথা থেকে এসেছি, আমার পরিবার আমার নিজের লোকদের কথা। ওই দস্তাবেজগুলো কোথায় আছে একমাত্র ডুকপা লামা জানেন, কাজেই তাকে আমার খুঁজে বের করতে হবেই, যদি উনি বেঁচে থাকেন। কারণ হয়তো ওগুলোতেই আমি খুঁজে পাবো আমার নিজের পরিচয়, আমার জাতির সন্ধান।"

"চলো যোদ্ধা, বেলা পড়তে শুরু করেছে। আমাদেরকে অনেক পথ হাঁটতে হবে, তার ওপরে তুমি যেভাবে আহত হয়েছো," বলে কালন্তি উঠে দাঁড়িয়ে একটা হাত বাড়িয়ে দিলো শামানের দিকে। তার বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরে উঠে দাঁড়ালো।

"আমরা এখান থেকে তোমাদের ডেরায় ফিরবো কিভাবে?" শামান জানতে চাইলো।

কালন্তি হাত তুলে সামনে দেখালো। "আমরা এখান থেকে মাইলখানেক পর্যন্ত নদীর তীর ধরে এগোব। যেখানে নদীটা ডানে বাঁক নেয়ার কথা সেখান থেকে আমরা বাঁকের উল্টোদিকের জঙ্গলে ঢুকে সামনে এগোতে থাকবো। আমার ধারণা যদি সঠিক হয় তবে জঙ্গলের ভেতরে একটা পথ পাবো আমরা। সেটা ধরে মাইল পাঁচেক গেলে একটা হাট পাওয়া যাবে, আমরা ওই পথটা ধরে এগোব কিন্তু হাট পর্যন্ত যাবো না, তার আগেই আবারো জঙ্গলে ঢুকে আরো মাইল দুয়েক হাঁটলেই আমরা ডেরার কাছাকাছি পৌছে যাবো।"

কালন্তির বর্ণনা শুনে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লো শামান। ওর ভঙ্গি দেখে হেসে উঠলো কালন্তি। "চলো শুরু করি, যতো দ্রুত রওনা দেয়া যাবে ততোই তাড়াতাড়ি পৌছানো যাবে। কাজেই চলো।"

ওরা নদীর কিনারা ধরে হাঁটতে লাগলো। "রাজকুমারি, তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি। মানে, সত্যি কথা বলতে কি তোমার মতো রাজার মেয়ে আমি এর আগে দেখিনি। এমন বিশেষ করে এমন যুদ্ধবাজ রাজকুমারি। হা-হা," শামানের সাথে সাথে হেসে উঠলো কালন্তি।

"যুদ্ধবাজির তো কিছু দেখোই নি এখনো," বলে কালন্তি হাঁটতে-হাঁটতেই একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। "আমি আসলে বাবা মানে থারু রাজা মানরুর পালক কন্যা। এ-কারণেই তখন বলছিলাম যে আমি রাজার মেয়ে হলেও রাজকুমারি নই।"

"শাক্যদের ওপরে তোমার এতো রাগ কেন? কিছু মনে করো না, ওদের সাথে তোমার কথোপকথন দেখে এমনটাই মনে হয়েছে আমার," শামানের শরীর দূর্বল লাগলেও হাঁটতে তেমন কষ্ট হচ্ছে না।

কালন্তি কোন জবাব দিচ্ছে না দেখে শামান তার দিকে ফিরে দেখলো কালন্তির চোখ-জোড়া যেন জ্বলছে। "শাক্যরা হলো বেঈমানের জাত। বাবা ওদেরকে আশ্রয় দিয়ে বিরাট

ভুল করেছে, দেখো তুমি। ওরা সবসময় উপকারীর অপকার করতে পারঙ্গম।”

“কিন্তু তোমার বাবা যেটা ভাবছে সেটাও তো ভুল নয়। বিশ বছরের শত্রুতা ভুলে উনি এই উপত্যকায় শান্তি স্থাপন করতে চাইছেন সেটা আমি সমর্থন করি। কারণ...”

“শোন যোদ্ধা,” শামানকে কথা শেষ করতে দিলো না কালন্তি। “তুমি এই এলাকার ইতিহাস জানো না। এ-কারণেই এ-কথা বলছো কিন্তু সত্যিটা হলো; বাবা যা চাইছে সেটা কোনদিনই হবে না। কারণ শাক্যরা হলো শয়তান আর কাপুরুষ। তোমাকে ইতিহাস বলি, আমি আর আমার যমজ বোন তখন আমাদের বয়স ছয়-সাত বছর। আমরা থারু গোত্রের ছোট একটা অংশ ছিলাম। রাজা মানরুর শাসনের অন্তর্ভূক্ত হলেও আমরা দূরবর্তি এক জায়গায় বাস করতাম। আমার মনে পড়ে আমার বাবা চর্মকার ছিল, সুখের সংসার ছিল আমাদের। তখন সবেমাত্র রাজা মানরু শাসক হয়েছেন, শাক্য আর থারুদের ভেতরে তখন ব্যাপক যুদ্ধ চলছিল। সদ্য তরুণ রাজা মানরুর ওপর শাসন ভার আসতেই শাক্যরা তার ওপরে সমানে আক্রমণ করতে থাকে। কিন্তু বয়সে তরুণ হলেও রাজা বেশ ভালোভাবেই সামলাতে থাকেন পরিস্থিতি। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে উভয় গোত্রেরই ক্ষতি হতে থাকে। রাজা মানরু চিন্তা করেন এভাবে যুদ্ধ জিতেই বা কি হবে তাই উনি শাক্যদের কাছে সন্ধি প্রস্তাব পাঠান। প্রায় সাথে সাথেই শাক্যরা তা মেনে নেয়। দুই দল যখন আলোচনায় বসেছে এমন সময় বাবাকে আলোচনায় ব্যস্ত রেখে ওরা একে-একে তার সামরিক শক্তি ধ্বংস করতে থাকে, সেইসাথে দখল করে নেয় রাজা মানরুর রাজ্যের বেশিরভাগ অংশ। রাজা মানরু বাধ্য হয়ে তার গোত্রের লোকজন নিয়ে পালিয়ে আসেন এই জঙ্গলে,” ওরা নদীর বাঁকের কাছে এসে নদীকে ডানেই রেখে বাম পাশের জঙ্গলে ঢুকে পড়লো।

“যা বললাম এসব বোঝার মতো বয়স তো আমার তখন ছিল না, এসব আমি পরে জেনেছি। কিন্তু সেদিনের কথা আমার পরিষ্কার মনে পড়ে, এসব যুদ্ধ থেকে আমাদের গোত্রের অংশটা বেশ দূরেই ছিল কিন্তু শাসনযন্ত্রের চাকা যখন ঘুরতে শুরু করে সবাইকেই সেই বৃহত্তর চক্রের অংশ হতেই হয়। আমরাও সেটার বাইরে থাকতে পারিনি। আমি আর আমার ছোট বোন সেদিন বাড়ির বাইরে খেলছিলাম, মা ঘর-কন্না করছিল, বাবা তার নতুন সংগ্রহ করা চমড়াগুলো শুকাতে দিচ্ছিলো এমন সময় আমাদের গ্রামে প্রায় কোন পূর্বাভাস ছাড়াই ঝাঁপিয়ে পড়ে শাক্যদের সৈন্যবাহিনী। আমার পরিবারসহ আমাদের গ্রামের সবাইকে খুন করে ওরা। আমার চোখের সামনে আমার মাকে, বোনকে...” কালন্তির চোখের দৃষ্টি চলে গেছে বহুদূরে, যেন সেই বিভৎস সময়টাকে দেখতে পাচ্ছে সে চোখের সামনে।

“ওরা সবাইকে মারে, সবাইকে, একে-একে,” বলে সে শামানের দিকে ফিরে তাকাল। “আমি জানি তুমি কী ভাবছো যোদ্ধা, আমি কিভাবে বেঁচে গেলাম। আমার দাদির কারণে। গ্রামে শাক্যদের আক্রমণ হতেই আমার দাদি আমাকে গ্রামের একমাত্র ইঁদারার ভেতরে ফেলে দেন। ইদারা চেনো তো কূয়া। জল তোলার জন্যে মাটিতে গভীর গর্ত করে কিনারা

বাঁধিয়ে রেখে দেয়া হয়, যাতে যেকোন সময় যেকেউ দড়িতে বেঁধে কোন পাত্র ফেলে জল তুলতে পারে।”

“তুমি মায়ের সাথে মামার বাড়ির গল্প করছো, রাজকুমারি। আমি পাহাড়ি এলাকার লোক, মাইলকে মাইল ধূসর পাহাড়ের অনেক জায়গাতে কূয়োই জলের একমাত্র ভরসা।”

“দাদি আমাকে কূয়োয় ফেলে দেন, ওই অন্ধকার গর্তের ভেতরে শ্যাওলা আর জলজ গাছের দঙ্গলের ভেতরে বসে আমি শুনতে পাই আমার গ্রামের মানুষদেরকে হত্যা করা হচ্ছে। তাদের সেই মরণ আর্তনাদ আমি আজো পরিষ্কার শুনতে পাই আমি। সবচেয়ে বিভৎস ব্যাপার শুরু হয় সবাইকে খুন করার পর। শাক্যরা গ্রামের মানুষদের মেরে ফেলে দেয় কূয়োর ভেতরে, বাকিদেরকে ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। আমার বাপ-মা-বোন-দাদিসহ আরো কয়েকজনের লাশের সাথে আমি ওই অন্ধকার কূয়োর ভেতরে তিনদিন চাররাত পড়ে থাকি। আজো আমি রাতের বেলা ঘুম থেকে জেগে উঠি পচা লাশের গন্ধ পেয়ে, নিজের বাবা-মায়ের অর্ধ গলিত লাশের চেহারা দুঃস্বপ্নে ভেসে ওঠে আমার।”

পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে শামান ফিরে তাকাল মেয়েটার দিকে। মেয়েটার মনের গভীরে কতোটা কষ্ট লুকিয়ে আছে অনুভব করে বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলো ওর। “এরপর?”

“অন্ধকার কুয়োর ভেতরে পচা লাশের সাথে থাকতে থাকতে আমি যখন মৃতুর অপেক্ষা করছি তখন ওপরে পায়ের আওয়াজ শুনতে পাই। শত্রু-মিত্র জানা নেই, কিন্তু আর কোন রাস্তাও নেই। তাই যতোটুক শক্তি অবশিষ্ট ছিল সেটা দিয়ে চিৎকার করতে থাকি। রাজা মানরুর লোকেরা আমাকে দড়ি বেঁধে কুয়ো থেকে টেনে তোলে। রাজা আমাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। রাজা মানরুর নিঃসন্তান স্ত্রী মানে আমার মা আমাকে নিজের সন্তান হিসেবে ঘোষণা করেন। এ-নিয়ে তাদেরকেও নিজের গ্রোত্রের ভেতরে কম ঝামেলা পোহাতে হয়নি, তবুও তারা অটল ছিলেন,” বলে কালন্তি ফিরে তাকাল শামানের দিকে। “সেই ছোটবেলা থেকে আমার একটাই নিয়তি ছিল। আমি যোদ্ধা হবো, জীবনে যতোজন পারি শাক্যদেরকে খুন করবো। এখন তুমি বলো সেই শাক্যদেরকে যদি আমার বাঁচাতে হয় তবে আমি সেটা কিভাবে সহ্য করবো?”

শামান আনমনেই মাথা নাড়লো। “আমি তোমার কষ্ট বুঝতে পারছি,” বলেই সে নিজেকে সংশোধন করলো। “মানে অনুধাবন করতে পারছি। কিন্তু কখনো সকলের ভালোর জন্যে হলেও কিছু ব্যাপার মেনে নিতেই হয়।”

শামান ভেবেছিল এই কথা শুনে কালন্তি রেগে উঠবে কিন্তু হলো বরং উল্টো। সে একেবারেই শান্তভাবে বলে উঠলো, “হ্যাঁ, আমারও সেটাই কথা। কিন্তু আমাকে আগে ভালোটা বুঝতে হবে তো নাকি? আজ আমি সকলের ভালোর কথা চিন্তা করে শাক্যদেরকে মাথায় তুলে নিচ্ছি, কিন্তু কাল যদি মাথায় তুলে নেয়া এই লোকগুলো আমার

নিজের মানুষগুলোর ক্ষতি করে তবে সে দ্বায়ভার কে নেবে। কারণ শাক্যদেরকে আমি একবিন্দু বিশ্বাস করি না।”

শামান দেখলো ওরা নদীর বাঁক থেকে অনেকক্ষণ হলো একটা জঙ্গলে হাঁটছে, এখন সেটা একটা পথের কিনারায় এসে থেমে গেল। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে ডানে মোড় নিয়ে রাস্তাটা উল্টোদিকে চলে গেছে।

“এটাই কি সেই পথ নাকি?” শামান হাঁটুর ওপরে ভর দিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে জানতে চাইলো।

“হ্যাঁ, দেখে তো তাই মনে হচ্ছে,” বলে ওই মোড়ের অন্যদিকে দেখে কালন্তি বলে উঠলো, “দাঁড়াও একটু নিশ্চিত হয়ে নেই। আমরা...” কালন্তি কথা শেষ করার আগেই রাস্তার বাঁকের অন্যপাশে ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। সেইসাথে ঘোড়াকে ধমক দিচ্ছে এরকম একটা গলা। সাথে-সাথে শামানের একটা হাত চলে গেল শরীরের পেছন দিকে। তলোয়ারের বাটের ওপরে চেপে বসলো আঙ্গুল। শামান দেখলো কালন্তিও এক হাতে চেপে ধরেছে কোমরে পেঁচিয়ে রাখা চাবুকের বাট।

জঙ্গলের ওপাশ থেকে কে আসছে জানা নেই। যে-ই আসুক মোকাবেলা করতে হবে, কারণ পালাবার সময় নেই।

অধ্যায় সাতাশ

বর্তমান সময়

আখালিয়া সুরমা, সিলেট

লাক্কাতুরার জঙ্গুলে এলাকা পুরো চষে ফেলেও কিছু পাচ্ছে না তানভীরের টিম।

"ব্যাপার কি, ওটা গুগল ম্যাপেও নেই, আমাদের নিজেদের ম্যাপেও নেই," তানভীর একটু অবাক হয়েই বলে উঠলো।

"হতে পারে," লায়লা আনমনেই মাথা নাড়তে-নাড়তে বলতে লাগলা। "কারণ আমার যতোটুকু মনে পড়ে মিতায়ন বলেছিল জায়গাটা বনাঞ্চল হলেও ওটা একটা প্রাইভেট প্রপার্টি। আর ওখানে যে-বাংলোতে ওদের অফিস সেই বাংলোটাও সম্ভবত একই মালিকের।"

"হতে পারে, স্যার," লায়রার কথার সাথে ইকবাল যোগ করলো। "কারণ ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রপার্টি অনেক সময় ম্যাপে থাকে না। বিশেষ করে জায়গাটা ছোট হলে।"

"প্রশ্ন সেটা না," ঘড়ি দেখতে-দেখতে তানভীর বলে উঠলো। "আমার প্রশ্ন হলো, যদি সঠিক ঠিকানাটা না পাই তবে আমরা সেখানে যাবো কিভাবে?" ঘড়িতে তিনটার ওপরে বাজে। তানভীর হিসেব করে দেখলো, যদি এখান থেকে বাংলোতে যাবার জন্যে ওরা রওনা দেয় তবুও চারটা বেজে যাবে। একে তো শীতের সময়, তার ওপরে পাহাড়ি এলাকায় সন্ধ্যে নামে খুবই দ্রুত। আর বাংলোটা পরীক্ষা করা খুবই জরুরি মনে হচ্ছে ওর কাছে। কারণ ওটাই যদি ডক্টরের মূল অফিস হয়ে থাকে তবে ডক্টরের আসাম অভিযানের বিস্তারিত তথ্য ওখানেই পাওয়া যাবে। এমনকি ডক্টরের অন্তর্ধানের ব্যাপারেও জরুরি কিছু না কিছু অবশ্যই জানা যাবে।

"আমি আপনাদেরকে ওখানে নিয়ে যেতে পারি," সবাইকে অবাক করে দিয়ে-বিশেষ করে তানভীরতে অবাক করে দিয়ে লায়লা বলে উঠলো।

"আপনি আমাদেরকে নিয়ে যাবেন মানে?" তানভীর অবাক হয়ে বলে উঠলো। "আপনি তো আমাদেরকে সঠিক অবস্থানটাই জানাতে পারছেন না, নিয়ে যাবেন কী ক'রে?"

"বাংলোর অবস্থান জানাতে না পারি দেখাতে তো পারবো," লায়লাকে মনে হলো সে একটু খুশি হয়ে উঠেছে।

"আপনি সেখানে গেছেন নাকি এর আগে?" সুলতান জানতে চাইলো।

“একেবারে বাংলো পর্যন্ত গেছি বললে ভুল হবে, তবে ওটার কাছাকাছি গেছি,” বলে সে যোগ করলো। “আজ থেকে বছর দেড়েক আগে লাক্কাতুরার কাছেই ওয়ান্ডারল্যান্ডে আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে পিকনিকে গেছিল। তো আমি পিকনিকের গাড়ি মিস করি। মিতায়ন আমাকে বলে, সে ওদিকেই যাচ্ছে কাজেই চাইলে সে আমাকে নামিয়ে দিতে পারে। ও আমাকে নিয়ে কাতিয়ার মূল রাস্তা পর্যন্ত যায়, এরপরে ওখান থেকে ডিপার্টমেন্টের গাড়ি এসে আমাকে পিক করে নেয়। আর মিতায়ন ওর অফিসে চয়ে যায়। কাজেই আমি খুব সহজেই আপনাদেরকে দেখাতে পারবো জায়গাটা।”

“ভালোই তো হলো তাহলে, আপনি-” টমি খুশি হয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই তানভীর গভীর আপত্তির সাথে মাথা নাড়লো। “না-না সেটা হয়না, এটা একটা পুলিশি ইনভেস্টিগেশন, আর উনি একজন সিভিলিয়ান। ওখানে যদি কোন বিপদ হয় তবে কী হবে, তারচেয়ে-” তানভীর কথা শেষ করার আগেই বাইরে চেঁচামেচি শোনা গেল। বারান্দায় হুঁড়মুড় করে ঢুকে পড়লো মধ্যবয়স্ক একজন মহিলা।

বয়স্ক মহিলা পলকে সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়েই ছুটে গেল লায়লার দিকে। “মা-” বলে চেঁচিয়ে উঠে সে এতো জোরে লায়লাকে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো, আরেকটু হলে লায়লা চেয়ার উল্টে পড়ে যেত মাটিতে।

তানভীর উঠে দাঁড়ালো, এখন পারিবারিক কাহিনী হবে, এগুলো না দেখে ওর বরং ওর কাজ করা উচিত। সুলতানের দিকে ইশারা করে ও উঠে দাঁড়িয়ে ডায়নিং রুমে বেরিয়ে এলো। বাইরে এসে আরেকটু হলেই ওর সাথে ধাক্কা লাগতে যাচ্ছিলো একজন মানুষের। নিজেকে সামলে নিয়ে সরি বলতে যাবে দেখতে পেল মানুষটা ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

“তানভীর ভাই, তুমি?” আক্ষরিক অর্থেই মানুষটার মুখ হা হয়ে গেছে তানভীরকে দেখে। “তুমি এখানে!”

মানুষটাকে চিনতে মুহূর্তখানেক লাগলো তানভীরের, যদিও বহু বছর পরে দেখা, মেয়েটা অনেক বড় হয়ে গেছে তবুও চিনতে খুব একটা বেগ পেতে হলো না তানভীরের। “শায়লা তুই?”

লায়লার ছোট বোন শায়লা। তানভীরের চেয়ে দুই বছরের ছোট ছিল তখন। লায়লা আর তানভীরের প্রেম নিয়ে সবচেয়ে বেশি উচ্ছসিত থাকতো শায়লা। আবার সবচেয়ে বেশি দুষ্টুমিও করতো সে-ই। লায়লার সাথে তানভীরের প্রেম ভেঙে যাবার পর শায়লা বহুবার ওর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছে কিন্তু তানভীর কোনভাবেই হতে দেয়নি সেটা। অনেকদিন চেষ্টা করতে-করতে অবশেষে ক্ষান্ত দেয় সে। “তুই এখানে?” তানভীর কী বলবে বুঝতে না পেরে বলে উঠলো।

"আমার বড় বোনের হাজবেন্ড মিসিং, আমি এখানে থাকবো না তো কে থাকবে," শায়লা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছে তানভীরকে। "কিন্তু তুমি এখানে কেন?"

কিছু বলার আগে এমনিতেই হেসে ফেললো তানভীর। "আমি ডক্টর মিতায়ন আহমেদ মিসিং কেসের তদন্তকারী অফিসার।"

"তারমানে ঢাকা থেকে বিশেষ ফোর্সের একজন অফিসার আসার কথা, সেটা তাহলে তুমি?" শায়লার গলার বিস্ময়টা চাইলেও সে কোনভাবেই লুকাতে পারছে না। "মাই গড! তাই বলে শেষ পর্যন্ত তুমি?"

"কপালের লিখন, না যায় খন্ডন," কী বলবে ভেবে না পেয়ে বহু আগে কোন একটা বইতে পড়া ডায়লগ ঝেড়ে দিলো তানভীর। "তুই কেমন আছিস, কী করছিস এখন?" তানভীর জানতে চাইলো, কিন্তু শায়লা জবাব দেয়ার আগেই ভেতর থেকে উত্তেজিত চেঁচামেচি ভেসে এলো। তানভীর আর শায়লা দুজনেই ফিরে তাকাল সেদিকে।

"আপার ওপরে নাকি হামলা হয়েছিল? ব্যাপারটা কি, আমরা একটু জিন্দাবাজার গেছিলাম। খবর পেয়ে একরকম ছুটে এলাম," শায়লা উদ্বিগ্ন মুখে বলে উঠলো।

তানভীর চোখ তুলে তাকাল শায়লার দিকে, কিছু না বলে খানিকটা এগিয়ে ভগ্নদশা ডায়নিং রুমের একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো। "তোর বোন সুস্থ আছে," বলে একটু হেসে যোগ করলো। "ভয় পেয়েছে আরকি, যেটা এতোদিন অন্য মানুষকে পাওয়াতো।"

তানভীরের কথা শুনে হেসে উঠলো শায়লা। তার হাতে কয়েকটা ব্যাগ ছিল সেগুলো নামিয়ে রাখলো টেবিলের ওপরে। সেও বসে পড়লো একটা চেয়ার টেনে। বারান্দার দিকে ইশারা করে বললো। "ওখানে কে-কে আছে?"

"তোর মা, লায়লা আর আমার একজন মহিলা এজেন্ট আছে। তোর বোন বরাবরের মতোই অনেক লাকি, কারণ আমরা একেবারে সময়মতো পৌছে গেছিলাম। না হলে আজ খারাপ কিছু হতে পারতো," শায়লার স্থির দৃষ্টির সামনে একুট বিব্রত বোধ করছে তানভীর।

"তানভীর ভাই, আসলে হচ্ছেটা কি বলো তো। আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না। প্রথমে এভাবে জিজু হারিয়ে গেল এরপর আপার ওপরে হামলা," বলে সে তার আঙ্গুলে পরে থাকা বড়-বড় আঙটিগুলোর একটা ধরে মোচড়াতে লাগলো। "আমরা পরিবারের লোকজন খুব অসহায় বোধ করছি।"

"শোন, তোকে যে আমি বিস্তারিত বলবো, আমি নিজেই তো সবকিছু এখনো পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি। আমি ইংল্যান্ডে ছিলাম দুইদিন আগেও। হঠাৎ জরুরি তলবে আমাকে ডেকে আনা হলো। এরপর আজ অফিসে গিয়ে জানতে পারলাম এই কেসের ব্যাপারে। আমারও তো একটু সময় দরকার বুঝে ওঠার জন্যে," বলে একটু থেমে ও যোগ করলো। "তোর দেখি আগের মতোই আংটি পরার অভ্যাস আছে এখনো।"

নিজের ভাবনার জগতে হারিয়ে গেছিল শায়লা হঠাৎ তানভীরের কথা শুনে সে একটু অবাক হয়েই ফিরে তাকাল। তারপর নিজের হাতের আংটিগুলোর দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো। "আমি, এখনো অনেকটা আগের মতোই আছি। তুমি কেমন আছো?"

তানভীর একটু উদাস গলাতেই উত্তর দিলো। "তুই যেমন আগের মতোই আছিস, আমি ঠিক তার উল্টো। আমার ভেতরে আগের সেই তানভীরের ছিটেফোঁটাও আর নেই।"

"বললে হয়তো তুমি বিশ্বাস করবে না তানভীর ভাই, তোমার সাথে আমি যোগাযোগ করার কতো যে চেষ্টা করেছি," বলে একটু থেমে যোগ করলো। "আপা তোমার সাথে যা করেছে সেটা... সেটা অনেক অনেক বেশি কষ্ট দিয়েছিল আমাকে। তুমি হয়তো মানবে না কিন্তু বাবাও অনেক কষ্ট পেয়েছিল। এমনকি বাবা এক বছর কথা বলেনি আপার সাথে," বলে সে কাঁধ ঝাঁকালো, "কিন্তু আপাকে তো তুমি চেনোই। কারো কথা শোনার মতো মানুষ সে কখনোই ছিল না। সে..."

তানভীর একটা হাত তুলে থামিয়ে দিলো ওকে। "বাদ দে না, এসব পুরনো কথা আর ঘেঁটে লাভ নেই। আমি বলতে গেলে সব ভুলেই গেছি। এই উদ্ভট কেসে আমাকে না পাঠালে ওগুলো আর মনে করারও দরকার পড়তো না। এসব বাদ দিয়ে বরং বল তুই কি করছিস এখন?"

"আমি তো জাহাঙ্গীরনগর থেকে গ্র্যাজুয়েট করে এখন একটা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছি। এইতো, কয়েক বছর হলো।"

"তোর ওই 'ভ্যাবলা-মার্কা' বয়ফ্রেন্ডটা আছে এখনো?" তানভীর হেসে উঠে জানতে চাইলো। "সরি, কিছু মনে করিস না।"

শায়লাও হেসে উঠলো। "আলিফকে তুমি কখনোই পছন্দ করতে না, আমি জানতাম। আছে, ভালোই আছে," ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে উঠলো শায়লা। "সংসার করছে সুখে।"

"বাহ, তোদের বিয়েও হয়ে গেছে বুঝি, কনগ্র্যাটজ।"

"আরে, তানভীর ভাই!" বলে শায়লা একরকম মুখ ঝামটা দিলো। "বলেছি সে সংসার করছে, আমার সাথে সংসার করছে সেটা তো বলিনি। ওকে ঝেটিয়ে বিদেয় করে বেঁচেছি। গাধাটা এতো ক্যারিয়ারিস্ট, সারাক্ষণ চাকরি-বস-অফিস, উফ্, আল্লাহ বাঁচিয়েছে বলদটাকে বিয়ে করিনি।"

একমুহূর্ত তানভীর তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। তারপর দুজনেই একসাথে হেসে উঠলো আবার। "আচ্ছা, তুই বললি লায়লা আমাকে ডিচ করার পর, মানে ওই ঘটনার পর আঙ্কেল অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন। আন্টি নিশ্চই খুব খুশি হয়েছিলেন। উনি তো আমাকে..."

“এখন আর মিথ্যে বলবো না,” শায়লার চোখে দুষ্টামির হাসি। “মা আসলেও অনেক খুশি হয়েছিল। মা...”

শায়লা কথা শেষ করার আগেই বারান্দার দিক থেকে চেঁচামেচি ভেসে এলো। প্রায় ঝড়ের বেগে ডায়নিং রুমে প্রবেশ করলো ঢোলা পালাজ্জো আর গোলাপি রঙের ঢোলা শার্ট পরা বয়ষ্ক একজন মহিলা। তানভীর আর শায়লা দুজনেই ফিরে তাকাল তার দিকে।

শায়লা-লায়লার মা। মহিলাকে চিনতে পারার সাথে-সাথেই তানভীর বুঝতে পারলো মহিলা এখনো পুরোপুরি আগের মতোই আছে। একটুও বদলায়নি। সেই উগ্র সাজগোজ, বেমানান কড়া লিপস্টিক। এখনো সে তার দুই মেয়ের চেয়ে বেশি সাজগোজ করে।

বয়ষ্ক মহিলা ঝড়ের বেগে ডায়নিং রুমে প্রবেশ করে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, “আমি জানতে চাচ্ছি এখানে অথরিটি কে? আমার মেয়ের এতো বড় বিপদ, কেউ কিছু তো করছেই না, আবার ওকে নিয়ে নাকি তারা কোথায় যেতে চায়। এতো বড় সাহস কার? আমি একটু দেখতে চাই।”

“এই যে আন্টি, আমি এখানকার দায়িত্বরত অফিসার,” তানভীর বসা অবস্থাতেই বলে উঠলো। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মহিলার দিকে। “কিছু বলার থাকলে আমাকে বলতে পারেন।”

মহিলা বিশাল দেহ নিয়ে বলতে গেলে প্রায় লাফিয়ে এগিয়ে এলো তানভীরের দিকে। একেবারে তানভীরের সামনে এসে মুখের সামনে আঙ্গুল তুলে শাসিয়ে-শাসিয়ে কথা বলতে শুরু করলো। “আপনি কি পুলিশ? আপনার ইউনিফর্ম কোথায়? আপানাদের এতো বড় সাহস...”

“মা কী হয়েছে?” তানভীরের পাশ থেকে শায়লা বলে উঠলো। “এতো উত্তেজিত হচ্ছো কেন?”

“উত্তেজিত হবো না,” মহিলা তার মেয়ের দিকে ফিরে উছলে উঠলো। “আমার মেয়ের জামাই নিখোঁজ, আমার মেয়ের ওপরে সন্ত্রাসিরা হামলা করেছে। পুলিশ কিংবা অন্য কেউ তো কিছু করছেই না বরং উল্টো এখন তারা আমার মেয়ের কাছ থেকে সাহায্য চায়। কতো বড় সাহস,” বলে মহিলা আবার ফিরে তাকাল তানভীরের দিকে। তানভীর এখনো শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মহিলার দিকে। “এ্যাই আপনি এখানকার নাকি দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার, আপনি বলুন। ঢাকা থেকে আপনাদের না কে আসার কথা, সে আসছে না কেন?”

“আমিই সেই ঢাকা থেকে আসা অফিসার,” বলে তানভীর উঠে দাঁড়িয়ে একেবারে মহিলার মুখোমুখি দাঁড়ালো।

মহিলা তানভীরের একেবারে মুখের সামনে আঙ্গুল তুলে চোখ-মুখ খিঁচিয়ে শাসানোর ভঙ্গিতে কিছু একটা বলতে চাচ্ছিলো হঠাৎ সে থেমে গেল। চূড়ান্ত অবাক হয়ে সে বলে

উঠলো, "তানভীর! তুমি?" বহু বছরের পরিবর্তনে অনেকটাই বদলে যাওয়া তানভীরকে প্রথমে চিনতে পারেনি সে। হঠাৎ চিনতে পেরে একেবারে থমকে গেল।

"জি, আমি। আমিই ঢাকা থেকে আসা সেই অফিসার। ডক্টর মিতায়ন আহমেদ অন্তর্ধান কেসের দায়িত্ব এই মুহূর্তে আমার আমার ওপরেই ন্যস্ত," তানভীর বেপরোয়া দৃষ্টিতে সরাসরি মহিলার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে।

মহিলা কিছুক্ষণ স্থবির হয়ে থেকে একেবারে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলে উঠলো, "হাউ ডেয়ার দে, হাউ ডেয়ার দে সেন্ড ইউ ফর দিস কেস। তুমি তো জীবনেও মিতায়নকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে না উল্টো পারলে আমার মেয়েকে..." বলে মহিলা থেমে গেল। "আচ্ছা, এইজন্যেই তুমি তাহলে আমার মেয়েকে নিয়ে যেতে চাইছো বাংলো খুঁজে বের করতে। আমি কি বুঝি না..."

"মা তুমি কী শুরু করলে?" শায়লা বলে উঠলো। বাইরে থেকে ফরেকসিকের সবাই তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। ভেতরের রুম থেকে টমি আর সুলতানও বেরিয়ে এসেছে। "তুমি জানো এখানে কী ঘটেছে? তুমি অকারণে-"

"এই, তুই চুপ থাক..." মহিলা একবাক্যে চুপ করিয়ে দিলো শায়লাকে। "ওদের এতো বড় সাহস, ওরা ভেবেছে কি? আমরা অসহায়? আমার পারিবারিক কানেকশন কতোটুক, ওদের কোন ধারণা আছে? পররাষ্ট্র মন্ত্রী আমার আপন চাচাতো ভাই। আমি চাইলে..."

"খুঁজে বের করেন," তানভীর মহিলার কথার মাঝেই খুব শান্তভাবে বলে উঠলো। "আপনার তো অনেক কানেকশন, তো আপনার কানেশনের জোরে খুঁজে বের করেন আপনার মেয়ের জামাইকে।"

"মানে," মহিলা একটু থমকে গেছে। "কী বলতে চাইছো তুমি?"

"খুব সহজ কথা, আপনি তো বলছেন আমি কিছুই করবো না, আমার উদ্দেশ্য খারাপ, ইত্যাদি-ইত্যাদি। তো আপনি আপনার কানেকশনের জোরে মেয়ের জামাইকে খুঁজে বের করেন," তানভীর একটু এগিয়ে এলো মহিলার দিকে। সরাসরি তার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, "আমার প্রশ্ন হলো, ইতিমধ্যেই কয়েকদিন পার হয়ে গেছে, আপনি কিছু করেন নি কেন?"

মহিলা একটু পিছিয়ে গিয়ে সবার দিকে তাকাচ্ছে। "এই ছেলে কী বলছে, ও কি পাগল হয়ে গেছে নাকি?"

"পারেন নি, তাই না?" তানভীর বলে উঠলো। "শুনুন, আপনার কানেকশন আছে কি নেই, আমি আপনার শত্রু না বন্ধু এসব ব্যাপারের অনেক উর্দ্ধে চলে গেছে এই ঘটনা। মানেন আর না মানেন, সত্যি কথা হলো আমি তানভীর মালিকই এখন আপনাদের একমাত্র ভরসা। কাজেই নিজের ভালোর জন্যে হলেও মুরুব্বি হিসেবে দোয়া করেন যেন অমি সফল হই।"

“দেখো, তাই বলে তুমি আমার মেয়েকে নিয়ে এভাবে মাঠে নামতে পারো না, তুমি যদি...”

“মা তুমি চুপ করবে?” বারান্দার দরজার কাছ থেকে নতুন কণ্ঠস্বর শুনে সবাই সেদিকে ফিরে তাকাল। লায়লা দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। “তুমি সবসময় বেশি কথা বলো। তোমাকে কে বলেছে উনারা আমাকে নিয়ে কাজে নামতে চাইছে। আমি উনাদেরকে বলেছি মিতায়নকে খুঁজে বের করতে যেকোন সাহায্য করতে চাই। বাংলো খুঁজে বের করার ব্যাপারটাও তাই।”

“তাই বলে এই ছেলে,” বলে সে তানভীরের দিকে দেখালো। “এই ছেলে তো তোর জানের শত্রু। এ তো তোকে মেরে ফেলবে।”

“মা, তুমি না কি যে সব বলো মাঝে-মধ্যে,” বলে সে তানভীরের দিকে তাকিয়ে দৃঢ় স্বরে বলে উঠলো, “অফিসার আপনারা গাড়িতে গিয়ে বসুন আমি রেডি হয়ে আসছি।”

একবার লায়লার দিকে তাকিয়ে আরেকবার ওর মা আর শায়লার দিকে দেখলো তানভীর, তারপর কিছু না বলে নিজের লোকদের উদ্দেশ্যে ইশারা করে বাংলোর বাইরে বেরিয়ে এলো।

দুপুরের সূর্যের তেজ অনেকটাই কমে এসেছে। বিকেল না হলেও সময়টা যেন দুপুর আর বিকেলের দড়ি-টানাটানির মাঝে পড়ে থমকে গেছে।

বাইরে বেরিয়ে তানভীর বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলো। একদিনের ব্যবধানে জীবনটা হঠাৎ খুব কঠিন মনে হচ্ছে ওর কাছে। বাংলোর বারান্দা থেকে নেমে পায়ে চলার পথটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলোর কাছে এসে থেমে গেল। পেটের ভেতরে পাকস্থলি মোচড় দিয়ে জানান দিচ্ছে সকালের নাস্তায় একটা স্যান্ডউইচ আর এক কাপ কফি ছাড়া আর কিছু খাওয়া হয়নি। মজার ব্যাপার হলো পেটের ভেতরে পাকস্থলি মোচড় দিচ্ছে কিন্তু কিছু খাবার কথা মনে হচ্ছে না বরং মনে হচ্ছে আরো সিগারেট টানতে পারলে ভালো হত।

রক্তের ভেতরে নিকোটিনের নেশা যেন অনেকদিন বন্দি থাকার পর লাগাম ছাড়া ঘোড়ার মতো ছুটতে শুরু করেছে। কোকের বোতলের মুখ চেপে ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে ছেড়ে দিলে যেভাবে গল-গল করে বেরুতে শুরু করে, প্রায় আট বছর পরে সিগারেটে টান দেয়াতে রক্তের ভেতরে নিকোটিনের নেশার যেন ঝড় শুরু হয়েছে।

“বস, বলেন। নির্দেশনা কি?” ও পেছন ফিরে দেখেলো টমি, সুলতান আর ইকবাল এসে দাঁড়িয়েছে ওদের পাশে। টমি জানতে চাইছে এবার ওদের করণীয় কি।

কিন্তু টমির প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বরং ওর দিকে ফিরে জানতে চাইলো, “টমি, তুই কি সিগারেট খাস?” ঘন্টাখানেকের ব্যবধানে টমিকে তানভীর আপনি থেকে তুমি, এখন তুমি থেকে তুই ডাকতে শুরু করেছে।

কিন্তু টমির কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সে বিগলিত গলায় বলে উঠলো, “না, বস। কেন?”

এবারও টমির প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ও ইকবালের দিকে ফিরে ভ্রু নাচিয়ে একই প্রশ্ন করলো। সুদর্শন সাব ইন্সপেক্টর হাসি দিয়ে দুই হাত তুলে নিজের অপারগতা প্রকাশ করলো।

“বস,” সুলতানেরে ডাক শুনে সেদিকে ফিরে ও দেখতে পেল একটা গোল্ডলিফের প্যাকেট আর একটা লাইটার ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে সুলতান। “কিছু মনে করবেন না, ছোটবেলার অভ্যাস।”

মৃদু হাসি দিয়ে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরিয়ে টান দিলো ও। গোল্ডলিফের কড়া স্বাদের কারণে চোখে জল চলে এলো প্রায়। “ইকবাল, যা-যা বলেছিলাম করা হয়েছে?”

“জি, বস, পাহারা বসানো হয়েছে, সতর্ক করে দেয়া হয়েছে সমস্ত পুলিশ চৌকিকে। বাকি যা-যা বলেছেন সেগুলোও ব্যবস্থা করা হচ্ছে,” ইকবাল মাথা নেড়ে বলে উঠলো।

“টমি, তুই ফরেনসিকের ওদেরকে নিয়ে ল্যাবে চলে যা। আমি ইকবাল, সুলতান আর লায়লাকে নিয়ে সেই বাংলোর অনুসন্ধানে যাবো। আমার ধারণা ওখানে গেলে অবশ্যই কিছু না কিছু পাওয়া যাবে কারণ ডক্টর মিতায়নের অনেক কিছুই আমাদের কাছে পরিষ্কার না,” বলে ও সিগারেটটাকে টমির দিকে পিস্তলের মতো তাক করলো। “বিশেষ করে তার আসাম অপারেশনের ব্যাপারে বিশদ জানতে পারলে অবশ্যই আমরা কোন না কোন ক্লু পাবো তার অন্তর্ধানের ব্যাপারে। তুই ল্যাবে গিয়ে আগে যা-যা বলেছি সেগুলো খতিয়ে দেখবি, বিশেষ করে ভাড়া করা প্লেনের ব্যাপারটা, আর সুলতানের বলা অস্ত্রের ব্যাপারে খোঁজ নিবি। আর সেইসাথে এখানকার ফরেনসিক রিপোর্ট চাই আমি, একেবারে বিস্তারিত,” ওই পর্যন্ত বলে ও একে-একে টমি-সুলতান আর ইকবারকে দেখলো।

“সবাইকে একটা ব্যাপারে সচেতন করে দেই,” বলে ও সিগারেটে জোরে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লো ওপরের দিকে। “আপনারা হয়তো জানেন বা বুঝতে পেরেছেন এই কেসের সাথে আমার একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার জড়িয়ে যাওয়াতে কেসটা আমাদের জন্যে আরো জটিল হয়ে গেছে। একদিকে, আমরা সরাসরি পুলিশ বা পিবিআইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট না, অন্যদিকে আমি সুলতান টমি আবার এই কেসে এসেছি ইএএফের সাথে কোলাবোরেশনে কাজ করতে। পুলিশ বলেন পিবিআই বলেন আর ইএএফ বলেন আমাদের সফলতার ভাগ সবাই চাইবে, কিন্তু ব্যর্থ হলে আমাদের কল্লা নিতে এক বিন্দু দ্বিধা করবে না কেউ। তার ওপরে আছে লায়লার মা। আমি যতোটুক জানি মহিলার পারিবারিক কানেকশন আসলেই খুব ভালো। বাংলাদেশে এসব কানেকশনের জোরে কোন কাজ না হলেও প্রচুর অকাজ ঠিকই হয়। কাজেই আমরা যদি কোনভাবে ব্যর্থ হই, বা লায়লার কোন ক্ষতি হয়, কিংবা আমাদের কারণে ডক্টর মিতায়নের কোন ক্ষতি হয়, এই মহিলা আমাদের বিশেষ করে আমার কল্লা চিবিয়ে খাবে,” বলে ও একটু থামলো।

“কাজেই আমাদের সবাইকে খুব সাবধানে সর্বোচ্চ শ্রম-মেধা দিয়ে এই কেসের পেছনে লাগতে হবে। আমি কথাগুলো বললাম আপনাদেরকে ভয় দেখানোর জন্যে না, বরং যাতে কাজটাকে গুরুত্বসহকারে নিয়ে ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পারেন সেজন্যে। সবাই বুঝতে পেরেছেন?”

সবাই এক যোগে মাথা নাড়লো। সন্তুষ্টির সাথে মাথা নাড়লো তানভীর। “ইকবাল, আপনি এই বাংলোতে পুলিশ পাহারা বসানোর ব্যবস্থা করে আমাদের মাইক্রোর ড্রাইভারকে গাড়ি প্রস্তুত করতে বলেন। আর টমি তুই ফরেনসিক নিয়ে ল্যাবে গিয়ে কাজ শুরু কর।”

দুজনেই প্রস্থান করতেই সুলতান বলে উঠলো, “বস, একটা কথা বলি, যদি কিছু মনে না করেন।”

“বলো, সমস্যা নেই,” বলেই ও মৃদু হেসে উঠলো। “যে-অবস্থার মধ্যে আছি এরচেয়ে খারাপ আর কী হতে পারে।”

সুলতানও হেসে উঠলো। “বস, আপনার আর মিসেস লায়লার পুরনো ব্যক্তিগত ব্যাপারটা যেভাবে সবার সামনে চলে এসেছে তাতে এই পরিস্থিতিতে উনাকে নিয়ে বাংলো খুঁজতে যাওয়াটা কতোটুক ঠিক হচ্ছে?” বলেই সে ব্যাখ্যা করার ভঙ্গিতে বলে উঠলো, “বাই এনি চান্স, উনার কিছু হলে সব কিন্তু দোষ আপনার ওপরে এসে পড়বে।”

কোন জবাব না দিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে নিজের দাড়িতে হাত বুলাতে লাগলো তানভীর। মনের ভেতরে প্রশ্ন,

ভুল সিদ্ধান্ত হয়ে যাচ্ছে না তো?

অধ্যায় আটাশ

সময়: ১৮০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ

পৃথুরা বনভূমি, কন্নোর, ভারতবর্ষ

মুহূর্তের জন্যে শামানের মনে হলো ওর সিদ্ধান্তটা ভুল ছিল। এভাবে পথের ওপরে দাঁড়িয়ে না থেকে, বরং চেষ্টা করলে হয়তো জঙ্গলের ভেতরে লুকানো যেত।

“সাবধান! উল্টোপাল্টা কিছু করো না, জঙ্গলে লুকানোর সময় নেই, শত্রু না মিত্র জানা নেই। শত্রু হলে আর সংখ্যায় বেশি হলে স্রেফ উল্টো ঘুরে জঙ্গলে ঢুকে পড়াই সবদিক থেকে শ্রেয় হবে,” দ্রুত নিজের চুল আর মুখ ঢাকতে-ঢাকতে কালন্তিকে সাবধান করে দিলো শামান।

কালন্তি একবার মাথা নেড়ে সায় জানালো।

ওরা পুরোপুরি প্রস্তুত হবার আগেই বাঁক ঘুরে এগিয়ে এলো একটা ঘোড়ার গাড়ি। শক্তিশালী ঘোড়া দুটোর পেছনে একটা মালামাল আনা-নেয়া করার খাঁচার আকৃতির ভেতরে অনেকগুলো কাঠের গুড়ি বসানো। আর সেগুলোর ওপরে শরীর খাড়া করে বসে আছে এক বুড়ো লোক। বুড়োকে দেখে দুজনেই একটু স্বাভাবিক বোধ করলো। এই বুড়ো আর যাই হোক শত্রু নয়।

বুড়োর ঘোড়াদুটো বেশ দ্রুত গতিতে মোড় নিয়ে রাস্তার ওপরে উঠে আসছিল হঠাৎ জঙ্গলের কিনারায় ওদেরকে দেখে গতি কমে গেল ওটার। একেবারে ওদের সামনে এসে থেমে গেল ঘোড়ার গাড়ি। শামান-কালন্তি দুজনারই মনে প্রশ্ন, ব্যাপার কি, বুড়ো ঘোড়ার গাড়ি থামালো কেন?

“অ্যাই তুমরা,” বুড়ো গাড়ির ওপর থেকে ঘাড় বেঁকিয়ে উঁকি দিলো। “এয়ানে কি করো, তোমরা? ঝগড়া করার জইন্যে এউয়া কেমন জায়গা?” বলে বুড়ো খ্যাক-খ্যাক করে হেসে উঠলো। শামান ইশারায় কালন্তিকে জবাব দিতে বললো।

কালন্তি অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকালো। “অ্যাই মেয়ে, আর ছেলে। তোমরা কথা কও না ক্যান?” বুড়োর গলা শুনে শামানের মনে হলো বুড়ো সোমরস খেয়ে একেবারে মাতাল হয়ে আছে। আবারো ও কালন্তির দিকে ফিরে ইশারায় কথা বলতে বললো। “চাচা, আমরা জঙ্গলের ভেতরে পথ হারায়ে ফেলেছি। মন্তলার হাটের দিকে আমাদের গ্রাম, আপনি বলতে পারবেন সেডা কোনদিকে?”

“হা-হা-হা,” কালন্তির কথার জবাবে বুড়ো ভুরি দুলিয়ে হেসে উঠলো। শামান কালন্তির দিকে তাকিয়ে চোখ গরম করলো। কালন্তি অসহায়ভাবে বলে উঠলো, “আর কি বলবো?”

"অ্যাই তোমরা মিথ্যে কচ্ছো ক্যান? তোমার বউ," বলে সে শামানের দিকে দেখালো। "ঝগড়া করে বাড়ি থেইকে পলায়ছিল তুমি এইসে ধরেছো, তাইনা?" শামান কিছু না বলে অসহায়ভাবে হাসলো। বুড়ো ইশারায় ওদেরকে গাড়িতে উঠে পড়তে বললো। "আমি মন্তলার হাটের দিকেই যাইছি, উঠে পড়ো।"

কালন্তি শামানের কাছে ইশারায় জানতে চাইলো কী করবে। জবাবে শামান লাফিয়ে একটা গাছের গুড়ি ধরে ফেলে ওটা বেয়ে উঠে এলো ওপরে। কালন্তি রাগের সাথে শামানের দিকে একবার আঙ্গুল নেড়ে সেও উঠে এলো ওপরে। ওঠার সময়ে শামান তাকে সাহায্য করার জন্যে হাত বাড়ালো কিন্তু রাগের সাথে সেটো এড়িয়ে গেল কালন্তি।

"ওরে বাপরে, মেয়ে দেখি এখনো রেইগে আছে," বলে বুড়ো হাসতে লাগলো। "তা বাপু ওকে মানালে কী করে, রাগ করা মেয়ে মানুষকে মানানো তো সোজ লয়," বলে সে হাসতেই থাকলো।

কালন্তির দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো শামান, "আর বইলেন না চাচা, জান বারায়ে গেছে। তা চাচা এই সময়ে কই যাচ্ছেন এইগুলান নিয়া?"

"কাম ,বাপু, কাম," বুড়োকে দেখে মনে হচ্ছে সে বেশ আনন্দে আছে। "কামে বুড়ারেও ছাড়ে না। তয় এইবার বিরাট একটা কাম পাইয়েছি, এই কারণেই এই ঘুড়া দুইট্টা আর গাড়ি ভাড়া করেছি।"

"কি কাম চাচা?" শামানের পাশে বসে থাকা কালন্তি জানতে চাইলো। সে পথের ওপরে কড়া নজর রেখেছে, কারণ যে-রাস্তা দিয়ে ওরা যাচ্ছে সেই রাস্তাতে লিচ্ছবীদের পাহারা থাকতে পারে।

"আর কইয়ো না, জঙ্গলের মইধ্যে কাঠ কাটতে-কাটতে জীবন শ্যাষ হয়ে যাচ্ছিলো, তার উপরে গেল বছর মন্দায় এক্কেরে শ্যাষ। এইবার একটা ভালা কাম পাউনে জানডা বাঁচবো মনে হইতেছে। লিচ্ছবী রাজার লুকেরা বিরাট একটা কাম পাওয়ায়ে দিছে," বলে বুড়ো তার ছোট লাঠির মাথায় আটকানো ছিপের মতো দেখতে দড়ি নিয়ে ঘোড়া সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

শামান আর কালন্তি দুজনেই বুড়োর শেষ কথা শুনে একেবারে সচকিত হয়ে উঠেছে। দুজনেই একে অপরের দিকে ফিরে তাকাল। শামান দেখলো একটু আগে চোখা করা লাঠির এক প্রান্তে ধরে রাখা আঙ্গুলের গাট সাদা হয়ে গেছে কালন্তির। ইশারায় তাকে শান্ত থাকতে বললো ও। ওরা বসেছিল ঘোড়ার গাড়ির ওপরে রাখা কাঠের গুড়িগুলোর এক পাশে। কালন্তি সাবধানে শরীরটা টেনে-টেনে যতোটা সম্ভব চাচার কাছাকাছি চলে এলো। "লিচ্ছবী রাজার লুকেরা কি কাম পাওয়ায়ে দিছে চাচা?" মুখে আগের মতোই হাসি ধরে রেখে ও জানতে চাইলো।

“আরে, তুমরা জানো না, কুন মুল্লুকে থাহো? কাইল দিন বাদে পরশু তো বিরাট ঘটনা ঘইটতে যাইতেছে মন্তলার বাজার এলাকায়। হের লাইগ্গা লিচ্ছবী রাজার বিরাট আয়োজন চলতাছে। হেইহানেই কাম পাওয়ায়ে দিছে আমার এক ভাতিজা।”

শামান ঝট করে কালন্তির দিকে দেখলো। কাল বাদে পরশু তারমানে অব্যশই বড় কিছু একটা ঘটতে চলেছে। যজ্ঞ বাবা তাহলে মরার আগে ভুল বকে যায় নি। কিন্তু কি ঘটতে চলেছে পরশু।

“চাচ্ া আমরা তো জঙ্গলের মানুষ, এসব খবর রাহিনে, কতো কী হয়, এইগুলা আমাগো জাইন্না কী হইবে?” বলে কালন্তি আরেকটু হাসি যোগ করে নিরীহভাবে জানতে চাইলো, “কিন্তু আপনের কথা শুইন্নে তো ভারি জাইনতে ইচ্ছে করতেছে কী হইবে ওইখানে? আর এতো গাছের গুড়ি দিয়ে কী কইরবে ওরা?”

বুড়ো গাড়ি চালাতে-চালাতে রাগত ভঙ্গিতে ফিরে তাকাল কালন্তির দিকে। বুড়োকে ফিরে তাকাতে দেখে আনমনেই শামানের হাত চলে যাচ্ছিলো নিজের তলোয়ারের বাটের দিকে কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে মুখের বোকা বোকা হাসিটা ধরে রাখলো।

“এইজন্যেই বাপু তুমার বউ তুমার উপর রাগ কইরে বাড়ি থেইকে বারায়ে যায়, কুনো খবর রাখিসনে,” বলে বুড়ো রাগত ভঙ্গি ভুলে গিয়ে হাসতে-হাসতে লাগলো খিক-খিক করে। “মা জননি কিছু মনে করিসনে, তোর জামাইডা এক্করে ভ্যাবলা।”

শামান মনে-মনে বুড়োর পিন্ডি চটকাচ্ছে। শালা বুড়ো আবোল-তাবোল বকছে কিন্তু কাজের কথা বলছে না।

“ও তো এম্বাই চাচা,” কালন্তি বলে উঠলো। “কিন্তু চাচা আমাগোও ভারি জানতি ইচ্ছে হইচ্ছে আসলে কী হইবো ওইখানে আর এতো কাঠ দিয়েই বা কী হইবে?”

বুড়ো অবারো ফিরে তাকাল ওদের দিকে। এবার রাগত ভঙ্গির জায়গায় দেখা দিয়েছে দুঃখের হাসি। “ও, তুইও তো দেহি তোর ভ্যাবলা জামাইয়ের মতোনই। ওইহানে কী হইবে সেইটা আমি কী জানি। আমারে বুঝি কইয়েছে রাজার লুকেরা। তয় এইডা জানি অনেক বিরাট কিছু হইতে যাইতেছে, আর বুকা তরা, এই কাঠ দেইহা কইতাছে আর এতো কাঠ দিয়ে হেরা কী কইরবো, আরে বুকার দল অমার মতোন এই রহম আরো কতোজনরে কইছে এইরহম কাঠ আনতে তার সীমা আছে। বুকার বুকা, তরা জামাই বউ দুনিয়াতে চলবি ক্যামনে?” বুড়ো অনমনেই বিড়-বিড় করতে লাগলো।

“এই দাঁড়াও,” এতোক্ষণের স্বাভাবিক কথোপকথন বাদ দিয়ে নিজস্ব গলায় প্রায় ধমকে উঠলো কালন্তি, বুড়ো ঘোড়ার রাশ টানতে গিয়ে আরেকটু হলে ঘোড়া সহ গাড়ি উল্টাতে-উল্টাতে কোনমতে সামলে নিলো। শামানও আরেকটু হলে পড়েই যাচ্ছিলো গাড়ি থেকে। কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে ফিরে তাকাল কালন্তির দিকে। কারণ মেয়েটা হঠাৎ

এভাবে চিৎকার করে ওঠাতে ওর ভালো লাগেনি, কে জানে রাগের মাথায় আবারো বোকার মতো কিছু করে বসে কিনা।

কিন্তু কালন্তির দিকে ফিরে ও দেখলো মেয়েটা খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামলো।

"কিরে মা জননি, নাইমে গেলি যে, বুড়ার কথায় রাগ কইরেছোস?" বুড়োকে দেখে মনে হচ্ছে সে একটু দ্বিধান্বিত।

"না চাচা, আমগো গাঁও আইসে গেছে," বলে সে উল্টো পথে জঙ্গলের দিকে দেখালো, "ওই দিকে আমাগো গাঁও, এই বুকাডা," বলে সে শামানকে দেখালো। "নিজের গাঁওয়ের রাস্তাও ভুইলে যায়, কী যে করবো এরে নিয়ে চাচা।"

কালন্তির কথা শুনে বুড়ো এক মুহূর্ত দুজনকেই দেখলো, তারপর জোরে হেসে উঠলো। শামান গাড়ি থেকে নেমে বুড়োকে ধন্যবাদ জানাতে বুড়ো হাসতে-হাসতেই বিদায় নিলো।

বুড়োর গাড়িটা চলে গেল। শামান কিছু বলার জন্যে উদ্যত হতেই কালন্তি হাতের ইশারায় চুপ থাকতে বলে ওকে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়লো। শামান দেখলো বুড়োকে সে জঙ্গলের যেদিকে দেখিয়েছিল তার উল্টোদিকের জঙ্গলে ঢুকে ওকে এগোতে ইশারা করলো। কিছুদূর এগোতেই সে বলে উঠলো, "এবার বলতে পারো। রাস্তার কাছাকাছি কথা বলাটা ঠিক হত না। কারণ কোনদিকে লিচ্ছবীদের পাহারাদার আছে কে জানে।"

"তুমি না বললে তোমাদের গ্রাম ওদিকের জঙ্গলে তবে এইদিকে ঢুকলে কেন?" শামান জানতে চাইলো।

কালন্তি ওর দিকে ফিরে আগের মতোই একতটা রহস্যময় হাসি দিলো। "বোকা? বুড়োকে নিজের আসল এলাকা দেখিয়ে দিবো নাকি, আর শোন এখন যেদিকে যাচ্ছি আমাদের এলাকা মূলত সেদিকেও না। আমরা এখান থেকে অনেকটা এগিয়ে বাঁক নিয়ে আবার অন্যদিকে যাবো। কারণ পথের ওপর থেকে কেউ যদি নজর রেখে থাকে তবে বিপদ হতে পারে।"

শামান মাথা নেড়ে সমর্থন জানিয়ে পা চালালো। মেয়েটা জঙ্গলের পথে যেন উড়ে চলেছে। আর পাহাড়ি এলাকার মানুষ শামান চাইলেও তার সাথে তাল রাখতে পারছে না। তার ওপরে আহত শরীর। আরো বেশ কিছুদূর এগিয়ে শামান দুই হাঁটুতে হাত রেখে ওকে থামতে বললো। "আর চলতে পারছি না। তুমি না বলেছিলে কাছেই তবে এতোদূরে কেন?"

"বোকা, তুমি আসলেই বোঝনি?" কালন্তি বেশ অবাক হয়েই জানতে চাইলো। শামান মাথা নেড়ে জানালো সে বোঝেনি।

“শুনলে না মন্তলার হাটে বিরাট কিছু চলছে, তারমানে ওদিকে অবশ্যই পাহারা আছে। তাই যেখানে নামতে চেয়েছিলাম তারচেয়ে অনেক আগেই নেমে গেছি। আচ্ছা, বুড়ো যা বললো সেটা তো যজ্ঞ বাবার কথাকেই সমর্থন করে?”

“হ্যাঁ, অবশ্যই,” শামান সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কালন্তিতে এগোনোর ইশারা করলো। “কিন্তু একটা ব্যাপার খেয়াল করেছো, যাই ঘটতে চলেছে, বুড়ো ওখানে কাজ করছে তাও সে জানে না আসলে কী ঘটতে চলেছে। আর বুড়োর কথায় যা বুঝলাম তাতে মনে হলো ওইখানে আরো অনেক লোক কাজ করছে তারমানে বেশ বড় কিছু একটা ঘটতে চলেছে।”

“হ্যাঁ, আমাদেরকে সেটাই বের করতে হবে,” বলে কালন্তি থেমে দাঁড়িয়ে একবার চারপাশে দেখলো। “আর সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাও নিতে হবে। বলে সে চারপাশটা দেখে নিয়ে নিশ্চিত হয়ে নির্দিষ্ট দিকে দেখিয়ে এগোতে ইশারা করলো।

ওরা আরো প্রায় ঘন্টাখানেকের মতো হেঁটে এক জায়গায় এসে থামলো। মুখের ভেতরে আঙ্গুল পুরে কালন্তি পাখির ডাকের মতো বিচিত্র এক ধরণের শব্দ করে উঠলো। সাথে সাথে সামনের দূর্ভেদ্য জঙ্গলের একটা অংশ আলগা হয়ে গেল। শামান চিনতে পারলো ওইদিন এ-পথ দিয়েই ওদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আজ সকালে ওরা এই পথ দিয়েই বের হয়েছে।

ওরা দুজনে হেঁটে ভেতরে প্রবেশ করতেই হা-হা করে ছুটে এলো কয়েকজন প্রহরী। “রাজকুমারি, আপনি বেঁচে আছেন। রাজাসহ সবাই...” লোকটাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে কালন্তি রীতিমতো দৌড়াতে লাগলো। শামানও এগিয়ে গেল তার পিছু-পিছু। থারুদের বসতির আগে সেই খালের ওপরে সেতুটা ওঠানোই আছে আজ। সেটা দৌড়েই পার হলো ওরা। বসতির লোকজন সবাই তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। ওরা খালপাড়ের পথ ধরে দৌড়ে এগিয়ে গেল রাজা মানরুর বাসস্থানের দিকে। ওখানে গিয়ে দেখলো শাক্য থারু সবাই বসে আছে। সবার অগ্রভাগে বিধু-ঘোষিতরাম-ধোয়ী আর জাথুরিয়া।

ওদেরকে দেখে প্রায় সবাই উঠে দাঁড়ালো। রাজা মানরু দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরলো কালন্তিকে। “আমি তো ভেবেছিলাম তোরা...” বলে সে কালন্তিকে জড়িয়ে ধরে রেখে একজন প্রহরীর উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠলো, “এই, বাড়ির ভেতরে খবর পাঠাও। কালন্তি ফিরে এসেছে।”

বাবা-মেয়ের এই মিলন দৃশ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতেই শামান দেখলো হেলে-দুলে ওর দিকে এগিয়ে আসছে বিধু আর ঘোষিত। হঠাৎ একটা ব্যাপার খেয়াল করলো শামান, গায়ের রঙটা বাদ দিলে দুজনেই প্রায় একইরকম দেখতে।

“আরে ওস্তাদ, মারাত্মক খেল দেখাইলা...” বলে সে হাতের কনুই দিয়ে ঘোষিতের গায়ে গুঁতো মারলো। “দেখেছিস আমার ওস্তাদ বলে কথা, একেবারে মরা থেকে জাইগা উঠছে।

তাও আবার রাজকুমারিকেও উদ্ধার করে আনছে,” বলেই সে এগিয়ে এসে প্রায় সর্বশক্তিতে জড়িয়ে ধরলো শামানকে।

শামানের মনে হলো ওর শরীরের সব হাড় একসাথে ভেঙে যাবে। কিন্তু মুখে কিছু বললো না। বরং বিধুর পিঠে মৃদু চাপড়ে দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে গেল রাজা মানরু আর শাক্য রাজা শঙ্করাদিত্যের দিকে।

“যোদ্ধা, তুমি ফিরে আসাতে আমরা সবাই খুশি,” রাজাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে ও কালন্তি আর মানরুর দিকে ফিরে বলে উঠলো, “রাজা মানরু, খবর আছে। আমরা জানতে পেরেছি কাল বাদে পরশু মন্তলার হাটে কিছু একটা হতে যাচ্ছে কিন্তু এটা বের করা যায়নি যে কী হবে। আমাদেরকে এখন...”

“মস্তক ছিন্ন করা হবে,” পেছন থেকে গম্ভীর গলায় বলে উঠলো কেউ একজন। প্রতিউত্তর শুনে ফিরে তাকাল শামান।

শাক্য রাজা শঙ্করাদিত্য কথা বলে উঠেছে, “বাজার থেকে আমাদের একেবারে ভেতরের গুপ্তচরের মাধ্যমে আপনারা আসার একটু আগেই আমরা খবর পেয়েছি। কাল বাদে পরশু জনসন্মুখে বৌদ্ধ শ্রমণদের মস্তক ছিন্ন করা হবে,” বলে সে সবাইকে এক পলক দেখে নিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে যোগ করলো, “তারই আয়োজন চলছে মন্তলার হাটে।”

অধ্যায় উনত্রিশ

বর্তমান সময়

লাক্কাতুরা টি-স্টেট এলাকা, সিলেট

বাংলোর সামনে দাঁড়িয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে দাঁড়িতে হাত বুলাচ্ছে তানভীর। "ঝামেলা যে হতে পারে সেটা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছি, কিন্তু লায়লাকে না নিয়েই বা উপায় কি, বলো?" কথাটা সুলতানকে উদ্দেশ্য করে বলে ও বাংলোর বারান্দার দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেল লায়লা আর শায়লা দুই বোন বেরিয়ে এসেছে মূল দরজা দিয়ে। লায়লা পোশাক পাল্টেছে, তাকে এখন আগের চেয়ে স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। ওরা কাছাকাছি আসতেই শায়লা বলে উঠলো, "তানভীর ভাই, আপনারা যতো দ্রুত সম্ভব ফিরে আসবেন। আর আপুর দিকে খেয়াল রাখবেন।"

"অবশ্যই," বলে তানভীর যোগ করলো। "পরিস্থিতি যা, তাতে মনে হচ্ছে নিজের মাথার চেয়ে তোমার আপার দিকে বেশি নজর রাখতে হবে। তবে ভাবনার কিছু নেই। আমরা স্রেফ ডক্টর মিতায়নের অফিসটা খুঁজে বের করেই লায়লাকে ফেরত পাঠিয়ে দিবো, আসলে অন্য কোন উপায় থাকলে ওকে ইনভলভড করতাম না। আমরা নিজেরা ডক্টর মিতায়নের অফিসটা খুঁজে বের করতে গিয়ে যদি আরো সময় লাগে তবে হয়তো ডক্টরের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আরো বেড়ে যাবে।"

শায়লা তানভীরের দিকে তাকিয়ে একবার মাথা নেড়ে ওদের বাড়ির দিকে রওনা দিলো। মাইক্রোতে ওঠার আগে তানভীর দেখলো বাড়ির দরজায় শায়লা-লায়লার মা দাঁড়িয়ে কড়া দৃষ্টিতে ওদের গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে, লেখকদের ভাষায় যে-দৃষ্টিকে বলে 'ক্রুর দৃষ্টি'।

মনে-মনে নিজেকে এক দফা সাবধান করে দিয়ে গাড়ির কাছে চলে এলো ও। মাইক্রোর মাঝের সিটে বসে আছে লায়লা আর সুলতান। ইকবালকে পেছনে উঠতে বলে ও এসে বসলো ড্রাইভারের পাশের সিটে। আরেকবার বাংলোর বারান্দার দিকে তাকিয়ে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলো গাড়ি স্টার্ট দেয়ার জন্যে। ড্রাইভার সুরমার গলি থেকে গাড়ি উঠিয়ে আনলো মূল রাস্তায়।

"স্যার, কোন্তা খায়তায়না নি?" বয়স্ক ড্রাইভার সিলেটি ডায়লেক্টে ওরা কিছু খাবে কিনা জানতে চাইবার সাথে সাথে যেন আরেকবার তানভীরের মনে পড়ে গেল যে ওরা কেউই দুপুরে খায়নি।

"খাওয়া তো দরকার কিন্তু লাক্কাতুরা পৌছানোটা আরো বেশি দরকার," বলে ও একটু ভেবে যোগ করলো। "ঠিক আছে এক কাজ করো, এখানে কোন খাবারের দোকানের

সামনে গাড়ি থামিয়ে দ্রুত কিছু কিনে নিয়ে এসো। হালকা কিছু এনো, যাতে দ্রুত কাজ চালানোর মতো খাওয়া সেরে নেয়া যায়।"

ড্রাইভার গাড়ি থামাতেই সুলতান, ইকবাল আর রসুল মিয়া নেমে গেল। তানভীর মোবাইল বের করে ওর মাকে কল দিলো। অনেকক্ষণ মায়ের কোন খবর নেয়া হয়না। কল করে জানতে চাইলো দুপুরে খেয়েছে কিনা, বিকেলে কখন বাইরে যাবে, ফার্নিচারের অর্ডার আজ দিবে কিনা ইত্যাদি।

মায়ের সাথে কথা বলা শেষ করে মোবাইলটা পকেটে রাখতেই পেছনের সিট থেকে লায়লা জানতে চাইলো, "আঙ্কেল-আন্টি কেমন আছেন?"

"হুম্, ভালো। মা ভালোই আছে, বাবা মারা গেছেন," বলে ও আর কী বলবে ভেবে পেল না। "আঙ্কেল, মানে তোমার বাবাও নাকি মারা গেছেন শুনলাম, কি হয়েছিল?"

লায়লা একটু চুপ থেকে উত্তর দিলো, "বাবার লিভার সিরোসিস হয়েছিল, তুমি তো জানতেই বাবা টুক-টাক ড্রিঙ্ক করতো। শেষদিকে এসে মাত্রাটা অনেক বেড়ে গেছিল। পরিবারের লোকজন-ডাক্তার সবাই মিলে মানা করার পরও বাবা শুনতেন না।"

"পরিবারের লোকজন বলতে নিশ্চই শায়লা?" তানভীর মুচকি হাসি দিয়ে বলে উঠলো।

লায়লার কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে পেছনে ফিরে দেখলো সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। ওকে তাকাতে দেখে সামান্য মাথা নেড়ে হ্যাঁ-সূচক জবাব দিলো। লায়লা ঠিকই বুঝতে পেরেছে বাবা যে দীর্ঘদিন তার সাথে কথা বলেনি, এটা তানভীর জানে। এরপর আর কথা হলো না কিন্তু নিরবতা যেন ভারি পর্দার মতো ঝুলে রইলো দুজনার মাঝে, যতোক্ষণ না সুলতানরা এসে উদ্ধার করলো ওদেরকে।

সুলতান খাবার নিয়ে আসতেই তানভীর গাড়ি ছেড়ে দিতে বললো রসুল মিয়াকে। গাড়িতেই ওরা হালকা খাওয়ার কাজ সম্পন্ন করে নিলো দ্রুত। কারণ ওদের মাইক্রো ইতিমধ্যেই সুনামগঞ্জ রোড ধরে আম্বরখানার দিকে ধেয়ে চলেছে বেশ দ্রুত গতিতে।

"এখান থেকে আর কতোদূরে হতে পারে জায়গাটা?" তানভীর খাওয়া শেষ করে মুখ মুছতে মুছতে রসুল মিয়ার কাছে জানতে চাইলো।

"স্যার, আর বেশি সময় লাগের না, এই আর ফনরো-বিশ মিনিট লাগের," রসুল মিয়া তার পানের দাগওয়ালা দাঁত বের করে হাসি দিয়ে জবাব দিলো। কিন্তু, তার কথা পুরোপুরি ঠিক হলো না। আরো আধা ঘন্টার ওপরে লাগলো ওদের লাক্কাতুরা পার হতে। "ম্যাডাম খিয়াল লাখিয়ের, কোনবায় যাইয়ার?"

লায়লা মাইক্রোর জানালা দিয়ে মনোযোগ দিয়ে বাইরে দেখছে। লাক্কাতুরা টি-এস্টেট পার হয়ে আধা মাইলের মতো সামনে এগোতেই লায়লা বলে উঠলো, "একটু আস্তে

চালান, এদিকেই কোথাও হবে,” বলেই সে সামনে হাতের বাম দিকে দেখালো। “ওই পথটা হতে পারে।”

কিন্তু রসুল মিয়া পথটার কাছে আসতেই সে-ধারণা বাতিল হয়ে গেল কারণ সামনে হাতের বামদিকে যে-পথটা নেমে গেছে, সেটা একটা গাড়ি চলার মতো যথেষ্ট চওড়া না।

“এটা অবশ্যই না,” তানভীর বলে উঠলো। “আমার মনে হয় আরো সামনে এগোতে হবে, নাকি পেছনে?” বলে সে লায়লার দিকে তাকিয়ে রইলো। কিন্তু লায়লার হাব-ভাব দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে নিশ্চিত হতে পারছে না। তাকে মাইক্রোর পেছনের সিট থেকে সাহায্য করলো ইকবাল।

“ম্যাডাম আমার মনে হয়, আরো সামনে এগোতে হবে। আমরা এখান থেকে এগিয়ে মালিনীছড়া পর্যন্ত যাবো, তাও যদি আপনে পথটা বের করতে না পারেন তাহলে আবার মালিনীছড়া থেকে এই পথে ফিরে আসবো ধীরে-ধীরে, তাহলে আপনি বের করতে পারবেন,” কথাটা বলে সে সমর্থনের আশায় বাকিদের দিকে তাকিয়ে রইলো।

কেউ কোন উত্তর দিলো না। একটু পরে তানভীরই বলে উঠলো, “ঠিক আছে, আমার মনে হয় এতেই কাজ হতে পারে। তবে একটা প্রশ্ন আছে আমার,” বলে সে লায়লার দিকে ফিরে জানতে চাইলো, “তুমি নিশ্চিত তো জায়গাটা লাক্কাতুরা আর মালিনীছড়ার মাঝামাঝি? যদি সেটা না হয় তবে খুঁজে পেতে খবরই আছে”

“না-না সেটা সমস্যা না, কারণ আমি এই ব্যাপারে অন্তত নিশ্চিত যে পথটা এই দুটো জায়গার মাঝামাঝি। কিন্তু আমি আসলে আরো অনেক আগে এসেছি তাও মাত্র একবার, ওই যে...” কথা শেষ না করেই সে চেঁচিয়ে উঠলো সামনের দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করে।

রসুল মিয়া আস্তে-আস্তে মাইক্রোটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো, লায়লা চিৎকার করে উঠতেই সে ওটাকে থামিয়ে ফেললো মেইন রোডের ওপরে। পেছনে একটা প্রাইভেট কার আসছিল, সেটা আরেকটু হলেই ধাক্কা খেতে যাচ্ছিলো ওদের মাইক্রোর সাথে, কোনমতে সামলে নিয়ে ওদের মাইক্রোকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। পেছনের সিট থেকে একজন কারের জানালা দিয়ে মাথা বের করে চেঁচিয়ে উঠলো, ‘আখতা বিরেক মারছে, আবাদি গুলান মা...’ গালির শেষ অংশটা গাড়ির সাথে সাথে হারিয়ে গেল।

রসুল মিয়া যেখানে ব্রেক করেছে তানভীর সেদিক দিয়ে বামে তাকিয়ে দেখতে পেল দুই পাশে গজার গাছের সারির ভেতর দিয়ে একট টিলাকে পাশ কাটিয়ে মূল রাস্তা থেকে ভেতরে দিকে চলে গেছে একটা মাটির কাঁচা রাস্তা। রাস্তাটা কাঁচা হলেও একেবারে সরু না, আরামসে দুটো গাড়ি পরস্পরকে পাশ কাটিয়ে যাবার মতো চওড়া পথ।

“লায়লা, তুমি নিশ্চিত এটাই সেই রাস্তা?”

“অবশ্যই, এইযে লালচে টিলাটা এটার পাশ দিয়ে মিতায়ন গাড়ি নিয়ে ঢুকে গেছিল, পরিষ্কার মনে আছে আমার,” সে বেশ জোরের সাথে বলে উঠলো। “এটাই সেই রাস্তা।”

রসুল মিয়ার দিকে ইশারা করতেই সে ধীরে-ধীরে বামে বাঁক নিয়ে কাঁচা রাস্তাটায় নামিয়ে দিলো মাইক্রোটাকে।

"সাবধানে চালাবেন," বলে তানভীর সামনের দিকে মনোযোগ দিলো। ছোট-বড় বিভিন্ন আকৃতির বেশ কিছু টিলাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেছে কাঁচা রাস্তাটা। দুয়েক জায়গায় ফসলের জমি চোখে পড়লেও কোন বসতি দেখতে পেল না ওরা। আবার দুয়েকটা টিলার গায়ে দূর থেকে ছড়ানো চা-বাগান আর দুয়েকটাকে ঘিরে কাঁটা তারে বেড়া দেখতে পেল ও। "ওই বেড়াগুলো কিসের?" রসুল মিয়ার কাছে জানতে চইলো তানভীর।

"মনে খরিয়ের, ওগলা লাক্কাতুরা বাগানের ঠিলা অইবার পারের," বুড়ো ড্রাইভার গাড়ি চালাতে চালাতেই জবাব দিলো। "টিলা ওগুলান যদি ডাইনে অইতো, তাইলে মালিনীছড়ার অইতে পারতো, কন্তু বামে ওউনের কারণে ধইরা নিতে পারুক্কা ওগুলান লাক্কাতুরার টিলা।"

"তারমানে, আমরা এখন যেখান দিয়ে যাচ্ছি, এই জায়গাটা লাক্কাতুরারও নয়, আবার মালিনীছড়ারও প্রপার্টি নয়," বলে ও আনমনেই বলে উঠলো, "হতে পারে এই জায়গাটা নির্দিষ্ট কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি। যদি তাই হয়..."

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো ও তার আগেই পেছন থেকে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো লায়লা, "ওই যে, বাংলোটা দেখা যাচ্ছে, ওটাই মিতায়নের আসাম প্রজেক্টের অফিস," তার গলায় উত্তেজনা আর স্বস্তি মিলে-মিশে একাকার।

ওদের মাইক্রো এখনো ধীরে-ধীরে সামনের দিকে এগিয় চলেছে। তানভীর দেখলো বাংলোটা এখনো ওদের অবস্থান থেকে বেশ দূরে কিন্তু দূর থেকেই সহজে চোখে পড়ছে, কারণ বাংলোটা একটা টিলার ওপরে অবস্থিত। ওরা যে-পথটা ধরে এগিয়ে এসেছে সেটা ধীরে-ধীরে একটা টিলা বেয়ে ওপরে উঠে গেছে। শেষ মাথায় চমৎকার একটা বাংলো বিকেলের রোদে রীতিমতো ঝিল-মিল করছে।

"স্যার, উঠিয়ে নি?" রসুল মিয়া জানতে চাইলো।

তানভীর কিছু না বলে ইশারা করে বললো ওপরের দিকে উঠতে। প্রায় সাথে-সাথেই গিয়ার পরিবর্তন করে রসুল মিয়া মাইক্রোটাকে জোরগতিতে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চললো। টিলা বেয়ে ওদের মাইক্রো বাংলোর কাঠের তৈরী গেটের কাছে এসে থেমে গেল। মাইক্রো থামতেই ওটা থেকে প্রথমেই নেমে এলো তানভীর।

জায়গাটাতে চোখ বুলিয়ে ওর কাছে মনে হচ্ছে পুরনো কোন ওয়েস্টার্ন সিনেমার সেটে চলে এসেছে, কারণ কাঠের তৈরী বাংলোটা অক্ষরিক অর্থেই অনেকটা বুনো পশ্চিমের মতো দেখতে।

"ওয়াও," ওর পাশ থেকে সুলতানের গলা শুনতে পেল ও। ইকবাল আর লায়লাও নেমে এসেছে। বুড়ো রসুল মিয়াকে মাইক্রোটা নিয়ে টিলার নিচে নেমে অপেক্ষা করতে বলে

সবাইকে নিয়ে বাংলোর কাঠের গেট পার হয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো ও।

জায়গাটা সুন্দর, তারচেয়ে বেশি সুন্দর বাংলোটা। টিলার ওপরে একপাশে অনেকটা সমতল জায়গায় বানানো হয়েছে ওটাকে। ওপরে টিনের চালের নিচে বড়-বড় কাঠের গুড়ি বসিয়ে বানানো হয়েছে সামনেটা। একপাশে সিমেন্টের দেয়াল। সামনে লম্বা বারান্দা আর তারচেয়ে সুন্দর বারান্দার সামনের খোলা আঙ্গিনা। অসাধারণ সুন্দর একটা বাড়ি।

"চমৎকার জায়গা, তাইনা?" তানভীর সবাইকে গেট দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে বলে ও সুলতানের দিকে ফিরে কথাটা বলতে-বলতে একহাতে গেটটা লাগাতে যাচ্ছিলো তার আগেই তীব্র গুলির শব্দের সাথে সাথে গেটটা ওর হাত থেকে ছুটে গিয়ে বাড়ি খেলো পাল্লার সাথে। তানভীর কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওকে নিয়ে সুলতান গড়িয়ে পড়লো মাটিতে, আর প্রায় সাথে-সাথেই আরো দু-তিনটে গুলি এসে লাগলো বাংলোর গেটে।

দুজনেই মাটিতে গড়িয়ে পড়েছে, গুলির শব্দে কান ঝালা-পালা হয়ে গেছে তানভীরের, ওর ওপর থেকে সরে গেল সুলতান। কানে কিছু শুনতে না পেলেও ঝাপসা চোখে ও দেকতে পেল একহাতে নিজের বিরাট পিস্তলটা বের করে এনেছে সুলতান, অন্যদিকে ইকবাল আর লায়লাকে চিৎকার করে নির্দেশ দিলো মাটিতে শুয়ে পড়ার জন্যে।

"স্যার, স্যার..." সুলতানের তীব্র ঝাঁকির সাথে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো তানভীর। মাটিতে আধশোয়া অবস্থাতেই একটানে বের করে আনলো নিজের ডেজার্ট ঈগল। "সুলতান, হচ্ছেটা কি?" প্রশ্ন শেষ হবার আগেই ওরা যেখানে শুয়ে আছে তার কাছেই বাংলোর কাঠের বেড়ার চলটা উঠিয়ে দিলো দুটো গুলি। অন্যদিকে তাকিয়ে দেখলো বাংলোর পথের কাছে একটা ছোট খোঁয়ারের মতো আছে, সেটার আড়ালে বসে আছে ইকবাল আর লায়লা। হাতের ইশারায় ওদেরকে স্থির থাকতে বলে উঠে বসলো ও।

"সুলতান, গুলি আসছে কোনদিক..."

সুলতানের জবাব দিতে হলো না কাঠের গেটের বাইরে থেকে ভেসে আসা গুলিতে আরেকটু হলেই ঘায়েল হতে যাচ্ছিলো ও কিন্তু আবারো সুলতান ওকে টেনে সরিয়ে দিলো। "স্যার, সাবধান," বলেই সে হাতের ইশারায় কাঠের বেড়ার বাইরে দেখালো। "সম্ভবত গুলি আসছে গেটের বাইরে থেকে।"

তানভীর দেখলো সুলতান টিলার একপাশে গাছপালার আড়ালের দিকে নির্দেশ করছে। "এভাবে খোলা জায়গায় বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব নয়, যদি বাইরে থেকে গুলি আসে তবে বাংলোর দিকে এগোনোই ভালো হবে," তানভীর কথাটা বলতেই সুলতান সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো। "তাহলে আমি বাংলোর দিকে এগোই, আমাকে কভার করার জন্যে তুমি গুলি করবে," তানভীরের কথা শেষ হতেই আবারো সুলতান মাথা নেড়ে জবাব দিলো।

খোঁয়ারের আড়ালে থাকা ইকবাল আর লায়লার দিকে ইশারা করে ও বাংলোর দিকে এগোতে বললো। তারপর সুলতানের দিকে ফিরে ইশারা করতেই কাঠের বেড়ার ফাঁক

দিয়ে নিজের পিস্তল বের করে গুলি করতে শুরু করলো সুলতান।

খানিকটা কুঁজো হয়ে বাংলোর দিকে দৌড়াতে শুরু করলো তানভীর। পায়ে চলা পথটা ধরে এক দৌড়ে বাংলোর বারান্দার প্রায় কাছাকাছি পৌছে গেছে এমন সময় ধাম করে খুলে গেল বাংলোর কাঠের দরজা। তানভীর নিজেকে সামলানোর আগেই সেখানে উদয় হলো এক অস্ত্রধারী। দরজা খুলেই দুই পা এগিয়ে এলো সে বাংলোর বারান্দায়।

কুঁজো হয়ে দৌড়াতে থাকা তানভীর অস্ত্রধারীকে দেখতে পেয়ে হঠাৎ একেবারে ব্রেক কষে থেমে গেল। থামার ধাক্কা সামলাতে না পেরে পা পিছলে ছিটকে পড়লো বাংলোর প্রবেশ পথের ওপরে। হাত থেকে ছুটে গেল ডেজার্ট ঈগল।

মাটিতে পড়ে যাওয়া তানভীরে দিকে অস্ত্র তুললো বের হয়ে আসা অস্ত্রধারী। লোকটার হাতে ধরা পুরনো দিনের দো'নলা বন্দুকের কালো নলের দিকে তাকিয়ে তানভীর অনুধাবন করলো, ওর হিসেবে বিরাট গরমিল হয়ে গেছে।

অধ্যায় ত্রিশ

সময় ১৮০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ

মন্তলার হাট, কন্নোর, ভারতবর্ষ

শামান ঠান্ডা মাথায় সব হিসেব করে রেখেছে, কাজেই ওর বিশ্বাস গরমিল হবার কোন কারণ নেই।

তবে মুখের ওপরের মোটা কাপড়ের আবরণটার কারণে বার-বার হাঁচি আসছে। ওটা একটু টেনে আলগা করে দেয়ার চেষ্টা করতেই যেন আরো বেশি চেপে বসলো মুখের ওপরে। মাথার চুলগুলো টাইট করে পাতলা কাপড় দিয়ে বাঁধা, তার ওপরে আবার চড়িয়েছে একটা মস্তকাবরণ, সেটার নিচে মুখোশের মতো এই জিনিসটা। সব মিলিয়ে দম বন্ধ হয়ে আসছে ওর, মুখের ওপর থেকে টান দিয়ে মুখাবরণটা খুলে বড় বড় করে দম নিতে লাগলো ও।

মুখোশের মতো জিনিসটা কারণে অসহ্য লাগছিল। ওটা খোলাতে একটু স্বস্তি লাগছে, তবে ওটা খুলে ফেললেও মাথার ওপরে ঘোমটার মতো মস্তকাবরণটা আরেকটু টেনে দিলো ও। আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো কেউ খেয়াল করছে কিনা ওদেরকে।

শামান আর কালন্তি এই মুহূর্তে অবস্থান করছে মন্তলার হাট নামের সেই জায়গাতে যেখানে আজ বৌদ্ধ শ্রমণদের মস্তক ছিন্ন করা হবে। গতকালের আগের দিন এই ঘটনার ব্যাপারে জানতে পারার পর থেকেই বহু কষ্টে অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে অবশেষে ঘন্টাখানেক আগে এই বাজারে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছে ওরা। শামান চোখ তুলে পুরো বাজারটার যে-অংশে ওরা আছে সেদিকে চোখ বুলিয়ে নিলো একবার।

বাজারটা বেশ চমৎকার একটা জায়গাতে অবস্থিত। দুদিকে ঘন জঙ্গল, একদিকে খোলা সমতল ভূমি, আর অন্যদিকে বড় একটা পাহাড়ি টিলার পাদদেশে খোলা মাঠের মতো জায়গাটায় ছোট একটা গ্রামের মতো বসতিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে বাজারটা, একপাশ দিয়ে ছোট একটা শাখা নদী বয়ে যাওয়াতে যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক সহজ হয়েছে ব্যবসায়িদের জন্যে। বাজারের নিয়মিত বিক্রেতারা সবাই বাজার সংলগ্ন এই গ্রামেই বাস করে, আবার বৃহত্তর এলাকা তো বটেই বিভিন্ন মৌসুমে বহু দূর-দূরান্ত থেকেও লোকজন আসে এখানে বিক্রি-বাট্টা ও কেনাকাটা করার জন্যে। স্থানীয় লোকজনের জন্যে এই বাজার তাদের পন্য সামগ্রী বিক্রি আর খরিদ করার জন্যে সবচেয়ে ভালো জায়গা।

শামান ভালোভাবে খেয়াল করে দেখলো পুরো বাজার এলাকা নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থার মোড়কে মোড়ানো হয়েছে। ওই বুড়োর সাথে দেখা অতো-অতো কঠের গুড়ির রহস্যটাও পরিষ্কার হয়েছে এখানে আসার পর।

পুরো বাজার এলাকাকেই ছোট ছোট কাঠের গুড়ি দিয়ে ঘিরে বেড়া দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে বাজারের একপাশে খোলা মাঠে যেখানে শ্রমণদের মস্তক ছিন্ন করার আয়োজন করা হয়েছে সেখানে নির্মাণ করা হয়েছে বিশেষ বেদী। বাজার এলাকা থেকে শুরু করে সেই মাঠের মতো জায়গাটাকে ঘিরে রেখেছে লিচ্ছবী রাজার বিশেষ বাহিনী।

গতকালের আগের দিন ওরা বিয়ষটা জানতে পারার সাথে সাথেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। প্রথমেই লোক লাগিয়ে খবর নিয়ে জানা যায়, দুইদিন ধরে বাজার এলাকায় সকলের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাজার লোকদের ঘের দেয়া আর বেদী নির্মাণের কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সকলের প্রবেশ নিষেধ। তাই আগেভাগে বাজারে প্রবেশ করে প্রস্তুতি নিয়ে রাখার ধারণাটা বাতিল করতে হয়। পরে ওরা জানতে পারে নির্দিষ্ট দিনেও বাজার এলাকায় লোকজনকে একেবারে নিখুঁতভাবে পরীক্ষা না করে প্রবেশ করানো হবে না, সেইসাথে সকল ধরণের অস্ত্র বহন করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এরপরে ওদের পরিকল্পনা আবারো পরিবর্তন করতে হয়।

শামানের পরিকল্পনা খুব সহজ, একটু আগে চারটা দলে ভাগ হয়ে ওরা ষোলজন প্রবেশ করেছে বাজার এলাকায়। কেউ ফল বিক্রেতা, কেউ ঝালাইকার, কেউ চর্মকার সেজে। এই চার দলকে চার রকম দায়িত্ব দিয়ে বাজার এলাকায় ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। যে-যার যার কাজ ঠিকমতো সম্পন্ন করতে পারলেই ওরা প্রস্তুতি নিয়ে গ্যাট হয়ে অবস্থান নিবে যার-যার জায়গায়। এরপরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে হবে, কারণ কোথায় কী করতে হবে সেটা আগে থেকে যেহেতু জানার উপায় নেই কাজেই আগে থেকে পরিকল্পনা করেও লাভ নেই। বরং এখানে আসার পর থেকে এক গাড়ি ফল নিয়ে বিক্রি করতে করতে মনে-মনে নিজের পরিকল্পনা ঝালিয়ে নিচ্ছে শামান।

সামনের গাড়িতে রাখা বেগুনি রঙের একটা ফল হাতে তুলে নিয়ে ওটাতে কামড় বসালো ও। নিজের অজান্তেই ফলের তেতো স্বাদে মুখ বিকৃত হয়ে গেল। কচ্চ নামের অদ্ভুত দেখতে এই স্থানীয় ফল এর আগে কোনদিন দেখেনি শামান। খাওয়া তো দূরে থাক।

“তুমি তো খুব বাজে বিক্রেতা হে,” বলে ওর পাশে থেকে মৃদু টিটকিরির হাসি হাসলো কালন্তি। “নিজের বিক্রির জিনিস নিজেই খেতে শুরু করেছো।” কৃত্রিম রাগের সাথে তার দিকে ফিরে তাকাল শামান। আগাগোড়া ছেলেদের পোশাক পরা কালন্তিকে দেখে কোনভাবেই বোঝার উপায় নেই সে মেয়ে। “এই এলাকার মানুষজনের মতো দেখি এখানকার ফলও একই রকম বাজে। এরকম তিতকুটে ফল আমি জীবনেও খাইনি।”

“শোন যোদ্ধা, একটু অপেক্ষা করো, দেখবে মুখের ভেতরে মিষ্টি একটা স্বাদের আভাস টের পাচ্ছো,” বলে কালন্তি একেবারে শামানের কাছাকাছি এসে নিজের ধূসর দৃষ্টি স্থির করলো শামানের চোখে। তারপর রহস্যে মোড়ানো কণ্ঠে বলে উঠলো, “কন্নোর এলাকার মানুষ বলো আর ফল, এর প্রকৃত রস আস্বাদন করতে হলে তোমাকে ধৈর্য সহকারে এর গভীরে যেতে হবে। ধৈর্য হারালেই সর্বনাশ, কোন স্বাদই টের পাবে না।”

কালন্তির দৃষ্টির গভীরে তাকিয়ে আনমনেই একবার ঢোক গিললো শামান। তারপর দৃষ্টি সরিয়ে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল সকালের সূর্য জঙ্গলের মাথা ছাড়িয়ে ধীরে-ধীরে ওপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে। ওদের জানামতে সূর্য মাথার ওপরে উঠলেই বৌদ্ধ শ্রমণদের মস্তক ছিন্ন করা হবে। দিগন্তের দিকে তাকিয়ে শামান প্রশ্ন করে উঠলো কালন্তিকে, "তোমার কি মনে হয়, বিধু-ঘোষিত-জাথুরিয়া নিজেদের কাজ ঠিক সময়মতো করতে পারবে?"

"ওদেরকে পারতেই হবে। তা-না হলে সর্বনাশ," বলে কালন্তি ওর মুখের আবরণটা টেনে দিলো। "মুখের আবরণ সরানোটা কি ঠিক হয়েছে তোমার? একেতো তালগাছের মতো লম্বা তুমি, পুরো বাজারে সবার মাথা থেকে এক হাত ওপরে তোমার মাথা। তার ওপরে নীল চোখ, লোকে ভালোভাবে দেখলেই বুঝে ফেলবে তুমি এই এলাকার কেউ নও।"

মুখের আবরণটা আবারো টেনে দিতে-দিতে শামান বলে উঠলো, "ওটার ভেতরে দম বন্ধ হয়ে আসে আমার।"

"শোন, কখনো কখনো নিঃশ্বাস নিতে পারার চেয়ে নিঃশ্বাসকে স্রেফ প্রবাহিত হতে দেয়াটাই সমীচীন-" সে আরো কিছু বলতে যচ্ছিলো তার আগেই জঙ্গলের দিক থেকে অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের শব্দ আর গাড়ি টেনে আনার শব্দ শোনা গেল সেইসাথে ঢোলের ভারি আওয়াজ।

"লিচ্ছবী রাজার লোকেরা চলে এসেছে," আনমনেই বলে উঠলো কালন্তি। "এখন বাকিদের ওপরে নির্ভর করছে সবকিছু।"

***

বিধু আর ধোয়ী অবশ্য শামানদের মতো এতো চিন্তিত নয়। বরং তারা বেশ স্বাচ্ছন্দের সাথে রাস্তা ধরে হাঁটছে। ধোয়ীকে দেখে মনেই হচ্ছে না সে কোন ভয়ঙ্কর উদ্দেশ্য নিয়ে শত্রু এলাকায় প্রবেশ করেছে বরং সে তার গোল মুখে একেবারেই নিরাসক্ত ভঙ্গি নিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে।

আর এ-ব্যাপারটাই বেশি যন্ত্রণা দিচ্ছে বিধুকে। ঠিক যন্ত্রণা দিচ্ছে বললে ভুল হবে, তার বিরক্ত লাগছে। বার-বার আড়চোখে দেখছে সে ধোয়ীকে। এরকম অদ্ভুত চেহারার মানুষ সে জীবনেও দেখেনি। মানুষটা তার চেয়ে বেশ অনেকখানি লম্বা, মুখটা একেবারে গোল, বাচ্চাদের মতো টুপ-টুপে গাল। তবে তার শরীরটা যেকোন কুস্তিগীরের চেয়েও বেশি পেশিবহুল আর শক্তিশালী। মনে-মনে একবার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে দলের বাকিদের দিকে দেখলো।

দলে ওরা মোট চারজন, সে নিজে, ধোয়ী আর দুজন। ওরা থারু না শাক্য জানে না কিন্তু দুজনেই দক্ষ যোদ্ধা, থারু রাজা মানরু আর শাক্য প্রধান শঙ্করাদিত্য নিজের সেরা

যোদ্ধাদেরকেই পাঠিয়েছে ওদের সাথে। কারণ এই বৌদ্ধ শ্রমণদের মৃত্যু তো ঠেকাতেই হবে সেইসাথে তাদেরকে জীবিত উদ্ধার করে নিয়ে যেতে হবে এখান থেকে। তাহলেই একমাত্র বিক্রমাদিত্য আর ডুকপা লামার খোঁজ বের করা সম্ভব হবে। এখানে আসার ব্যাপারে বিধু চেয়েছিল ঘোষিতের সাথে থাকতে আর না হয় শামানের দলে থাকতে, কিন্তু শামানই দলগুলো অন্যভাবে সাজিয়েছে। কারণ ঘেষিতের সাথে বিধুকে একই দলে দিলে ওরা দুজনে গল্প করতে এতো ব্যস্ত হয়ে যেত কাজের বারোটা বাজতো। আর নিজের সাথে ও নেয়নি কারণ অন্য দলগুলোতে কর্মতৎপরতা বজায় রাখার জন্যে শামান নিজের লোক রাখতে চেয়েছিল। সবমিলিয়ে অবশেষে বিধুর স্থান হয়েছে ধোয়ীর সাথে।

কাল থেকে চেষ্টা করার পর অবশেষে আধ ঘন্টা আগে ওরা বাজারে প্রবেশকারীদের সাথে চর্মকারের ছদ্মবেশে ঢুকতে পেরেছে। ওদের সাথে বহন করা শুকনো চামড়ার বোঝা বাকি দুজনের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে বিধু আর ধোয়ী আগে-আগে হাঁটছে। নিজের কাছে নিজেকে কেমন জানি ন্যাংটো মনে হচ্ছে বিধুর। এর কারণ হলো ওর সাথে কোন অস্ত্র নেই। শেষবার কবে অস্ত্র ছাড়া কোথাও গেছে মনেই নেই বিধুর। দীর্ঘদিনের যোদ্ধা জীবনে অস্ত্র সাথে রাখতে রাখতে এখন অবস্থা এমন হয়েছে যে, অস্ত্র যেন শরীরের একটা অঙ্গ হয়ে গেছে। শরীরের সাথে একটা হাত না থাকলে যেরকম লাগবে ওর কাছে এই মুহূর্তে সেরকমই লাগছে। তবে সে অবাক হয়ে বেশ কৌতুকের সাথে লক্ষ্য করলো ওর সাথের এই ধোয়ী লোকটার অবস্থাও অনেকটা সেরকম, কারণ সেও একটু পর-পর আনমনেই পিঠের দিকে হাত বুলাচ্ছে। ওখানেই তার বর্শাটা রাখে সে। এই লোক নাকি এই অঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ বর্শা আর তলোয়ার যোদ্ধা।

"সামনে গিয়ে আমরা ডাইনে বাঁক নেবো। ওখান থেকে খানিকটা সোজা এগিয়ে পথের শেষ মাথায় মদারু অস্ত্রকারের বাড়ি," বিধুর কাছাকাছি এসে আস্তে-আস্তে বলে উঠলো ধোয়ী। মানুষটার কণ্ঠস্বরও তার শরীরের সাথে একেবারেই যায় না, কেমন জানি মেয়েলি কণ্ঠস্বর। এইরকম মুশকো জোয়ানের গলা থেকে এরকম মেয়েলি গলা বেরুচ্ছে সামনা-সামনি না দেখলে বিশ্বাস করা মুশকিল।

"ঠিক আছে," বলে বিধু একবার চারপাশে দেখে নিলো। ওরা বাজার এলাকায় প্রবেশ করার পর কিছুক্ষণ এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করেছে এরপর সোজা রওনা দিয়েছে কাজের উদ্দেশ্যে। বাজার এলাকায় প্রবেশ করা চার দলের ভেতরে ওদের কাজটার গুরুত্ব অপরিসীম। ওদের ওপরে দায়িত্ব পড়েছে বাজার এলাকা থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করার। যেহেতু বাজার এলাকায় কোনভাবেই অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করা সম্ভব নয় তাই ঘোষিতরাম ওদেরকে একটা ভালো বুদ্ধি দেয়। বাজার এলাকায় থারুদের সহমর্মি একজন অস্ত্রকার আছে। অত্র এলাকার সবচেয়ে নামকরা অস্ত্র নির্মাতা সে। ধোয়ীর সাথে তার বেশ ভালো সম্পর্ক। তাই ঘোষিতের পরামর্শ অনুযায়ী ওদের দলটা বাজারে প্রবেশ করে অস্ত্রকারের কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে মস্তক কর্তনের বেদীর কাছে দুটো দলের কাছে পৌছে দিবে। যাতে সময়মতো তারা সেটা ঠেকাতে পারে।

হাঁটতে-হাঁটতে ধোয়ীর নির্দেশিত পথে এগিয়ে চললো ওরা। সামনের বাঁকটা পার হয়ে চলে এলো মূল গলিতে, যেটার শেষ মাথায় চর্মকারের বাড়ি। পথের শেষ মাথায় ছোট একটা ডোবার মতো দেখা যাচ্ছে, সেটার সাথে লাগোয়া বাঁশের তল্লির বেড়া দেয়া একটা ঝুপড়ি ঘর। "ওই তো, ওটাই মদারুর বাড়ি।"

শুনে বিধু মনে-মনে খুশি হয়ে উঠলো। কারণ মনে হচ্ছে তেমন কোন ঝামেলা ছাড়াই মদারুর কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করা যাবে। কিন্তু মনের কথা মনেই রয়ে গেল তার। বাড়িটার প্রায় কাছাকাছি পৌছে গেছে এমন সময় তল্লীর বেড়ার মুখে লাগলো ছোট দরজা ফাঁক করে ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো দুজন সুসজ্জিত সৈনিক। দেখার সাথে-সাথে বিধু বুঝতে পারলো এরা লিচ্ছবীদের লোক। সৈন্য দুজন বেরিয়ে এসে নিজেদের ভেতরে কথা বলতে শুরু করলো।

আর ফেঁসে গেল ওরা। রাস্তায় আর কোন লোক নেই যে ভিড়ের সুযোগে মিশে যাবে, আবার থেমে গেলেও সন্দেহ করবে ওরা। আর এগিয়েও লাভ নেই, কারণ পথের শেষে মদারুর বাড়ি ছাড়া আর কোন বাড়িও নেই।

দলে সবার সামনে ছিল ধোয়ী, সৈন্যদেরকে দেখার সাথে-সাথে গতি কমিয়ে ফেলেছিল সে। ধীরে-ধীরে একেবারেই থেমে গেল, আরেকটু হলে বিধু তার গায়ে গিয়ে ধাক্কা খেতো, কোনমতে সামলে নিয়ে ধোয়ীর দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল সে। ধোয়ীও অসহায়ভবে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। দুজনার কেউই বুঝতে পারছে না ওরা কী করবে।

***

ওদিকে বাজারে আসা তৃতীয় দলটা পড়েছে আরেক বিপদে। এই দলের নেতৃত্বে আছে ঘোষিতরাম আর জাথুরিয়া।

মুখে-মুখে যতোই বলা হোক না কেন থারু আর শাক্যরা বন্ধু হয়ে গেছে, বাস্তব চিত্রটা অতো সহজ নয়। কারণ জন্মের পর থেকে একে অপরকে শত্রু জেনে আসা দুটো জাতি যারা পূর্বপুরুষের সময় থেকে একে-অপরের হাতে লাঞ্ছিত-বঞ্চিত আর নিগ্রীহিত হয়েছে তাদেরকে যতো যুক্তি-তর্ক আর ভালোবাসার কথাই বলা হোক না কেন, মনের ভেতর থেকে তাদের একত্রিত হওয়া এতোটা সহজ নয়।

ঠিক এই ব্যাপারটাই এই মুহূর্তে ঘটে চলেছে ঘোষিত আর জাথুরিয়ার ভেতরে। আজ থেকে বিশ বছর আগে থারু আর শাক্যদের ভেতরকার যুদ্ধের সময়ে ঘোষিত তখন দশ-বারো বছরের বালক, সেই যুদ্ধে শাক্যদের হাতে তার বাবা নিহত হয়েছিল। থারুদের একটা দল যারা শাক্যদের সাথে শান্তিচুক্তির ব্যাপারে কথা বলতে গেছিল তাদের সবাইকে গলা কেটে গাছের সাথে ঝুলিয়ে দিয়েছিল শাক্যরা। সেই দলের নেতৃস্থানে ছিল ঘোষিতের

বাবা। জঙ্গলের প্রান্তে গাছের সাথে ঝুলানো লাশ মৃত্যুর তিন দিন পর যখন তাদের বাড়িতে আনা হয় কাক-শকুনে খেয়ে সেই লাশের অবস্থা ছিল ভয়াবহ। যতোবার শাক্যদের ওপরে দৃষ্টি পড়ে ঘোষিতের, নিজের বাবার ঠুকরে খাওয়া অর্ধ-গলিত লাশটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। শুধুমাত্র একটা কারণেই সে ওদেরকে মেনে নিয়েছে সেটা হলো থারু রাজা মানরু।

ঘোষিতের বাপ ছিল রাজা মানরুর একনিষ্ঠদের একজন। তার বাপের মৃত্যুর পর ঘোষিতের পরিবারকে একরকম রাজা মানরু নিজের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালনা করেছেন, যতোদিন না ঘোষিত নিজে পরিবারের হাল ধরতে পেরেছে। রাজা মানরু ঘোষিতের জন্যে শুধু রাজা নয়, তার কাছে নিজের খোদার চেয়েও বড়। সেই মানরু যখন বললো লাল চুলের যোদ্ধার বিশেষ বাহিনীতে তাকে কাজ করতে হবে, এক বাক্যে রাজি হয়ে গেছে সে। ছোটবেলা থেকে কঠোর সংগ্রাম করে বড় হতে-হতে সে একটা ব্যাপার শিখেছে, নিজের মন যেভাবে বলে দুনিয়া সেভাবে চলে না। তাই রাজা মানরুর মতো মনের গভীরে সেও চায় শত্রুরা যতো বড় হোক তাদের উপকার করতে পারলে এই উপত্যকায় শান্তি ফিরে আসতে পারে।

সেই হিসেবে আজকের অভিযানটা ওদের জন্যে সবদিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। চারটে দলের তৃতীয় ভাগে তাদের দলের কাজও অনেকটা বিধু আর ধোয়ীদের মতোই। তাদের ওপরও দায়িত্ব পড়েছে মূল দলের জন্যে বাজার এলাকার ভেতর থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করার। তবে বিধুদের মতো কোন অস্ত্রকারের কাছ থেকে নয় বরং সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পদ্ধতিতে। এই ধারণাটা ছিল শাক্য যোদ্ধা জাথুরিয়ার।

ওরা যখন জানতে পারে বাজার এলাকায় অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করা যাবে না তখন এই এলাকায় জন্ম থেকে বিচরণ করা জাথুরিয়া বাজারের ভেতরে প্রবেশের পর ভেতর থেকে কিভাবে অস্ত্র সংগ্রহ করা যেতে পারে সে-ব্যাপারে বেশ ভালো একটা পরামর্শ দেয়।

জাথুরিয়ার পরামর্শটা অনেকটা এরকম; মন্তলার হাট এলাকা সংলগ্ন একটা নদী আছে। নদীটা সরাসরি হাটের সাথে সংশ্লিষ্ট না হলেও এর একটা শাখা বাজারের গ্রাম এলাকার ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে, সেটা আবার হাট এলাকার বেশ কাছাকাছি। নদীর মূল উৎস থেকে যদি ভেলার মতো বানিয়ে তাতে কিছু অস্ত্র চাপিয়ে ছেড়ে দেয়া হয় তবে সেটা হাট এলাকার কাছাকাছি চলে এলে ওরা হাটের ভেতর থেকে সেগুলো সংগ্রহ করতে পারবে। তবে এতে ঝুঁকি আছে।

কারণ ছোট ভেলার মতো বানিয়ে সেটা ছাড়লেও ছাড়তে হবে একেবারে সঠিক জায়গা থেকে- যেখান থেকে স্রোত বাজার এলাকার নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হয়, তাও সেটা করতে হবে সঠিক জোয়ারের সময়ে যাতে জিনিসটা ঠিকমতো আসতে পারে। তার ওপরে আবার যদি একটা দুটো ভেলাতে অস্ত্র চাপিয়ে পাঠানোও হয় সেগুলো যে কারো চোখে পড়ে যাবে না সেটাও একটা ব্যাপার। তবে যাই হোক, বহু বছর এ এলাকায় নৌকা চালায় এরকম

একজন মাঝিকে নিয়ে গতকাল ভোরে ছোট ভেলার মতো বানিয়ে তাতে অস্ত্র চাপিয়ে সেগুলোর ওপরে ঝোপ-ঝাপ আগাছা দিয়ে নির্দিষ্ট জায়গা থেকে নির্দিষ্ট সময়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এখন বাকিটা ওদেরকে করতে হবে।

"আর কতোদূরে জায়গাটা?" জাথুরিয়ার দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় জানতে চাইলো ঘোষিত। পিঠের ওপরে ঝালাইয়ের জিনিসপত্র ভারি লাগছে ওর। ওরা বাজারে প্রবেশ করেছে ঝালাইকার হিসেবে। দলে আছে মোট চারজন।

জাথুরিয়াও একইরকম কড়া দৃষ্টি নিয়ে ফিরে তাকাল তার দিকে। "সময় হলেই জানতে পারবে।"

জাথুরিয়ার কথা শুনে ঘোষিত রেগে আগুন হয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই ওরা বাজার এলাকার শেষ প্রান্তে পৌছে জলের কুল-কুল শব্দ শুনতে পেল। "মনে হয় চলে এসেছি," জাথুরিয়া ঘোষিতের দিকে তাকিয়ে টিটকিরির হাসি দিলো।

ঘোষিত মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলো; সময় হলে এই ব্যাটার দাঁতগুলো একটা-একটা করে তুলে নিবে। ওরা বাজার এলাকা ছাড়িয়ে শেষপ্রান্তে চলে এলো। বাজারের যাবতীয় আবর্জনার স্তুপ এখানে। নদীর শাখা অংশটা পাশ দিয়ে চলে গেছে কিন্তু ময়লা আবর্জনা আর গাছপালার কারণে জলের প্রবাহ আটকে আছে এখানে। ওরা জায়গামতো পৌছে ময়লার স্তুপের ওপরে উঠে এলো। এতো-এতো হাবিজাবি জিনিসপত্র ছড়িয়ে আছে ডাঙ্গায় আর জলতে যে সেদিকে তাকিয়ে শিস দিয়ে উঠলো ঘোষিত, "এই ব্যাটা, শাক্যুরিয়া," জাথুরিয়ার নামটা ইচ্ছে করেই বিকৃত করে বললো সে। "এখানে আসল জিনিস খুঁজে পাবো কিভাবে?"

জাথুরিয়াও চিন্তিত মুখে এদিক-সেদিক দেখছে। সে পরিস্থিতি দেখে এতোটাই বিহ্বল হয়ে গেছে যে ঘোষিতের কটু কথাও কানে গেল না তার। "কোন উপায় নেই, সবাই ছড়িয়ে পড়ে খোঁজ লাগাতে হবে," বলেই সে মাথার ওপরে তাপ ছড়াতে থাকা সূর্যটার দিকে ফিরে তাকাল। শত্রুর মতো দ্রুত গতিতে ওটা মাথার ওপরের দিকে রওনা দিয়েছে। সময় এখন সবচেয়ে বড় শত্রু।

***

মাথার ওপরের সূর্যের দিকে চোখ তুলে তাকাল আরেকজন মানুষ। শামান।

অস্থির হয়ে একবার ও বাজারের প্রবেশ পথের দিকে ফিরে তাকাল। সেদিক দিয়ে প্রবেশ করছে লিচ্ছবী আর উরগদের যৌথ বাহিনী। এখনো ওরা পুরোপুরি দৃষ্টিসীমার ভেতরে প্রবেশ করেনি কিন্তু শামান দূর থেকে দেখে যা বুঝতে পারছে কমপক্ষে তিন-চারটে ঘোড়ার গাড়ি, ত্রিশ-চল্লিশটা ঘোড়া আর বেশ কিছু পদাতিক সৈন্যও আছে। কিন্তু উরগদের কাউকে চোখে পড়লো না।

“ব্যাপার কি, উরগদের কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না,” ওর পাশ থেকে কালন্তি বলে উঠলো।

“উরগ হোক আর মোরগ হোক, সবই আমাদের জন্যে সমান,” শামান ভেতরে-ভেতরে অস্থির হয়ে উঠছে, যে-অস্থিরতাকে ও যুদ্ধের ময়দানে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে। আর এটাও ওর জন্যে এই মুহূর্তে যুদ্ধের ময়দানই বটে।

শামান আড়চোখে সব্জি আর মাছ বিক্রি করতে থাকা ওর অন্য দলটাকে একবার দেখে নিলো। ওদেরকে দেখে মনে হচ্ছে সবাই প্রস্তুত আছে ওর নির্দেশের অপেক্ষায়। কিন্তু প্রস্তুত থেকে লাভ কি যদি সময়মতো অস্ত্রই হাতে এসে না পৌছায়।

“যোদ্ধা, অস্থির হয়ো না,” কালন্তি বলে উঠলো। “আমার বিশ্বাস তুমি কোন না কোন উপায় বের করবেই। বিশ্বাস করো নদীর পাড়ে যেভাবে তুমি তিনটে উরগের মোকাবেলা করেছো, ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য ছিল।”

“আমি ভাগ্যবান ছিলাম,” বলে ও কালন্তির দিকে ফিরে বলে উঠলো। “আর তুমি এই ‘যোদ্ধা যোদ্ধা’ বলা বন্ধ করবে, শামান ডাকতে পারো না?” বলেই ও সামনে ফিরে তাকাল। শত্রু বাহিনী এখন বাজারের প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকে বেদীর কাছের ফাঁকা জায়গাটাতে এসে জড়ো হয়েছে। শামান মনোযোগ দিয়ে দেখে বোঝার চেষ্টা করছে ওদের সংখ্যা, যোদ্বাদের অস্ত্র-সস্ত্র আর ওদের সৈন্যদের দক্ষতা।

ওরা বেদীর কাছে গিয়ে থামতেই আশ্বারোহিরা জায়গাটাকে ঘিরে ফেললো। আর তিনটে ঘোড়ার গাড়ি থেমে গেল ঠিক বেদীর সামনে। গাড়িগুলো থামতেই ধাম করে খুলে গেল একটা গাড়ির দরজা, সেটার ভেতর থেকে টেনে নামানো হলো ন্যাড়া মাথা তিনজন মানুষকে।

সাথে-সাথে শামানের বুকের ভেতরটো ধ্বক-ধ্বক করে উঠলো ডুকপা লামার কথা চিন্তা করে। বাজারের বেশিরভাগ মানুষ ধীরে-ধীরে বেদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দেখতে-দেখতেই বেদীর সামনে জমে ওঠা ভিড়ের পরিমাণ বাড়তে শুরু করেছে।

শামানরা যেখানে আছে সেটা বেদী থেকে একটু দূরে হলেও ওখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যেখানে গাড়িগুলো থেকে টেনে নামানো হেছ বৌদ্ধ শ্রমণদের। তিনজনের ভেতরে হন্যে হয়ে খুঁজেও ডুকপা লামাকে দেখতে পেল না ও। একই সাথে স্বস্তি আর অস্বস্তি দুটোই আচ্ছন্ন করে ফেললো ওকে। এদের ভেতরে ডুকপা লামা নেই, তারমানে কি তাকে ইতিমধ্যেই মেরে ফেলা হয়েছে?

ছাগলদেরকে টেনে যেভাবে খোঁয়ারে ওঠানো হয় অনেকটা সেই ভাঙ্গিতে শ্রমণদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো বেদীর ওপরে। বেদীর অন্যপাশ থেকে মোটামতন দেখতে একজন মানুষ এগিয়ে গেল তাদের দিকে। জল্লাদ।

“ভুলে যাও অস্ত্র, আমি এগোচ্ছি,” বলে শামান ওদের দিকে যাবার জন্যে উদ্যত হতেই কালন্তি একটা হাত চেপে ধরলো ওর। “দাঁড়াও, দেখো,” বলে সে দ্বিতীয় ঘোড়ার গাড়ির দিকে দেখালো সেটার ভেতর থেকে নেমে এসেছে আগাগোড়া লাল পোশাক পরা ছোট-খাট একজন মানুষ। “লিচ্ছবীদের রাজা, হেমচন্দ্র।”

সে নিচে নেমেই তৃতীয় ঘোড়ার গাড়ির দিকে ইশারা করতেই সেটার দরজা খুলে গেল। প্রায় সাথে সাথেই ভেতর থেকে ছিটকে বেড়িয়ে এলো একজন মানুষ। সে নিজ থেকে বেড়িয়ে এলো না তাকে গাড়ির ভেতর থেকে ছুঁড়ে ফেলা হলো বাইরে, ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু মানুষটাকে দেখে আনমনেই কালন্তি বলে উঠলো, “রাজা বিক্রমাদিত্য।”

ঝট করে কালন্তির দিকে ফিরলো শামান। ওর দিকেই তাকিয়ে ছিল কালন্তি।

“তারমানে এখানে শুধু বৌদ্ধ শ্রমণদের কতল করা হবে না বরং শাক্য রাজা বিক্রমাদিত্যকেও হত্যা করা হবে।”

***

মুহূর্তের জন্যে থেমে দাঁড়ালেও বিধু ইশারা করতেই আবার হাঁটতে শুরু করলো ধোয়ী। কিন্তু একবার থেমে দাঁড়ানো তারপর আবার হাঁটতে শুরু করতেই ওদের দিকে ফিরে তাকাল মদারুর দরজার বাইরে দাঁড়ানো দুই সৈন্যের একজন। “এই, এদিক দিয়া কই যাস, তোরা?”

প্রথমজনের কথা শুনে ওদের দিকে দেখলো দ্বিতীয়জন। মাটিতে এক দলা থুতু ফেলে প্রশ্ন করলো। “তগো পিডে এইগুলান কি, মরা ইন্দুর নাকি?”

ওরা কেউ কোন উত্তর দেয়ার আগেই প্রথমজন ধমকে উঠলো। “এই কতা কানে যায়না? উত্তর দেস না ক্যান?”

“হুজুর আমরা চামড়ার কারবারি, এইদিগে...” বিধু মুখে বোকা বোকা হাসি ফুঁটিয়ে তুলে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই প্রথম সৈন্য বলে উঠলো, “এইদিগে কিছু নাই, সামনে রাস্তা বন্ধ... ব্যাক্কলের মতোন কই যাইতাছোস, গাধার জাত,” বলে দুজনেই সমস্বরে হেসে উঠলো।

“ও হুজুর ভুল হই গেছে,” বলে সে পেছন ফিরে সবাইকে ফিরে যাবার জন্যে ইশারা করতেই হঠাৎ প্রথমজন বলে উঠলো। “এই তোর কথা এমুন ক্যারে, তুই কোনথাই আইছোস?”

বিধু জবাব না হাঁটতে শুরু করতেই তার সন্দেহের পারদ চড়ে গেল। “অ্যাই খাড়া,” বলে সে বিধুর দিকে এগোনোর চেষ্টা করতেই হঠাৎ বাড়ির ভেতর থেকে তীব্র চিৎকার ভেসে

এলো। দুই সৈন্য তো থেমে গেলই ওরাও ফিরে তাকাল বাড়ির দিকে। এই সুযোগটাই নিলো ধোয়ী।

বিধু দেখতে পেল ওর পাশ থেকে হঠাৎ ছায়ার মতো সরে গেল কিছু একটা। প্রায় সাথে সাথেই দেখতে পেল ধোয়ী পৌছে গেছে একজন সৈন্যের কাছাকাছি। সৈন্যের কাছাকাছি পৌছে একহাতে ঘাড় চেপে ধরে শূণ্যে তুলে ফেললো সে। এমনকি অন্য হাত না লাগিয়েই তাকে ছুঁড়ে মারলো দ্বিতীয় সৈন্যের দিকে। দুজনেই পড়ে যেতে প্রথমজনের তলোয়ারের খাপ থেকে তলোয়ার বের করে এক কোপে তার মাথা নামিয়ে দিলো। দ্বিতীয় জনের দিকে এগোতে যাবে একটা তীর এসে লাগলো ধোয়ীর হাতে ধরা তলোয়ারে। ওটা হাত থেকে ছুটে যেতেই সবাই দেখলো মদারুর বাড়ির ভেতর থেকে আরো দুজন সৈন্য বেরিয়ে এসেছে। ধোয়ী কিছু করার আগেই সক্রিয় হয়ে উঠলো বিধু, তার পাশের লোকটার চামড়ার গাটটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারলো দুজনার দিকে।

ওরা সেটা সামলানোর চেষ্টা করতে-করতে সে আর ধোয়ী দুজনেই দুই সৈন্যের তলোয়ার তুলে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে বাকি দুজনার ওপরে। ওদেরকে নিষ্ক্রিয় করে চারজনে মিলে বাড়ির ভেতরে ঢুকে দেখলো বাড়ির দাওয়ার সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে একজন মানুষকে।

ধোয়ী এগিয়ে প্রথম তার মুখের বাঁধন খুলে দিলো। তারপর হাত-পায়ের বাঁধন খুলতে লাগলো। “কি ব্যাপার, মদারু তোর এই অবস্থা?”

“আরে, আমার অবস্থা রাখ, তোরা এহানে কি করস?”

“আমরা... আমাগো কিছু অস্ত্র লাগবো, আর-”

ধোয়ী কথা শেষ করার আগেই বিধু বলে উঠলো। “বাজারে আইজ যাগো মারবো হেগো ফিরাইতে আইছি।”

মদারু নিজের হাত-পা ডলছিল বিধুর কথা শুনে থেমে গেল সে। হাতের তাল দিয়ে কপালে চাপড় মারলো। “গাধার দল। তগো কি মনে অয় হেরা আমারে বাইন্দা রাখছিল কেরে?”

“মানে?” ধোয়ী খুব অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো মদারুকে।

“মানে, হেরা আমার পুরা অস্ত্র গুদাম খালি কইরা আমারে বাইন্দা রাখছিল কারণ হেরা আগেই অনুমান করছে আমার অস্ত্র গুদাম থাইক্কা অস্ত্র নিয়া কেউ ঝামেলা পাকাইতে পারে। আরে বলদের পোতারা, আইজকা এইখানে বিরাট ঘটনা ঘটনা ঘটতে যাইতেছে।”

“সেইডা তো আমরা জানিই, বুদ্ধগরে...”

“আরে!” মদারুকে দেখে মনে হচ্ছে সে অস্থিরতায় মারাই যাবে। “বুকারা খালি কয়ডা বুদ্ধ মারুনের লাইগগা এতো আয়োজন দেইখা তগো মাতায় কিছু ডুকলো না। আইজ এইহানে রাজা বিক্রমের কল্লা কাডবো হেরা।”

“এই মদারু,” ধোয়ী তার দিকে দুই পা এগিয়ে গেল। “ঠিক কইরা ক, তুই সকাল বেলা মদ খাস নাইতো?”

“খাইলে তো বালাই আছিল,” বলে সে আশেপাশে দেখে মনে হয় হতাশ হয়ে ওদের দিকে ফিরে বলে উঠলো। “হেরা আইজ বিক্রমের কল্লা তো কাডবোই আরেকটা কারণে এই এলাকায় এতো মজবুত পাহারা লাগাইছে। এই এলাকায় নাকি লাল চুলের এক যুদ্ধার বাহিনী আইছে, হেরে ফান্দে ফেলানির লাইগগাই এতো আয়োজন। বাইরে যা সৈন্য দেখছোস তার চাইয়া অনেক বেশি সৈনিক বিভিন্ন জায়গায় লুকায়া আছে।”

মদারুর শেষ কথাটা শুনে বিধু ঝট করে ধোয়ীর দিকে ফিরলো। দুজনের মনে একই ভাবনা, শামানের দলটাকে সাবধান করে দিতে হবে, সেইসাথে সাবধান করে দিতে হবে ঘোষিত আর জাথুরিয়ার দলটাকে, যারা অস্ত্র সংগ্রহের জন্যে বাজার সংলগ্ন খালের দিকে গেছে।

সবাইকে সাবধান করে দিতে না পারলে সর্বনাশ হবে আজ।

অধ্যায় একত্রিশ

বর্তমান সময়

লাক্কাতুরা টি-এস্টেট, সিলেট

বাংলোর সামনে বেরিয়ে আসা দো'নলা বন্ধুক ধরে থাকা লোকটা নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে আনলো।

যেভাবে হিসেবে ভুল করে তানভীর বেশি এগিয়ে গেছিল লোকটার দিকে, ঠিক একইভাবে বন্দুক ধরে থাকা নাক বোঁচা চেহারার লোকটাও আনন্দের অতিশয্যে হিসেবে ভুল করে ফেললো। তানভীরকে বেকায়দা অবস্থায় পেয়ে বন্দুক হাতে অনেক বেশি সামনে চলে এলো সে।

মৃত্যুকে চোখের সামনে দেখে বন্দুকের কালো নলের দিকে যেন সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে ছিল তানভীর। গুলি না করে লোকটাকে এগিয়ে আসতে দেখে ধ্যান ভাঙলো ওর। মরিয়া হয়ে হাতের নাগালে চলে আসা মানুষটার বন্দুকের নল চেপে ধরলো ও। চেপে ধরেই নলটাকে মুখের সামনে থেকে সরিয়ে দিলো মাথার অন্যপাশে, সেইসাথে শরীরের নিচের অংশ বাঁকা করে পা'টাকে একটু দৈর্ঘ্যে ছোট করে ফেললো লাথি মারার জন্যে কিন্তু লোকটা ইতিমধ্যেই ট্রিগার টিপে দিয়েছে।

পুরনো দিনের দো'নলা বন্দুকের গুলির শব্দ যারা শুনেছে তারাই একমাত্র জানে এর শব্দ কতোটা বিভৎস হতে পারে। তানভীরের মনে হলো ওর হাতে কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, আর কানের কাছে যেন কয়েক লক্ষ কাঁচের গ্লাস একসাথে ভেঙেছে কেউ, সেইসাথে বন্দুকের নল থেকে বেরুনো ধোঁয়ায় চোখ-মুখ অন্ধকার হয়ে এলো।

সেকেন্ডের জন্যে কিছুই দেখতে-শুনতে-বুঝতে পারলো না তানভীর কিন্তু ধোঁয়াটা একটু পাতলা হতেই লোকটাকে ব্যস্ত হাতে বন্দুকের দ্বিতীয় নলটা লোড করার চেষ্টা করতে দেখে নিচের দিকে পা ছুঁড়তেই লোকটার হাঁটুতে লাথি লেগে খানিকটা সরে গেল সে। মুহূর্তের ভেতরে পা দুটোকে ঘুরিয়ে অ্যাক্রোবেটিক ভঙ্গিতে লাফিয়ে সোজা হলো ও। লোকটা শরীরের ব্যালেন্স ফিরে পেয়ে বন্দুকের নলটা তানভীরের দিকে তাক করতে যাচ্ছিলো। তার আগেই একহাতে নলটা ধরে শরীর বাঁকিয়ে মানুষটার পাশে চলে এলো।

মিক্সড মার্শাল আর্টে এই ভঙ্গিতে বলে ব্যাক হিপ থ্রো, তানভীরের ইচ্ছে ছিল লোকটার হাত থেকে বন্দুকটা ছিনিয়ে নিয়ে ব্যাক হিপ থ্রো করে তাকে উল্টে মাটিতে ফেলে দিবে, কিন্তু মানুষটাকে ছাড়িয়ে দৃষ্টিটা আরেকটু সামনে যেতেই ও দেখলো মানুষটার দ্বিতীয় সঙ্গী একটা শটগানের মতো দেখতে অস্ত্র তাক করেছে ওর দিকে। মুহূর্তেই মানুষটাকে একটানে নিজের সামনে নিয়ে এলো। দ্বিতীয় ব্যাক্তির গুলিটা কোথায় লাগলো বুঝতে

পারলো না কিন্তু তার আগেই ওর হাতে ধরে থাকা মানুষটার বন্দুকের নলটা সামান্য ঘুরিয়ে গুলি করলো ও নিজেই। যাকে গুলি করেছে সে আর ও নিজে দুজনেই ছিটকে পড়লো দুদিকে। যে লোকটাকে গুলি করেছে সে ছিটকে পড়েছে গুলি খেয়ে আর ও নিজে ছিটকে পড়েছে পুরনো বন্দুকের তীব্র রিকয়েলের ধাক্কায়।

মাটিতে গড়ান দিয়ে সোজা হবার আগেই চারপাশে একাধিক গুলিতে মাটি ছিটকে উঠলো।

আধ-বসা অবস্থাতেই মাটিতে একটা ডাইভ দিয়ে গড়িয়ে খানিকটা সরে এসে সেই খোঁয়ারের মতো দেখতে জায়গাটার আড়ালে চলে এলো ও।

ওটার আড়ালেই এতোক্ষণ লুকিয়ে ছিল লায়লা আর ইকবাল। ওকে দেখে চেঁচিয়ে ইকবাল বলে উঠলো, "স্যার, কী করবো কিছ্হুই তো বুঝতে পারছি না," ইকবাল এক হাতে নিজের পিস্তল চেপে ধরে রেখেছে, অন্য হাতে সামলে রেখেছে লায়লাকে। ইকবালের হাতের চাপে একেবারে মাটিতে যেন মিশে আছে লায়লা। ভয়ে বাচ্চা মুরগীর মতো কাঁপছে।

আনমনেই একবার চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিলো ও। সুলতান সেই দোলনার আড়ালে মাথা নিচু করে আছে, ওরা লুকিয়ে আছে খোঁয়ারের মতো দেখতে সেই ছোট ঘরটার অড়ালে। বাংলো থেকে বেরিয়ে এসেছে একাধিক লোক আর বাংলোর বাইরে থেকে গেটের অন্যপাশে প্রায় তিনজনকে সনাক্ত করতে পারলো ও। ওদেরকে ঘিরে ধরেছে বললেও কম বলা হয়। একেবারে কারেন্ট জালে বেড় দিয়ে মাছ ধরার মতো করে আটকে ফেলেছে।

তানভীর সুলতানের দিকে ফিরে ইশারা করলো, কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। তার ওপরে নিজের পিস্তল হারিয়ে হাত-পা বিহীন মানুষের মতো অসহায় লাগছে ওর। সুলতান ওকে আশ্বস্ত করে কিছু একটা বললো ইশারায়, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলো না ও। হঠাৎই সুলতান নিজের জ্যাকেটের পকেট থেকে কিছু একটা বের করে ছুঁড়ে দিলো তানভীরের দিকে।

গোল মতোন জিনিসটা উড়ে এসে পড়লো তানভীরের হাতে। খপ করে জিনিসটা ধরেই আবার নিচু হয়ে গেল ও। একেবারে নিঁখূত গোল জিনিসটার ওপরে ছোট একটা বোতামের মতো আছে। সুলতানের দিকে তাকিয়ে দেখলো ওকে বারান্দার দিকে ওটা ছুঁড়ে মারার জন্যে ইশারা করছে সে।

তানভীর সাথে-সাথেই বোতামটা চেপে ধরে জিনিসটা ছুঁড়ে দিলো বাংলোর বারান্দার দিকে। জিনিসটার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে জানা নেই, তাই ওটা ছুঁড়ে দিয়েই ইকবাল আর লায়লাকে চেপে ধরে মাটিতে শুয়ে পড়লো ও। প্রথম কয়েক সেকেন্ডে কিছুই হলো না, তাপরপরেই যেন হাজারখানের বাজ একসাথে ফেটে পড়লো বাংলোর বারান্দায়। সেইসাথে বাংলোর গেটের দিকে। কান চেপে ধরার পরেও তানভীরের মনে হলো কানে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না ও। একটু আগে কানের কাছে বন্দুকের গুলি আর এখন সাউন্ড

গ্রেনেড বিস্ফোরণে কানের বারোটা বেজেছে ওর। এর মধ্যেই মুখ তুলে সুলতানের দিকে তাকাল।

প্রায় সাথে-সাথেই দেখতে পেল সেই দোলনার আড়াল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাতে দুই জোড়া পিস্তল বের করে এনেছে মেয়েটা। এই প্রথমবারের মতো তানভীর বিরাট আকারের পিস্তল দুটো দেখতে পেল। একেকটার সাইজ বারো ইঞ্চির কম নয়। পিস্তলের দিকে তাকিয়ে থাকার প্রায় সাথে সাথেই ওর নজর চলে গেল পিস্তলের পেছনে থাকা মানুষটার দিকে।

ঘটনাটা ও চোখের সামনে না দেখে যদি কোন বইতে পড়তো কিংবা কেন সান্ধকালীন আড্ডায় শুনতো, স্রেফ হেসেই উড়িয়ে দিতো। এমনকি কেস স্টাডির ফাইলে পড়লেও বিশ্বাস করতে কষ্ট হত ওর। কিন্তু জলজ্যান্ত ঘটনাটা নিজের চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে ও।

সুলতান তার জোড়া পিস্তল হাতে উঠে দাঁড়িয়ে একটা পিস্তল দিয়ে অন্যটার হ্যামার টেনে লোড করে নিলো। তার অবস্থান থেকে বাংলোটার দূরত্ব হবে আশি গজের ওপরে, সাধারণত পঞ্চাশ গজের বেশি হলেই পিস্তলের নিশানা ঠিক রাখা এমনকি যেকোন মার্কসম্যানের জন্যেও কঠিন। তানভীর তাকিয়ে দেখলো, সুলতানের ডান হাতের পিস্তলটা আগুন উগড়ে দিতেই বাংলোর একেবারে বারান্দার কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা এক লোকের মাথা বিস্ফোরিত হলো ফাটা তরমুজের মতো।

প্রায় সাথে সাথেই সুলতান গুলি করলো তার থেকে গজ দশেক দূরে দাঁড়িয়ে থাকা আরেকজনকে, গুলিটা সরাসরি কাঁধে গিয়ে লাগতেই তার অস্ত্র ধরা হাতটা সোজা হয়ে সমানে গুলি উগড়ে দিতে লাগলো মাটির দিকে। নিখুঁত লক্ষ্যে আরেকটা গুলি উড়ে গেল তার দিকে, তানভীর দেখলো একাধিক গুলিতে মানুষটার অস্ত্র ধরা হাতটা আলগা হয়ে গেল কনুইয়ের কাছ থেকে।

দুজনকে একসাথে পড়ে যেতে দেখে তৃতীয় আরেকজন লাফিয়ে বারান্দায় উঠে রেলিঙের পেছনে বসে পড়লো। ইতিমধ্যেই সুলতান এগিয়ে গেছে বেশ খানিকটা। ডান হাতটা নিচে নামতেই বাম হাতের পিস্তল তুলে টানা কয়েকটা বুলেট উগড়ে দিলো সে বারান্দার দিকে তাক করে, তারও গুলি থামলো প্রায় সাথে সাথেই রেলিঙের আড়ালে লুকিয়ে থাকা লোকটা রেলিং ভেঙে পড়ে গেল মাটিতে। আহত অবস্থাতেই এক হাতে অস্ত্র তুললো সে, প্রায় সাথে সাথেই তার অস্ত্র ধরা হাতের কব্জি উড়ে গেল, সেইসাথে মাথার একাংশ হারিয়ে স্থির হয়ে গেল লোকটা।

“এই বেডি মানুষ না আজরাইল!” হতভম্ভ ইকবালের গলা দিয়ে আঞ্চলিক ভাষা বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে।

বারান্দার ওদিকটা শান্ত হয়ে যেতেই সুলতান হাসিমুখে ফিরে তাকাল তানভীরদের দিকে, আর সাথে সাথেই তীব্র গুলির ধাক্কায় ছিটকে পড়লো রাস্তার ওপরে। "নো," প্রায় চিৎকার করে গেটের দিকে ফিরে তাকাল তানভীর। গেটের অন্যপাশে থাকা অস্ত্রধারীদের কয়েকজন ঢুকে পড়েছে গেটের ভেতরে আর বাকিরাও রেলিঙের অন্যপাশ থেকে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে গুলি করতে শুরু করেছে। তানভীর চিৎকার করে উঠতেই একজন অস্ত্র তুললো ওদের দিকে। আনমনেই লায়লা আর ইকবালকে নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করে ইকবালের পিস্তলটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলো ও নিজের হাতে।

গেটের এপাশে চলে আসা দুই অস্ত্রধারী প্রায় একইসাথে অস্ত্র তাক করেছে ওদের দিকে। তানভীরও ইকবালের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া পিস্তলটা তাদের দিকে তাক করলো। দুই পক্ষই একে-অপরকে গুলি করার আগেই তানভীর দেখলো ওদেরকে বহন করে নিয়ে আসা সেই সাদা মাইক্রোর ধাক্কায় বাংলোর কাঠের গেটটা ভেঙে পড়লো।

গেটটার ডান দিকে দাঁড়িয়ে থাকা অস্ত্রধারী প্রথমে মাইক্রোর বাম্পারের সাথে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল তারপর সোজা চলে গেল গাড়ির চাকার নিচে। বিন্দুমাত্র পরোয়া না করে ড্রাইভার মাইক্রো চালিয়ে দিলো লোকটার ওপর দিয়ে। অস্ত্রধারীকে পিষে দিয়ে মাইক্রো স্কিড করে এগিয়ে এলো বেশ খানিকটা। ড্রাইভারের পাশের সিট থেকে নেমে এলো পুলিশের পোশাক পরা হালকা-পাতলা একজন মানুষ। বেরিয়েই সে সোজা গুলি করলো গেটের ডান দিকে থাকা মানুষটাকে। তানভীরও একবার বাংলোর দিকে চোখ বুলিয়ে দেখলো সুলতান এখনো মাটিতে পড়ে আছে কিন্তু ওদিকে কোন শত্রু নেই। বরং ধুপ-ধাপ গুলি ছুটে আসছে গেট আর কাঠের বেড়ার দিক থেকে।

দৃষ্টি ফিরিয়েই দেখতে পেল মাইক্রো থেকে বেরিয়ে আসা মানুষটা দুই হাতে দুটো পিস্তল তুলে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে টানা গুলি করছে। কোনদিক থেকে গুলি আসছে, শত্রুরা কয়জন, কোন পরোয়া নেই তার। টানা দুটো পিস্তলের সিলিন্ডার খালি করেই মাইক্রোর আড়ালে বসে পড়লো সে, খালি হয়ে যাওয়া পিস্তল দুটো মাটিতে রেখে হাঁপাচ্ছে, তানভীর অনুমান করলো লোকটা গুলি ভরবে পিস্তলে কিন্তু তার আগে ঠান্ডা হবার জন্যে মাটিতে রেখেছে ও দুটো। তানভীরকে দেখে ঝট করে ফিরলো সে ওর দিকে, এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে একবার মাথা নেড়ে মাটি থেকে পিস্তল তুলে নিয়ে গুলি ভরতে শুরু করলো।

তানভীর দেখলো লোকটা গুলি ভরছে আর এই সুযোগে তিনজন অস্ত্রধারী কাঠের বেড়া টপকে বাংলোর অঙ্গিনায় প্রবেশ করেছে। মাটিতে বসা অবস্থায়ই হাঁটু গেড়ে বসে ইকবালের পিস্তলটা দিয়ে গুলি করতে শরু করলো ও। একে তো অনভ্যস্ত হাত তার ওপরে অচেনা পিস্তল, নিশানার অবস্থা খুবই খারাপ ওর। কয়েকটা গুলি করতেই ও অবাক হয়ে দেখলো একজন পড়ে গেল মাটিতে, নিজের পারফরমেন্সে খুশি হবার আগেই দেখলো আসলে ওর গুলি লাগেনি শত্রুর, বরং সেই পুলিশ লোকটা গুলি করেছে। আবারো আনমনেই একবার মাথা নেড়ে আবার পিস্তল তুললো কিন্তু জমে গেল, গুলি থামিয়ে দিলো পুলিশ লোকটাও।

আঙ্গিনায় প্রবেশ করা সেই তিনজনের দুজন মাটিতে পড়ে গেছে গুলি খেয়ে কিন্তু তৃতীয় লোকটা নিজের অস্ত্র ঠেকিয়ে রেখেছে লায়লার মাথার পাশে। তার পাশেই দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছে ইকবাল। পুলিশ লোকটা আর তানভীর যখন বাকি দুজনকে নিকেশ করতে ব্যস্ত এই সুযোগে তৃতীয় জন কাঠের বেড়া টপকে চলে এসেছে বেশ ভেতরে, আর কিছুটা ভেতরে আসতেই তার মোলাকাত হয়েছে খোঁয়ারের পাশে লুকিয়ে থাকা লায়লা আর নিরস্ত্র ইকবালের সাথে।

"তানভীর," ভয়ের চোটে চিকন সুরে প্রাণপনে চেঁচিয়ে উঠলো লায়লা। কেন জানি এইরকম ভয়ঙ্কর অবস্থাতেও তার নাকি চিৎকার শুনে হাসি পেল তানভীরের। কিন্তু কিছু ভাবার আগেই তাকে ধরে রাখা লোকটা অচেনা এক ভাষায় চিৎকার করে উঠলো। অস্ত্র নেড়ে কিছু একটা বলছে সে। তানভীর চেঁচিয়ে উঠে তাকে শান্ত থাকতে বললো।

"কী কয় এই বালটা?" বলে ওর পাশ থেকে সেই পুলিশ লোকটা এগিয়ে গেল ওদের দুজনার দিকে। প্রায় সাথে সাথেই অস্ত্রধারী লোকটা তড়-বড় করে কিছু একটা বলে উঠে অস্ত্র চেপে ধরলো লায়লার মাথার পাশে, চেঁচিয়ে উঠলো লায়লা।

"এই যে মিস্টার সাবধানে, দেখুন-" তানভীর লোকটাকে সাবধান করার আগেই পুলিশ লোকটা সোজা গুলি করলো লায়লাকে ধরে থাকা লোকটাকে। কথা বলতে বলতে সে এগিয়ে গেছিল ওদের দিকে। আর লোকটা হঠাৎ অস্ত্র চেপে ধরাতে লায়লার পেছন থেকে পাশে চলে এসেছিল অনেকটা, এক মুহূর্ত দেরি না করে নিঁখূত নিশানায় তার খুলি উড়িয়ে দিয়েছে পুলিশ লোকটা।

মুহূর্তখানেক হতভম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের দিকে দৌড়ে গেল তানভীর। অস্ত্রধারী মাথার খুলির বেশ অনেকখানি অংশ হারিয়ে পড়ে আছে মাটিতে। লায়লার দিকে তাকিয়ে তার হা করা মুখের ভেতরে আলজিভটা পরিষ্কার দেখতে পেল তানভীর। ইকবালের দিকে ফিরে ওকে সামলানোর জনে ইশারা করে সে ফিরে তাকাল পুলিশ লোকটার দিকে।

"আপনি কে বলুন তো? এভাবে..."

"ধন্যবাদ পরে দিলেও চলবে," তানভীরকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সে একটা সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বলে উঠলো। সিগারেটে আগুন দিয়ে মুখের একপাশ দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলে উঠলো, "আপনাদের সবার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে," বলে সে সরকারি অফিসের দলিল লেখকদের মতো শুষ্ক একটা হাসি দিয়ে যোগ করলো, "বাই দ্য ওয়ে, আমি ওসি জালাল, জালাল উদ্দিন। আপনি নিশ্চই এই অপারেশনের কমান্ডার, তানভীর মালিক?"

তানভীর তাকে কিছু না বলে দৃষ্টি দিয়ে ভষ্ম করার খানিকটা চেষ্টা করে ও দৌড়ে এগিয়ে গেল বাংলোর রাস্তার ওপরে পড়ে থাকা সুলতানের দিকে। খানিকটা এগিয়েই দেখতে পেল সুলতান উঠে বসেছে। তার সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে তাকে উঠতে সহায়তা করলো তানভীর। "তুমি ঠিক আছো?"

"জি, বস, গুলি লাগেনি, কিন্তু বুলেটপ্রুফ ভেস্টের ওপরে পুরনো দিনের বন্দুকের গুলি এতো জোর আঘাত করেছিল জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম," বলে সে তানভীরের হাত ধরে উঠে বসলো। তার গ্যাবাডিন জ্যাকেটের পেটের কাছে বিরাট ফুটো হয়ে তুলো বেরিয়ে পড়েছে। "আপনারা কিভাবে..."

"ওই পুলিশ লোকটা সময়মতো এসে বাঁচিয়ে দিয়েছে," বলতে-বলতেই তানভীর সুলতানকে এক হাতে টেনে দাঁড় করিয়ে দিলো।

"লোকটা কে, স্যার?" সুলতান পোশাক ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

"এখনো জানি না," বলতেই হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল পাশা স্যার একজনকে পাঠানোর কথা ছিল, এ নিশ্চই সেই লোক। মানুষটা সিগারেট টানতে-টানতে এগিয়ে আসছে বাংলোর রাস্তা ধরে। তার নাক-মুখ দেখে মনে হচ্ছে ইটের ভাটার চিমনি। কারণ ঠিক চিমনির মতোই ধোঁয়া উগড়ে দিচ্ছে সে নাক-মুখ দিয়ে।

"আপনাকে কি পাশা স্যার পাঠিয়েছে?" তানভীর জানতে চাইলো।

"জে আজ্ঞে, বস। বুঝতে পারার জন্যে ধন্যবাদ," তার কথা বলার ভঙ্গিটাই কেমন জানি বাঁকা। মুখের প্রায় শেষ হয়ে আসা সিগারেরটা দিয়ে পকেট থেকে বের করে আরেকটা সিগারেট ধরালো সে। সুপিরিয়রের সামনে এরকম অবলীয়লায় সিগারেট টানতে এর আগে কাউকে দেখেনি তানভীর।

"আপনি এখানে এলেন কিভাবে?" ও জানতে চাইলো।

"গাজীপুর থেকে সিলেট পৌছেছি আজ দুপুরে, কদমতলী থেকে আম্বরখানা, ল্যাবে গিয়ে জানতে পারলাম আপনারা ভার্সিটিতে গেছেন, সেখানে গিয়ে জানলাম আপনারা সুরমা, সুরমা গিয়ে ওই ভদ্র মহিলার," বলে সে মাইক্রোর খোলা দরজায় বসে জল খেতে থাকা লায়লাকে দেখালো। ইকবাল আর ড্রাইভার রসুল মিয়া দুজনে লায়লার সেবায় রত।

"ওই মহিলার পরিবারের লোকজন জানালো আপনারা লাক্কাতুরা এসেছেন। এখানে এসে বাংলো খুঁজছি মূল রাস্তা থেকে গুলির ঠুস-ঠাস আওয়াজ শুনে এগিয়ে দেখি এখানে তুমুল গোলাগুলি চলছে। দূর থেকে দেখেই বুঝলাম আাপনারা বড়জোড় আর মিনিট পাঁচেক টিকবেন। তাই ড্রাইভারকে নিয়ে সোজা গেট ভেঙে ঢুকে গেলাম, বাকিটা আপনারা জানেন," বলে সে আবারো চিমনির মতো ধোঁয়া ছাড়তে লাগলো।

তানভীর আর সুলতান দৃষ্টি বিনিময় করলো। সুলতান একটা আঙুল তুলে তানভীরকে ইশারা করলো, এর মাথায় সমস্যা আছে।

"ঠিক আছে শার্লক হোমস, এখন আমাদেরকে বাংলোর ভেতরটা চেক করতে হবে," বলে তানভীর পায়ে চলা পথটার ডান দিকে দেখলো। ওখানেই হাতাহাতির সময়ে ডেজার্ট ঈগলটা পড়ে গেছিল। আছে ওটা।

"এক মিনিট," বলে ও ঘাসের ওপর থেকে পিস্তলটা নিয়ে ওটা পরিষ্কার করতে-করতে ওদের কাছে এসে দেখলো ওসি জালাল কৌতুকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর হাতে ধরা ডেজার্ট ঈগলের দিকে। "বস কি পিস্তলটা ফেলে দিয়েছিলেন নাকি?" বলে সে মুখ দিয়ে টিটকিকির হাসি আর সিগারেটের ধোঁয়া একসাথে উগড়ে দিয়ে বলে উঠলো, "ছোটবেলায় প্রথম যখন মেয়েরা শাড়ি পরে..." তানভীরের কড়া দৃষ্টি দেখে সে থেমে গিয়ে দুই হাত তুললো ক্ষমা চাইবার ভঙ্গিতে।

"সুলতান তোমরা রেডি হও, আমি ইকবাল আর রসুল মিয়াকে নির্দেশনা দিতে হবে," বলে তানভীর চলে এলো মাইক্রোর কাছে। লায়লার চেহারায় রঙ কিছুটা ফিরেছে এখন। "তুমি ঠিক আছো?" বলে সে উত্তরের অপেক্ষা না করে ইকবালকে নির্দেশনা দিলো ফোর্সে খবর দিতে, আর লায়লার দিকে খেয়াল রাখতে বলে চলে এলো বাংলোর সামনে। "এই বাংলোতে এতো পাহারা ছিল যেহেতু কাজেই অবশ্যই এতে কিছু না কিছু আছে।" নিজের ডেজার্ট ঈগল বাগিয়ে ধরে সুলতান আর ওসি জালালকে অনুসরণ করতে বলে উঠে এলো বাংলোর বারান্দায়।

পুরো বাংলোর সামনেটা জুড়ে লম্বা বারান্দা। তিনটে দরজা দেখা যাচ্ছে। মাঝের দরজাটার সামনে এসে একপাশে সরে মৃদু ঠেলা দিলো। "ভেতরে কেউ আছে বলে মনে হয় না," ওসি জালাল বলে উঠলো। "থাকলে এতোক্ষণে হয় পালিয়েছে আর না হয় গোলাগুলিতে মরেছে বা আহত হয়েছে।"

তাকে চুপ থাকতে ইশারা করলো সুলতান। "আমাকে কভার করো," বলে তানভীর দরজায় ঠেলা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো। বাংলোর বাইরেটা দেখতে রিসোর্টের মতো দেখালেও ভেতরেটা একেবারেই অফিসের আদলে সাজানো। ভেতরে এলোমেলো টেবিল-চেয়ার আর ছড়ানো কাগজপত্র দেখেই বোঝা যায় ঝড় বয়ে গেছে এখানে। কিন্তু কারো টিকিও নেই। ভেতরে প্রবেশ করে বসার ঘর আর রিসিপশনের মতো দেখতে জায়গাটা পার হয়ে ওরা চলে এলো ভেতরে।

ডায়নিং রুমের অবস্থা ভয়াবহ। শুধু-খাবার টেবিলের সেটটা বাদে আর কিছুই ঠিক নেই। কিচেনে এসে দেখলো পেছনের দিকের একটা দরজা খোলা। তানভীর উঁকি দিয়ে দেখলো, ওটা দিয়ে বাংলোর পেছনে নামা যায়, আর পথটা টিলা বেয়ে সোজা নিচে নেমে গেছে।

"মনে হয় কেউ একজন ভেতরে ছিল, সে বাকিদের অবস্থা খারাপ বুঝে এদিক দিয়ে পালিয়েছে," ওর পেছন থেকে ওসি জালাল বলে উঠলো। হঠাৎ অন্য রুম থেকে সুলতানের চিৎকার শুনে দুজনেই দৌড়ে সেদিকে এগোল। ডায়নিঙের ঠিক লাগোয়া পাশাপাশি দুটো রুম। ওরা অনুমান করলো, সম্ভবত শোবার ঘর। একটা রুমের দরজা হাট করে খোলা। অন্যটা বন্ধ।

"এটার ভেতরে কেউ আছে," সুলতান পিস্তল ধরে বলে উঠলো।

তানভীর এগিয়ে গিয়ে সাবধানে রুমটার দরজার নব ধরে মোচড় দিলো। "লক," ওদের দুজনার দিকে ফিরে বলে উঠলো।

"দেখি," বলে ওসি জালাল পিস্তল তাক করতে যাচ্ছিলো দরজার তালার দিকে, তাকে হাতের ইশারায় মানা করলো তানভীর। "ভেতরে কেউ থাকলে ক্ষতি হতে পারে," বলে সে নিজের পিস্তল হোলস্টারে রেখে দুই পা পিছিয়ে গেল।

"বস, তালাটা কিন্তু শক্ত আছে, আর দরজাও মোটা," সুলতান সাবধান করলো।

তানভীর তাকিয়ে আছে ওসি জালালের দিকে। ছোট বাচ্চারা যখন বড়দের সামনে শক্তি প্রদর্শন করতে যায় বড়রা তাদের দিকে যেভাবে তাকায় অনেকটা সেরকম ভঙ্গিতে তানভীরের দিকে তাকিয়ে আছে ওসি জালাল।

জালালকে দেখতে ইশারা করে দুই পা এগিয়ে সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে লকটা থেকে এক ফুট ডানে লাথি মারলো তানভীর। আবার, আবার, ফাইটার ব্র্যান্ডের বুটের চতুর্থ লাথিতে লকের অংশটুকু মূল দরজা থেকে ভেঙে আলগা হয়ে গেল। একহাতে পিস্তল বের করে অন্য হাতে কাঠের টুকরোর সাথে সামান্য আটকে থাকা দরজাটা এক ধাক্কায় মেলে ধরে ওসি জালালের শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে ভেতরে ঢোকার ইশারা করলো ও।

এই রুমটাও অন্যগুলোর থেকে ব্যতিক্রম নয়। তবে এতে একটা কাপড় রাখার কাঠের আলমারি আছে, একটা ড্রেসিং টেবিল আর একটা বড় খাট আছে। রুমের অন্যান্য দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে খাটের ওপরে দৃষ্টি পড়তেই চমকে উঠলো ওরা। সেখনে একজন মানুষ শুয়ে আছে।

জালাল আর সুলতান ইতিমধ্যেই খাটের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তানভীর, এগিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো খাটের পাশে। খাটে শুয়ে থাকা মানুষটার পরণে বহু পকেটওয়ালা একটা কমব্যাট ধরণের প্যান্ট, সাদা টি-শার্টটা ময়লা হয়ে হলদে হয়ে গেছে। অন্যদিকে মুখ দিয়ে শুয়ে থাকা মানুষটাকে এক হাতে ধরে এদিকে ফেরাতেই চমকে উঠলো তানভীর আর সুলতান।

জালাল তাকে চিনতে পারেনি। কিন্তু ওরা পেরেছে। মাথায় এলোমেলো চুল আর মুখে কয়েকদিনের না কাটা দাড়ি থাকা সত্বেও বহু ছবিতে দেখা ডক্টর মিতায়নকে চিনতে না পারার কোন কারণ নেই।

মানুষটাকে সোজা করে শুইয়ে তার পালস চেক করলো তানভীর। ক্ষীণ, তবে অবশ্যই বেঁচে আছে। তাকে একহাতে ধরে মৃদু ঝাঁকি দিলো তানভীর। "ডক্টর, ডক্টর মিতায়ন," সুলতানের দিকে ফিরে বলে উঠলো। "জলদি, ইকবালকে বলো অ্যাম্বুলেন্স খবর দিতে, আর লায়লাকে নিয়ে এসো এখানে," বলেই ও ফিরে তাকাল ডক্টর মিতায়নের দিকে। আবারো মৃদু ঝাঁকি দিয়ে বলে উঠলো, "ডক্টর, ডক্টর।"

ওর ঝাঁকির সাথে সাথে যেন সামান্য নড়ে উঠলো ডক্টর। বিড়-বিড় করে কিছু বলতে লাগলো সে। “ডক্টর কিছু বলছেন?” বলে তানভীর ওর কান দিয়ে এলো ডক্টরের একবারে মুখের কাছে। ডক্টর মিতায়নের বিড়-বিড় করে বলা কথাগুলো এবার একেবারে পরিষ্কার ধরা পড়লো ওর কানে।

বিড়-বিড় করে হলেও মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে ডক্টর বলে উঠলো,

“ব্ল্যাক... ব্ল্যাক বুদ্ধা।”

অধ্যায় বত্রিশ

সময়: ১৮০ খিস্টপূর্বাব্দ

মন্তলার হাট, কন্নোর, ভারতবর্ষ

ময়লার স্তুপের এখানে সেখানে খুঁজতে-খুঁজতে ওরা যখন প্রায় ক্লান্ত হয়ে হাল ছাড়ার দশা তখনই ঘোষিত আর জাথুরিয়ার দলের একজন হঠাৎ চিৎকার করে বাকি সবাইকে ডাকলো। মাটির কিনারা আর ময়লার স্তুপ যেখানে খালের সাথে মিশেছে সেখানে জলের কাছাকাছি ঝোপ-ঝাড়ের দঙ্গলের ভেতরে সে নাকি কিছু একটা দেখতে পেয়েছে। অন্যদেরকে খোঁজ চালিয়ে যেতে বলে কাছাকাছি থাকা ঘোষিত চলে এলো লোকটার কাছে।

ঝোপের কাছাকাছি জলতে বিভিন্ন হাবিজাবির সাথে বেশ বড় আকৃতির কিছু একটা আছে ব'লে মনে হচ্ছে, তবে সেটা জলের খোলা ঝোপঝাড়ের অংশ হওয়াটাও একেবারে বিচিত্র নয়।

"জিনিসটা ভালোভাবে দেখে নিয়ে লোকটাকে ঘোষিত বললো, "এক কাজ কর, বড় একটা লাঠি দিয়ে ওটাকে টেনে আন।"

একটু খুঁজে পেতেই একটা বড় একটা বাঁশের লাঠি দিয়ে টেনে আনার চেষ্টা করলো সে জিনিসটা কিন্তু নাগাল না পেয়ে অবশেষে জলতে নামতে হলো। লোকটা কোমর জলতে নেমে জিনিসটা টেনে নিয়ে এলো একেবারে পাড়ের কাছে। ওপরের আবরণটা সরাতেই খুশিতে প্রায় চিৎকার করে উঠলো ঘোষিত। "এই পেয়েছি। এইদিকে চলে আয় সবাই।"

বাকিদেরকে নিয়ে জাথুরিয়া চলে এলো ঘোষিতের কাছাকাছি।

ভেলার মতো জিনিসটার ওপর থেকে ঝোপের মতো দেখতে লাতা-পাতার দঙ্গল সরাতেই দেখা গেল কাঠের বড় বড় টুকরো জোড়া লাগিয়ে অনেকটা ভেলার মতো বানিয়ে সেটার ওপরে পাতলা আচ্ছাদন দিয়ে তার ওপরে রাখা হয়েছে বেশ কয়েকটা তলোয়ার-তীর ধনুক আর বর্শা। "সাবাশ," ঘোষিতের পাশ থেকে বলে উঠলো জাথুরিয়া। "আর নেই? একটাই পাওয়া গেছে?" জানতে চাইলো সে।

জাথুরিয়ার প্রশ্ন শুনে জলতে থাকা লোকটাকেও একই প্রশ্ন করলো ঘোষিত।

"না ওস্তাদ, আর নাই, একটাই আছে," লোকটা ময়লা ইত্যাদির আড়ালে উঁকি-ঝুঁকি মারতে মারতে জানালো।

“দরকার নেই, সময় কম, যতো দ্রুত সম্ভব এগুলো পৌছাতে হবে ওদের কাছে,” বলে উঠে ঘোষিত বাকিদেরকে নির্দেশনা দিতে লাগলো জিনিসটা উঠিয়ে আনার জন্যে।

“এই কি হইচ্ছে এখানে?” কড়া গলায় ধমক শুনে ফিরে তাকাল সবাই। ছয়-সাত জন সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে।

সাথে-সাথে ঘোষিত মাটি থেকে তুলে আনা অস্ত্রের স্তুপটার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ালো যেন সৈন্যদের দল সেটাকে দেখতে না পায়। “কিছু না, হুজুর, আমরা,” বলেই সে পাশে দাঁড়ানো নিজেদের লোকটার মাথায় একট চাটি মারলো। “আর বইলেন না হুজুর আমরা ঝালাইকার, আর আমার দলে এই গাধাটা ঝালাই করার যন্ত্রপাতি জলতে ফালায়া দিছে,” বলেই সে আবার নিজের লোকটার দিকে ফিরে বলে উঠলো। “যা তুই উঠায়া আন জল থাইক্কা,” সৈন্যদের দিকে ফিরে একটা বোকা-বোকা হাসি দিলো সে। ওর হাসির সাথে সাথে সৈন্যরাও হাসতে লাগলো।

“আমারে একটা কথা ক,” ঘোড়ার ওপরে বসা নেতাগোছের সৈন্যটা মৃদু হেসে বলে উঠলো, “তরা হইলি ঝালাইকার, তরা বাজারে না বইসা এইহানে কী করছ?”

“আমরা, আমরা...” ঘোষিত কথা খুজে না পেয়ে জাথুরিয়ার দিকে ফিরে তাকাল।

“শোন্, গাধার বাচ্চারা, আমরা অনেকক্ষণ ধইরা তগো উপরে নজর রাখতাছি, তরা...” দ্বিতীয় একজন সৈন্য বলে উঠলো। তবে সে কথা শেষ করার আগেই জাথুরিয়া নড়ে উঠলো। সে যেই বুঝতে পেরেছে ঘোষিত ওদের সাথে কথায় পারবে না একটু একটু করে নড়তে শুরু করেছিল, লোকটার কথার মাঝে হঠাৎ ঘোষিতের বান্ডিল থেকে একটা বর্শা বের করে ছুঁড়ে দিলো সৈন্যদের দিকে। কিন্তু লোকটা সাবধান ছিল, জাথুরিয়ার ছুঁড়ে দেয়া বর্শাটা খুব সহজেই এড়িয়ে গেল সে। প্রায় সাথে সাথেই নিজের ধনুক তুলে তীর যোজনা করতে শুরু করলো জাথুরিয়ার দিকে। লোকটা তীর ছোঁড়ার আগেই পেছন থেকে বিধুর ছুঁড়ে দেয়া তীর গলা এফাঁড় ওফোঁড় করে দিলো তার। ঘোষিত আর জাথুরিয়া যে-যার অস্ত্র তুলে নিয়ে সৈন্যদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো, সেইসাথে সৈন্যদলের পেছন থেকে তাদের ওপরে আক্রমণ চালালো বিধু আর ধোয়ীর দল।

মদারু ওদেরকে সাবধান করে দিতেই ওরা ঘোষিতদের সাহায্য করতে জলধারার কিনারায় এসে শাক্য সৈন্যদের কাছ থেকে হাতিয়ে নেওয়া অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ চালায়। দুইদলের সম্মিলিত আক্রমণে দিশেহারা হয়ে উঠলো শাক্য সৈন্যরা। যেখানে ওরা কোন প্রতিরোধই আশা করেনি বরং ভেবেছিল ফাঁদ পেতে ধরবে দলটাকে সেখানে দুই দলের সম্মিলিত আক্রমণে কচুকাটা হয়ে গেল কিছুক্ষণের ভেতরেই।

সৈন্যদেরকে নিকেশ করে তাদের অস্ত্র আর ঘোড়া দখল করে নিলো ওরা। নিজের বর্শার ওপরে ভর দিয়ে জাথুরিয়ার দিকে ফিরে ধোয়ী সরল মুখে মৃদু টিটকিরির হাসি হেসে বলে উঠলো, “বর্শা কিভাবে মারতে হয় শিখতে এখনো তোমার দেরি আছে।”

জাথুরিয়া রাগের সাথে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই ঘোড়ার পিঠে চড়া বিধু তাড়া লাগালো সবাইকে। "জলদি জলদি, ওস্তাদ শামান আর ওদেরকে সতর্ক করে দিতে হবে, ফাঁদে পড়তে যাচ্ছে ওরা। আমরা অস্ত্র যা পেয়েছি-"

সে কথা শেষ করার আগেই বাজারের অন্য দিক থেকে শিঙ্গার শব্দ ভেসে এলো। প্রায় সবাই একসাথে ফিরে তাকাল যেদিক থেকে আওয়াজ ভেসে এসেছে সেদিকে, নিশ্চই ভয়ঙ্কর কিছু ঘটছে ওদিকে।

***

রাজা বিক্রমাদিত্যকে ঘোড়ার গাড়ির ভেতর থেকে বাইরে ফেলে দেয়ার পর বলতে গেলে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হলো মঞ্চের দিকে। সেইসাথে বাকি বৌদ্ধ শ্রমণদেরকেও। তিন শ্রমণ আর বিক্রমাদিত্যকে টেনে-হিঁচড়ে মঞ্চের ওপরে তুলে জোর করে বসিয়ে দেয়া হলো হাঁটু গেড়ে।

একটু পরেই দুই পাশে সৈন্যদের সারি নিয়ে মঞ্চের ওপরের দিকে উঠতে শুরু করলো লিচ্ছবীদের রাজা হেমচন্দ্র।

একটানে কালন্তির হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিলো শামান। "সময় নেই, আমি কী বলি মনোযোগ দিয়ে শোন," বলে সে কালন্তির কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে কথা বলতে শুরু করলো। বলা শেষ হতেই কালন্তি রীতিমতো ঝামটে উঠলো। "শামান, তুমি যা করতে যাচ্ছে সেটা বোকামি হবে, বিধু-ঘোষিত অস্ত্র নিয়ে না পৌছালে..."

"ওরা অস্ত্র নিয়ে পৌছাতে-পৌছাতে সব শেষ হয়ে যাবে," বলেই সে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে নিজের লোকদেরকে সাবধান হতে বলে ফলের ঝুড়ির একপাশ থেকে টান দিয়ে তুলে নিলো একটা দড়ির বান্ডিল। সেটাকে নিজের কোমরের সাথে আটকে নিয়ে দ্রুত রওনা দিলো মঞ্চের দিকে। শরীর বাঁকিয়ে লোকজনের ভিড় ঠেলে প্রায় পৌছে গেল মঞ্চের কাছাকাছি। ওর উদ্দেশ্য মঞ্চের কাছাকাছি পৌছে মঞ্চের নিচে ঢুকে যাবে। মঞ্চের একবারে গোড়ার দিকে পৌছে গেছে এমন সময় কানে এলো মঞ্চের ওপর থেকে রাজা হেমচন্দ্র জনতার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে কিছু একটা বলতে শুরু করেছে, "সম..." শামান মঞ্চের প্রায় কাছে পৌছে গেছে হঠাৎ রাজার গলা ছাপিয়ে বেজে উঠলো একটা শিঙ্গার আওয়াজ।

রাজাও তার কথা থামিয়ে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে, শামানও থেমে গেছে মঞ্চের কাছে। আবারো জোরে বেজে উঠলো শিঙ্গা। শামান বুঝতে পারছে না শব্দটা আসছে কোথা থেকে, এটা বাজানোই বা হচ্ছে কী কারণে। আনমনেই ওর হাত চলে গেল নিজের পিঠের কাছে। অস্ত্র যে নেই সেটা মনেই নেই ওর। মনের ভেতরে বিপদ সংকেত বেজে উঠেছে, হঠাৎই মঞ্চের নিচ থেকে বেরিয়ে এলো বেশ কয়েকজন সৈন্য, ওদের সাথে

রাজার পাহারদারদের কয়েকজন যোগ দিয়ে ঘিরে ধরলো শামানকে। আচমকা একেবারেই হঠাৎ নিজেকে ও আবিষ্কার করলো একদল সৈন্যের মাঝখানে।

একজন এগিয়ে এসে ওকে ধরার চেষ্টা করতেই তাকে ঘুসি মেরে ফেলে দিলো শামান। দ্বিতীয় একজনকে ফেলে দিলো লাথি মেরে, তৃতীয় একজন খোলা তলোয়ার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লো ওর ওপরে, তলোয়ারের কোপ এড়িয়ে লোকটাকে ধরতে যাবে তার আগেই পেছন থেকে চারজনে মিলে ধরে ফেললো ওকে। একজন এগিয়ে এসে খপ করে ওর মাথার ওপরে বেঁধে রাখা কাপড়টা টান দিয়ে সরিয়ে দিতেই খোলা লাল চুল ছড়িয়ে পড়লো।

"লাল চুলের যোদ্ধা ধরা পড়েছে," একজন মঞ্চের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠলো। তাৎক্ষণিক শামানের কাছে মনে হলো পুরো ব্যাপারটাই একটা সাজানো ফাঁদ ছিল তাহলে। লোকটা মঞ্চের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠেই হাত বাড়ালো শামানকে ধরার জন্যে।

বাতাসে শিস কাটার মতো শব্দের সাথে তার হাতটা আটকা পড়ে গেল একটা চামড়ার ফালির সাথে। ফালিটা ধরে শক্ত টান পড়তেই উল্টে পড়ে গেল লোকটা। শামান দেখলো চাবুক ছুঁড়েছে কালন্তি।

সাথে সাথে সক্রিয় হয়ে উঠলো শামান। ওকে ধরে থাকা একজনের হাঁটুর ওপরে লাথি মারতেই একটু আলগা হয়ে গেল, টান দিয়ে নিজের একটা হাত ছুটিয়ে ফেললো ও। খোলা হাত দিয়ে ঘুসি বসিয়ে দিলো অন্য হাত ধরে থাকা লোকটাকে। ঘুসি খেয়ে দূর্বল হয়ে গেলেও সে ছাড়লো না ওকে। বরং আরো কয়েকজন মিলে ধরে ফেললো ওকে। লোকগুলো এখনো তলোয়ার চালায়নি, সম্ভবত ওকে জীবিত ধরার নির্দেশ আছে ওদের ওপরে।

শামানকে বন্দি করেই ওকে সবাই মিলে চাপ দিয়ে মাটিতে বসিয়ে দিলো। একজন দড়ি হাতে এগিয়ে এলো ওকে বেঁধে ফেলার জন্যে।

খট করে একটা শব্দ হলো অনেকটা কাঠের সাথে কাঠের বাড়ি লাগার মতো। শামান দেখলো দড়ি হাতে লোকটার খুলিতে একটা তীর এসে বিঁধেছে, ধাম করে সটান মাটিতে পড়ে গেল লোকটা। শামানকে ধরে থাকা আরো একজন উল্টে পড়লো তীর খেয়ে। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো শামান। ও নিজে যেমন চমকে গেছে, তেমনি ওকে বন্দি করে রাখা সৈন্যরাও চমকে গেছে।

ঘোড়ার খুরের শব্দের সাথে-সাথে দেখলো চার-পাঁচটা ঘোড়া এগিয়ে আসছে, সবার অগ্রভাগে একটা ঘোড়ার ওপরে তীর-ধনুক হাতে ঘোড়া চালকের পেছনে বসে আছে বিধু। খুশির সাথে সামনের একজনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো ও। আরেকটু এগিয়ে আসতেই, "ওস্তাদ," বলে এক চিৎকার করে একটা তলোয়ার ওর দিকে ছুঁড়ে দিলো বিধু। তলোয়ারটা ছুটে এসে মাটিতে ওর সামনে গেঁথে গেল। ওটাকে তুলে নিয়ে পাগলের মতো

কয়েকবার চক্কর কাটালো ও চারপাশে। আশেপাশের সবাই খানিকটা দূরে সরে গেছে দেখা মাত্রই কালন্তির দিকে তাকিয়ে একটা চিৎকার করে মঞ্চের দিকে দৌড় দিলো ও।

একাধিক সৈন্যকে মেরে-কেটে লাফিয়ে উঠে এলো ও মঞ্চের ওপরে। লিচ্ছবী সৈন্যরা একেবারেই বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে, এ-কারণে সংখ্যায় অনেক বেশি থাকার পরও তারা সুবিধে করে উঠতে পারছে না।

সৈন্যদের একটা অংশের সাথে বিধু-ঘোষিত-জাথুরিয়াদের সাথে খন্ড যুদ্ধ চলছে, অন্য অংশের একটা ভাগ রাজা হেমচন্দ্রকে নিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে গেছে কিন্তু তাকে নিয়ে তারা নেমেছে মঞ্চের উল্টোদিকে ফলে জাথুরিয়াদের সাথে খন্ড যুদ্ধের কারণে রাজাকে নিয়ে তারা ঘোড়ার গাড়ির কাছে পৌছাতে পারছে না, অন্যদিকে সৈন্যদের বাকি একটা অংশ ঘোড়ার গাড়িতে বসে আছে, মঞ্চের এ-পাশে কী হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না ওরা। হেমচন্দ্রের বাহিনীর শেষ অংশটা মঞ্চের ওপর থেকে বুদ্ধ শ্রমণ আর রাজা বিক্রমাদিত্যকে টেনে নামাতে ব্যস্ত।

শামান লাফিয়ে মঞ্চের ওপরে উঠে একবার চারপাশে চোখ বুলিয়ে পুরো পরিস্থিতি ঝালিয়ে নিলো। হেমচন্দ্রের সৈন্যদের ভেতরে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা লেগে গেছে। কে কাকে মারছে, আর কাকে মারবে- কাকে ধরবে আর কাকে রক্ষা করবে কিছ্ ুবুঝতে পারছে না ওরা। শামান অনুমান করলো লিচ্ছবীদের একাধিক বাহিনীকে একসাথে করার ফলেই এমনটা ঘটছে। ওদের ভেতরে একে অপরের ভেতরে সমন্বয় তো নেই তার ওপরে ওরা ভেবেছিল নিরস্ত্র কিছু বুদ্ধ শ্রমণ আর তাদের সম্ভাব্য যোদ্ধাদেরকে কোণঠাসা করে হত্যা করবে। কিন্তু পাশার দান পাল্টে যেতেই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে তারা। এই সুযোগটা পুরোপুরি কজে লাগাতে হবে, যদি ওরা এখান থেকে বেরুতে চায়।

শামান মঞ্চে উঠেই প্রথমে মঞ্চের ওপরে অবস্থানরত তিন সৈনিককে ঘায়েল করলো। তারপর প্রথমে বিধু জাথুরিয়াদেরকে নির্দেশ দিলো হেমচন্দ্রের সৈন্যদেরকে কব্জা করে রাখার। তারপর চিৎকার করে কালন্তিকে বললো প্রবেশদ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা তিনটে ঘোড়ার গাড়ির একটা নিয়ে আসার জন্যে।

নির্দেশনা দিয়ে সে চলে এলো মঞ্চের মাঝামাঝি মস্তক ছিন্ন করণের জন্যে বানানোর তিন বেদীর দুটোতে দড়ি বেঁধে দিলো আগের পরিকল্পনা অনুযায়ী। কাজ সেরেই সে রওনা দিলো মঞ্চের ডান দিকে। ওখানে ছয়-সাতজন সৈন্য তিন বুদ্ধ শ্রমণ আর রাজা বিক্রমকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ঘোড়ার গাড়ির দিকে। এক হাতে তলোয়ার তো ছিলই যাবার পথে মাটি থেকে একটা বর্শা তুলে নিলো। একহাতে বর্শা আর অন্য হাতে তলোয়ার নিয়ে মৃত্যুদূতের মতো সৈনিকদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো ও।

প্রথমেই এক বুদ্ধ শ্রমণকে ধরে থাকা সৈনিকের গলায় সেধিয়ে দিলো বর্শাটা। ওটা খুলে নেয়ার আগেই আরেকজনকে কোপ মারলো তলোয়ার দিয়ে। একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে মুক্ত করতেই দ্বিতীয়জনকে ধরে থাকা সৈনিক দুজন ঝাঁপিয়ে পড়লো ওর ওপরে। দুজনকেই

সামলানো অতোটা কঠিন হত না কিন্তু দুই সৈন্য আর ওর মাঝখানে পড়ে গেছে এক বুদ্ধ শ্রমণ। এক হাতে তাকে সামলে অন্য হাতে দুজনকে সামলাতে গিয়ে রীতিমতো হিমশিম খেয়ে উঠলো শামান। ওকে আঘাত করতে এগোতেই এক সৈন্যের তলোয়ার খালি হাতে ধরে ফেললো বুদ্ধ শ্রমণ। সৈন্যটা রেগে গিয়ে তলোয়ারটা সোজা সেঁধিয়ে দিলো শ্রমণের বুকে।

রাগে অন্ধ হয়ে এক কোপে সৈনিকের হাতটা ছিন্ন করে দিলো শামান। দ্বিতীয় জনের মাথা নামিয়ে দিলো সে সতর্ক হবার আগেই। আড়চোখে দেখলো তৃতীয় শ্রমণ আর রাজা বিক্রমকে টেনে ঘোড়ার গাড়ির পেছনে তুলছে দুই সৈনিক মিলে। হাতের বর্শাটা মাটিতে পড়ে গেছিল ওটা তুলে নিয়ে সোজা ছুঁড়ে দিলো একজনের বুকে। অপরজন ওকে এগোতে দেখে রাজা আর শ্রমণকে ছেড়ে দিয়ে জোরে দৌড় দিলো উল্টো দিকে।

তৃতীয় ভিক্ষু আর রাজা বিক্রমের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠলো ও। "রাজা বিক্রম, আমার সাথে আসুন," বলেই দুই শ্রমণ আর রাজাকে আগলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর আগেই দেখতে পেল পালিয়ে যাওয়া সৈনিকটা গাছের গুড়ি দিয়ে বানানো প্রবেশদ্বারের কাছে অবস্থানরত সৈনিকদেরকে ডেকে নিয়ে আসছে। "জলদি, জলদি," ওদেরকে নিয়ে মঞ্চের অন্যদিকে রওনা দিবে, তার আগেই কালন্তির ডাক শুনে থেমে গেল ও। দেখলো একটা ঘোড়ার গাড়ি এগিয়ে আসছে। ওটার অগ্রভাগে বসে আছে কালন্তি।

শামান মনে-মনে হিসেব করে দেখলে ঘোড়ার গাড়ি আর প্রবেশদ্বারের কাছে অবস্থার করা সৈনিকেরা প্রায় একই সময়ে পৌছে যাবে এখানে। সেক্ষেত্রে ওদেরকে গাড়ির দিকে এগোতে হবে। মঞ্চের ওপর থেকে সেই দড়ির এক মাথা হাতে তুলে নিয়ে বাকিদেরকেসহ ও যতোটা জোরে পারা যায় দৌড়াতে লাগলো গাড়ির দিকে। সৈনিকদের তীরের আঘাতে পড়ে গেল আরেকজন শ্রমণ। জীবিত একমাত্র বুদ্ধ শ্রমণ আর রাজা বিক্রমকে নিয়ে প্রাণপনে দৌড়াতে লাগলো শামান। বাঁচতে হলে যেভাবেই হোক কালন্তির গাড়ির কাছে পৌছাতে হবে।

কালন্তি গাড়িটাকে নিয়ে এসে এক চক্কর খেয়ে ওটা থেমে গেল ওদের সামনে, প্রথমে রাজা বিক্রমকে তুলে দিলো ও গাড়ির ভেতরে। বুদ্ধ শ্রমণকে উঠানোর জন্যে তুলে ধরতেই একটা তীর এসে তার কামানো খুলিতে সেঁধিয়ে গেল। শ্রমণের আলগা হয়ে যাওয়া শরীরটা নিয়ে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল ও। রাজা বিক্রম একটা হাত বাড়িয়ে টেনে তুললো ওকে। প্রায় সাথে সাথেই রাজার কাঁধের একপাশে এসে বিঁধলো একটা তীর। চিৎকার করে রাজার ঢলে পড়া দেহটা কোনমতো তুলে গাড়ির ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো ও।

কালন্তিকে চিৎকার করে গাড়ি ছাড়তে বললো।

"তুমি?" কালন্তি ঘোড়ার গায়ে চাবুক হাঁকাতে-হাঁকাতে জানতে চাইলো। শামান দেখলো সৈন্যরা প্রায় পৌছে গেছে, কালন্তি গাড়ি ছাড়লেও ওরা নিরাপদে পার হতে পারবে না।

ওর চারপাশে এখানে ওখানে এসে লাগছে তীর। যেকোন সময় একটা এসে বিদ্ধ করতে পারে ওকে, জলদি বেদির সাথে আটকানো দড়ির আলগা শেষ প্রান্তটা বেঁধে দিলো ও গাড়ির পেছনে, তারপর চিৎকার করে বলে উঠলো। "তুমি যাও, যতো জোরে পারবে গাড়ি ছোটাবে বুঝেছো?" কালন্তি কিছু না বলে সর্বশক্তি দিয়ে চাবুক হাঁকালো।

আর শামান দৌড় দিলো মঞ্চের দিকে।

কালন্তির গাড়ি ছুটে চলেছে গেটের দিকে, সৈন্যরা ছুটে আসছে শামানের দিকে, শামান মঞ্চের ওপর দিয়ে দৌড় দিলো যতোটা জোরে পারে। কালন্তির গাড়ি বেশ অনেকটা এগোতেই এক পর্যায়ে টান পড়লো দড়িতে। শামানও থেমে গেল।

মুহূর্তের জন্যে মনে হলো দড়িটা ছিঁড়ে যাবে কিংবা গাড়িটারই শেষ প্রান্ত ভেঙে পড়বে কিন্তু মুহূর্তখানেক আটকে থেকে মড়-মড় করে উঠলো পুরো মঞ্চ। শামান থেমে গেছিল, মঞ্চ মড়-মড় করে উঠতেই আবারো দৌড় লাগালো ও।

কালন্তির গাড়ি গেটের বাইরের দিকে রওনা দিলো, আর গাড়ির পেছনে আটকানো দড়িটা বাঁধা ছিল মঞ্চের দুই বেদীর সাথে, গাড়িটা মঞ্চের একটা অংশ ভেঙে দিয়ে টেনে নিয়ে চললো ওটার সাথে। প্রবেশদ্বারের কাছ থেকে আসা সৈন্যরা থেমে গেছে, থেমে গেছে বিধুরাও, সবাই তাকিয়ে আছে মঞ্চের দিকে। আর শামান দৌড়ে চলেছে ভেঙে পড়তে থাকা মঞ্চের ওপর দিয়ে।

কালন্তির গাড়ি মঞ্চটার একটা অংশ ভেঙে দিয়ে বেরিয়ে গেলে গেট দিয়ে। শামান লাফিয়ে নেমে এলো মঞ্চের অন্যদিকে। বিস্ফোরণের মতো টুকরো হয়ে ওর পেছনে ভেঙে পড়লো পুরো মঞ্চটা।

ওটার এক দিকে আটকা পড়েছে প্রবেশদ্বারের দিক থেকে আসা সৈন্যরা, অন্যদিকে আটকা পড়েছে রাজা হেমচন্দ্রের বাহিনী। শামান মাটিতে নেমে হাঁপাতে লাগলো। একাধিক ঘোড়া এসে থামলো ওর পাশে। একটা হাত টেনে তুললো ওকে ঘোড়ার ওপরে। বিধু-ঘোষিত জাথুরিয়া আর অন্যদের সাথে বাজারের নিচু দেয়াল টপকে জঙ্গলে ঢুকে পড়লো ওদের ঘোড়ার বাহিনী।

শামান বিধুর পেছনে বসে আছে, ক্লান্তির চোটে মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে পড়বে। জঙ্গলের পথে চলতে-চলতে শামানের মনে একটাই ভাবনা জেগে রইলো, কালন্তি রাজা বিক্রমকে নিয়ে থারুদের বসতিতে পৌছাতে পেরেছে কিনা। যদি না পারে তবে এতো কষ্টের সবই বৃথা যাবে।

ওদের ঘোড়ার দল জঙ্গলের পথে প্রবেশ করে দুই ভাগ হয়ে গেল। ভিন্ন-ভিন্ন পথে এগোবে ওরা। আরো ঘন্টাখানেকের মতো চলার পর কোনরকম ঝামলো ছাড়াই ওরা নির্দিষ্ট বসতিতে এসে পৌছালো। সেই কাঠের সেতু পার হয়ে সোজা চলে এলো রাজা

মানরু আর শাক্যদের বসতির ওখানে। বাইরেই কালন্তিকে দেখতে পেয়ে স্বস্তির একটা পরশ বয়ে গেল শামানের শরীরে।

ওকে দেখে প্রায় দৌড়ে এগিয়ে এলো কালন্তি। তার কপালের কাছটায় একটা ক্ষত থেকে রক্ত বেরিয়ে জমাট বেঁধে আছে। ওকে দেখেই শামান বলে উঠলো, "তুমি ঠিক আছো?" কালন্তি মাথা নেড়ে উত্তর দিয়ে প্রায় একই প্রশ্ন করলো ওকে।

জবাব না দিয়ে ও জানতে চাইলো, "রাজা বিক্রম?"

"ভেতরে আছে," বলে ও রাজা মানরুর বাড়ির ভেতরের দিকে দেখালো। শামান কিছু না বলে সোজা চলে এলো বাড়ির ভেতরে। বসার কক্ষের পাশেই একটা বিছানায় শুইয়ে রাখা হয়েছে রাজা বিক্রমকে। তার শিয়রের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে রাজা মানরু আর শাক্য প্রধান শঙ্করাদিত্য। "উনি সুস্থ আছেন?" বলে শামান দেখলো ওর হাতের এক জায়গা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। আহত হয়েছে উত্তেজনার চোটে সেটা বুঝতেই পারেনি ও।

"দাদা আহত, তবে মারা যাবে না," শঙ্করাদিত্য বলে উঠলো। "শঙ্কা কেটে গেছে"

স্বস্তির একটা পরশ বয়ে গেল শামানের শরীরে। "উনি কি কিছু বলেছেন?" শামান প্রশ্নটা শেষ করার আগেই হঠাৎ রাজা বিক্রম শোয়া থেকেই বিড়-বিড় করে উঠলো।

শামান আর শঙ্করাদিত্য এগিয়ে গেল তার শিয়রের দিকে। যে-দুজন বিক্রমাদিত্যের পরিচর্যা করছিল তারা একটু দূরে সরে গেল। রাজা বিক্রম আবারো বিড়-বিড় করে কথা বলে উঠলো।

"কি বলছেন উনি?" শামান জানতে চাইলো।

শঙ্করাদিত্য জবাব দেয়ার আগেই পেছন থেকে রাজা মানরু কথা বলে উঠলো। শামান পেছন ফিরে দেখলো রাজা মানরুর কালো চেহারা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। "কি বললেন উনি?" শামান জানতে চাইলো।

"অবতার, বুদ্ধের অন্ধকার অবতার নামিয়ে আনা হচ্ছে পৃথিবীতে," একেবারে পাংশু মুখে জবাব দিলো রাজা মানরু।

দ্বিতীয় অংশ:

অন্ধকারের অবতার

অধ্যায় তেত্রিশ

বর্তমান সময়

নির্মাণাধীন ল্যাব, শাহী ঈদগাহ, সিলেট

"বুদ্ধের অন্ধকার অবতার, ওরফে ব্ল্যাক বুদ্ধা," টমি পোদ্দার তার সামনে রাখা প্রজেক্টরে ওপেন করা ছবির দিকে তাকিয়ে শিক্ষকদের মতো ঢঙে বলে উঠলো। "ইউরোপ-আমেরিকাতে যেমন হলি গ্রেইল, মধ্যপ্রাচ্যে আর্ক অব কভেনান্ট, তেমনি এশিয়াতে..."

"এই ছবিটা কি সেই-" তানভীর কথা শেষ করার আগেই ওর মোবাইল বাজতে লাগলো। মোবাইলের দিকে তাকিয়ে দেখলো ওর মা কল করেছে। "সরি, এক মিনিট-" বলে ও উঠে এলো টেবিল থেকে। "হ্যালো, মা... হ্যাঁ নাস্তা খেয়েছি, তোমার কি অবস্থা? হাঁটতে বের হয়েছিলে গতকাল?... ও আচ্ছা... গিয়েছিলে সুমন ভাইয়ের দোকানে?... হুমম... বুঝতে পেরেছি, তুমি ঔষুধ খেয়ো ঠিকমতো, আর বাসার পাশের ফার্মেসিতে গিয়ে প্রেশার-ডায়বেটিজটা মাপিয়ে এসো। আমি একটা মিটিঙে আছি, এখন রাখি," বলে ও কলটা কেটে ফিরো এলো।

"সরি," বলে ক্ষমাপ্রার্থনাসুলভ হাসি দিয়ে টমিকে বললো আবার শুরু করতে।

"হুম্," লেকচার দেয়ার সুযোগ পেয়ে টমির ভাব এখন তুঙ্গে। আগের দিনের গুরুজিরা যেভাবে হাতের বেত দিয়ে বোর্ডের দিকে তাকিয়ে পড়া বোঝাতো অনেকটা সেভাবেই হাতের লেজার পয়েন্টারটা নেড়ে-নেড়ে কথা বলার চেষ্টা করছে সে। টমির ভাব দেখে সুলতানের দিকে তাকিয়ে একটা হাসি দিলো তানভীর।

বাম পাশের কানের লতিতে সাদা রঙের ছোট একটা ব্যান্ডেজ লাগানো সুলতানের। গতকালের অভিযানের ফল। ডক্টর মিতায়নকে লাক্কাতুরার সেই বাংলো থেকে উদ্ধার করার পর একদিন পার হয়েছে। এর মধ্যে বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। ডক্টর মিতায়নকে বাংলো থেকে উদ্ধার করার পর লায়লাসহ তাকে সোজা পাঠিয়ে দেয়া হয় সিলেট ওসমানি মেডিকেল হাসপাতালে।

তানভীরসহ বাকিরা প্রাথমিক চিকিৎসা নেয়ার পর পুলিশ আর ফরেনসিক টিম বাংলোতে পৌছালে তাদের নিয়ে কাজ শুরু করে ওরা। বাংলো থেকে বেশ কিছু ডক্যুমেন্টসহ চারটা লাশ আর একজনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। সমস্ত কাজ শেষ করে টমি-সুলতান আর ইকবালকে কিছু নির্দেশনা দিয়ে নির্মাণাধীন ল্যাবে ওর কোয়ার্টারে ফিরে আসে তানভীর। ক্লান্তিতে প্রায় ভেঙে পড়া শরীরে ঘুমিয়ে যায় একটু পরেই।

সকালবেলা ওর ঘুম ভাঙে ইএএফ'র প্রধান বাবুল আহমেদের কল পেয়ে। বেশ প্রশংসা করে সে তানভীরের, একদিনের ভেতরেই ডক্টর মিতায়নকে উদ্ধার করতে পারার কারণে

সে বেশ খুশি। সেইসাথে এও জানায় ও চাইলে কেসটা এখন ইএএফের হাতে তুলে দিতে পারে। তানভীর নির্দিষ্ট জবাব না দিয়ে জানায় ওর বস পাশা স্যারের অনুমতি না নিয়ে সে কিছুই বলতে পারবে না।

বাবুল আহমেদের সাথে কথা শেষ করেই ও কল দেয় পাশা স্যারকে। পাশা স্যার ওর কল পেয়ে প্রথমেই ওকে এক দফা ঝাড়ি দেয় গতকাল প্রপার চ্যানেলের মাধ্যমে যোগাযোগ না করার কারণে। এরপর সে প্রশংসার সাথে ওকে জানায়, বেশ ভালো কাজ দেখিয়েছে ও। এরপর তানভীর তাকে জানায় আর কি-কি ঘটেছে, 'ব্ল্যাক বুদ্ধা' শব্দটা শোনামাত্রই উনি তানভীরকে একটু পরে কল করবেন বলে কল কেটে দেন।

তানভীর বেশ অবাক হয়ে ফোন রেখে ফ্রেশ হয়ে নেয়।

রেডি হচ্ছে এমন সময় পাশা স্যার কল করে ওকে পুরো ব্যাপারটা খোলা চোখে যা দেখাচ্ছে ব্যাপারটা এরকম নাও হতে পারে। তাই তানভীর যেন কেসটা ছেড়ে না দিয়ে বরং এর পরবর্তী বিষয়গুলো আপডেট করে। কারণ এই ব্যাপারটার সাথে আরো ভিন্ন কিছু জড়িত থাকার সম্ভাবনা আছে। উনি টমিকে কিছু ফাইল পাঠিয়েছেন বলে ওকে ফোন রাখতে বলে নির্দেশ দেন উনাকে নির্দিষ্ট সময় পর-পর কাজের অগ্রগতি জানাতে। পাশা স্যারের সাথে কথা শেষ করে তানভীর টমিকে কল করে সুলতান আর ইকবালকে নিয়ে ইমিডিয়েটলি ল্যাবে আসতে বলে। সাথে এও জানায় সুলতান যেন ল্যাবে এসে সবাইকে নিয়ে একটা মিটিং ডাকে।

যথাযথ নির্দেশনা দিয়ে ডক্টর মিতায়নের খবর নেয় ও। গতকাল রাতে শেষবার খবর নিয়ে জানতে পেরেছিল তার কোন গুরুতর ক্ষতি হয়নি, সামান্য আহত হয়েছে। তাকে কোন ধরণের ড্রাগ পুশ করা হয়েছিল- তবে সেটা বেশি ক্ষতিকর কিছু না। এখন সিডেটিভ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। গতকাল রাতেই নিরাপত্তাজনিত কারণে ইএএফের অধীনে ওসমানী মেডিকেল থেকে সম্মিলিত পুলিশ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে তাকে। ডক্টরের খবর নিয়েই মাকে কল করে ও, কিন্তু মা ওর কল রিসিভ করেনি।

নাস্তা সেরে নিতে-নিতেই বাকিরা চলে আসার পর পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে ল্যাবের সেই মিটিং রুমে মিটিঙে বসেছে ওরা। মিটিঙের শুরুতেই ডক্টর মিতায়নের মুখে শোনা আর বাংলোতে পাওয়া অসংখ্য ডক্যুমেন্টে উল্লেখ ব্ল্যাক বুদ্ধার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে। গতদিন ডক্টর মিতায়নের মুখে কথাটা শুনে প্রথমে চমকে উঠেছিল ওরা।

ব্যাপার কি? ডক্টর জ্ঞান হারাবার আগে এটা কী বললো। পরে বাংলোতে পাওয়া ডক্যুমেন্টে ব্যাপারটার উল্লেখ পায় ওরা। সেগুলো থেকে প্রাথমিকভাবে এটা ধারণা করে নেয় যে ডক্টর মিতায়নরা আসামে যে-অভিযান চালাচ্ছিলো সেটার ভেতরে গোলমাল ছিল।

"যা বলছিলাম, ব্ল্যাক বুদ্ধা হলো আসলে একটা মুর্তি, অবশ্যই একটা বুদ্ধ মুর্তি," টমি আগের মতোই ভাব নিয়ে বলে চলেছে। তার পরনে কালো রঙের মেগাডেথের টি-শার্ট,

সেটা ঠেলে বেরিয়ে আছে গোলচে ভুড়ি। "ইউরোপ আমেরিকাতে যেমন হলি গ্রেইল, আর্ক অব কভেনান্ট, আটলান্টিস ইত্যাদি ইত্যাদি আরাধ্য সব অমিমাংসিত রহস্য রয়েছে ঠিক তেমনি এশিয়ান সাবকন্টিনেন্টের সবচেয়ে আরাধ্য এবং রহস্যময় একটি আর্টিফ্যাক্টগুলোর একটি হলো এই ব্ল্যাক বুদ্ধা।"

"এটাই কি সেই মুর্তির ছবি নাকি?" সুলতান প্রজেক্টরে ফুটে থাকা মুর্তির ছবিটার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো। "ব্ল্যাক বুদ্ধা?"

বড়দের আড্ডার আসরে বাচ্চারা হঠাৎ গুরুগম্ভীর কথা বললে মুরুব্বিরা যেভাবে তাকায় অনেকটা সেভাবেই টমি ফিরে তাকাল সুলতানের দিকে। "জি না, ম্যাডাম। এইটা সেই মুর্তির ছবি হলে তো ভালোই ছিল, এটা একটা কাল্পনিক ছবি," বলে সে অন্যদের দিকে ফিরে তাকাল। "ব্ল্যাক বুদ্ধা আসলে শুধু একটা মুর্তি না, তারচেয়ে অনেক বেশি কিছু। গতকাল রাতে তানভীর স্যারের সাথে কথা হবার পর পাশা স্যার ইন্টারপোলের সাথে যোগাযোগ করে ব্ল্যাক বুদ্ধা সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য জোগাড় করেছেন। কাল প্রায় সারারাত ধরে সেগুলো ঘেঁটে আমি যা বুঝেছি তারই সার-সংক্ষেপ আপনাদের সামনে এই স্লাইডে প্রেজেন্ট করছি।"

"তা তো বুঝলাম," তানভীর বলে উঠলো। "কিন্তু তুমিই বলছো ব্ল্যাক বুদ্ধা একটা মুর্তি, আবার তুমিই বলছো ব্ল্যাক বুদ্ধা আসলে একটা মুর্তি না, তারচেয়ে অনেক বেশি কিছু। এ-কেমন কথা?"

"এখানে পুরো ব্যাপারটাতে বেশ কিছু ঝামেলা আছে। এই গোলমালটা বুঝতে হলে আপনাদের সবাইকে ব্ল্যাক বুদ্ধার ইতিহাস জানতে হবে, মানে বুঝতে হবে ব্ল্যাক বুদ্ধার মূল পারসপেকটিভ। ব্ল্যাক বুদ্ধা হলো এমন এক মুর্তি যেটা নিয়ে সেই পুরনো সময় থেকে শুরু করে বর্তমানে এমনকি, মডার্ণ পপ কালচারেও এর ব্যবহারের শেষ নেই। এর পেছনে মূল কারণ হলো ব্ল্যাক বুদ্ধা নিয়ে হাজার বছর ধরে চলে আসা নানা মিথ। পাশা স্যারের পাঠানো ফাইলগুলো ঘেঁটে আমি এটা বুঝতে পারলাম যে," বলেই সে বিরাট আকারের একটা হাই ছাড়লো। "রাতভর গবেষণার ফসল," বলেই হেসে উঠলো। তার সাথে সাথে হেসে উঠলো বাকিরাও।

"এইসব রহস্যের ক্ষেত্রে সাধারণত যা হয়, ব্ল্যাক বুদ্ধার ক্ষেত্রে ঠিক তেমনটাই ঘটেছে। এইসব রহস্যের একটা মূল বীজ রোপিত থাকে ইতিহাসের কোন এক অধ্যায়ে, যেটা সঠিকভাবে কেউই বলতে পারে না। তারপর সেই বীজ থেকে ধীরে-ধীরে লোকমুখে ছড়িয়ে পড়া গুজবের মাধ্যমে নির্মিত হতে থাকে মহীরূহ। যে মহীরূহের কিছুটা অংশ সত্য আর বেশিরভাগই মানুষের লাগাম ছাড়া কল্পনার বহিঃপ্রকাশ। এসব গাল-গল্পের বেশিরভাগই হারিয়ে যায় ইতিহাসের আড়ালে। আর যেগুলো টিকে থাকে সেগুলো দিনে-দিনে আকারে শুধু বৃদ্ধিই পেতে থাকে। এগুলোকেই আমরা মিথ বা লেজেন্ড বলি। এসব মিথ সত্য-মিথ্যে মিলিয়ে লোকের মুখ থেকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে অ্যাকাডেমিকদের

কাগজের পাতায়, মিডিয়াতে, রহস্য উপন্যাসে। আর যে-রহস্য গভীর- যতো পুরনো- যতো বিখ্যাত সেই রহস্যের সাথে জড়িত আর্টিফ্যাক্টের দাম বাড়তে থাকে হু-হু করে-"

"এই যে ভাই, লেকচার বন্ধ করেন," এবার সুলতান একটু রাগের সাথে বলে উঠলো। "এসব আমরা জানি, ব্ল্যাক বুদ্ধার কথা বলেন, এইটা আসলে কি? খায় না মাথায় দেয়?"

টমি আবারো সুলতানের দিকে তাকিয়ে মুরুব্বিসুলভ একটা হাসি দিলো। অন্যান্য সময় সবাই তাকে নিয়ে মজা নেয়, এখন সবাইকে কৌতুহলের মধ্যে রাখতে পেরে সে বেশ মজা পাচ্ছে। "ধীরে ম্যাডাম, আমরা হাজার বছরের পুরনো রহস্যের জট খুলতে যাচ্ছি। সময় তো একটু লাগবেই। যাই হোক, রহস্য যতো বড়ই হোক এর বীজ তো একটা থাকেই। ব্ল্যাক বুদ্ধাও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে ব্ল্যাক বুদ্ধার কিছু বিষয় একেবারেই আলাদা। এর ব্যাপারে কিছুটা তথ্য একমাত্র অ্যাকাডেমিকরা ছাড়া কেউই দিতে পারেনি। এমনকি অ্যাকাডেমিকরাও এই ব্যাপারে এসে কেন জানি বার-বার খেই হারিয়ে ফেলেছে। সাদা চোখে যেটুকু প্রচলিত আছে তাতে আন্দাজ করা যায় এই রহস্যের বীজ রোপিত হয়েছিল আজ থেকে দুই হাজার বছরেরও বেশি আগে। আমাদের এই উপমহাদেশে বৌদ্ধ কমিউনিটির বসতিগুলো খেয়াল করে দেখেন," বলে সে দক্ষিণ এশিয়ার একটা ম্যাপ প্রদর্শন করলো পরের স্লাইডে।

"বেশিরভাগ বৌদ্ধ কমিউনিটির বসবাসের জায়গাগুলো কেমন যেন ছড়ানো-ছড়ানো," বলে সে তার লেজারে চাপ দিতেই ম্যাপের বেশকিছু জায়গা লাল হয়ে উঠলো। "দেখেন ভারতবর্ষের মাঝখানের অঞ্চলগুলোতে বৌদ্ধ কমিউনিটির বড় বসবাসের ক্ষেত্রগুলো তুলনামূলক কম, তারচেয়ে উত্তর আর দক্ষিণে বসবাসের মাত্রা অনেক বেশি। উত্তরে লাদাখ, সিকিম, তিব্বত, ভুটান, আবার দক্ষিণে শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড ইত্যাদি। এমনকি বাংলাদেশেও দেখেন," আরেকটা স্লাইড চাপতেই এবার বংলাদেশের ম্যাপ ফুটে উঠলো। সেখানেও দেখা গেল বড় বড় বৌদ্ধ মন্দির আর কমিউনিটিগুলো বেশিরভাগই দক্ষিণে। "দেশের মাঝামাঝি কম, বেশিরভাগই দক্ষিণে। অথচ মৌর্য শাসন আমলে বৌদ্ধরাই ছিল ভারতবর্ষের মূল শাসনের কেন্দ্রে। তাহলে তারা উত্তর আর দক্ষিণে এতোটা ছড়িয়ে পড়লো কিভাবে, কেউ বলতে পারবেন?"

"আমি যতোটুকু জানি ওদের ধর্মের বিকাশ ঘটেছিল বেশিরভাগই ওসব অঞ্চলে," স্প্যানিশ অভিনেতার মতো দেখতে ডক্টর প্রবীর বলে উঠলো।

"ভুল, কারণ আগেই বলেছি মৌর্য শাসন আমলে ভারতে বৌদ্ধ শাসনই মূখ্য ছিল। এই ছড়িয়ে পড়ার পেছনে একটা মূল কারণ হলো, যখন শুঙ্গদের হাতে মৌর্য শাসনের পতন হয় তখন শেষ মৌর্য রাজা বৃহদ্রথ তার ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুশ্যমিত্রের হাতে খুন হয়েছিল। তাকে খুন করেই পুশ্যমিত্র ক্ষমতা দখল করে মৌর্য শাসন বিলুপ্ত ঘোষণা করে শুঙ্গ সাম্রাজ্য চালু করে। এই ব্রাহ্মণ সেনাপতি রাজা হবার পর সে বৌদ্ধদেরকে গণহারে খুন

করতে শুরু করে। কথিত আছে, ক্ষমতা দখলের পর রাজা পুশ্যমিত্র প্রতিটি কর্তিত বৌদ্ধ মস্তকের জন্যে শত-সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করে।"

"ধর্ম যখন লৌকিক হাতিয়ার, মৃত্যু তোলে হাহাকার," তানভীর আনমনেই বলে উঠলো। "হাজার বছর কেটে গেছে অথচ চিত্রটা আজো একই।"

"ঠিক," বলে টমি আরেকটা হাই ছাড়লো। "ঠিক তখুনি রচিত হয়েছিল এই ব্ল্যাক বুদ্ধা মুর্তির রহস্য। ওই সময়ে আসলে কী ঘটেছিল সেটা পরিষ্কার কিছুই জানা যায়নি। তবে একটু জানা গেছে, ব্ল্যাক বুদ্ধা মুর্তিটা নাকি আসলে অদ্ভুত আর একেবারেই ব্যতিক্রম এক ধরণের কালো ধাতু দিয়ে নির্মিত। এই ধাতুটাও নাকি এক অনন্য ধাতু। কারণ যে-ধাতু দিয়ে মুর্তিটা নির্মিত সেটা নাকি আবার কেমিস্ট্রি মানে রসায়নের জগতের আরেক মিথ, আমি তো বিজ্ঞান অতো বুঝি না কিন্তু মনে হয় এই ধাতুর অবস্থান এমনকি পর্যায় সারণিতেও নেই। তাছাড়া মুর্তিটা আসলে দেখতে কেমন-কতো বড় এসব ব্যাপারেও সঠিকভাবে কিছ্ ুজানা যায়নি। তবে এই মুর্তি নিয়ে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার যেটা প্রচলিত সেটা হলো, এই মুর্তিতে নাকি স্বয়ং বুদ্ধের অন্ধকার এক রূপকে নামিয়ে আনা হয়েছিল সেই সময়ে। এই মুর্তির মাধ্যেমে নাকি স্বয়ং বুদ্ধ কথা বলেছিল তার অনুসারিদের সাথে।"

"এটা কি জেসাসের পূনরুত্থানের মতো কোন ব্যাপার?" তানভীর জানতে চাইলো।

"না, ঠিক উল্টো। খেয়াল করে দেখেন যদি সত্যি স্বয়ং বুদ্ধ কথা বলে থাকেন এই মূর্তির মাধ্যমে তাহলে ব্যাপারটা ভালো হবার কথা কিন্তু সেটা মোটেই সেরকম নয়। কারণ এই মুর্তি নির্মাণ করা হয়েছিল কালো জাদুর মাধ্যমে মানুষের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যে। যে-কারণে এই মুর্তির ভেতরে নাকি বন্দি হয়ে আছে বুদ্ধের এক অন্ধকার অবতার। আর এ-কারণেই একে বলা হয় ব্ল্যাক বুদ্ধা।"

"কি সব আল-বাল কাহিনী। কালো জাদু, পর্যায় সারণি বহির্ভূত ধাতু, বুদ্ধের অন্ধকার অবতার," সুলতান আর ইকবালে দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো তানভীর। "টমি, এই সকালবেলা এসব আজাইরা বক-বক না করে আমাদেরকে কংক্রিট কিছু দাও যেটা নিয়ে আমরা কাজে নামতে পারবো। প্লিজ আমাকে এসব আলতু-ফালতু জিনিস বিশ্বাস করতে বলো না।"

তানভীর কথাগুলো বলে টমির দিকে তাকিয়ে রইলো। সে ভেবেছিল টমি ওর কথা শুনে খুব ইমোশনাল হয়ে যাবে। কিন্তু হলো উল্টো। ওর কথাগুলো শুনে টমি হেসে উঠলো। "থ্যাঙ্কু স্যার, আমি যা বললাম তারপরে ঠিক এরকম কেউ বলবে সেটাই আশা করছিলাম। আপনি আমার মনের আশা পূরণ করে দিয়েছেন," বলে সে তানভীরের দিকে একটু এগিয়ে এলো।

"স্যার, আপনি যা বললেন ঠিক এই পয়েন্টটাই অমি ধরাতে চাইছিলাম সবাইকে," বলে সে অন্যদের দিকে ফিরে তাকাল। "আমি যা বললাম এর সবই প্রচলিত কথা। সঠিক তথ্য হয়তো ডক্টর মিতায়ন বলতে পারবেন। কিন্তু আমার পয়েন্ট হলো, যে কথাগুলো তানভীর স্যার কিংবা আপনারা মানছেন না সেগুলোই লোকমুখে, বইয়ের পাতায়, মডার্ন আর্ট-কালচারে প্রচলিত আছে হাজার-দুই হাজার বছর ধরে। এমনকি বর্তমান সময়ের অনেক সেলিব্রেটিদের মধ্যে এ-নিয়ে তুমুল ক্রেজ বিদ্যমান। যেমন ধরেন অ্যাপেলের প্রয়াত সিইও স্টিভ জবস বুদ্ধিজমের ব্যাপারে ক্রেজি ছিলেন, এছাড়াও ফেসবুকের কর্ণধার মার্ক জুকারবার্গ থেকে শুরু করে অনেকেই বুদ্ধিজম নিয়ে ফ্যাসিনেটেড। তাহলে চিন্তা করেন হাজারো বছর ধরে প্রচলিত এরকম একটা রহস্যময় জিনিস সত্যি যদি কেউ আবিষ্কার করতে পারে তাহলে সেটার অ্যান্টিক ভ্যালু কতোটা হবে? তাও টাকার ব্যাপারটা যদি বাদ দেই, এরকম একটা আবিষ্কার কতোটা আলোড়ন সৃষ্টি করবে ভাবেন একবার।"

সবাই চুপ কেউই কিছু বলছে না।

"আমি এই লাইনের এক্সপার্ট নই। কিন্তু পাশা স্যারের ফাইল ঘেঁটে বুঝলাম, ব্ল্যাক বুদ্ধা যদি সত্যি আবিষ্কার হয়ে থাকে তবে এটার মূল্য অপরিসীম হবে," বলে সে পরের স্লাইডে চাপ দিলো। সেখানে একটা হিসেব দেখানো আছে। "এখানে ওয়ার্ল্ড আর্কিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের হিসেবে হলি গ্রেইল থেকে শুরু করে ইতিহাসের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি কল্পিত আর্টিফ্যাক্টের একটা তুলনামূলক দাম হিসেব করা হয়ে দেয়া হয় মার্কেট প্রাইস যাচাই করে। ব্যাপারটা অনেকটা এরকেম যদি এইসব আর্টিফ্যাক্ট বাস্তবে খুঁজে পাওয়া যায় তবে এর বর্তমান লিগ্যাল মার্কেট প্রাইস কতো হতে পারে। ওদের হিসেবে মার্কেট প্রাইস যাচাই করে এখানে ব্ল্যাক বুদ্ধার একটা দাম লেখা আছে।"

ডলারের অঙ্কটা দেখে প্রায় সবারই বলতে গেলে চোখ কপালে উঠে গেল।

"সর্বনাশ, ইতা খিতা মাতরায়," ডক্টর প্রবীরের মুখ দিয়ে একেবারে খাস সিলেটি ভাষা বেরিয়ে এসেছে। "আট্টু অইলে তো..."

তার দিকে এক পা এগিয়ে গেল টমি। "ডিয়ার ডক্টর প্রবীর এটা অনুমেয় দাম, তাও লিস্টেড বায়ারদের জন্যে। যেকোন প্রাইভেট কালেক্টর এর দ্বিগুণ দিতে রাজি হয়ে যাবে। আপনারা হয়তো ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারছেন না। একটা মুর্তিই তো, এর দাম এতো হবে কিভাবে? একটা উদাহরণ দেই তাহলে বুঝতে পারবেন। ধরেন আজ যদি মোনালিসা লুভর থেকে চুরি হয়ে মার্কেটে চলে আসে, অথবা কোহিণূর হিরা টাওয়ার অব লন্ডন থেকে চুরি করে কেউ ব্ল্যাক মার্কেটে সেল করতে যায়, তবে এগুলোর দাম কি কেউ কল্পনা করতে পারবে?" বলে সে একটু থেমে নাটকীয়ভাবে যোগ করলো।

"কিংবা ধরেন আরো প্রাচীন মিথিক্যাল রহস্যগুলোর মধ্যে একটা, মনে করেন ফিলোসফারস স্টোন যদি আবিষ্কার হয় সেটার মূল্য কতো হতে পারে? কেউ বলতে পারবে? ব্ল্যাক বুদ্ধার ব্যাপারটাও অনেকটা এমন। আপনার বা আমার মতো মানুষদের

কাছে এই মুর্তি কিছুই না। কিন্তু বহু মানুষ এর জন্যে জান দিয়ে দিবে। তার ওপরে এটার একটা অ্যাবসট্র্যাক্ট ও রিলিজিয়াস ভ্যালু আছে। কারণ কথিত আছে এটার বিশেষ ক্ষমতা আছে, আবার এটা নির্মিত এমন এক ধাতু দিয়ে, যেটা নাকি পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে বহু আগে। ব্ল্যাক বুদ্ধা খঁজে পাওয়া গেলে পৃথিবীর বড়-বড় অনেক ল্যাব এই মুর্তি নিয়ে কাজ করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠবে। তারমানে যেকোন অ্যাঙ্গেল থেকেই ব্ল্যাক বুদ্ধার কোন তুলনা নেই। আমার বিশ্বাস এই কেসের সাথে ওতপ্রতভাবে জড়িয়ে আছে এই মুর্তি। এই কেস সলভ করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে ব্ল্যাক বুদ্ধা।”

অধ্যায় চৌত্রিশ

সময়: ১৮০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ

পৃথুরা বনভূমি, কন্নোর, ভারতবর্ষ

"অন্ধকারের অবতারের ব্যাপারটা আসলে কি?" খেতে খেতেই জানতে চাইলো শামান।

মন্তলার হাট থেকে আসার পর এরইমধ্যে পরিচ্ছন্ন হয়ে বৈদ্যর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিয়েছে ওরা সবাই। তারপর খেতে বসেই চলছে বুদ্ধের অন্ধকার অবতার বিষয়ক আলোচনা। অন্যদিকে রাজা বিক্রমাদিত্যকেও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখার পর থেকে সে এখন অনেকটাই সুস্থ। বৈদ্য বলেছে রাজার ক্ষতমুখে যেহেতু টান ধরেছে কাজেই প্রাথমিক বিপদ কেটে গেছে, এখন সে ঘুমাবে। আর এই ঘুমটা তার জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

রাজা তো শান্তিতে ঘুমাচ্ছে কিন্তু থারুদের রাজ্যে অন্য কারো মনে শান্তি নেই। বিশেষ করে বুদ্ধের অন্ধকারের অবতারকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনা হবে শোনার পর থেকে চারপাশে একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ বিরাজ করছে। এ-কারণেই শামান খেতে-খেতেই সবাইকে নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে চাইছে। এখন রাজা মানরুর খাবার ঘরেই বসেছে আলোচনা।

রাজা মানরু একবার শঙ্করাদিত্যের দিকে তাকাল, তারপর নিজের লোকদের উদ্দেশ্যে বলে উঠলো, "আমি বলার চেয়ে বরং শাক্যদের প্রতিনিধি হিসেবে শঙ্করাদিত্য বলাচাই বেশি সমীচিন হবে," রাজা মানরু কথা শেষ করার আগেই শঙ্করাদিত্য মাথা নেড়ে নিজের অপারগতা প্রকাশ করলো।

"রাজা মশাই আপনিই এখানে উপস্থিত সবার মাঝে সবচেয়ে বয়ষ্ক ও অভিজ্ঞ কাজেই আপনি বললেই ভালো। আর তাছাড়া যেহেতু বিষয়টাও একদিকে গুরুত্বপূর্ণ আবার অন্যদিকে এতোদিন সবার থেকে আড়াল করাই ছিল কাজেই এটা আপনার মতো কেউ বললেই অধিক গুরুত্ব পাবে," রাজা মানরুকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলেই শঙ্করাদিত্য বসে পড়লো।

রাজা মানরু কারো দিকে না তাকিয়ে আপন মনেই একবার মাথা নাড়লো। "ঠিক আছে, বলতে যেহেতু হবেই কাজেই জলদি শুরু করাই শ্রেয়।"

"হ্যাঁ, জলদিই শুরু করুন," শামান একটু বিরক্ত হয়ে বললো। এই ঠেলাঠেলি একেবারেই ভালো লাগছে না ওর। "কারণ এখানকার গল্প-গুজব শেষ করে আমাকে কাজে নামতে হবে। মন্তলার হাটে যা ঘটে গেল এরপরে ডুকপা লামা কী অবস্থায় আছে কে জানে," ডুকপা লামার কথা মনে হতেই মনের ভেতরটা কেমন জানি হাহাকার করে উঠলো ওর।

বাজে শঙ্কা হচ্ছে, হয়তো মন্তলার হাটের ঘটনার পর তাকে আর বাঁচিয়ে রাখা হবে না। ওদের কৃতকর্মের প্রতিক্রিয়া হয়তো ডুকপা লামাকে বহন করতে হবে।

"একদম ঠিক বলেছে যোদ্ধা," কালন্তি বলে উঠলো। তাকেও একটু বিরক্ত মনে হচ্ছে।

"ঠিক আছে," বলে রাজা মানরু আপনমনে মাথা নাড়লো। "আমি সবাইকে আবারো বলে নিচ্ছি প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি পরিবার, প্রতিটি জাতিরই কিছু না কিছু গোপন ব্যাপার থাকে। আর সেই গোপন ব্যাপারগুলো যখন আবর্তিত হয় কোন বিখ্যাত মানুষকে ঘিরে তখন সেটা অনেকটাই হয়ে পড়ে লোক নির্ভর। তখন মুখ থেকে মুখে বার-বার প্রচলিত কথাগুলোর পট পরিবর্তন হতে থাকে, বদলে যেতে থাকে কাহিনীর গভীরতা, চরিত্রের সংশ্লিষ্টতা সেইসাথে অবশ্যই মূল ব্যাপারগুলো," বলে রাজা মানরু তার সামনে উপবিষ্ট সবাইকে এক ঝলক দেখে নিয়ে একবার কাধঁ ঝাঁকিয়ে বলতে লাগলো। "কাজেই আমি এখন যা বলতে যাচ্ছি সেগুলোর সবই শোনা কথা, কোথাও লিপিবদ্ধ নেই, সেইসাথে এই ঘটনাগুলোকে বুদ্ধের জীবনী থেকে যত্নের সাথে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তবে এতো বছর পরে আবার এই ব্যাপারটা লোকসন্মুখে প্রচলিত হয়ে উঠবে, সেটা ভাবাই যায়নি। যাই হোক, মূল কথায় আসি।"

"আজ থেকে শ'দেড়েক বছর আগে মহান বুদ্ধ যখন এই ধরিত্রীর বুকে বিচরণ করতেন, তার অন্যতম একটা শখ ছিল ভ্রমণ। কখনো নিজের সতীর্থদের সান্নিধ্যে কখনো একা, আবার কখনো নিজের চাচাতো ভাই ও তার একান্ত কাছের বন্ধু আনন্দকে সাথে নিয়ে তিনি ভ্রমণ করে বেড়াতেন দেশে-বিদেশে। গৌতম নির্বাণ লাভের বহু বছর পরের কথা। নিজের ভক্তকুলের সান্নিধ্যে বেশ লম্বা সময় কাটানোর পর হঠাৎ একদিন আনন্দকে সাথে নিয়ে বেড়িয়ে পড়লেন অজানা দেশের উদ্দেশ্যে। বুদ্ধ মাঝে-মাঝে এরকম বেড়িয়ে পড়তেন অজানার পানে। নতুন মানুষ-নতুন জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। আবার কখনো কখনো এরকম অবস্থায় ঘুরে বেড়ানোর সময় নিজে থেকেই জড়িয়ে পড়তেন নানা ঘটনার সাথে, সাহায্য করতেন বিভিন্ন শ্রেণির মানুষদের। এমনকি উনি কাঠের কাজ থেকে শুরু করে লোহার কাজ পর্যন্ত জানতেন। বিভিন্ন সময়ে এমনকি নানা ধরণের শল্য চিকিৎসার মাধ্যমেও সাহায্য করতেন প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষকে। এমনও ঘটনা জানা যায় বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের নিমন্ত্রণে উনি নাকি মহামারীরও দূর করেছিলেন।"

শামান অনেকক্ষণ ধরেই রাজা মানরুর এই নানা কাহিনীর বর্ণনায় বিরক্ত বোধ করছিল। তাই খাওয়া শেষ করে নিজের বাঁশের ধুম্র-কাঠি জ্বালাতে জ্বালাতে সরাসরি রাজার কাছে প্রশ্ন করে উঠলো, "মূল ঘটনাটা কি?"

শামানের প্রশ্ন শুনে রাজা মানরু সামান্য হেসে উঠলো। "আমি জানি মূল ঘটনা বলার আগে অনেক বেশি আধিখ্যেতা করছি কিন্তু মূল ব্যাপারটা বুঝতে হলে এই ঘটনাগুলো জানাটা জরুরি। কারণ এই ঘটনাগুলো বুদ্ধের জীবনের লুকানো ব্যাপারগুলোর মধ্যে অন্যতম। যাই হোক, বুদ্ধ আর আনন্দ উত্তরের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে

অজানা-অচেনা এক দেশের বনাঞ্চলে গিয়ে থামলো। চারপাশে পাহাড়ে ঘেরা চমৎকার এক বনাঞ্চল। বনে ফল-মূল, খাবার-দাবার ইত্যাদির কোন অভাব নেই। বুদ্ধ আর আনন্দ মিলে বনেই সময় কাটাতে লাগলেন। দুজনে খায় দায় ঘুরে বেড়ায়, জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করে। দুজনার সময় ভালোই কাটছিল, এমন সময় সেই বনে এসে হাজির হয় ওই এলাকার রাজার সৈনিকেরা, তাদের কাছে খবর আছে বনে দুজন আগন্তুক এসেছে। রাজার নির্দেশে তাদেরকে রাজ দরবারে হাজির করতে হবে।"

"তাদেরকে কি ধরে নিয়ে যাওয়া হয় রাজ দরবারে?" কালন্তি জানতে চাইলো।

"না, ঠিক ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বললে ভুল হবে তবে রাজার নির্দেশেই তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় রাজ দরবারে। তো রাজ দরবার নিয়ে যাবার পর রাজা তাদের সাথে কথাবার্তা বলার এক পর্যায়ে যখন জানতে পারে স্বয়ং বুদ্ধ তাদের রাজ্যে পা রেখেছেন সে তাদেরকে যথেষ্ট সম্মানের সাথে আদর-আপায়ন করতে থাকেন। রাজার আদর আপ্যায়নে মুগ্ধ হয়ে বুদ্ধ সেখানে কিছু সময় কাটানোর পর রাজাকে জানান তাদের আদর আপ্যায়নে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন, রাজাকে তিনি নিজ থেকে একটা উপহার দিতে চান।"

"বাহ, ভালোই তো," মুখ দিয়ে গল-গল করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে খানিকটা টিটকিরির সুরে কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল শামান। কারণ রাজা মানরু কড়া চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। "দুঃখিত," নিজের একটা হাত তুলে ক্ষমা প্রার্থনা করলো ও। "বলেন, এরপরে কী হলো।"

"অদ্ভুত ব্যাপার হলো, উপহারের কথা শুনে রাজা হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গেল। রাজা বুদ্ধকে জানায় উপহার তার চাইনা কিন্তু তার বদলে বুদ্ধ যদি একটা ব্যাপারে তাকে কোন সহায়তা করতে পারেন তবে তার জন্যে বড়ই উপকার হয়। বুদ্ধ জানতে চান, কী উপকারের কথা বলছেন রাজা। জবাবে রাজা খুবই আজব এক গল্প শোনায় বুদ্ধকে। তার রাজ্যে হঠাৎ এক অদ্ভুত সমস্যা দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি তার ছোট ভাই-যে কিনা তার রাজ্যের পাহাড়ি এক অঞ্চলের দয়িত্বে ছিল সে নাকি খুন হয়েছে বিদ্রোহী এক গোষ্ঠীর হাতে। রাজা বুদ্ধকে জানায় এই বিশেষ গোষ্ঠী নাকি সর্প দেবতার পূজো করে..."

"উরগ," আনমনেই বলে উঠলো কালন্তি।

"উরগ কিনা সেটা সঠিকভাবে জানা যায়নি," রাজা মানরু বলে উঠলো। "তবে হ্যাঁ বুদ্ধের সাথে যাদের শক্তি পরীক্ষার যুদ্ধ হয়েছিল তারাও সর্প দেবতার পূজো করতো। তো যাই হোক রাজা জানালো, তাদের রাজ্যে পাহাড়ি দেবতার পূজো করে, রাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী অন্য গোত্রগুলোও পাহাড়ি দেবতার পূজো করতে বাধ্য ছিল। কিন্তু এই বিশেষ গোত্র বহু পুরুষ আগে থেকেই পাহাড়ি দেবতার পূজো করার ব্যাপারটা অস্বীকার করে তাই তাদেরকে রাজ্যের এক কিনারায় অন্যদের থেকে একেবারে আলাদাভাবে থাকার জায়গা করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি ওখানে কিছু একটা হয়েছে যার প্রেক্ষিতে তারা নাকি অনেক বেশ বলবান হয়ে আশেপাশের রাজ্যগুলোর ওপরে আক্রমণ শুরু করে। সেই

আক্রমণ ফেরানোর জন্যেই তার ছোট ভাইকে পাঠানো হয়েছিল এই বিশেষ গোত্রের মোকাবেলা করার জন্যে। কিন্তু সেই ছোট ভাই ও তার বাহিনী পুরোটাই গায়েব হয়ে গেছে। বলতে গেলে কেউই ফিরে আসেনি। কিন্তু তাদের দলের এক সংবাদ বাহক ফিরে এসে জানায় ওই সর্পপূজক জাতি নাকি বিশেষ এক ধাতু দিয়ে কালো জাদুর মাধ্যমে অস্বাভাবিক শক্তিশালী অস্ত্র নির্মাণ করেছে। তারাই নাকি আশেপাশের রাজ্যগুলোতে অত্যাচার করে বেড়াচ্ছে। সেইসাথে দিন-দিন নিজেদের কালো জাদুর মাধ্যমে আরো অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠছে।"

"হিস্বা," মৃদু স্বরে ফিস-ফিস করে উঠলো শামান।

রাজা মানরু বলে চলেছে, "এরপরে কী হয়েছিল সঠিকভাবে জানা যায়নি তবে এটা জানা যায় বুদ্ধ নাকি তার সহিস ও ভাই আনন্দকে নিয়ে পাড়ি জমায় সেই রাজ্যে। সেখানে নাকি তার সাথে সেই সর্পপূজারি জাতির কালো জাদুকরের ডেকে আনা অন্ধকারের অবতারের মোকাবেলা করতে হয় তাকে। অবশেষে কালো জাদুর প্রকোপ থেকে উনি মুক্ত করেন সেই রাজ্যকে। এরপরে সেই কালো জাদুকর, সেই অস্বাভাবিক ধাতু আর অন্ধকারের অবতারকে বুদ্ধ কী করেছিলেন সেটা কেউই সঠিকভাবে বলতে পারে না। তবে কথিত আছে অন্ধকারের সেই অবতারকে বুদ্ধ নাকি নিজের আত্মার ভেতরে বন্দি করে রেখেছিলেন।"

"অদ্ভুত তো..."

"হ্যাঁ, অদ্ভুত তো বটেই। কিন্তু এর পেছনে কারণও ছিল। অন্ধকারের সেই অবতার নাকি এতোটাই শক্তিশালী ছিল যে, সে নাকি পৃথিবীর সকল ভালো শক্তির বিনাশ সাধন করার ক্ষমতা রাখতো তাই একে বুদ্ধ অন্য কোথাও বন্দি করার সাহস পাননি। এ-কারণেই এই কালো শক্তিকে নিজের ভেতরে বন্দি করে রাখেন বুদ্ধ।"

"এই ঘটনার সাথে বর্তমান সময়ের এই অন্ধকারের অবতারের সম্পর্ক কি? আর ডুকপা লামাকেই বা এসবের সাথে জড়ানো হলো কেন?" শামান জানতে চাইলো।

"এই প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারবো," পেছন থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বরটা শুনে সবাই ফিরে তাকাল। রাজা বিক্রমকে দেখে যারপরনাই অবাক হলো সবাই। নিজের একজন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে পায়ে পায়ে হেঁটে ভেতরে এসে ঢুকলো সে।

"রাজা বিক্রম আপনি ঠিক আছেন?" রাজা মানরু বিক্রমকে বসার জন্যে জায়গা করে দিয়ে জানতে চাইলো।

"আমি একদম ঠিক আছি, আর আমার ঠিক থাকার চেয়ে এই মুহূর্তে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো পরিস্থিতি বিবেচনা করে কাজে নামা," বিক্রম রাজা মানরুর দিকে থেকে দৃষ্টি সরিয়ে শামানের দিকে ফিরে তাকাল। "তুমি নিশ্চই তিব্বত থেকে আসা সেই যোদ্ধা, যার কথা আমি শুনেছি," রাজা বিক্রমের প্রশ্নের জবাবে শামান কিছুই না বলে স্রেফ একবার

মাথা নাড়লো। শামানের জবাব পেয়ে রাজা নিজের দুই হাত জোড় করে শামানের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো। "আমি রাজ পরিবারে জন্ম নিয়েছি। কিন্তু আমার রাজ্য আমি শুধু পারিবারিক ক্ষমতাবলে অর্জন করিনি বরং আমি নিজের কাজ দিয়ে মানুষের মাঝে প্রতিষ্ঠা পাবার চেষ্টা করেছি, ঠিক যেমনটা বুদ্ধ বলে গেছেন," রাজা বিক্রম এই পর্যন্ত বলতেই শামান ফিরে তাকাল কালন্তির দিকে।

কালন্তি অন্যদিকে তাকিয়ে আছে কিন্তু তারপরও শামান বুঝতে পারলো রাগের সাথে ফুঁসছে সে।

রাজা বিক্রমের এদিকে খেয়াল নেই। সে বলে চলেছে, "তবুও আজ পর্যন্ত কারো কাছে আমি কোনদিন হাত জোড় করিনি। আজ তোমার সামনে করছি ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্যে," বলে সে আবারো রাজা মানরু আর শামানের লোকদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, "আজ আপনারা না থাকলে এতোক্ষণে আমার মাথা ধর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতো," বলে সে দুই হাত জোড় করে মাথা নিচু করে রইলো। একটু পরে যখন মাথা তুললো তার দুই চোখ বেয়ে নেমে আসছে অশ্রুধারা। "আমি আজ সবার সন্মুখে শাক্য আর থারুদের মাঝে গত বিশ বছর ধরে বিরাজমান সমস্ত বিবাদ, যুদ্ধ আর অত্যাচারের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সেইসাথে আমি কথা দিচ্ছি, আমি যদি আবারো আমার রাজ্য ফিরে পাই গত বিশ বছর ধরে চলে আসা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা করবো," বলে সে আবারো দুই হাত জোড় করে মাথা নিচু করলো।

"বিশ বছরের জখম কখনোই বিশ দিনে ভরে না রাজা বিক্রম," কালন্তি এতোক্ষণ চুপচাপ থাকলেও হঠাৎ সে কথা বলে উঠলো। রাজা মানরু তার দিকে তাকিয়ে নিশ্চুপ থাকার জন্যে ইশারা করলেও সে রাজার কথা শুনলো না। বরং বেশ ঝাঁঝের সাথে বলে উঠলো। "আর আপনার জ্ঞাতার্থে বলছি যে-জখম ভরবার নয় সেই জখমে মলম না লাগানোই ভালো। তারচেয়ে বরং নিজেদের ভবিতব্য নিয়ে আলোচনা করাই সবদিক থেকে শ্রেয়।"

"হ্যাঁ, সেইটাই," শামান যোগ করলো। "রাজা বিক্রম, আমি যোদ্ধা, যুদ্ধই আমার পেশা কিন্তু আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি এখানে আমি যুদ্ধের জন্যে আসিনি। আমি এখানে এসেছি ডুকপা লামাকে উদ্ধার করতে, এর পাশাপাশি অন্য যা কিছু ঘটছে বা ঘটবে সেটা আপনাদের প্রাধান্য হতে পারে আমার নয়। কাজেই আমি প্রথমেই আপনার কাছে জানতে চাই। ডুকপা লামা কি বেঁচে আছেন?" এই শেষ শব্দ কয়টা উচ্চারণ করতে ওর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো। "যদি সত্যিই আজকের ঘটনার পরা আপনার মনে হয় আমার কাছে আপনার কোন কৃতজ্ঞতা আছে, তবে আমি জানতে চাই ডুকপা লামার জীবিত থাকার ব্যাপারে আপনি যা জানেন আমাকে জানালে কৃতার্থ হবো," কথাগুলো বলে শামান একবার বিধুর দিকে তাকাল। বিধুর দৃষ্টিতেও অদমনীয় কৌতুহলো।

রাজা বিক্রম শামানের দিকে তাকিয়ে আছে। ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে উঠলো, "ডুকপা লামা বেঁচে আছেন, আমি আপনাদেরকে নিশ্চিত করছি। যদিও সাঁচি থেকে ধরে

নেয়ার পরই আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছিল কিন্তু আমি নিশ্চিত উনি বেঁচে আছেন। লিচ্ছবী আর উরগরা তাকে কোনভাবেই মারবে না। কেন মারবে না সেটা বলতে হলে আগে আমাকে পুরো ঘটনাটা বলতে হবে। রাজা মানরু বুদ্ধের অন্ধকারের অবতারের ব্যাপারে যা বললেন সেই ঘটনার কয়েকটা রকমফের প্রচলিত আছে লোকমুখে। তবে মূল ঘটনাটা মোটামুটি কাছাকাছি। তবে এটাও ঠিক যে আসলেই এরকম কিছু ঘটেছিল কিনা অতীতে সেটার কোন নিশ্চয়তা কেউই দিতে পারেনি। এমনকি বুদ্ধও কখনো এই ব্যাপারে নিজে থেকে কিছু বলেন নি।"

"তাহলে আজ শত বছর পরে এই ব্যাপারটা কেন আবারো আলোচনায় এলো সেটাই তো বুঝতে পারছি না আমি," শামান বলে উঠলো।

"বলছি। আগে বলে নেই আমাদের সাথে কী ঘটেছিল। ব্রাহ্মণ শুঙ্গ সেনাপতি রাজা বৃহদ্রথকে মেরে ভারতবর্ষে শুঙ্গ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরই এই খবর এসে পৌছায় আমাদের কাছে কিন্তু আমি প্রথম থেকেই ব্যাপারটাকে আমলে নেইনি। পাহাড় জঙ্গল বিধৌত এলাকা হবার কারণে আমি ভাবতেই পারিনি ভারতবর্ষের সেই তমসা আমাদের এখান পর্যন্ত এসে পৌছাবে। আর অন্যদিকে তিব্বত থেকে ডুকপা লামার দ্বিবার্ষিক সফরেরও সময় ঘনিয়ে আসছিল। তো আমি ভেবেছিলাম ডুকপা লামার সফরটা শেষ হয়ে যাক, এই সফরের যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করার পর আমি তার সাথে ব্যাপারটা আলোচনা করবো কিন্তু এর মধ্যেই ঘটে গেল সব। আমাদেরকে সাঁচির স্তুপ থেকে ধরে নেয়ার পর প্রথমে আমাকে আর ডুকপা লামাকে একসাথেই রাখা হয়েছিল। আমাদেরকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় রামগড়ে। সেখানে এমনকি আমাদেরকে পাশাপশি কামরাতেই আটকে রাখা হয়। আমাদেরকে ধরে নেয়ার দুইদিন পরেই উরগরা এসে ডুকপা লামাকে সেখান থেকে নিয়ে যায়। এরপরে আমাকে ওখানে বন্দি করে রাখা হয় মন্তলার হাটে নিয়ে আসার আগ পর্যন্ত," এই পর্যন্ত বলে রাজা বিক্রম একটু থামলো।

একটু থেমে আবারো শুরু করলো, "রামগড়ে বন্দি থাকা অবস্থায়, এরপরে মন্তলাল হাটে মস্তক ছিন্ন করণের জন্যে নিয়ে আসার সময়ে আমি আরো বেশ কিছু ব্যাপারে জানতে পারি উরগ আর লিচ্ছবীদের ভেতরে কথোপকথন থেকে," বলে সে রাজা মানরুর দিকে একবার দেখে নিয়ে শুরু করলো। "রাজা মানরু যে-পর্যন্ত বললেন এর পর থেকে আমি শুরু করবো। যদি বুদ্ধের ওই ঘটনা সত্যি হয়ে থাকে তবে ধারণা করা হয় যাদের সাথে বুদ্ধের গোলযোগ হয়েছিল উরগরা তাদেরই বংশধর। সর্প দেবতার পূজো, কালো জাদু-বিশেষ ধাতুর ব্যবহার এসবে ওরাই পারঙ্গম।"

"মৌর্য শাসেনর অবসান, শুঙ্গদের সাথে লিচ্ছবীদের যোগাযোগ আর সর্বোপরি এই ঘটনার সাথে উরগদের সংযোগ, সেইসাথে ডুকপা লামার অপহরণ। এই ব্যাপারগুলোকে আমি কোনভাবেই এক সুতোয় আনতে পারছি না," শামান মন্তব্য করলো।

"সেটাই করার চেষ্টা করবো আমি," রাজা বিক্রম বলে উঠলো। "আমি এখন পর্যন্ত যা-যা শুনেছি সেগুলোর সাথে খানিকটা নিজের ধারণা মিশিয়ে আমি পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি। শুঙ্গ সেনাপতি রাজা বৃহদ্রথকে হত্যা করে মৌর্য শাসনের অবসান করার পর যখন ভারতবর্ষ থকে বৌদ্ধদের অবলুপ্তি ঘোষণা করলো তখন আমাদের এই কন্নোরে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় আরোহন করতে ইচ্ছুক আমাদের জ্ঞাতি ভাই লিচ্ছবীরা এটাকে একটা সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করে। তারা নাকি নিজ থেকেই শুঙ্গ রাজার কাছে বার্তা পাঠায়, কন্নোর থেকে আমাদের শাসন উৎখাত করে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়, সেইসাথে তারা এর মাধ্যমে শুঙ্গদের সাথে একাত্ম হতে চায়। কিন্তু শুঙ্গ রাজা লিচ্ছবীদেরকে অসভ্য বিবেচনা করে তাদের প্রস্তাবকে ফিরিয়ে দিতে চাইলে তখন লিচ্ছবীরা তার সাথে এক বিশেষ চুক্তিতে আসে। তারা শুঙ্গ রাজাকে জানায় তাদের কাছে বিশেষ কিছু একটা আছে। তারা চাইলে বুদ্ধের অন্ধকার অবতারকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনতে পারবে। শুঙ্গ রাজা তখন খানিকটা আগ্রহী হয়ে ওঠে। শুঙ্গরা জানায় যদি লিচ্ছবীরা এটা করতে পারে তবে ওদের বিরাট সুবিধে হবে। কারণ একদিকে তারা গণহত্যা তো চালাচ্ছেই অন্যদিকে স্বয়ং বুদ্ধের অবতার সাধারণ মানুষের সামনে নিয়ে আসতে পারলে তাদের জন্যে এই গণহত্যাকে বৈধ করার একটা পন্থা পাবে কারণ, লোকসন্মূখে নাকি স্বয়ং বুদ্ধের অবতার তার অন্ধকার দিক তুলে ধরবে।"

"এর মানে কি? বুদ্ধের অবতার আবার কথা বলবে কিভাবে?"

"রাজা মানরু এই ব্যাপারটা সবাইকে বলেন নি। বুদ্ধের অন্ধকারের অবতারের ব্যাপারে একটা কথা প্রচলিত আছে যে তাকে পৃথিবীতে তুলে আনতে পারলে নাকি সে স্বয়ং কথা বলবে, বুদ্ধের সকল খারাপ আর অন্ধকার দিক সে তুলে ধরবে। ব্যাপারটা অনেকটা জীবন আলোকিত করার উল্টোদিক দিক। বুদ্ধ সারাজীবন মানুষের জীবন আলোকিত করার বাণী প্রচার করে গেছেন- তার অন্ধকারের অবতার নাকি উল্টেটা করতে সক্ষম। পাগলামি আরকি। তবে প্রশ্ন সেটা না, প্রশ্ন হলো লিচ্ছবীদের এই পাগলামি প্রস্তাব শুনে শুঙ্গরা আগ্রহী হয়ে ওঠে, তাদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়। এরপরে লিচ্ছবীরা বিশেষ বাহিনী গঠন করে স্তুপ থেকে আমাদেরকে ধরে নিয়ে আসে। এর পেছনে কারণ ছিল দুটো; এক, আমাকে বন্দি করতে না পারলে ওরা রাজ্য দখল করতে পারছিল না। দুই, ডুকপা লামা। ভারতবর্ষের বৌদ্ধদের জন্যে ডুকপা লামা একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। বৌদ্ধ রাজা বিক্রম, ডুকপা লামা আর বুদ্ধের অন্ধকার অবতার এই তিনটে শুঙ্গদেরকে ভেট হিসেবে দিতে পারলেই লিচ্ছবীরা শুঙ্গদের মাধ্যমে চিরকালের জন্যে এই এলাকার শাসক হতে পারবে। এটাই ছিল শুঙ্গদের সাথে তাদের চুক্তি। এছাড়াও ডুকপা লামাকে ধরে নেয়ার পেছনে আরো একটা কারণ আছে। আপনি কি জানেন শ্রমণ হিসেবে দীক্ষা নেবার অগে ডুকপা লামার পেশা কী ছিল?" রাজা বিক্রম শেষ কথাটা বলেছে শামানকে উদ্দেশ্য করে।

"শ্রমণ হিসেব দীক্ষা নেয়ার আগে?" শামান আনমনেই মাথা নাড়লো। "আমি জানি না।"

“ডুকপা লামার পরিবার ছিল তিব্বতের সেরা কামার গোত্রগুলোর একটি। প্রাথমিক জীবনে ডুকপা লামা ধাতব জিনিসপত্র নির্মাণের কারিগর হিসেবে শিক্ষা নিয়েছিলেন। তার বাবা ছিল তিব্বতের সেরা কারিগরদের একজন। ডুকপা লামার বাবা নাকি পুরো তিব্বতের ভেতরে একমাত্র মানুষ যিনি জানতেন ভিন্ন-ভিন্ন ধাতুকে কিভাবে নানাবিধ পন্থায় ভিন্ন রূপ দিয়ে সেরা অস্ত্র নির্মাণ করা যায়। সেইসাথে আরো একটা জিনিস উনি জানতেন,” বলে রাজা বিক্রম থামলো। “আমরা এতোক্ষণ ধরে যে অন্ধকারের অবতার বিষয়ে আলোচনা করছি, আপনাদের কি কারো মনে হয়েছে এই অন্ধকারের অবতারটা আসলে কি?”

সবাই চুপ এই ব্যাপারটা কারো মাথায় আসেনি।

“এতোটা না জানলেও এটা তো জানেন যে, বুদ্ধ মারা যাবার পর তার দেহভস্ম প্রথমে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে তৎকালীন সম্ভ্রান্ত সাত পরিবারের মাঝে। তারপর সম্রাট অশোকের সময়ে নির্মাণকৃত সব স্তুপয় ছড়িয়ে দেয়া হয় তার দেহভস্ম। লিচ্ছবীরা শুঙ্গদের সহায়তায় সেরা বারোটা স্তুপ থেকে বুদ্ধের দেহভস্ম সংগ্রহ করেছে, সেইসাথে তারা উরগদের মাধ্যমে সংগ্রহ করেছে পৃথিবীর অন্যতম দুষ্প্রাপ্য ধাতু হিম্বা, বুদ্ধের দেহভস্ম আর কালো জাদুর আধার হিম্বার মাধ্যমে ওরা ফিরিয়ে আনতে চলেছে বুদ্ধের অন্ধকারের অবতারকে।”

“মুর্তি,” রাজা বিক্রমের কথা শেষ হবার আগেই শামান বলে উঠলো। “ওরা আসলে বুদ্ধের দেহভস্ম আর আর কালো জাদুর সংমিশ্রণে একটা মুর্তি নির্মাণ করছে।”

“একদম ঠিক,” রাজা বিক্রম সবাইকে দেখে নিয়ে যোগ করলো। “লিচ্ছবীদের ধারণা উরগদের ম্যাধমে যদি তারা এই বিশেষ ধাতু হিম্বা- যেটাকে ওরা বলে কালো জাদুর আধার, এর খোলসের ভেতরে বুদ্ধের দেহাবশেষকে বন্দি করতে পারে তবে শত বছর আগে বুদ্ধ যে অন্ধকারের অবতারকে নিজের ভেতরে বন্দি করেছিলেন সেই অন্ধকারের অবতার আবার ফিরে আসবে পৃথিবীতে, স্বয়ং বুদ্ধ মুর্তির ভেতর থেকে কথা বলে উঠবে সেই অবতার। বুদ্ধ নিজের জ্ঞান দিয়ে ঠিক যেভাবে সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে আলোকিত করার চেষ্টা করেছেন ঠিক উল্টোভাবে এর মাধ্যমে শুঙ্গরা বিপরীত কাজটা করবে।”

শামান উঠে দাঁড়ালো। “বুদ্ধের দেহাবশেষ আর এই ধাতুর সম্মিলন ঘটানোর জন্যে ওরা বেছে নিয়েছে তিব্বতের সেরা মানুষটাকে।”

“ডুকপা লামা,” রাজা বিক্রম বলে উঠলো। “যদি এই কাজে ওরা সফল হয় তবে...”

“সেটা হবে না,” শামান দৃঢ় স্বরে বলে উঠলো। “কারণ অমি সেটা হতে দেবো না। ডুকপা লামাকে এই ঘৃণ্য কাজ করতে বাধ্য হবার আগেই তাকে উদ্ধার করবো আমি,” বলে সে সবাইকে দেখলো। “আমাদের সবাইকে সম্মিলিতভাবে ঠেকাতে হবে এটা। যেভাবেই হোক।”

অধ্যায় পঁয়ত্রিশ

বর্তমান সময়

শাহী ঈদগাহ, আম্বরখানা, সিলেট

"আমার মনে হয় সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করলে অবশ্যই ব্ল্যাক বুদ্ধা খুঁজে বের করা সম্ভব," ট্রিম করা দাড়িতে হাত বুলাতে-বুলাতে আনমনেই বলে উঠলো তানভীর। মনে-মনে ও সম্পূর্ণ পরিস্থিতি অ্যানালিসিস করছে। "সম্ভব এই কারণেই, যেহেতু আমরা ধারণা করছি ওটা এখনো সিলেট শহরেই আছে। আমার প্রশ্ন হলো, আমাদের কেসে এই ব্ল্যাক বুদ্ধা এলো কিভাবে?" টমির দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো তানভীর।

"আমার ধারণা-মানে বাংলো থেকে উদ্ধার হওয়া কাগজ থেকে যা বুঝতে পেরেছি ডক্টর মিতায়নরা অফিসিয়ালি যা বলেছে আসলে তারা সেরকম কিছু এক্সপ্লোর করেনি বরং তারা ব্ল্যাক বুদ্ধা'র অনুসন্ধান করছিল। সম্ভবত ওটা তারা খুঁজেও পেয়েছিল। "

"সর্বনাশ! যদি তাই হয়ে থাকে, তবে আসলে ঘটেছিল কি?" সুলতান বলে উঠলো।

"সেটা আমরা বুঝতে পারবো একমাত্র ডক্টর মিতায়নের জ্ঞান ফিরে এলেই," তানভীর বলে উঠলো। "ইকবাল, আপনি একটু খবর নেন তো ডক্টর মিতায়নের এখন কী অবস্থা?"

"জি, স্যার," বলে ইকবাল বেরিয়ে গেল।

"টমি, ব্ল্যাক বুদ্ধার ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পেরেছি। এখন বাকি ব্যাপারগুলো বলো। যা-যা বলেছিলাম সেগুলোর ব্যাপারে খোঁজ করা হয়েছে?" তানভীর প্রশ্ন করলো, ওকে এখন পুরো ঘটনার টুকরো টুকরো অংশগুলো জোড়া লাগাতে হবে। "ওগুলোর ব্যাপারে যা-যা জানতে পেরেছো সেগুলো একটা একটা করে জানাও। সুলতান তুমি নোট নাও। আচ্ছা, ওসি জালাল কোথায়, সকাল থেকে তো তাকে দেখতে পেলাম না?" কাজের চাপে আর নানাবিধ চিন্তায় ওসি জালালের কথা ভুলেই গেছিল ও।

"কমান্ডার, আমি এইখানে," তানভীর তাকিয়ে দেখলো কনফারেন্স রুমের স্লাইডিং ডোর ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলো ওসি জালাল। সে ভেতরে প্রবেশ করা মাত্রই কড়া সিগারেটের গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো এসি রুমে। খুক-খুক করে উঠলো দুয়েকজন। হাসলো না কাশলো সেটা ঠিক বুঝতে পারলো না তানভীর।

"কি ব্যাপার, আপনি এতো দেরি করে-"

"স্যার অমি বাইরেই ছিলাম," বলে সে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো কারো অনুমতির তোয়াক্কা না করে। "বাইরে থাইক্কা শুনলাম ওই পোদ্দার মিয়া কী সব মুর্তি-ফুর্তি নিয়া

কথা বলতাছে, এইগুলা আবার আমার সয় না। আমি হলাম মাঠের মানুষ, এসি রুমের টেবিলে বইসা এইসব কচকচানি শুনলে আমার গা গুলায়।"

"তা তো গুলাবেই, এসি রুমে তো আর বিড়ি খাওয়া যায় না," বিড়-বিড় করে কথাটা বললেও আশেপাশের সবাই কথাটা শুনে মৃদু হেসে উঠলো। "টমি বলে যাও।"

"স্যার, প্রথমেই সেই জায়গাটার ব্যাপারে, মানে যেখানে ওই বাংলোটা অবস্থিত, ডক্টর মিতায়নকে যেখান থেকে উদ্ধার করেছেন আপনারা। জায়গাটা লাক্কাতুরা টি-এস্টেট আর মালিনীছড়া টি-এস্টেটের মাঝামাঝি একটা প্রাইভেট প্রপার্টি। সেটার মালিক আসলে কে, সেই ব্যাপারে খোঁজ লাগানো হয়েছে কাল রাতেই, আশা করি কিছুক্ষণের ভেতরেই সঠিক খবর জেনে যাবো।"

ইকবাল এসে তানভীরের কানে কানে- কিছু একটা বললো। কথাটা শুনে তাকে বসতে ইশারা করলো তানভীর। "টমি, বলো।"

"দ্বিতীয় ইস্যু, সেই চার্টার করা প্লেন। এটার ব্যাপারে খুব ইন্টারেস্টিং তথ্য আছে। চার্টার করা একটা প্লেন সত্যিই সেদিন এয়ারেপোর্টে ছিল। নির্দিষ্ট সময়ে সেটা ফ্লাই করার কথা ছিল কিন্তু কোন অদ্ভুত কারণে প্লেনটা সময়ের আগেই এয়ারপোর্ট ছেড়ে চলে যায়। এরপরে ওইদিন নাকি ওই প্লেনের ব্যাপারে আর কেউ কোন খোঁজ-খবর করতেও আসেনি।"

"ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা কি?" তানভীর জানতে চাইলো।

"ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো, প্লেনটা এয়ারপোর্টে রেজিস্ট্রি করা ছিল যে কোম্পানির নামে ওইনামে কোন প্রাইভেট এয়ারলাইনই নেই। দ্বিতীয়ত, যে লোক প্লেনটা ভাড়া করেছিল, মানে যার নামে রেজিস্ট্রি করা সেই নামেও ডক্টর মিতায়নের টিমে কেউই নেই।"

"মোদ্দা কথা ওইখান থেকে কিছুই বের করা যাবে না? তাইতো?" তানভীর প্রশ্ন করলো। টমি মাথা নেড়ে জানালো তাই। "তারপরও যে লোকের নামে প্লেনটা রেজিস্টি করা ছিল তার ব্যাপারে খোঁজ লাগানোর চেষ্টা করো। আচ্ছা এখন সেই অস্ত্রটা ব্যাপারে বলো। ডক্টর মিতায়নের বাড়ি থেকে যেটা উদ্ধার করার পর সুলতান বিশদ বর্ণনা দিয়েছিল।"

"এখান থেকে একটা লিড আমরা পেতে পারি। সুলতান ভাই," বলেই টমি নিজেকে শুধরে নিলো। "মানে সুলতান আপা যা বলেছিল ব্যাপারটা একদম ঠিক। আমাদের এক্সপার্টরাও এই ব্যাপারে একই মত পোষণ করেছে। জিনিসটা আসলেই ইউনিক। একেবারেই হাতে তৈরী। ওই অস্ত্রটার সাথে যোগ হয়েছে লাক্কাতুরার বাংলো থেকে পাওয়া অস্ত্রগুলো। প্রতিটি অস্ত্রই পুরনো আর গঠনের ভিত্তিতে আলাদা।"

টমির কথার সাথে-সাথে তানভীরের মনে পড়ে গেল বাংলোর সামনের আঙ্গিনায় চেপে ধরা সেই দো-নলা বন্দুকের কালো নলটা। আনমনেই শিউড়ে উঠলো ও। পলকের ওপর দিয়ে বেঁচে গেছে কাল। "ওখান থেকে কী লিড পাওয়া গেল?"

"স্যার, এখানে আমি একটু বলি," ইকবাল বলে উঠলো পাশ থেকে। "যেই অস্ত্রগুলা নিয়ে আমরা কথা বলছি, এইগুলোর ব্যাপারে তথ্য দেয়ার মতো একজন মানুষই আছে এই এলাকায়। সিলেট শহরে অবৈধ অস্ত্র চোরাচালানের অন্যতম একজন মাধ্যম সে। লোকটা আবার আমাদের ইনফর্মার হিসেবেও কাজ করতো এক সময়। তার নাম নচি বিশ্বাস।"

"কি? বিচি বিশ্বাস!" এতোক্ষণ চুপ করা থাকা ওসি জালাল হঠাৎ পাশ থেকে বলেই হেসে উঠলো। "এ-কেমন নাম?"

চেষ্টা করেও হাসি থামাতে পারলো না তানভীর। হাসতে-হাসতেই ও ফিরে তাকাল ইকবালের দিকে। সবার হাসি দেখে বেশ বোকার মতো তাকিয়ে আছে ইকবাল।

তার দিকে তাকিয়ে তানভীর বলে উঠলো, "ইকবাল, আপনি এই বিচি বিশ্বাস, মানে নচি বিশ্বাসের সাথে যোগাযোগ করেন, নরমভাবে না, শক্তভাবে। তাকে যেখান থেকে পারেন ধরে নিয়ে আসেন। প্রায়োজনে ইএএফের সহায়তা নেন। আর টমি তুই বাংলোর মালিকের ব্যাপারে খোঁজ-খবর করে তার সাথে যোগাযোগ কর। সুলতান, তুমি সহায়তা করো টমিকে। টমি তুই তোর সোর্সের মাধ্যমে প্লেন চার্টার করা ওই লোকটার ব্যাপারেও খোঁজ নেয়ার চেষ্টা কর," বলে ও উঠে দাঁড়ালো। "জালালসাহেব, আপনি আমার সাথে চলেন, ডক্টর মিতায়নের জ্ঞান ফিরেছে। তার সাথে কথা বলতে হবে আমাদের। এই রহস্যেও শিকড় লুকিয়ে আছে ডক্টর মিতায়নের মাথার ভেতরে, যেভাবেই হোক সেটা টেনে বের করতে হবে।"

ওসি জালালকে নিয়ে বাইরে চলে এলো ও। বিল্ডিঙের বাইরে বেরিয়েই পকেট থেকে প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরালো ওসি জালাল। তানভীরের দিকে ফিরে এক দঙ্গল ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে বলে উঠলো, "কমান্ডার, আপনি বয়সে আমার ছোটই হবেন। আপনার সামনে ক্রমাগত বিড়ি খাচ্ছি, কিছু মনে করেন না।"

তানভীর রসুল মিয়াকে ইশারা করে মাইক্রোটা নিয়ে আসতে বললো। তারপর ওসি জালালের দিকে তাকিয়ে বললো, "সিগারেট তো খেয়েই ফেলেছেন, বলে আর কী হবে," বলে ও ওসি জালালের হাত থেকে প্যাকেটটা নিয়ে একটা সিগারেট ঠোঁটে লাগালো। ওসি'র ধরানো সিগারেট দিয়ে সেটা ধরিয়েই বলে উঠলো, "আপনি মনে হয় পাশা স্যারের সাথে অনেকদিন ধরেই পরিচিত। বিশেষ করে গেল বছর গাজীপুরে এক দুর্নিতীগস্থ ওসি গিয়াসুদ্দিন আর আন্ডারওর্য়াল্ড এক ডনের কেসে আপনি নাকি স্যারকে হেল্প করেছিলেন। ওই কেসের কথা স্যার প্রায়ই বলেন আমাদের। বিশেষ করে আপনার সাহসিকতার কথা।"

ওদের গাড়ি চলে আসাতে তাতে উঠে বসে রসুল মিয়াকে ও জানালো কোথায় যেতে হবে।

তানভীর ভেবেছিল লোকটার প্রশংসা করাতে সে খুশি হবে। কিন্তু তার মধ্যে কোন বিকার দেখা গেল না। সে একমনে সিগারেট টেনে চলেছে। "এইগুলান ভূয়া কথা, বুঝছেন কমান্ডার। আপনে মনে হয় নতুন মাঠে নামছেন। আপনেরে দেইখাই বুঝা যায়। শোনেন, আমি যেইগুলা করি এইগুলা সাহসিকতা না। এইগুলা হইলো পাগলামি। এই পাগলামির কারণেই একদিন আমি মরবো। আসল সাহসিকতা কি জানেন," বলে সে ফিরে তাকাল তানভীরের দিকে। "নিজের মুখোমুখি হওয়া। নিজেরে সামলানি হইলো দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সাহসিকতা। নিজেরে নিজে ছাড়ায় যাওয়া হইলো সবচেয়ে বড় সাহসিকতা। যেইটা আমগো দেশের প্রত্যেকটা মধ্যবিত্ত পরিবারের বাবা-মায়েরা করে। প্রত্যেকটা দিন ছোট ইনকাম লয়া নিজের অপিস, নিজের বস, দেশের সরকার থেকে শুরু করে নিজের সন্তানের সাথে হেরা লইড়াই যাইতাছে। এইডা এমন এক যুদ্ধ যেই যুদ্ধ কুনোদিন শেষ অইবে না। বুঝলেন কমান্ডার যে-সাহস আমরা দেহাই হেই সাহস কুনো সাহস না, ওই সাহস অইলো আসল সাহস, যেহানে আপনে জানেন যেই যুদ্ধে কুনো জয়-পরাজয় নাই, যেই যুদ্ধ কুনোদিন শেষ অয়না। আমি মাইনষের চোক্ষের দিকে তাকায়া মাইনষেরে গুরি কইরা মারতে পারি কিন্তুক অই সাহস আমি দেহাইতে পারি নাই। আমি সংসার করতে পারি নাই।"

বলেই সে হেসে উঠলো। "পাশা স্যারের মতোন মানুষরে আমি, শ্রদ্ধা করি ক্যান জানেন, এইরকম মানুষগুলা সিস্টেমের সাথে লড়াই করতে জানে। সেই সাহস হেগো আছে। তাগো এই লড়াইডা প্রকারান্তরে দেশের ওইসব মধ্যবিত্ত মানুষগুলার কামে আয়ে। পচা-গলা নোংরা এই সিস্টেমের মধ্যে পাশা স্যারের মতোন মানুষগুলান অইলো দুয়েকটা শালুক ফুলের মতোন। যাগকা অনেক কথা কইলাম। তয় কমান্ডার আমার মনে অইতাছে আমাগো এই কেসে বহুত গোলমাল আছে। আপনে সাবধান থাইক্কেন। গুলি করন লাগলে আমি আছি, সুলতান আছে। কিন্তুক মনে রাইখেন আপনের টিমে বড় গোলমাল সামলানির মতোন লুক একটাও নই। ওইডা কিন্তুক আপনেরই করণ লাগবো। বিশেষ কইরা এই কেসের ব্যাপারে যা শুনছি তাতে ইএএফ এরিমইধ্যে-"

"স্যার, চলি আইয়ার," সামনের সিট থেকে রসুল মিয়া বলে উঠলো।

"চলুন, জালালসাহেব," বলে বাইরে বেরিরে এলো, সাথে জালাল উদ্দিন। সে বাইরে বেরিয়েই মুখে ধরানো সিগারেটের মোথাটা মাটিতে ফেলে জুতো দিয়ে পিষে দিলো। "চলেন, কমান্ডার।"

পুলিশ হাসপাতালটা বেশ বড় কিন্তু লোকজন বলতে গেলে একেবারেই নেই। বাইরে দুজন সেন্ট্রিকে বসে থাকতে দেখলো ও। জিন্স আর লেদার জ্যাকেট পরিহিত তানভীরকে দেখে তাদের মধ্যে কোন বিকার দেখা গেল না, কিন্তু পুলিশের পোশাক পরা জালালকে দেখে সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গেল দুজনেই। ডক্টর মিতায়নকে কোথায় রাখা হয়েছে সেটা ওদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে সোজা তিন তলায় চলে এলো ওরা। হাসপাতালের লম্বা করিডরের দুপাশে সারি-সারি কামরা। রিসিপশনে একজন নার্সকে দেখা গেল খুব আয়েশ

করে চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে এক পুলিশ কন্সটেবলের সাথে গল্প করছে। ছেলেটা প্রথমে ওদেরকে দেখে চমকে উঠলো, তারপর জালাল তাকে হাতের ইশারায় কাছে ডাকতেই ভড়কে গেল একেবারে।

"এই, এদিকে আয়," হাতের ইশারায় জালাল তাকে ডাকতেই বন্দুক সামলাবে না নিজেকে সামলাবে বুঝে উঠতে-উঠতে প্রায় দৌড়ে এগিয়ে এলো সে।

"স্যার," পা ঠুকলো স্যালুটের ভঙ্গিতে।

"তুই, কি এইহানে প্রফেসরের নিরাপত্তার দায়িত্বে আছোস?" জালালের হাত আনমনেই চলে গেছিল পকেটে রাখা সিগারেটের প্যাকেটের দিকে কিন্তু জায়গাটা হাসপাতাল মনে পড়তেই সে নিজেকে সামলে নিলো।

"জি, স্যার আমি এইহানে আর বাইরে আরো দুইজন আছে," ছেলেটা একবার জালালকে দেখছে অরেকবার তানভীরকে।

"এই তোর নিরাপত্তা? নার্সের লগে গপ্প করার লাইগা তোরে রাখছে এইহানে," জালাল এক পা এগিয়ে গেল ছেলেটার দিকে আর ছেলেটা এক পা পিছিয়ে গেল। "হারামজাদা, আরেকবার যদি দেহি ঠিকমতো ডিউটিতে নাই প্যান্ট খুইল্লা হোগা দিয়া তোর হাতের ডান্ডাটা ভইরা দিবো, বুঝছোস?"

বিদ্যুৎ বেগে মাথা ঝাঁকাতে থাকা কন্সটেবলকে দেখে মনে হচ্ছে যেকোন সময় তার মাথাটা স্প্রিঙের পুতুলের মতো খুলে যেতে পারে।

"ডক্টর মিতায়ন কোন রুমে আছে?" প্রশ্নটা তানভীর করেছিল তরুণ কন্সটেবলকে উদ্দেশ্য করে কিন্তু জবাব পেল পেছন থেকে।

"তানভীর ভাই, এদিকে," রিনরিনে গলা শুনে পেছন ফিরে দেখলো শায়লা দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে।

"কি ব্যাপার, তুই এখানে?" তানভীরও হাসিমুখে জানতে চাইলো।

"আমার বোনের বিপদ তো আমি এখানে থাকবো না তো কে থাকবে?" শায়লা ওদেরকে পথ দেখিয়ে সামনের দিকে নিয়ে চললো।

"তোর মা নেই তো আবার, উনি থাকলে তো-"

তানভীরের কথা শুনে মুচকি হেসে উঠলো শায়লা। "তুমি কি মাকে এখনো ভয় পাও?" শায়লার কথার জবাবে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তানভীর তার আগেই একটা হাত তুলে ওকে আশ্বস্ত করলো সে, "মা নেই, তোমার ভয় পাবারও কোন কারণ নেই। তবে তানভীর ভাই, তোমাকে আমার একটা বিরাট ধন্যবাদ দেয়ার আছে," শায়লা সরাসরি

তাকিয়ে আছে তানভীরের চোখে। "দুলাভাই, মানে মিতায়ন ভাইকে তুমি এতোটা জলদি ফিরিয়ে আনতে পারবে, আমরা কেউ ভাবতেও পারিনি। মা তো ভাবছিল-"

"তোর মায়ের ভাবনা আমার কাছে একেবারেই অপ্রাসঙ্গীক। আর আমি যা করেছি সেটা একেবারেই প্রফেশনাল ব্যাপার," বলে ও প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চাইলো। "পরিচয় করিয়ে দেই, উনি ওসি জালাল উদ্দিন। আমার সাথে এই অপারেশনে কাজ করছেন। সত্যি কথা হলো উনি না থাকলে গতকাল আমরা সবাই গেছিলাম," বলে তানভীর একটা বিশেষ ভঙ্গি করলো গলা কাটার, শায়লা হেসে উঠলো।

জালাল কিছু না বলে শায়লার দিকে তাকিয়ে একবার মাথা নাড়লো।

"হ্যাঁ, আমি আপার কাছে শুনেছি, কী ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে পড়েছিলে ওখানে তোমরা। ভেতরে এসো," ওরা নির্দিষ্ট কেবিনের দরজার সামনে চলে এসেছে। "দুলাভাই এখন ভালোই আছে। কাল রাতে জ্ঞান ফিরেছে। আপাও আছে ভেতরে। "

কেবিনের ভেতরে ঢুকে তানভীর একটু অবাক হয়ে গেল। বাইরের সাদামাটা করিডরে দাঁড়িয়ে ও ভাবতেও পারেনি ভেতরের কেবিন এতোটা সুসজ্জিত হবে। ও অনুমান করলো এটা সম্ভবত ভিআইপি কেবিন, তা-না হলে এতোটা ভালো হবার কথা নয়। ভেতরে সোফা আছে, অতিরিক্ত বেড আছে, আবার রুমে এলইডি টিভি, সবমিলিয়ে বেশ ভালো আয়োজন।

ভেতরে ঢুকে দেখলো বেডের ঠিক পাশেই একটা চেয়ারে লায়লা বসে আছে, বেডের ওপরে শুয়ে থাকা মানুষটার একটা হাত ধরে আছে। ওদেরকে দেখে একটু সরে গেল সে।

ওরা এগিয়ে যেতেই তানভীরকে দেখে লায়লা ভাঙা গলায় বলে উঠলো, "কেমন আছো, তানভীর?"

লায়লার দুই চোখ প্রায় গর্তে বসে আছে, চেহারা একেবারেই রুক্ষ আর এলোমেলো। গতকালও তাকে এতোটা বিধ্বস্ত লাগেনি, আজ তাকে দেখে মনে হচ্ছে বয়স যেন হঠাৎ অনেক বেড়ে গেছে। লায়লার দিকে তাকিয়ে আবেগের একটা ঝোঁক তানভীরের গলা বেয়ে উঠে আসতে চাইলো, কিন্তু বহু কষ্টে সেটা দমন করে ওর দিকে এক সেকেন্ড তাকিয়ে রইলো তারপর যেন যন্ত্রের মতো বলে উঠলো, "আমি ভালোই আছি," ডক্টর মিতায়নের দিকে দেখিয়ে বললো। "আমরা ডক্টর মিতায়নের সাথে কথা বলবো। ভালো হত যদি তোমরা একটু বাইরে অপেক্ষা করতে।"

লায়লা তাকিয়ে আছে তানভীরের দিকে। কিছু না বলে একবার ওকে দেখলো, তানভীরের চোখে কোন ভাব নেই। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে শায়লার দিকে ফিরে ইশারায় কিছু একটা বলে বেরিয়ে গের দুজনে। তানভীর এতোক্ষণ ডক্টর মিতায়নের দিকে ভালোভাবে তাকায়নি। এবার তাকিয়ে দেখলো।

একটু মঙ্গলয়েড ধাঁচের চেহারা তার আদিবাসী পরিচয় বহন করছে। যদিও শুয়ে আছে তবুও তাকে দেখে ও আন্দাজ করলো ডক্টর খুব বেশি লম্বা হবে না, বড়জোড় পাঁচ ফিট চার বা পাঁচ হতে পারে। মাথায় এই মুহূর্তে পুরনো দিনের বাংলা সিনেমার নায়কদের মতো একটা পট্টি লাগানো, একটা হাত ¯িøঙে ঝোলানো, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখ বন্ধ।

"উনি কি ঘুমিয়ে আছেন?" রুমে একটু আগে একজন নার্স প্রবেশ করে একটা মেডিকেল কিটের মতো কিছু একটা রাখতে যাচ্ছিলো টেবিলের পাশে, তাকে উদ্দেশ্য করে জানতে চাইলো তানভীর। কিন্তু নার্স জবাব দেয়ার আগেই চোখ বন্ধ অবস্থায় ডক্টর বলে উঠলো, "তুমি! তুমি কেন?"

"মানে?" তানভীর খুব অবাক হয়ে জানতে চাইলো। ডক্টর এখনো চোখ খোলে নি। ওসি জালালের দিকে তাকিয়ে তানভীর কাঁধ ঝাঁকালো। ওসি জালাল নার্সের কাছ থেকে ডক্টরের মেডিকেল হিস্ট্রির চার্টটা নিয়ে ওতে চোখ বুলাচ্ছিলো, সেও অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তানভীরের দিকে।

"সরি, ডক্টর মিতায়ন, আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারিনি," তানভীর একটা চেয়ার টেনে ডক্টরের মুখোমুখি বসে জালালকেও বসতে ইশারা করলো।

ডক্টর মিতায়ন আচমকাই চোখ খুলে মাথাটা একটু এগিয়ে আনলো তানভীরের দিকে। "আপনি লায়লাকে সরাসরি তুমি বললেন, কারণটা কি?" বলে সে যেন মৃদু হেসে উঠলো। হাসিটা এমন সেটা ঠোঁটের কোণ থেকে শুরু হলো কিন্তু চোখের কোণে যাবার আগেই হারিয়ে গেল। "অফিসার, আপনার নামটা যেন কি?" ডক্টরের বাংলা উচ্চারণ একটু অদ্ভুত। কোন এলাকার টান নাকি অন্য কোন ভাষার টান তার কথায় তানভীর ঠিক বুঝতে পারলো না।

চেয়ারটাকে আরেকটু বিছানার দিকে এগিয়ে আনলো তানভীর। "ডক্টর, আমার নাম তানভীর, তানভীর মালিক, এই কেসের কমান্ডিং অফিসার," তানভীর তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছে। "আপনার সাথে আমাদের বেশ কিছু কথা আছে।"

ডক্টর কিছুই না বলে জানালার দিকে ফিরে তাকাল। তানভীর আশা করেছিল ওর নামটা শুনে ডক্টরের মুখে আবারো সেই হাসির রেখাটা ফুটে উঠবে কিন্তু তার পরিবর্তে যেন খানিকটা আঁধার ঘনিয়ে এলো তার মুখে। "অফিসার তানভীর, আমার মনে হয় আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, আমাকে প্রাণে বাঁচানোর জন্যে কিন্তু আমি সেটা করতে পারছি না। আমি আসলে কিছুই করতে পারছি না। আমার জীবনের সেরা আবিষ্কার ওইখানেই কোথাও অন্য কারো হাতে আছে," বলে সে জানালা দিয়ে বাইরে দেখালো। "অথচ আমার পক্ষে বিছানা থেকেই ওঠাই সম্ভব না। এরচেয়ে কষ্টের আর কিছু হতে পারে না," বলে সে আবারো ফিরে তাকাল তানভীরের দিকে। এবার একেবারে সরাসরি ওর চোখের দিকে।

"অফিসার, জীবনে কখনো খুব তীব্রভাবে কিছু চেয়েছেন? নিজের জীবন, নিজের পরিজন, নিজের সৃষ্টি নিজের অর্জনের চেয়েও অনেক বড় কিছু? অনেক-অনেক বড় কিছু। তারপর একদিন আচমকাই সেটা পেয়ে গেলেন," বলে সে একটু থেমে যোগ করলো, "পেয়েই দেখলেন আপনার কাছের প্রতিটা মানুষ আপনার সাথে বেঈমানি করলো। আপনাকে সেটা হারাতে হলো। কেমন লাগবে অফিসার?" ডক্টর মিতায়ন একটু খেপাটে ভঙ্গিতে নিজের চোখের মণি একেবারে স্থির করে রেখেছে তানভীরের চোখে। "কোনকিছু না পাবার চেয়ে পেয়ে হারানো কতোটা কষ্টের আপনি জানেন অফিসার," বলে সে পাগলাটে ভঙ্গিতে হেসে উঠলো। "হয়তো আপনিই ভালো জানেন," বলে সে হাসতে লাগলো।

ডক্টরের শেষ কথাটা শুনে তানভীরের গলার কাছটায় কেমন জানি একটা ঠান্ডা অনুভূতি হলো, দীর্ঘক্ষণ পিপাসার্ত থাকার পর হঠাৎ অনেক বেশি ঠান্ডা জল খেয়ে ফেললে এর কাছাকাছি একটা অনুভূতি হয়। ডক্টর কি ওর আর লায়লার ব্যাপারটা জানে, মনের ভেতরে আনমনেই এই প্রশ্নটাই জাগলো সবার প্রথমে। কিন্তু ও বাস্তবে ফিরে এলো ওসি জালালের কথা শুনে।

"ডক্টর অকারণে কাহিনী না ঘুরায়া শুরু থাইক্কা বলেন," জালাল একটা চেয়ার টেনে বসেছে। তার হাতে ডক্টরের মেডিকেল রিপোর্ট। "প্রথম কথা, আপনেরা আসামে যে অপারেশনের কথা কইছিলেন এইটা পুরাটাই ভূয়া ছিল, তাইনা?"

ডক্টর আবারো জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। তানভীর তাকে বেশ কড়া সুরেই বলে উঠলো, "শুনুন ডক্টর। আপনি যদি মুখ না খোলেন তাহলে আপনিই সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়বেন। কাজেই একেবারে শুরু থেকে সব খুলে বলুন।"

"শুরুটা হয়েছিল অনেক আগে। আজ থেকে চার বছর আগে হবে মনে হয় সময়টা," ডক্টর জানালার দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলতে শুরু করেছে। "আমি তখন সবেমাত্র আমার ডক্টরেট শেষ করে ছুটিতে ছিলাম। নিজের ক্যারিয়ার বা কর্মক্ষেত্র নিয়ে ঠিক কী করবো সিদ্ধান্ত নেইনি। এমন সময় লন্ডনের এক পাবে একজন অ্যাকাডেমিক বন্ধুর মাধ্যমে পরিচয় হয় প্রফেসর টেড চ্যাঙের সাথে। উনি আর আমি প্রায় কাছাকাছি অ্যাকাডেমিক ফিল্ডের মানুষ, আবার উনি সাউথ এশিয়ান আর্কিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের হর্তাকর্তা-তাই আড্ডা জমে উঠতে খুব একটা সময় লাগেনি। পাবে আড্ডা দিতে দিতে বেশ রাত হয়ে যায়, এমন সময় ডক্টর চ্যাঙ আমাকে তার বাসায় আমন্ত্রণ জানান একটা জিনিস দেখাবেন বলে। ততোক্ষণ কয়েকদফা পেগ চড়ে যাবার পর আমার অবস্থাও খারাপ, তাই ভাবলাম যাই দেখি কি জিনিস। আর তেমন কিছু না হলে রাতটা উনার ওখানে থেকে তারপর হোটেলে ফেরা যাবে। উনার বাসা পাব থেকে কয়েক ব্লক দূরই ছিল। তাই আমরা হেঁটেই গেলাম। ছোট একটা অ্যাপার্টমেন্ট, বইপত্র আর নানা ধরণের পুরনো আমলের জিনিসে ভর্তি। ওখানে যাবার পর উনি আমাকে এমন এক জিনিস দেখান, আমার নেশা ছুটে যায়। জিনিসটা ছিল একটা তলোয়ার। সঠিকভাবে বলতে গেলে একটা

কাতানা। কালো ধাতু দিয়ে নির্মিত সোনালি বর্ডারের ওরকম জিনিস আমি জীবনেও দেখিনি।”

“কি এমন তলোয়ার, বিশেষত্ব কি ওটার?” তানভীর জানতে চাইলো। মোবাইলের নোট প্যাডে নোট নিতে শুরু করেছে ও।

“একেবারেই ব্যতিক্রম জিনিসটা। কাতানা বেশিরভাগই জাজলজদের তৈরী কিন্তু এই কাতানাটা জাজলজ কাতানা থেকে একেবারেই ভিন্ন। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হলো, জিনিসটা নির্মিত হয়েছে অদ্ভুত এক ধাতু দিয়ে, যে-ধাতুর অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে বিলীন হয়ে গেছে। প্রফেসর আমাকে জানান এই ধাতুটার অবস্থান নাকি সায়েন্সেও নেই। এই ধাতুর একটা হইপোথেটিক্যাল নাম আছে-হিম্বা-কিন্তু বাস্তবে এর কোন অস্তিত্ব এতোদিন ছিল না। যতোদিন না এই কাতানাটা খুঁজে পাওয়া গেছে।”

“টেড চ্যাঙ ওটা পেয়েছিল কোথায়?”

“জিনিসটার অরিজিন তিব্বতে। ১৯২৫ সাথে যখন চায়না তিব্বত দখল করে নেয়, তখন তিব্বতের বিভিন্ন মঠে ব্যাপক লুট-পাট চালানো হয়। সেইসব মঠগুলো থেকে লুটপাটের জিনিসগুলো পরবর্তীতে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন জায়গায়। কিছু জিনিস চায়না, নেপাল আর ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক লোকজনের মাধ্যমে স্থান পায় বিভিন্ন সরকারি জাদুঘরে, আর বেশিরভাগ জিনিসই ছড়িয়ে পড়ে এশিয়া আর ইউরোপের চোরা বাজারে। যে-ব্যাপারটা কেউ জানতো না সেটা হলো এইসব লুটপাটের জিনিসগুলোর ভেতরে কিছু জিনিস সংরক্ষিত ছিল একেবারেই লোকচক্ষুর অন্তরালে নেপালের রাজ পরিবারের ব্যক্তিগত সংগ্রহে। এসব জিনিস হয়তো চিরকাল নেপালের রাজ পরিবারের অন্ধকার কুঠুরিতেই বন্দি থাকতো যদি না ২০০১ সাথে নেপালের রাজ পরিবারে রাজা জ্ঞ্যানেন্দ্রর ম্যাধমে সেই হত্যাকান্ডটা সংঘটিত না হত।”

“নেপালের রাজকুমার জ্ঞ্যানেন্দ্র পরিবারের সবাইকে গুলি করে মারে, ওই ঘটনা?” জালাল বলে উঠলো। “পত্রিকায় পড়েছিলাম। ”

“হ্যাঁ, ওটাই। তা ওই ঘটনার সময়ে যেটা ঘটে; নেপালের রাজ পরিবারে গন্ডগোলের সুযোগে মহলের কর্মচারিরা রাজ পরিবারের মূল্যবান অনেক জিনিস চুরি করে বাইরে বিক্রি করে দেয়। এর মধ্যে একটা ছিল এই কাতানা। বিভিন্ন হাত ঘুরে এই জিনিসটা চলে যায় থাইল্যান্ডে। দেখতে ওতটা সুন্দর নয় বলে ওটা থাইল্যান্ডের এক অ্যান্টিকের চোরা মার্কেটে কোন এক অখ্যাত দোকানের প্রদর্শনীর কাঁচের নিচে পড়ে থাকতো যদি না জিনিসটা প্রফেসর টেড চ্যাঙের নজরে পড়তো। থাইল্যান্ডের চোরা বাজার থেকে ওটা কিনে টেড চ্যাঙ জিনিসটা নিয়ে কাজ শুরু করে, প্রথমেই তার নজর কাড়ে ধাতুটা। ওটা নিয়ে খোঁজ করতে গিয়েই বেরিয়ে আসে জিনিসটা আসলে কি। ওটা যে ধাতু দিয়ে নির্মিত তার হাইপোথেটিক্যাল নাম ‘হিম্বা’। এই ধাতুর অস্তিত্ব এতোদিন শুধু মিথেই ছিল। বাস্তবে এরকম কিছু আছে কেউই বিশ্বাস করতো না। টেড চ্যাঙের মুখে হিম্বার নাম শুনে আমি চমকে উঠি। কারণ এই ধাতুর সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটা মিথ আছে। এই ধাতু দিয়ে নির্মিত একটা মাত্র জিনিসই পৃথিবীতে আছে।”

"ব্ল্যাক বুদ্ধা," আনমনেই বলে উঠলো তানভীর।

"হাজার বছরের পুরনো সেই মুর্তি যাকে বলা হয়ে থাকে বুদ্ধের অন্ধকার অবতার। যে মুর্তির মুখ দিয়ে নাকি স্বয়ং বুদ্ধ কথা বলতেন। তখনো চমক বাকি ছিল। চ্যাঙ আমাকে আরো অদ্ভুত এক জিনিস দেখায়। কাতানাটার হাতলের একটা জায়গায় মোচড় দিতেই সেটা আলগা হয়ে খুলে যায়। ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে একটা পুরনো রোল করা চামড়ার পার্চমেন্ট। জিনিসটাতে চোখ বুলাতেই আমি বুঝতে পারি এটা তিব্বতি ভাষার বহু পুরনো এক রূপ। প্রফেসর আমাকে জানায়, এটাকে ডিসাইফার করার জন্যেই সে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো বহুদিন ধরে। তার বিশ্বাস এটা ডিসাইফার করতে পারলেই আমরা ব্ল্যাক বুদ্ধার সন্ধান পাবো।"

"সত্যিই কি তাই ছিল?" প্রফেসর মিতায়নের গল্প শুনতে শুনতে নিরাসক্ত জালালও আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

"না, টেড চ্যাঙ ভুল ভেবেছিল। কাতানাতে পাওয়া বার্তাটা ডিসাইফার করতে অনেক সময় লেগে যায়। তবে ওটার অর্থ উদ্ধার করে আমরা যা জানতে পারি সেটা খুবই হাতাশাজনক। ওতে থাকা মেসেজটা অসম্পূর্ণ, কারণ একইরকম অরেকটা কাতানা আছে। দুটোর মেসেজকে এক করতে পারলেই তবে পুরো জিনিসটার অর্থ উদ্ধার করা যাবে, খুঁজে পাওয়া যাবে ব্ল্যাক বুদ্ধা। আমরা বুঝতে পারি আমাদেরকে মাঠে নামতে হবে। আমরা থাইল্যান্ডের সেই দোকান থেকে ট্রেস করা শুরু করি। প্রায় এক বছর খোঁজ করার পর জানতে পারি জোড়া কাতানার অন্যটা নেপালেই আছে," বলে ডক্টর মিতায়ন চোখ বন্ধ করে ফেললো।

ডক্টরের বক্তব্য শুনতে-শুনতে তানভীরের মনে পড়ে গেল ডক্টরের ডেস্কে দেখা নেপালের সেই পেপারওয়েটের কথা। তারমানে নেপালের সাথে এদের ঘটনার একটা সংযোগ অবশ্যই আছে।

"বিশ্বাস করেন, নেপালের লিঙ্ক পেয়ে..." ডক্টর বলে চলেছে। "...আমরা পুরো নেপাল স্রেফ চষে ফেলি কিন্তু কোন খোঁজ বের করতে পারিনি। এমন সময় ২০১৫ সালে নেপালের সেই কুখ্যাত ভূমিকম্প হয়। নেপালের জন্যে অভিশাপ হলেও আমাদের জন্যে ওই ভূমিকম্প দেখা দেয় আশীর্বাদ হিসেবে। ভূমিকম্পের পরে আমরা প্রথমে যাই লুম্বিনিতে। তারপর সেখান থেকে নেপালের ভক্তপুরে আমাদের এক সোর্সের মাধ্যমে জানতে পারি যা-খুঁজছি এরকম কিছু একটার সন্ধান আছে তার কাছে। লুম্বিনি থেকে আমরা ছুটে যাই ভক্তপুরে। ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত ভক্তপুরে সেই সোর্স আমাদেরকে নিয়ে যায় এক বৃদ্ধের বাড়িতে। ভূমিকম্পে আহত হয়ে বৃদ্ধের অবস্থা খুবই গুরুতর। তার পরিবারের লোকজনের সামর্থ নেই তার চিকিৎসা করানোর। সেই বৃদ্ধ আমাদেরকে জানায় সে এক সময় নেপালের রাজ পরিবারের খানসামা ছিল। রাজ পরিবারে গন্ডগোলের সময়ে সে রাজ বাড়ি থেকে বহুকিছু চুরি করে পালিয়েছিল। দামি জিনিসগুলো

বিক্রি করে দিলেও টুকিটাকি কিছু জিনিস রয়ে গেছে তার কাছে। সেগুলোর ভেতরেই আমরা খুঁজে পাই সেই জোড়া কাতানার দ্বিতীয়টা। সেই বৃদ্ধের পরিবারকে তার চিকিৎসা করানোর অর্থের বিনিময়ে আমরা কিনে নেই সেটা। শুরু হয় আমাদের গবেষণার দ্বিতীয় পর্ব।"

ডক্টর মিতায়ন এই পর্যন্ত বলে জল খেয়ে আবার শুরু করলো। "জোড়া কাতানার দ্বিতীয়টা থেকে আরেকটা চামড়ার পার্চমেন্ট পাই আমরা, সাথে একটা ম্যাপ। মেসেজটা অ্যানালিসিস করে জানতে পারি ব্ল্যাক বুদ্ধার অবস্থান সেভেন সিস্টার্সের আসামের কোথাও। আর ম্যাপটা কাজে লাগবে জায়গামতো পৌছানোর পর। এতোদিন পর্যন্ত আমাদের অভিযান ব্যক্তিগত পর্যায়েই ছিল, এবার আমরা বুঝতে পারি আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা লাগবে। টেড চ্যাঙ আমাকে আশ্বস্ত করে বলে অর্থ নিয়ে যেন আমি চিন্তা না করি। কিন্তু আমাদের একটা কভার দরকার ছিল। কোন কভারে, কোন একটা নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান করে কাজটা ভালোভাবে সারা যায় সেটা নিয়ে আমরা ভাবছিলাম এমন সময় চোখে পড়ে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্ট খুলতে যাচ্ছে। সেখানে প্রফেসর ও অভিজ্ঞ শিক্ষক দরকার। টেড চ্যাঙই আমাকে বুদ্ধি দেয় যদি আমি সেখানে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিতে পারি তবে আমাদের জন্যে সরকারি লেবাস পরিয়ে কাজটা করতে সুবিধে হবে। আমি তখন ব্ল্যাক বুদ্ধার খোঁজ বের করার জন্যে অন্ধ। ফলে চ্যাঙ যা বললো তাই করলাম, সিলেটে এসে শাবিপ্রবিতে যোগ দিলাম, বিয়ে করলাম, আর ডিপার্টমেন্টের সহায়তায় সরকারি অর্থায়নে আর সাউথ এশিয়ান আর্কিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের ব্যানারে একটা ভূয়া কেস স্টাডি সাজিয়ে অভিযান চালিয়ে যেতে লাগলাম আসামে। "

"আসামের সরকারি কর্তৃপক্ষ কোন ঝামেলা করেনি?" তানভীর জানতে চাইলো।

"উল্টো ওরা সহায়তা করেছে, এটাও চ্যাঙেরই বুদ্ধি ছিল। চ্যাঙই এমন ব্যবস্থা করেছিল যে বাংলাদেশের সরকারি প্রজেক্ট হওয়াতে ওরা বরং উল্টো আমাদেরকে লোকবল দিয়ে সহায়তা করেছে। "

"আপনার কাছে একবারও মনে হয়নি এভাবে সরকারি রিসোর্স ব্যবহার করে ভূয়া অভিযান চালানোটা ঠিক হচ্ছে না?" জালাল বলে উঠলো।

ডক্টর মিতায়ন একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। সে ফিরে তাকাল ওসি জালালের দিকে। "আপনি কখনো কোন অ্যাকাডেমিকের সাথে কাজ করেছেন? করেন নি, আমার ধারণা। তাদের মাথায় যখন কিছু জেঁকে বসে সেটার বাইরে তারা আর কিছুই দেখতে পায়না। আমিও তখন প্রায় অন্ধ হয়ে গেছিলাম। চ্যাঙ যা বুঝিয়েছে তাই বুঝেছি। চ্যাঙ আমাকে বুঝিয়েছিল আমরা যা করতে যাচ্ছি তাতে আখেরে দেশেরই লাভ হবে। আগে থেকে সব জানা থাকলে সরকরি কর্তৃপক্ষ অনুমতি নাও দিতে পারে, আসামের ওরা ভাগ বসাতে পারে। তারচেয়ে সব গোপনে সেরে জিনিসটা উদ্ধার করতে পারলে তখন আমরাই সরকারকে

জানাবো। আর যেহেতু সাউথ এশিয়ান আর্কিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন আমাদের পেছনে আছে, কাজেই সরকারও তখন কিছু করতে পারবে না। পরে কী করা হবে সরকার আর অ্যাসোসিয়েশন মিলে সেই সিদ্ধান্ত নিবে। আমার কাছেও এটাই ঠিক মনে হয়েছে। সত্যি কথা হলো, আমি এতোকিছু ভাবিইনি। আমার উদ্দ্যেশ ছিল যেভাবেই হোক ব্ল্যাক বুদ্ধা উদ্ধার করা। এটা উদ্ধার করতে পারলে তুতেম খানের মমি আবিষ্কারের পর সবচেয়ে বড় আবিষ্কার হবে আর্কিওলজির জগতে।"

"তারপর, পেরেছিলেন আপনারা ব্ল্যাক বুদ্ধা আবিষ্কার করতে?"

ডক্টর কড়া দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল তানভীরের দিকে। "আপনার কি মনে হয়, যদি নাই পারতাম তবে আমার এই মুহূর্তে এই অবস্থা কেন?"

"মাই গড! তারমানে আপনারা ঠিকই ব্ল্যাক বুদ্ধা..."

"ঠিক, আমরা সেই দুটো লেখা মিলিয়ে প্রায় তিন বছর ধরে ধীরে-ধীরে আসামের সেই বিরাট মন্দির এলাকা খুঁজে বের করি। তারপর কাজ শুরু করি দ্বিতীয় ম্যাপ নিয়ে। একদিকে আসাম কর্তৃপক্ষকে ধোঁকা দেয়া, অন্যদিকে উলফাদের একটা সিসটার মিলিট্যান্সি গ্রুপের সাথে আমাদের সংঘর্ষ লাগে, ওরা ঠিকই বুঝে ফেলেছিল আমরা ভিন্ন কিছু করতে যাচ্ছি। সবমিলিয়ে দুনিয়ার সব ঝামেলা পার করে আমরা ব্ল্যাক বুদ্ধা শুধু খুঁজেই বের করিনি, সেই মন্দিরের তল থেকে সেটাকে উঠিয়ে এনে ঠিকই ওইদিন রাতে দেশে প্রবেশ করি ওটাকে নিয়ে।"

"তাহলে গোলটা বাঁধলো কখন?" জালালের প্রশ্ন। "মানে ঝামেলা লাগলো কখন?"

"ঝামেলাটা কখন লাগলো সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। চ্যাঙ আসলে খুবই বিচিত্র আর অবাক করার মতো একজন মানুষ। তার গুনের যেমন কোন শেষ নেই তেমনি ধৈর্যও অপরিসীম। তবে অভিযানের শেষ দিকে এসে চ্যাঙকে মাঝে-মাঝে আমার খুব অস্থির মনে হত, আবার হঠাৎ-হঠাৎ সে খুবই হিংস্র আর জঘন্য ব্যবহার করতো। তার মতো অ্যাকাডেমিকের সাথে যেটা একেবারেই মেলে না। তবে অভিযানের শেষ দিকে আমার ওপরে সে খুব নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল, তাই মাঝে-মধ্যে খারাপ ব্যবহার করলেও অতিরিক্ত কিছু করতো না। আসাম থেকে জিনিসটা উদ্ধার করার পর সেই মিলিট্যান্সি গ্রুপ আমাদের পিছু লাগে। তখন খুব দৌড়ের ওপরে ছিলাম আমরা, জিনিসটা নিয়ে কোনমতে দেশে প্রবেশ করতে পারলেই বাঁচি। তখন কী যে ঘটেছিল আমার ঠিক খেয়াল নেই, তবে ওরকম বাজে অবস্থাতেও আমার মনে হচ্ছিলো আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। আমি ঘুমিয়ে পড়ি, ঘুম ভাঙে একেবারে বাংলাদেশে প্রবেশ করার পর। জেগে ওঠার পর আমি বুঝতে পারি কিছু একটা গন্ডগোল হয়েছে। তখন চ্যাঙ আমাকে জানায়, সে আসলে এতোদিন নিজের পরিচয় গোপন করেছে। সে মনে হয় আমাকে মেরেই ফেলতো, কিন্তু এমন সময় ঘটে ভিন্ন এক ঘটনা। আমাদের ট্রাকের ওপরে আক্রমণ হয়।"

“আক্রমণ হয় মানে?” তানভীর অবাক হয়ে জানতে চেয়ে আবার জালালের দিকে ফিরে তাকাল।

“জানি না, ব্যাপারটা আসলে কি? কিন্তু সত্যি-সত্যি আমাদের ওপরে আক্রমণ হয়। এরপর কী হয়েছিল আর না হয়েছিল আমি বলতে পারবো না। কারণ ওখানেই আক্রমণকারীরা আমাকে বেঁধে কোন একটা ইনজেকশন পুশ করে। এরপর থেকে ঔষুধের ঘোরে থাকার কারণেই হয়তো আমার আর কিছু পরিষ্কার কিছু মনে পড়ে না।”

“লোভে পাপ, পাপে বাচ্চার বাপ,” মৃদু টিটকিরির সুরে বলে উঠলো ওসি জালাল। “আমি একটা জিনিস বুঝলাম না আপনার মতো দশ ঘাটের জল খাওয়া একজন মানুষ এটা বুঝতে পারলো না যে চ্যাঙের মতো একজন মানুষের সাথে মিলে এভাবে দুই দেশের সরকারের সাথে ধোঁকাবাজি করে আপনারা একটা অভিযান চালাবেন আর সেটার ফলাফল চ্যাঙের মতো একজন লোক নিজের কাজে না লাগিয়ে পৃথিবীর সমনে তুলে ধরবে!” বলে জালাল নিজের দুই হাত তুলে ধরলো। “দুনিয়ার উন্নয়নের জন্যে?”

ডক্টর কথা না বলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। “এখন আমি যা-ই বলি না কেন সবই মিথ্যে আর বানোয়াট শোনাবে, কারণ আমি ধরা খেয়ে গেছি। আর ধরা খাওয়া মানুষের কথা পৃথিবী শোনে না, কখনোই না,” বলে সে খানিকটা দুঃখের হাসি হাসলো। “তবে একটা সত্যি কথা হলো, পুরো ব্যাপারটা আপনারা এখন যে-দৃষ্টিতে দেখছেন অথচ আজ থেকে তিন বা চার বছর আগে ব্যাপারটা এমন ছিল না,” বলে সে উঠে বসলো।

“চ্যাঙকে আমার কাছে মাঝে-মধ্যে খুবই জ্ঞানী মনে হত। সব কাজে তার নিজস্ব একটা দৃষ্টিভঙ্গি আছে, সেইসাথে তার নিজস্ব একটা ফিলোসফিও। অস্বীকার করতে দ্বিধা নেই আমি চ্যাঙকে পছন্দ করতাম। আমরা দুজনে মিলে ভেবেছিলাম এমন একটা কিছু করবো যেটা সবার কাজে লাগবে। সত্যি বলতে আমরা আমাদের আবিষ্কারকে নির্দিষ্ট কোন গন্ডি কিংবা কোন দেশের সীমানার ভেতরে আটকে ফেলতে চাইনি। এই কারণেই এতোসব লুকোছাপা। চ্যাঙের একটা কথা আমার খুব পছন্দের ছিল, ‘হয় তুমি পৃথিবীকে বদলে দাও, আর না হয় পৃথিবীই তোমাকে বদলে দিবে’,” ডক্টর উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল জানালা দিয়ে, সে ফিরে তাকাল তানভীরের দিকে। “ঠিক না মিস্টার তানভীর, আমাদের সবচেয়ে কাছের মানুষগুলোই আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি বদলে দেয়। যাদেরকে আমরা সবচেয়ে বেশি আপন মনে করি।”

ডক্টর একেবারে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তানভীরের চোখে। বুকের ভেতর থেকে উঠে আসা গভীর নিঃশ্বাসটাকে আবারো বুকের ভেতরেই চালান করে দিয়ে তানভীরও একই দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ডক্টরের দিকে।

“ডক্টর, আপনাদের ফিলোসফিতে আমার কোন আগ্রহ নেই। আমি ঘটনার ওপরে ফোকাস করতে চাই। আপনি যা বলছেন তাতে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, আপনি আর চ্যাঙ মিলে ব্ল্যাক

বুদ্ধা উদ্ধার করে দেশের ভেতরে প্রবেশ করেন, এরপরে আপনাদের ওপরে হামলা হয়। ব্যাপারটা কারা ঘটিয়েছে কিংবা কী ঘটেছে এই ব্যাপারে আপনার কোন ধারণা আছে?"

"এখানে আপনাদেরকে একটা ব্যাপার বলা হয়নি। পুরো অভিযানে শুধু আমি আর চ্যাঙ ছিলাম না। আমাদের একজন ফিন্যানশিয়ার ছিল," বলে ডক্টর মাথা নেড়ে বললো, "চাইলে স্পনসরও বলতে পারেন। বছর দুয়েক আগে তখন আমরা অভিযানের বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গায় আছি এমন সময় সরকারি সহায়তা বন্ধ হয়ে গেলে বাধ্য হয়ে আমাদেরকে অভিযান বন্ধ করে ফিরে আসতে হয়। এমন সময় আমাদেরকে শুধু অর্থ সহায়তা নয় বরং লোকবল থেকে শুরু করে অন্যান্য সব ধরণের সহায়তা করে একজন মানুষ।"

"লাক্কাতুরার সেই বাংলোর মালিক?" তানভীর নোট নিচ্ছিলো তার মাঝেই হঠাৎ বলে উঠলো।

"হ্যাঁ, একদম ঠিক বলেছেন। আপনাদের সাথে কি তার দেখা হয়েছে?" ডক্টরের চোখে দপ করে আলো জ্বলে উঠলো যেন।

"মানুষটা কে, সেটাই তো জানতে পারিনি এখনো?" তানভীর একবার জালালের দিকে দেখে নিয়ে বলে উঠলো।

"সিলেটের বিশিষ্ট ব্যবসায়ি হেকমত আবদুল্লাহ। আমরা যখন হন্যে হয়ে আমাদের অভিযানের জন্যে একজন স্পনসর খুঁজছিলাম তখন উনিই আমাদেরকে সব ধরণের সহায়তা করার প্রতিজ্ঞা করেন। ওই বাংলোটাকেও উনি আমাদের টেম্পোরারি অফিস করার অনুমতি দেন।"

"বিনিময়ে?" জালাল জানতে চাইলো। "আমি হেকমত আবদুল্লাকে চিনি না কিন্তু তার মতো ব্যবসায়িদের খুব ভালোভাবে চিনি। বিনিময়ে সে কি চায়? নিশ্চই মহানুভবতা দেখানোর জন্যে তার মতো একজন লোক একটা অ্যাকাডেমিক প্রজেক্টের পেছনে টাকা ঢালতে শুরু করে নি।"

ডক্টরের মাথা নিচু হয়ে গেল। "এই ব্যাপারটাও আমি সঠিক জানি না। কারণ চুক্তিটা করেছিল চ্যাঙ। তাদের ভেতরে কী চুক্তি হয়েছিল সেটা আমি জানি না, তবে এটা বুঝতে পারতাম সেটা ভালো কিছু না। কারণ প্রায়ই আমরা অভিযানে যাবার সময়ে দেখতাম ট্রাকে আমাদের জিনিসপত্রের আড়ালে নানা ধরণের মাল তোলা হত। ফেরার সময়েও একই ঘটনা ঘটতো।"

"তারমানে বুঝেছেন?" জালাল তানভীরের দিকে ফিরে বলে উঠলো। "অ্যাকাডেমিক ছাড়পত্র ব্যবহার করে ওরা ট্রাকে ক'রে অবৈধ জিনিসপত্র আনা নেওয়া করতো। চোরাচালান আর কি। মনে হয় অস্ত্র চোরাচালান করতো। কারণ ড্রাগ আজকাল এমনেই আসে-যায়। ওটার জন্যে এতো কাহিনীর দরকার পড়েনা। তবে অস্ত্র নিয়ে ঝামেলা আছে।

তাই ওরা অ্যাকাডেমিক পারপাসকে ব্যবহার করে এর আড়ালে সম্ভবত অস্ত্র আনা-নেয়া করতো।”

“তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, আপনারা দেশে ঢোকার পর একেবারে সঠিকভাবে সঠিক সময়ে আপনাদের ওপরে হামলা হলো, ব্যাপারটা আমাকে খোঁচাচ্ছে। এই ব্যাপারটা জানতো একমাত্র-”

“হেকমত আবদুল্লাহ,” ডক্টর বলে উঠলো। দীর্ঘক্ষণ কথা বলাতে তাকে এখন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে, সেইসাথে কিছুটা ক্লান্তও। “আপনি ঠিকই ধরেছেন অফিসার। আমার বিশ্বাস ঠিক যেভাবে চ্যাঙ আমাকে ধোঁকা দিয়েছে ঠিক একইভাবে হেকমতও চ্যাঙকে ধোঁকা দিয়ে ছিনিয়ে নিয়েছে মুর্তিটা। আমার বিশ্বাস ব্ল্যাক বুদ্ধা সিলেট শহরেই আছে,” বলে ডক্টর একটু বিরতি দিয়ে নিজেকে সামলে নিলো। “আর সেটা আছে হেকমত আবদুল্লার কব্জায়। সম্ভবত চ্যাঙও তার হাতেই বন্দি।”

জালালের দিকে তাকিয়ে তানভীর বলে উঠলো, “টমি আর ইকবালের সাথে যোগাযোগ করেন। হেকমত আবদুল্লার খবর নিতে হবে এক্ষুণি।” জালাল একবার ডক্টর আর একবার তানভীরকে দেখে নিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বাইরে চলে গেল।

“ডক্টর, আপনি যখন ওই বাংলোতে ছিলেন আপনার কোন স্মৃতি মনে পড়ে? বা ওরা কি আপনাকে কিছু বলেছে, অথবা এমন কিছু যা আমাদের কাজে সহায়তা করতে পারে?”

“অফিসার আমি-” ডক্টর মিতায়ন বলতে শুরু করার আগেই তানভীরের মোবাইল বাজতে লাগলো। ও মোবাইল বের করে দেখলো সুলতানের কল। ও কলটা রিসিভি করার আগেই ওসি জালাল প্রবেশ করলো রুমে। তার চেহারা দেখেই তানভীর অনুমান করলো গুরুতর কিছু একটা ঘটেছে। ও সুলতানের কলটা রিসিভ না করে কেটে দিলো।

“কি ব্যাপার-”

“কমান্ডার আমি টমিকে কল দিয়ে হেকমত অবদুল্লার কথা বললাম কিন্তু ও ভূমি অফিস থেকে জমি রেজিস্ট্রির দলিল ঘেঁটে বাংলোর মালিক যে হেকমত এটা আগেই বের করে ফেলেছিল। ওটা বের করে ও হেকমতের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে জানতে পারে হেকমত আবদুল্লার লাশ পাওয়া গেছে,” বলে সে হতবিহ্বল ভঙ্গিতে একবার তানভীরকে দেখলো সেইসাথে অধিক ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া ডক্টর মিতায়নকেও।

“নিজ বাড়িতে একদিন আগে খুন হয়েছে সে।”

অধ্যায় ছত্রিশ

সময়: ১৮০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ

পৃত্থুরা বসভূমি, কন্নোর, ভারতবর্ষ

হোক না অন্যের বাড়ি, তবুও তো ঘর, একান্তই নিজের ঘর, নিজের পরিবার।

এরকম বাড়ি-ঘর-ছোট গ্রাম দেখলে শামানের মনটা সবসময় কেমন জানি আনচান করে ওঠে। আজো নিজের স্থায়ি ঘরবাড়ি আর পরিবার হলো না। হয়তো কোনদিনই হবে না। ছোট-ছোট বাড়িগুলো থেকে দৃষ্টি সরিয়ে শামান ফিরে তাকাল ওর পাশে কুঁকড়ে-মুঁকড়ে বসে থাকা ঘোষিতের দিকে।

“ঘোষিত, তুমি কি নিশ্চিত?” শামান শেষবারের মতো প্রশ্ন করলো। গায়ের শতছিন্ন পোশাক আর মাথার কালি মাখানো চুল সবমিলিয়ে খুবই বিচ্ছিরি লাগছে ওর। কিন্তু এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। “ঘোষিত, আমি মনে হয় কিছু একটা জানতে চেয়েছি?”

“ওহ ওহ্,” ঘোষিত তার কোমরে গুঁজে রাখা থলে থেকে কোন এক ধরণের গুঁড়ো বের করে হাতের তালুতে রেখে অত্যন্ত যত্নের সাথে নাক দিয়ে টেনে নিতে নিতে জবাব দিলো। শামান খপ করে তার হাতের তালু থলেসহ চেপে ধরে জোরে মুচড়ে দিলো। “কথা জিজ্ঞেস করি, কানে যায় না?”

“আহ, আহ! আরে ওস্তাদ, ছাড়ো,” বলে সে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ওদের সাথেই পথের একপাশে অপেক্ষারত ভুখা-নাঙ্গা চেহারার ছোট-খাট লোকটার মাথায় চাটি মারলো। “এই ব্যাটা, ওস্তাদ কী বলে, উত্তর দে।”

“আইবো হুজুর, ওরা আইতে বাইদ্য,” ভয়ের চোটে রীতিমতো কাঁপতে থাকা লোকটা প্রায় সাথে-সাথে জবাব দিলো। “হেগো নিজেগো ফায়দা আছে না?”

“কথা যেন ঠিক থাকে, না থাকলে কিন্তু খবরই আছে,” বলে সে একটা হাত তুলে শাঁসাতে-শাঁসাতে বলে উঠলো, “পরে যদি উল্টো-পাল্টা কিছু হয় তাইলে কিন্তু জ্যান্ত চামড়া ছাড়ায়া নিবো।”

“অরে হুজুর, কিছুই হইবে না,” হাত নেড়ে হাসির সাথে বলে উঠে ঘোষিত আবারো তার নেশা করার থলেটা মুখের সামনে উঠাতে যাচ্ছিলো তার আগেই শামানের কড়া চাহনি দেখে থেমে গেল। দুজনকে আবারো ঠিক-ঠাক মতো দাঁড়াতে বলে শামান মাথার ওপরে

উঠতে থাকা গনগনে সূর্যের দিকে একবার দেখে নিয়ে জঙ্গলের দিকে তাকাল। ওখানেই ওর লোকেরা অপেক্ষা করার কথা।

ওরা এই মুহূর্তে অবস্থান করছে থারুদের বসতি থেকে মাইল তিনেক জঙ্গলের ভেতরে একটা বিশেষ জায়গায়। জায়গাটার একপাশে একটা ছোট্ট নালার মতো আছে, সেটা সরু থেকে ধীরে-ধীরে চওড়া হয়ে দূরবর্তী নদীতে গিয়ে মিশেছে। এই নালাটার পাশেই জঙ্গলের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় পর-পর কয়েকটা ঘরে একাধিক পরিবার বসবাস করে। এই পরিবারগুলো অত্র এলাকায় একটা বিশেষ কারণে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই পরিবারগুলো বংশতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশেষ একটা পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট।

এরা জঙ্গল থেকে বিভিন্ন প্রাণী শিকার করে তাদের নাড়ি কিংবা অন্ত্রকে প্রক্রিয়াজাত করে সেটার সাহায্যে এক ধরণের ফিতার মতো তৈরী করে। রাজ পরিবার থেকে শুরু করে অনেক সাধারণ মানুষের কাছে এই জিনিসটার কারণেই এই পরিবারের বিরাট গুরুত্ব। প্রশ্ন হলো, সমাজের উঁচু স্তর থেকে শুরু করে একেবারে নিচু স্তর পর্যন্ত এই সুতোর এতোটা গুরুত্ব কেন। গুরুত্ব থাকার কারণ হলো এই বিশেষ ফিতা পাকিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস তৈরী করা হয়।

জিনিসটা হলো ধনুকের ছিলা। ধনুকের ছিলা- মানে ধনুকের যে অংশতে টেনে ধরে তীর ছোঁড়া হয় সেই অংশটাকে ছিলা বলে। এই ছিলা জিনিসটা যেকোন ধর্নুবিদদের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একটা ভালো ছিলার ওপরে অনেক কিছুই নির্ভর করে। যেকোন ধরণের ধনুকের জন্যে উন্নত প্রাণীর অন্ত্র থেকে নির্মিত ছিলা সবচেয়ে ভালো মানের হয়ে থাকে। এই জিনিসটা নির্মাণে ছিলাটাকে কিভাবে প্রক্রিয়াজাত করা হচ্ছে সেটার বিরাট একটা ভূমিকা থাকে। কাজেই এই পেশায় সবসময়ই দক্ষ হাতের অনেক দাম। সবাই এই পেশায় দক্ষ হয় না। এ-কারণেই গুটিকয়েক পরিবার যারা এই কাজে দক্ষ তাদের বেশ কদর।

এই ব্যাপারটাই কাজে লাগাতে চাইছে শামান। তবে শামানেরা ধনুকের ছিলার জন্যে এখানে আসেনি বরং তারা এসেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক উদ্দেশ্য নিয়ে। রাজা বিক্রম গতদিন সব বর্ণনা করার পর শামান যখন ঘোষণা করে ওরা যে করেই হোক ডুকপা লামাকে উদ্ধার করবে সেইসাথে এই অন্ধকবারে অবতার-ফবতার যেটার কথই বলুক না কেন সেটার শেষ দেখে ছাড়বে ও, তখন রাজা বিক্রম আর ওরা মিলে পরিকল্পনা করতে বসে।

প্রথমেই রাজা বিক্রম ওদেরকে সম্পূর্ণ ব্যাপারটার সবচেয়ে বড় সমস্যাটা তুলে ধরে। সেটা হলো, লিচ্ছবী আর উরগরা মিলে ডুকপা লামাকে আসলে কোথায় রেখেছে কিংবা এই অন্ধকারের অবতার কিংবা মুর্তি যাই নির্মাণ করুক ওরা সেটা আসলে করছেটা কোথায় সেটা বের করাটাই সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার। রাজা বিক্রম আর শঙ্কর মিলে ওদেরকে পুরো এলাকার একটা চিত্রের মতো এঁকে নিয়ে একটা একটা করে সম্ভ্যাব্য সব জায়গাগুলোকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করে। রাজা বিক্রম আর শঙ্করকে সাহায্য করে থারু রাজা মানরু

কালন্তি আর সেইসাথে ঘোষিত আর জাথুরিয়া। কারণ এলাকা ওরাও খুব ভালো চেনে। সমস্ত আলোচনা শেষে সবাই মিলে সিদ্ধান্তে আসে, ওরা ডুকপা লামাকে বন্দি করে এই মুর্তি নির্মাণের ব্যাপারটা পুরো কন্নোর এলাকার শুধুমাত্র দুটো জায়গাতেই সম্ভব।

এই এলাকাতে রাজ্য শাসন, মালামাল গুদামজাত সহ সামরিক কাজে ব্যবহার করার জন্যে তিনটে বড় আকৃতির স্থপনা বা দুর্গ রয়েছে। এই দুর্গগুলোর ভেতরে রাজা বিক্রমকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল রামগড়ের দুর্গে। রাজা বিক্রম মোটামুটি নিশ্চিত ওই দুর্গে ডুকপা লামাকে রাখা হয়নি। তাহলে বাকি রইলো অন্য দুটো দুর্গ। একটা হলো মধুসন্তলার আস্তানা আর অন্যটা হলো বিধোরীর দুর্গ। দুটো দুর্গই আকারে বিরাট আর প্রহরাও অনেক বেশি। কাজেই ডুকপা লামা এই দুটো দুর্গের ঠিক কোনটাতে আছে আগে সেটা বের করতে হবে তারপর চালাতে হবে অভিযান।

সেটা করার জন্যে শামানই একটা বুদ্ধি দেয়। লিচ্ছবী রাজার বাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করে এমন সৈনিকরা অবশ্যই জানবে ডুকপা লামাকে কোথায় রাখা হয়েছে, কাজেই ওদেরকে সৈনিকদের কাছ থেকে তথ্য বের করতে হবে। যেহতু মন্তলার হাটে একটা ঘটনা ঘটে গেছে আর সেটার কারণে এখন জঙ্গলের পথ থেকে শুরু করে সবখানে প্রহরা ইত্যাদি সব বেড়ে গেছে কাজেই ওদেরকে ফাঁদ পেতে সৈনিকদের দলটাকে ধরতে হবে। এছাড়া আরেকটা কারণে সৈনিকদেরকে দরকার ওদের। ওদের পোশাক আর অস্ত্র।

ডুকপা লামাকে যেখানেই রাখা হয়ে থাকুক না কেন, সেই দুর্গে প্রবেশ করতে হলে হয় ওদেরকে সরাসরি সন্মূখ যুদ্ধে যেতে হবে আর না হয় কৌশলে কাজ উদ্ধার করতে হবে। সন্মূখ যুদ্ধে সেখানে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। আর তাই ওদেরকে লুকিয়ে দুর্গে ঢুকে উদ্দেশ্য হাসিল করতে হবে। আর সেটা করতে হলে একটা উপায় হতে পারে লিচ্ছবীদের সৈনিকের বেশে ভেতরে প্রবেশ করা। কাজেই ফাঁদ পেতে সৈনিক ধরা ছাড়া উপায় নেই।

তবে মাঠে নামার সাথে সাথে ওরা বুঝতে পারে কাজটা সহজ হবে না, কারণ মন্তলার হাটে ওই ঘটনার পর ওরা নিশ্চই পাগলা কুত্তার মতো হয়ে গেছে। বিশেষ করে যেখানে রাজা বিক্রমের মস্তক ছিন্ন করার কথা সেখানে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে পুরো সৈন্যবাহিনীর সামনে থেকে, তাও গুটি কয়েক লোকজন এটা নিশ্চই লিচ্ছবী রাজা হেমচন্দ্র মেনেই নিতে পারছে না।

তাই সঠিকভাবে কাজটা করার জন্যে ঘোষিতরামের সাহায্যে পুরো এলাকায় খবরি বা গুপ্তচর ছড়িয়ে দেয়া হয়। খবর না পেয়ে ওরা যখন মোটমুটি হতাশ, এমন সময় ঘোষিতের এক গুপ্তচর অদ্ভুত এক খবর নিয়ে আসে। থারুদের ডেরার মোটামুটি কাছেই ধনুকের ছিলা প্রস্তুতকারীদের ছোট্ট একটা বসতি আছে, সেখানে লিচ্ছবীদের রাজার তরফ থেকে আসন্ন পরিস্থিতির জন্যে সেরা মানের কিছু ছিলা প্রস্তুত করার জন্যে সেনাপতির সরাসরি নির্দেশ এসেছে কয়েকদিন আগে। ওদের ওপরে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেরা

মানের ছিলা প্রস্তুত করে রাখতে হবে, খোদ সেনাপতির নিজের লোক এসে নিয়ে যাবে ওগুলো।

এই খবর শোনামাত্রই শামান উত্তেজিত হয়ে ওঠে। যদি এই খবর সত্যি হয়ে থাকে তবে ওদের জন্যে এটা একটা বিরাট ব্যাপার হতে পারে। কারণ লিচ্ছবীরা যদি সত্যি-সত্যি কোন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এদের কাছ থেকে জিনিসগুলো নেয়ার জন্যে আসার কথা থাকে অবশ্যই ব্যাপারটা ওদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ কাজেই জিনিসগুলো নেয়ার জন্যে যারা আসবে তাদের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ কেউ না কেউ থাকবে। যদি এদেরকে ঠিকমতো কব্জা করা যায় তবে অবশ্যই এদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে। আর বাড়তি পাওনা হিসেবে পোশাকের ব্যাপারসহ অরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তো আছেই।

সেই ভাবনা অনুযায়ী ওরা তিনটে দলে ভাগ হয়ে প্রস্তুতকারীদের সাথে এসে দেখা করে খুব ভোরে। ঘোষিতরাম ওদেরকে অনেক আগে থেকে চেনে, কাজেই ওদের সাথে কথা বলে ব্যাপারগুলো ঠিক করাটা কঠিন হয়নি। তার ওপরে বহু বছর ধরে এরা থারুদের সাথে ব্যবসা করে আসছে কাজেই পুরনো মালিকদেরকে প্রাধান্য দেয়াটাই ওরা সমীচীন মনে করেছে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী কালন্তির নেতৃতে তীরন্দাজদের পাঁচ জনের একটা দলকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে বাড়ির আঙ্গিনার একদিকে, অ্যনদিকে বিধুর নেতৃত্বে আরেকটা দলকে রাখা হয়েছে ভিন্নদিকে। আর জাথুরিয়ার সাথে আরো কয়েকজনের তলোয়ারবাজদেরও একটা দল আছে বাড়ির পেছনে। জাথুরিয়াদের দলটার মূল কাজ বাড়ির বাসিন্দাদের যেকোন ধরণের বিপদ থেকে রক্ষা করা, সেইসাথে যদি একান্তই প্রয়োজন হয় তবে বিধু অথবা কালন্তিদের সহায়তা করা।

সবশেষে শামান আর ঘোষিত তারা দুজনে বাড়ির মূল কর্তা অর্থাৎ প্রধান ফিতা প্রস্তুতকারীর সাথে ওদেরই লোক সেজে অবস্থান নিয়েছে বাড়ির মূল দরজার কাছে। ওদের কর্মচারি হিসেবে অবস্থান নেয়ার জন্যেই ওদের পুরনো পোশাক পরতে হয়েছে, সেইসাথে নিজের চুল আর চেহারা আড়াল করার জন্যে শামানকে চুলে চোখে-মুখে কালি মাখাতে হয়েছে। নিজের পোশাকের ওপরে চাপাতে হয়েছে ওদের পুরনো নোংরা পোশাক। শরীর কুট-কুট করে ওঠাতে আরেকবার ফিতা প্রস্তুতকারীর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো, “ঠিক জানে তো আজ আসার কথা সৈন্যদের?” শামান হিসেব করে দেখলো প্রায় দুই ঘন্টা হয়ে গেছে সকাল থেকে ওরা বসে অপেক্ষা করছে ওই লোকগুলোর জন্যে কিন্তু কারো কোন খবর নেই এখনো।

“জি হুজুর... ওরা তো আইজকাই আসুনের কতা,” বলে লোকটা মাথা চুলকাতে লাগলো। হঠাৎ অনুচ্চ শিসের শব্দ শুনে শামান জঙ্গলের দিকে ফিরে তাকাল। ওর লোকদের ওপরে নির্দেশ আছে দুই ধরণের শিস বাজানোর জন্যে বেশি জোরে মানে বিপদ আর অনুচ্চ শিস মানে নিজেদের কোন সমস্যা হয়েছে। এইবার দ্বিতীয় ধরণের শিস বেজে ওঠাতে বুঝতে

পারলো নিশ্চই ওর লোকেরাও বিরক্ত হয়ে উঠেছে অপেক্ষা করতে করতে। জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে শামানের মন আনচান করে উঠলো। আর একটানা বসে থাকতে-থাকতে শরীরেও বেশ আড়ষ্টতা এসে গেছে, কাজেই সে উঠে দাঁড়িয়ে শরীরের আড়মোড়া ভেঙে ঘোষিতকে কিছু নির্দেশনা দিয়ে রওনা দিলো জঙ্গলের দিকে।

ধনুকের ছিলা প্রস্তুতকারীদের বাড়ি আর জঙ্গলে মাঝে জায়গাটার দূরত্ব হবে প্রায় পাঁচশো গজের মতো। জায়গাটার মাঝামাঝি পৌছে গেছে এমন সময় খুবই উচ্চ স্বরে শিস বেজে উঠলো। আগের জায়গায় ফিরে যাবে, নাকি জঙ্গলের দিকে যাবে সেটা ঠিক করার আগেই ঘোড়ার শব্দ শুনতে পেল ও। শামান দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলো আগের জায়গাতেই ফিরে যাবে কিন্তু দ্রুত পা চালিয়েও কাজ হলো না। গজ বিশেক এগোনোর আগেই কয়েকটা ঘোড়া আর একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে থামলো প্রাঙ্গনের মাঝামাঝি।

উঠানের ঠিক মাঝখানে আটকা পড়ে গেল শামান।

অধ্যায় সাইত্রিশ

বর্তমান সময়

দক্ষিণ সুরমা আবাসিক এলাকা, সিলেট

মৃত্যুর কি কোন গন্ধ আছে?

ব্যাপারটা বিভিন্ন বইতে পড়েছে তানভীর। বিশেষ করে থ্রিলার বইতে বিভিন্ন পন্থায় বর্ণনা করা থাকে কিভাবে নায়কেরা মৃত্যুর গন্ধ পায়- বিপদের গন্ধ ভেসে বেড়ায় বাতাসে।

ব্যাপারগুলো কতোটা সঠিক কখনো অনুধাবন করতে পারেনি ও। তবে হেকমত আবদুল্লার বাড়িতে প্রবেশ করে বাতাসে মৃত্যুর গন্ধ না পেলেও মৃতদেহের গন্ধ ও ঠিকই টের পেল।

সিলেটের বিশিষ্ট ব্যবসায়ি ও ডক্টর মিতায়নদের আসাম অভিযানের অর্থ যোগানদার হেকমত আবদুল্লার বাড়ির ভেতরে খুবই বাজে একটা গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। বাড়িটাতে প্রবেশ করা মাত্রই মাংস পচা গন্ধটা যেন নাকে এসে বাড়ি মারলো।

পুলিশ হাসপাতালে ডক্টর মিতায়নের সাথে কথা বলার সময়ে ওসি জালাল এসে যখন খবর দিলো টমিরা জানতে পেরেছে হেকমত আবদুল্লাহ মারা গেছে, সাথে-সাথে ও আর জালাল বেরিয়ে টমির নির্দেশিত দক্ষিণ সুরমায় অবস্থিত হেকতম আবদুল্লার বাড়ির দিকে রওনা দেয়। পথিমধ্যে সুলতান আর ইকবালের সাথে কথা হয়। ওরা নচি বিশ্বাসকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। ওদেরকে তানভীর নির্দেশ দেয় নচি বিশ্বাসকে পাওয়া মাত্রই যেন ওকে জানানো হয়, কারণ ও নিজে নচি বিশ্বাসের সাথে কথা বলতে চায়। উদ্ধার হওয়া অস্ত্র আর বাংলোতে মারা যাওয়া আদিবাসী লোকগুলোর ব্যাপারে জানতে হলে এখন নচি বিশ্বাসই একমাত্র ভরসা।

খুব অল্প সময়ের ভেতরেই ওদের গাড়ি দক্ষিণ সুরমা এলাকায় প্রবেশ করে। সিলেট শহরে দুটো সুরমা এলাকা আছে। একটা আখালিয়া সুরমা, অন্যটা দক্ষিণ সুরমা। আগে সিলেটে থাকার সুবাদে তানভীর জানে দক্ষিণ সুরমা মূলত অভিজাত লোকজনের এলাকা। টমির নির্দেশিত ঠিকানা খুঁজে বের করে ওরা বিরাট একটা বাড়ির আঙ্গিনায় প্রবেশ করে মাইক্রো নিয়ে। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাড়িটার অবস্থান। বাড়ির সামনে খোলা জায়গাতে সুন্দর বাগান, বাড়ির সামনে নির্মিত বাড়িটার মার্বেলে মোড়ানো বিরাট বিরাট থাম। বাড়ির অঙ্গিনাতে বেশ কয়েকটা গাড়ি দাঁড়ানো। সবগুলোই পুলিশ কিংবা ফরেনসিকের গাড়ি।

তানভীর আর জালাল মাইক্রো থেকে নেমে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করতেই বিশ্রী গন্ধটা ওদের নাকে লাগে। ওদেরকে দেখে টমি দৌড়ে এলো। “বস, আর বইলেন না, বাজে

অবস্থা । বাড়ির দারোয়ান, হেকমত আবদুল্লার সেক্রেটারি আর হেতকম আবদুল্লাহ, তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে বাড়ির রান্নাঘর থেকে। তিনজনকেই একইভাবে গুলি করা হয়েছে।"

"আমি ডেডবডিগুলো দেখবো," বলে তানভীর টমিকে পথ দেখাতে বললো। টমি ওদেরকে পথ দেখিয়ে সোজা লম্বা হলওয়ের মতো ডায়নিং রুমে নিয়ে এলো। সেখানে তিনটে মৃতদেহ সারি দিয়ে রাখা হয়েছে। ফরেনসিকের একজন নিচু হয়ে একটা মৃতদেহ পরীক্ষা করছিল ওদেরকে দেখতে পেয়ে মৃতদেহটার ওপরে রাখা ক্লথের মতো জিনিসটাকে আরেকটু সরিয়ে ধরলো।

তানভীর মুখে রুমাল চাপা দিয়ে এগিয়ে গেল ওটার দিকে, টমি আগে থেকেই মুখে মাস্ক পরে ছিল। কিন্তু জালালের দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হলো তানভীর। লোকটার কোন বিকার নেই। সোজা তাকিয়ে আছে দেহটার দিকে। মুখে রাখা একটা ম্যাচের কাঠি এদিক থেকে সেদিক করছে সে। তানভীর কোথায় যেন পড়েছিল অতিরিক্ত ধূমপান নাকি মানুষের কিছু-কিছু ইন্দ্রিয় ভোতা করে দেয়। এই লোকেরও মনে হয় তাই হয়েছে।

নজর সরিয়ে দেহটার দিকে তাকাল ও। ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সের এক যুবক। ইতিমধ্যেই অনেকটা ফুলে উঠলেও দেখলেই বোঝা যায় যুবক বেশ সুদর্শন আর স্বাস্থ্যবান ছিল। "গুলি কোথায় করা হয়েছে?" জানতে চাইলো তানভীর।

"এখানে স্যার," বলে লোকটা প্লাস্টিকের মতো কাপড়টা টেনে আরেকটু সরিয়ে দিলো। নিঁখুত গোল একটা ফুটো, বুকের ঠিক বাম পাশে হৃদপিন্ডের ওপরে। ওটার চারপাশে গোল হয়ে ছড়িয়ে আছে শুকনো রক্ত, খানিকটা গড়িয়েও পড়েছে বাইরে। "ইনি নিশ্চই হেকমত আবদুল্লাহ নন?"

"নাহ স্যার," টমি বলে উঠলো ওর পাশে থেকে। যুবকের পাশেই এক মধ্য বয়স্ক একজন লোকের দেহ রাখা। কাপড় সরাতেই দেখা গেল ছাগুলে দাড়িওয়ালা পাতলা চুলের একজন মানুষ। "একেও কি...?"

তানভীর প্রশ্ন শেষ না করতেই ফরেনসিকের লোকটা বলে উঠলো, "একই স্যার। ঠিক হৃদপিন্ডের ওপরে নিখুঁত ফুটো।"

"স্যার, খুবই প্রফেশনাল হাতের কাজ-"

ওসি জালাল মৃতদেহের একবারে শিয়রে বসে গুলির ফুটোটা দেখছিল। "যে গুলি করেছে তাকে শুধু প্রফেশনাল বললে অপমান করা হবে। একেবারে আন্তর্জাতিক ট্রেনিং প্রাপ্ত এবং অভিজ্ঞ।"

"তাই নাকি?" একটু টিটকিরির সুরে বলে উঠলো তানভীর। "শুধু গুলির ক্ষতমুখ দেখেই খুনির ট্রেনিঙের বিবরণও দিয়ে দেবেন মনে হচ্ছে?"

জালাল আগুনে চোখে তানভীরের দিকে ফিরে তাকাল। "গুলিটা শুধু ঠিক জায়গামতোই করা হয়নি, এমনভাবে অ্যাঙ্গেল করে করা হয়েছে যাতে কাজ ঠিকই হয় আবার পরিমাণে বেশি রক্তও না ঝড়ে," বলেই সে ফিরে তাকাল ফরেনসিকের লোকটার দিকে। "কি, ঠিক বলেছি?"

লোকটা একবার একবার তানভীরকে দেখে নিয়ে জালালের দিকে ফিরে জবাব দিলো, "জি, স্যার।"

এবার জালালের মুখে ফুটে উঠলো টিটকিরির হাসি। "কমান্ডার, আমি যতোই পিস্তল চালাই এরকম গুলি এমনকি আমিও চালাতে পারবো না।"

"কখন মারা হয়েছে এদেরকে?" ফরেনসিকের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো।

"স্যার, নির্দিষ্ট সময়টা বলতে গেলে তো অবশ্যই পোটমর্টেম করতে হবে তবে অবশ্যই দুদিন হবে," বলে সে সাথে যোগ করলো। "প্রাথমিক সুরতহাল দেখে তাই মনে হচ্ছে। প্রত্যেকের বুকের ওপরে পিস্তল চেপে ধরে একটা করে গুলি করা হয়েছে।"

"তৃতীয় লোকটা কে?" জালাল জানতে চাইলো।

"বাড়ির দারোয়ান, স্যার।"

তানভীরের গা গুলাতে-গুলাতে এখন ওর বমি লাগছে। ও ইশারায় টমি আর জালালকে বাইরের দিকে বেরুতে ইশারা করে নিজেও সেদিকে এগুলো। বাইর লনে দাঁড়িয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে খানিকটা সুস্থির লাগলো।

জালালের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, "জালাল ভাই, একটা সিগারেট দেন তো"

টমি আর জালাল দুজনেই বিস্ময়ের সাথে দেখলো ওকে। বিশেষ করে জালাল, একে তো ভাই ডাকছে আবার সিগারেট চাইছে কিছু না বলে যন্ত্রের মতো একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিলো সে তানভীরের দিকে। ওটা ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে তানভীর বলে উঠলো, "টমি কিভাবে কী হলো, বল দেখি। এভাবে সিলেটের একজন গন্যমান্য ব্যাক্তি দুই দিন ধরে খুন হয়ে পড়ে আছে তার নিজের বাড়িতে, কেউ টের পেল না, এটা কিভাবে সম্ভব? আর তু-ই বা একে বের করলি কিভাবে?"

"স্যার, আপনারা বের হয়ে যাবার পর প্রথমেই আমি ভূমি অফিসে একজনকে কাজে লাগিয়ে দেই। মজার ব্যাপার হলো, সে কাজ শুরু করার আগেই জানতে পারে ডক্টর মিতায়নকে উদ্ধার করা হয়েছে যেখান থেকে সেই বাংলোর মালিক বিশিষ্ট ব্যবসায়ি হেকমত আবদুল্লাহ। কারণ ভূমি অফিসের অনেকেই মুখে-মুখে জানে ওই এলাকার বহু জমির মালিক হেকমত আবদুল্লাহ। আমাকে জানাতেই আমি তাকে কাগজপত্র চেক করে কনফার্ম করতে বলি। এরপর আমি আমার কাজে লেগে যাই। ডাটাবেজ থেকে তার ব্যাপারে বিস্তারিত বের করে তার সেক্রেটারিকে কল দেই। মোবাইল বন্ধ পাই। হেকমত

আবদুল্লার ব্যবসার মূল অফিসে যোগাযোগ করে জানতে পারি সে নাকি দেশের বাইরে গেছে। কিন্তু কোথায় গেছে সঠিকভাবে কেউই বলতে পারে না। পরে আরো বিস্তারিত খবর নিয়ে জানতে পারি দেশের বাইরে নাকি গেছে তার পরিবারের লোকজন, সবাই মিলে লন্ডনে গেছে হেকমত আবদুল্লার ছোট বোনের ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠানে। হেকমতও যাবার কথা ছিল কিন্তু সে যায়নি," এই পর্যন্ত বলে টমি একটু থামলো।

"ব্যাপারটা আমার কাছে অদ্ভুত লাগে, কারণ হেকমত সাহেব অফিসে বলেছে দেশের বাইরে গেছে অথচ পরিবারের সবাইকে সে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে গেল না, আবার তার ও তার সেক্রেটারি দুজনের মোবাইল বন্ধ। আমি তার বাড়িতে লোক পাঠাই। সেই লোক এসে দেখে পুরো বাড়ি শুনশান, গেটে এমনকি দারোয়ানও নেই। সে দেয়াল টপকে ভেতরে প্রবেশ করে দেখে এই অবস্থা। বস, আপনাদেরকে আমি একটা জিনিস দেখাতে চাই," বলে সে বাড়ির ভেতরের দিকে যাবার ইশারা করলো সবাইকে।

দুজনেই টমিকে অনুসরণ করলো। আবারো সেই জৌলুসময় করিডর, বসার ঘর আর ডায়নিং রুম পার হয়ে ওরা চলে এলো কিচেনে। "এখানে কি?" জানতে চাইলো তানভীর।

"এখানেই মজা, দেখেন বস," বলে সে আলমারির মতো বিরাট আকারের ফ্রিজের দরজাটা একেবারে হা করে খুলে ধরলো। ভেতরের দৃশ্য দেখে তানভীর আর জালাল দুজনেই বেশ অবাক হলো।

না, ভেতরে কোন মৃতদেহ নেই। মানুষের কাটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গও নেই। বরং পুরো ফ্রিজ ভর্তি খাবার। কাচা শাক-সব্জি থেকে শুরু করে রেডিমেইড স্যান্ডুইচ, বার্গার পর্যন্ত হেনতম কোন জিনিস নেই যা ফ্রিজে নেই। পুরো ফ্রিজ বলতে গেলে খাবারে একেবারে উপচে পড়ছে।

"এতো খাবার-" তানভীর একটু অবাক হয়েই বলে উঠলো।

টমি পোদ্দার খুশিতে তালি দিয়ে উঠলো। "একদম ঠিক বলেছেন বস। এতো খাবার। ব্যাপারটা খেয়াল করে দেখেন, একজন লোক তার অফিসে জানালো সে বিদেশ যাচ্ছে। তার পরিবারের লোকজনকে সে বিদেশ পাঠিয়ে দিলো এই বলে যে তার অফিসে কাজ আছে। আবার তার ফ্রিজ ভর্তি খাবার," এই পর্যন্ত বলে টমি চুপ হয়ে রইলো সিনেমাতে দেখানো সাসপেন্স দৃশ্যের মতো।

"তাতে কি, ফ্রিজে খাবার থাকবো না তো কি কাঁথা-বালিশ থাকবে?" জালাল বলে উঠলো।

"আরে..."

তানভীরের মোবাইল বাজতে লাগলো। ও দেখলো ইকবালের কল। ইকবালের সাথে কথা বলা শেষ করে সবাইকে বাইরে যাবার ইশারা করে ও হাঁটতে-হাঁটতে বলে উঠলো। "টমি একদম ঠিক বলেছে, ব্যাপারটা মোটেই স্বাভাবিক না। যে-লোক দুই জায়গায় দুই কথা

বলে ফ্রিজ ভর্তি করে রেখেছে খাবার দিয়ে অবশ্যই তার ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য ছিল। সম্ভবত তার এখানে কারো আসার কথা ছিল-যার সাথে তার গোপন কাজ ছিল," অনেকটা ঘোষণার মতো বলে উঠলো তানভীর।

"বিশেষ করে এর দুইদিন পরেই যদি সে খুন হয়। অবশ্যই সে কিছু একটা করার তালে ছিল, ব্যাপারটা কিছুটা বুঝতে পারলেও সরাসরি কোন সমাধানে এভাবে পৌছানোটা একেবারেই ঠিক হবে না," ওরা বাইরে এসে সোজা চলে এলো মাইক্রোর কাছে। "আমার আরো এভিডেন্স চাই। এটা একটা পাজলের টুকরো মাত্র, পুরো পাজলটা ধরতে হলে আরো অনেক আলগা সুতো জোড়া লাগাতে হবে।"

ড্রাইভারকে মাইক্রো স্টার্ট করতে বলে ও ফিরে তাকাল টমির দিকে। "টমি, তুমি তো ব্যাপক কাজ দেখিয়েছো হে। এতো অল্প সময়ে সব জানলে কিভাবে?"

"স্যার," টমি খুব বিগলিত মুখে বিরাট একটা গল্প শুরু করতে যাচ্ছিলো তার আগেই জালালের দিকে ফিরে তানভীর বলে উঠলো। "ইকবাল কল করেছিল, আমাদেরকে বন্দরের দিকে যেতে হবে। ওরা নচি বিশ্বাসকে খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু ব্যাটা নাকি খুব ঝামেলা করছে," বলেই ও আবারো টমির দিকে ফিরে বাড়ির গেটের ওপরে থাকা সিসি টিভির দিকে দেখালো। "টমি বাড়ির সব সিসি টিভির ফুটেজ চেক করো। আমি-"

"কিচ্ছু নাই, বস। এরই মধ্যে চেক করা হইছে। সব নষ্ট।"

"স্বাভাবিক, যেভাবে তাদেরকে খুন করা হয়েছে এরকম প্রফেশনাল লোকেরা সিসি টিভি ফুটেজ রেখে যাবার কথা নয় কথা," বলে ও একটু ভাবলো। "এক কাজ করো, ফরেনসিককে ওদের কাজ শেষ করে লোকাল পুলিশে খবর দিয়ে বলো ডেড বডি ইত্যাদির ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে হেকমত আবদুল্লার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে। আর তুমি, আশেপাশের বাড়িগুলোতে খুঁজে দেখ, কোন সিসি টিভিতে কিছু পাও কিনা। বিশেষ করে আশেপাশে যদি কোন ব্যাঙ্কের এটিএম বুথ কিংবা যদি কোন সুপারশপ থেকে থাকে তবে ওদের ক্যামেরা অনেক সময় সামনেটা কভার করে। ওগুলোও ঘেঁটে দেখ," বলে ও আরো যোগ করলো। "খুনের সম্ভাব্য সময়টা বের করে ওই সময়টা ঘিরে খোঁজ লাগাও। কিছু পেলে সাথে সাথে আমাকে জানাবে।

টমি মাথা নেড়ে সায় জানাতেই ওরা গাড়িতে উঠে বসলো, "রসুল মিয়া, বন্দরের দিকে চলেন," বলে চোখে সানগ্লাসটা পরে নিয়ে জালালের দিকে ফিরে বলে উঠলো, "দেখি এই ব্যাটা নচি বিশ্বাসের কী সমস্যা।"

জালাল মাইক্রোর জানালা দিয়ে মুখে থাকা ম্যাচের কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তানভীরের দিকে ফিরে বলে উঠলো, "এই ব্যাটা বিচি বিশ্বাস যদি বেশি উল্টা-পাল্টা করে, খোদার কসম ব্যাটার বিচি আমি গলায়া দিবো।"

***

সিলেট শহরের অনেকগুলো প্রচীন ঐতিহ্যের ভেতরে অন্যতম দুটি হলো; কিন ব্রিজ আর আলী আমজাদের ঘড়ি। দুটো স্থাপনাই সিলেটের উত্তর সুরমা এলাকায় প্রায় পাশাপাশি অবস্থিত। ১৮৭৪ সালে- যখন ঘড়ি জিনিসটার তেমন প্রচলন ছিল না- সেই সময়ে কুলাউড়ার জমিদার আলী আমজাদ খান ঘড়িটা স্থাপন করেছিল। বহুবার চালু আর বন্ধ অবস্থায় থাকার পর আড়াই ফিট ডায়ামিটার আর দুই ফিট লম্বা একেকটা কাটার ঘড়িটা এখন আবার বন্ধ। কিন ব্রিজের কাছাকাছি অবস্থিত এই ঐতিহাসিক ঘড়ির নিচেই ইকবালের অপেক্ষা করার কথা।

ওদের মাইক্রো দক্ষিণ সুরমা থেকে রওনা দিয়ে বন্দর এলাকায় পৌছাতে বেশ সময়ে লেগে গেল। একেবারে মধ্যদুপুর হওয়াতে জায়গায়-জায়গায় বেশ জ্যাম। বন্দর পৌছানোর একটু আগেই ইকবালের নির্দেশনা অনুযায়ী রসুল মিয়া গাড়ি ঘুরিয়ে বামে মোড় নিলো। ওদিক দিয়ে কিন ব্রিজে ওঠার আগেই একটু ডানে কাটলেই আলী আমজাদের ঘড়ি। ওটার ঠিক নিচেই দাঁড়িয়ে থাকার কথা ইকবালের।

নির্দিষ্ট দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে রসুল মিয়া সোজা চলে এলো আলী আমজাদের ঘড়ির সামনে। “এনু কই অফেক্ষা খরিয়ের না...”

“ওই যে, ইকবাল আসছে,” মাইক্রোর জানালা দিয়ে সুরমা নদীর পাশ দিয়ে এগিয়ে যাওয়া সুন্দর পায়ে চলা পথটা ধরে প্রায় দৌড়ের গতিতে এগিয়ে আসতে থাকা ইকবালকে দেখা গেল। ওদের গাড়ি উদ্দেশ্য করে হাত নাড়ছে সে। ইকবাল কাছে আসতেই মাইক্রোর দরজা খুলে দিলো তানভীর।

“কি ব্যাপার, কি সমস্যা হয়েছে?” তানভীর একটু উদ্বিগ্ন স্বরেই জানতে চাইলো।

“স্যার,” প্রায় দৌড়ে আসাতে ইকবাল এখন হাঁপাচ্ছে। “এই ব্যাটা নচি বিশ্বাস, দুই দিন আগেও ছিল পুলিশের পোষা কুত্তা, হারামজাদা কিছুদিন হলো টাকা-পয়সা বানিয়েছে আর কিছু নেতা-ফেতার সাথে উঠ-বস করে। হারামজাদার পা মাটিতে পড়ে না।”

“ইকবাল, এতো কথা না বলে হয়েছে কি, সেটা বলো,” তানভীর পয়েন্টে আসতে চাইছে।

“স্যার, শালারে বের করতে আমার আর সুলতানা আপার জান বের হয়ে গেছে,” ইকবাল সুলতানকে ভুলে সুলতানা বলছে। “শালারে এতো কষ্ট করে বের করলাম, ফাজিলে কিনা আমাদের সাথে পল্টি নেয়। সব শোনার পরে সে বলে কিছু জানে না, সে কিছু বলতে পারবে না। এইযে গোঁ ধরলো শালায় আর কিছু বললোই না। আমরাও ছাড়িনা, আমি ওসি স্যারকে কল দিলাম। সে বললো ওরে সার্কিট হাউজে নিয়ে তারপর আপনাকে খবর দিতে।”

“ও কি এখন সার্কিট হাউজে?”

তানভীর প্রশ্ন করতেই ইকবাল একটা হাত তুলে ওরা কিন ব্রিজের যে-দিকে ওরা অবস্থান করছে তার উল্টোদিকে দেখালো। "জি, স্যার। ওরে সার্কিট হাউজে যাওয়ার কথা বলতেই শালায় শুরু করলো তেড়িবেড়ি। কয় ওমুক নেতারে কল দিবো, ওর কোন ক্ষতি করলে খবরই আছে, এমপি সাবরে কল দিবো, হ্যান-ত্যান। এরপরে সুলতানা আপা পিস্তল বের করে ধরতেই রওনা দিলো কিন্তু তেজে ফনফন করছে। অপনারা ফোন করতেই ওকে কোনরকমে সার্কিট হাউজের এক রুমে বসায়া সুলতানা আপা আর দুইজন সিকিউরিটিরে বাইরে রেখে আমি দৌড়ে আসছি।"

ইকবাল উঠে বসতেই গাড়ি ছেড়ে দিলো রসুল মিয়া।

"দ্রুত চলো, যতো দেরি, তত সমস্যা," তানভীর আনমনেই বলে উঠলো।

"এই ব্যাটা অবশ্যই কিছু জানে," জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে ওসি জালাল ।

"অবশ্যই জানে," তানভীর বলে উঠলো। "তা-না হলে সে এরকম অস্বীকার করতো না। যদি তার কোন তথ্য শেয়ার করার না-ই থাকতো তবে সেটা সে প্রথমেই করতো। পুরোটা শোনার পর মানা করতো না। যেহেতু পুরোটা শোনার পর সে বেঁকে বসেছে, তারমানে অবশ্যই সে কিছু না কিছু ধরতে পেরেছে।"

আলী আমজাদের ঘড়ির সামনে থেকে সার্কিট হাউজের সামনে আসতে দুই মিনিট লাগলো। তানভীরের কথা শেষ না হতেই ওদের মাইক্রো সার্কিট হাউজের সামনে এসে থেমে গেল।

"কিন্তু প্রশ্ন হলো, ব্যাটার কাছ থেকে এই স্বল্প সময়ের ভেতরে তথ্য বের করবো কিভাবে?" তানভীর নামতে-নামতে বলতে লাগলো।

"তথ্য বের করার ব্যাপারটা আমার ওপরে ছেড়ে দেন কমান্ডার," বলে ওসি জালাল মাথাটা দুই দিকে ঝাঁকিয়ে ঘাড়ের হাড় ফুটালো কট-কট করে। "ওই ব্যাটা কথা কইবে না মানে, গান গাইবে। আর কথা না কইলে ব্যাটার লম্প-ঝম্ফ আমি ওর 'ভারতের সমুদ্র সৈকত' দিয়া ঢুকায়া দিবো," বলে সে সার্কিট হাউজের ভেতরের দিকে রওনা দিলো।

ইকবাল মাইক্রো থেকে নেমে তানভীরের পাশে দাঁড়িয়ে খুব চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করলো, "স্যার, ভারতের সমুদ্র সৈকত মানে?" মাথা চুলকাতে-চুলকাতে সে বলে উঠলো, "ও আচ্ছা, গো..." তানভীরের রাগত চাহনি দেখে শব্দটা শেষ না করেই থেমে গেল।

রাগের সাথে তার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে কিছু না বলে জালালের পিছু নিলো তানভীর।

অধ্যায় আটত্রিশ

সময়: ১৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ

পৃত্থুরা বনভূমি, কন্নোর, ভারতবর্ষ

লিচ্ছবী সৈন্যদের দলটা ছিলা প্রস্তুতকারীদের বাড়ির আঙ্গিনায় প্রবেশ করতেই শামান একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। কারণ ওকে দৌড়াতে দেখলে কিছু একটা সন্দেহ করে বসতে পারে সৈন্যগুলো। ওরা যেখানে থেমেছে সেখান থেকে শামানের দূরত্ব একেবারেই কম। ঘোড়াগুলো থেমে যেতেই শামানকে উদ্দেশ্য করে কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠলো। স্থানীয় ভাষায় কিছু একটা জানতে চাইছে।

ভাষাটা পরিষ্কার বুঝতে পারলো না শামান। তাই জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে রইলো ও। কারণ যদিও চোহারা কালি দিয়ে আড়াল করে রেখেছে কিন্তু মনোযোগ দিয়ে দেখলে ওর চোখের রঙ বুঝে ফেললে বিপদ হতে পারে, আর মাথার চুল দেখতে পেলে তো কথাই নেই। লোকটা আবারো চেঁচিয়ে উঠে কিছু একটা জানতে চাইলো। শামান কী করবে বুঝতে না পেরে পোশাকের আড়ালে কাতানার বাটের ওপরে ওর হাতের আঙ্গুলগুলো শক্ত হয়ে গেল। দলের প্রধান সৈনিক লোকটা এবার আরো উত্তেজিত স্বরে কিছু একটা বলে উঠতেই দুটো ঘোড়ার ওপর থেকে নেমে এলো আরো দুজন। সবাই মিলে এগিয়ে আসতে শুরু করলো ওর দিকে।

***

কালন্তি আর ওর দলের বাকি চারজন তীরন্দাজ অবস্থান নিয়েছে ছিলা প্রস্তুতকারীদের বাড়ির কাছে আঙ্গিনার পেছনে কয়েকটা ছোট গাছের আড়ালে। অনেকক্ষণ ধরে বসে থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে অনুচ্চ স্বরে শিস বাজিয়েছিল কালন্তি। কিন্তু শিস বাজানোর ফলে যে-পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে সেটা দেখে ভয় পেয়ে গেছে সে। পরিকল্পনা ছিল একরকম কিন্তু ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে অন্যরকম।

পুরো পরিকল্পনা সাজানোই হয়েছিল শামানকে কেন্দ্র করে। বিশেষ ক'রে কখন ওদেরকে আক্রমণ করতে হবে, কিভাবে আক্রমণ করতে হবে সেটা পুরোপুরি শামানের নির্দেশে হবার কথা ছিল। কিন্তু এখন শামান আঙ্গিনার মাঝামাঝি আটকা পড়াতে, সে চলে গেছে

ওদের দৃষ্টির আড়ালে। একদিকে ওরা শামানকে দেখতে পাচ্ছে না, অন্যদিকে কালন্তি বুঝতে পারছে শামান এখন যেখানে আছে তাতে লিচ্ছবী সৈনিকদল আর বিধুদের তীরের ঠিক মাঝখানে আটকে গেছে সে।

ফলে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে এমন, কালন্তির দলের পক্ষেও কিছু করা কঠিন, আবার বিধুরাও কিছু করতে পারবে না। কী করবে না করবে ঠিক করে ওঠার আগেই কালন্তি দেখতে পেল ঘোড়া থেকে নেমে লোকগুলো এগিয়ে যেতে শুরু করেছে শামানের দিকে। মনে-মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো সে। যা হবার হবে কিন্তু সরাসরি আক্রমণে যাবে ওরা। নিজের লোকদেরকে প্রস্তুত হবার জন্যে ইশারা করেই কালন্তি মুখের ভেতরে নিজের দুই আঙ্গুল পুরো দিলো সবাই সাবধান করে আক্রমণের ঘোষণা দেয়ার জন্যে। শিস বাজাবে কিন্তু তার আগেই দেখতে পেল প্রধান ছিলা প্রস্তুতকারী লোকটা দৌড়ে লিচ্ছবী সৈন্যদের কাছে গিয়ে থেমে গেল। চোখ কুঁচকে উঠলো কালন্তির, করছেটা কী ওরা?

***

লিচ্ছবী সৈনিকদের এগিয়ে আসতে দেখে শামানের মুখ-চোখ কুঁচকে উঠেছে। নড়ারও উপায় নেই, আবার সরাসরি আক্রমণে যেতেও বাঁধছে ওর। কারণ ও যদি সরাসরি আক্রমণে যায় তবে অকারণে রক্তপাত তো হবেই মূল কাজটাও হবে না। বিশেষ করে প্রয়োজনমতো সেনাপতির লোকটাকে ধরতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে, আক্রমণ করতে গিয়ে আসল লোকটাকে নিকেশ করে দিলে বাকিদেরকে ধরেও তেমন লাভ হবে না। আবার আক্রমণে না গিয়েও উপায় নেই।

লিচ্ছবীরা প্রায় ওর কাছে পৌছে গেছে এমন সময় দৌড়াতে-দৌড়াতে ঠিক ওদের মাঝখানে এসে পড়লো ছিলা প্রস্তুতকারীদের প্রধান লোকটা। এসেই সে লিচ্ছবী সৈন্যদের কাছে মাফ চেয়ে নিয়ে ওদের সাথে কথা বলতে শুরু করলো। স্বস্তির একটা নিঃশাস ফেললো শামান। লোকটা এসে বাঁচিয়ে দিয়েছে ওকে। কিন্তু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার আগেই সৈন্যদের মাঝের একজন উত্তেজিত হয়ে কিছু বলতে লাগলো ওকে দেখিয়ে। সাথে সে ওকে ইশারা করলো ওদিকে এগিয়ে যাবার জন্যে। বিধু আর কালন্তিদের উদ্দেশ্যে ইশারা করার আগেই বাড়ির ভেতর থেকে একজন কাপড়ে মোড়ানো গাইটের মতো দেখতে জিনিস নিয়ে এসেছে। ওগুলোর একটা চাপিয়ে দেয়া হলো ওর হাতে। জিনিসটা নিয়ে ঘোড়ার গাড়ির পেছনে চলে এলো শামান আর ছিলা প্রস্তুতকারী লোকটা।

“ব্যাপার কি? কী বলছিল ওরা?” শামান জানতে চাইলো।

ছিলা প্রস্তুতকারী লোকটা ফিস-ফিস করে বলে উঠলো। “হুজুর, আপনি কথা না কওয়াতে হেরা সন্দেহ করছিল। আর আমি কইছি, আপনে আমার বাতিজা। দূর গাও থাইক্কা আসছেন, এই এলাকার কথা বোঝেন না। এরপরে ঠান্ডা অইছে। হুজুর সাবধান। এরা বহুত তেন্দর।”

ওরা ঘোড়ার গাড়িটার পেছন থেকে সামনের দিকে চলেছে। লিচ্ছবী সৈনিকদের একজন দলের বাকিদেরকে ওর দিকে দেখিয়ে কিছু একটা বলে হাসাহাসি করছে। শামান পা চালালো, খোলা জায়গাতেই গিয়েই আক্রমণের নির্দেশ দিবে। কিন্তু তার আগেই ওরা এগিয়ে যাবার সময় এক সৈন্য শামানের মাথায় পেঁচিয়ে রাখা কাপড়টা ধরে টান দিলো। সাথে-সাথে ওটা আলগা হয়ে ওর লাল চুলের গোছা ছড়িয়ে পড়লো মাথা জুড়ে। লিচ্ছবী সৈন্যদের একজন চেঁচিয়ে উঠে বাকিদের সাবধান করে দেয়ার আগেই উচ্চস্বরে শিস বেজে উঠলো।

যে-লোকটা শামানের কাপড় ধরে টান দিয়েছিল সে দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে ওর দিকে হাত বাড়ালো ধরার জন্যে। একটানে নিজের কাতানা বের করে আনলো শামান। লোকটার হাতের কাপড় আর তার কোমরে গুঁজে রাখা অস্ত্রের ফাঁক দিয়ে তলোয়ার চালিয়ে কাঠের ঘোড়া গাড়ির সাথে আটকে দিলো তাকে। লোকটা নড়ে ওঠার আগেই ও অন্যহাতে বের করে আনলো নিজের অপর কাতানা। ওর পাশে দাঁড়ানো আরেকজন সৈন্য তরবারি বের করতে যাচ্ছিলো তার আগেই একটা তীর এসে বিঁধলো লোকটার অস্ত্র ধরা হাতে।

শামান তাকিয়ে দেখলো আঙ্গিনা আর জঙ্গল দুই দিক থেকে বিধু আর কালন্তির নেতৃত্বে দুই দল তীরন্দাজ বেরিয়ে এসে ঘিরে ধরেছে ওদেরকে। দ্বিতীয় আক্রমণকারী তীরের আঘাতে অস্ত্র হারাতেই শামান নিজের অপর কাতানাটা দিয়ে ঘোড়ার গাড়ির সাথে আটকানো লোকটার শরীর আর হাত মুক্ত করে দুটো কাতানার ধারালো ফলা দুজনের ঠিক গলার নিচে তাক করে গম্ভীর স্বরে ভাঙা-ভাঙা স্থানীয় ভাষায় বলে উঠলো, “নড়লেই খবর আছে।”

কিন্তু তার সাবধানবাণী শুনলো না একজন। সৈন্যদের মাঝে দাঁড়ানো নেতাগোছের লোকটা ঘোড়ার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। মারামারির সুযোগে প্রথমেই সে ঘোড়ার ওপরে উঠে বসেছে। তার ইচ্ছে ছিল সে ঘোড়ার ওপরে উঠে আক্রমণ করবে কিন্তু সে ঘোড়ার ওপরে উঠে বসেই দেখতে পেল পরিস্থিতি পাল্টে গিছে, একদিকে তাদেরকে ঘিরে ফেলা হয়েছে, তার ওপরে বাকি তলোয়ারবাজদের সাথে লড়তে গিয়ে প্রাণ হারাতে বসেছে তার লোকেরা, তাই সে আগের পরিকল্পনা বাদ দিয়ে সোজা ঘোড়া ছোটালো জঙ্গলের দিকে। শামানরা সাবধান হবার আগেই এক লাফে ওদেরকে ছাড়িয়ে খোলা জায়গার বেশ খানিকটা পার হয়ে গেল সে। জঙ্গলের দিকে ছুট লাগাতেই বিধুর ছুঁড়ে দেয়া দুটো তীর গিয়ে বিঁধলো লোকটার ছুটন্ত ঘোড়ার পেছনের পায়ে, পাগলের মতো লাফিয়ে উঠলো ঘোড়া। ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল লিচ্ছবী নেতা।

শামান তার কাছে পৌছানোর আগেই কালন্তি পৌছে গেল। লোকটা মাটিতে গড়ান দিয়ে উঠে বসেছিল, কালন্তির চাবুক ছুটে গিয়ে পেঁচিয়ে ধরলো তার গলা। ওটা ধরে এক টান দিতেই মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো জবরজং পোশাক পরা লিচ্ছবী নেতা।

শামান তার সামনে গিয়ে নিজের একটা কাতানা ঠেকালো লোকটার গলায়। মুখে মৃদু হাসি নিয়ে বললো, “আমার বিশ্বাস তুমি রাজা হেমচন্দ্রের সেনাপতির লোক, তোমার সাথে আমাদের কিছু কথা আছে। সেইসাথে তোমার লোকদেরকেও দরকার,” বলে লোকটার লাল হয়ে উঠা মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠে ও যোগ করলো, “বিশেষ ক’রে তোমাদের পোশাকগুলো বেশি দরকার আমাদের।”

অধ্যায় উনচল্লিশ

বর্তমান সময়

সার্কিট হাউজ, সিলেট

সার্কিট হাউজের ভেতরটা একেবারে খালি, লোকজন নেই বলতে গেলে। জালাল আর তানভীর ইকবালের সাথে ভেতরে প্রবেশ করতেই রিসিপশন রুমের পাশ থেকে উত্তপ্ত কথোপকথন ভেসে এলো। ইকবাল ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো রিসিপশনের পাশে ছোট্ট একটা কামরায়।

কামরাটার অবস্থান দেখে তানভীর আন্দাজ করলো ওটাতে সম্ভবত সিকিউরিটি গার্ডরা বিশ্রাম নেয়। রুমের বাইরে দাঁড়ানো দুই সিকিউরিটি গার্ড ওদেরকে দেখে স্যালুট ঠুকলো। তানভীর আর জালালকে নিয়ে ইকবাল চলে এলো রুমের ভেতরে।

কামরার ভেতরে একদিকে একটা জলের ফিল্টার, তার অন্যপাশে একটা খাট, আর রুমের ঠিক মাঝখানে একটা টেবিলকে ঘিরে তিনটে চেয়ার। তিন চেয়ারের একটাতে বসা সুলতান। তার ঠিক বিপরীতে বসে আছে সাদা-লুঙ্গি আর সাদা ঢোলা শার্ট পরনে এক লোক। সে খুব উত্তেজিত ভঙ্গিতে চিৎকার করে সুলতানকে কিছু একটা বলছিল, ওদেরকে দেখে থেমে গেল। তানভীর তাকিয়ে দেখলো লোকটা লুঙ্গি-পাঞ্জাবি পরে থাকলেও তার দুটো পোশাকই বেশ দামি, হাতে সোনালি রঙের বিরাট একটা ঘড়ি, গলায় চকচক করতে থাকা সোনার চেইনটাও বেশ মোটা।

লুঙ্গি পরা মানুষটা ওদের তিনজনকে দেখে সোজা তানভীরের দিকে দৃষ্টি স্থির করলো। বুদ্ধিমান লোক, দেখার সাথে সাথেই বুঝতে পেরেছে দলটার নেতৃত্ব কার হাতে। "এইয়া, স্যার, এগু দেখরায় খিতা খইয়ের। আমার মতন একগা বালা মানুষরে এমনিছাই ধরিয়া আনিয়ের..."

"আপনার নাম কি নচি বিশ্বাস?" তানভীর শান্ত স্বরে প্রশ্ন করলো। ওদেরকে দেখে সুলতান উঠে দাঁড়িয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তাকে চুপ থাকতে বলে তানভীর একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো।

"দেখুক্কা অপিসার, আমি কিন্তুক সম্মানি লুক, এগুক্কা আমারে মাঝ দুফরো এমনিছাই ধরিয়া রাখতা ফারিয়ের না। আমি কানুন জানি। খুলাউরার এমপি আমার বাই লাগের, এখতন হের কানে খবর গেলে..."

"আপনি এতো উত্তেজিত হচ্ছেন কেন, নচি বিশ্বাস?" লোকটার কথা শুনে গা জ্বলে যাচ্ছে তানভীরের। "এতো উত্তেজিত হবার মতো কিছু হয়নি। আপনাকে কেউ ধরে আনেনি

এখানে। আমাদের কিছু জিনিস জানা দরকার সে-ব্যাপারে-”

তানভীরের কথা শেষ হবার আগেই নচি বিশ্বাস লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো চেয়ার থেকে। “আফনেগর খিতা জানুনের আছুইন হেয় খিতা আমি খইয়ের নাকি?” বলেই সে লুঙ্গির ভাজ থেকে মোবাইল বের করে ডায়াল করতে-করতে বলতে লাগলো, “আমি অসরতরে খবর দিয়ার, হেয় এগু আইলে এখবার দেখরাম এগু আবাদিগুলান কি খরিয়ের আমরারে...”

‘আবাদি’ শব্দটা শুনতেই গায়ে আগুন ধরে গেল তানভীরের। এটা এক ধরণের গালি। ও কড়া ভাষায় কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো। তার আগেই অনুভব করলো ওর পেছনে একটা ছায়া নড়ে উঠলো।

ওসি জালাল স্রেফ বাতাসের একটা ঝলকের মতো এগিয়ে গেল নচি বিশ্বাসের দিকে। মোবাইল ডায়াল করতে-করতে নচি বিশ্বাস আবারো বসে পড়েছিল চেয়ারে, জালালের এক লাথি খেয়ে উড়ে গেল চেয়ারটা। তবে নচি বিশ্বাস মাটিতে পড়লো না, চেয়ার সরে যাবার আগেই একহাতে তার সাদা শার্টের কলার ধরে পেটে একটা ঘুসি বসালো জালাল।

তানভীর প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, “জালাল-”

কে শোনে কার কথা।

জালাল নচি বিশ্বাসের পেটে ঘুসি মেরে তাকে উড়িয়ে নিয়ে ফেললো দেয়ালের সাথে লাগানো ছোট বিছানাটার ওপরে। এগিয়ে যেতে-যেতে পিস্তল বের করে ফেললো সে। বিছানায় পড়ে থাকা নচির ওপরে চেপে ধরে পিস্তলের বাট দিয়ে হালকা একটা বাড়ি মারলো তার চোয়ালে। সাথে-সাথে হা হয়ে গেল নচির মুখ। তার মুখের ভেতরে পিস্তলের নল ঢুকিয়ে দিলো জালাল। তারপর মৃদু হেসে খুব শান্ত স্বরে যেন রসালাপ করছে এমন স্বরে কথা বলে উঠলো, “কলেজে থাকতে আমার খুব শখ ছিল...” সে খুব আরামে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তানভীরের ধমক খেয়ে থেমে গেল।

“জালাল, স্টপ ইট, ” তানভীর আনমনেই সামনে এগিয়ে গেছে এক ধাপ। সবাই ঘিরে দাঁড়িয়েছে ওদেরকে। “জালাল।”

জালালের কোন বিকার নেই, সে বলে চলেছে, “এখন তুই আমারে ক, তুই কি কথা কইবি? নাকি, আমি এইটা টিপ্পা দিবো?” নচি কচর-মচর করে কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে, তানভীর আবারো ধমকে উঠলো। জালাল তানভীরের দিকে ফিরে শান্ত স্বরে বলে উঠলো, “রিল্যাক্স, বস,” বলে সে ওর উদ্দেশ্যে একবার চোখ টিপলো তারপর নচির দিকে ফিরে মৃদু হেসে পিস্তলের ট্রিগার টিপে দিলো।

***

সকাল বেলা মিটিং শেষ করার পর একের পর এক সাফল্য পেয়ে টমি পোদ্দার আজ কাজের তুঙ্গে ছিল কিন্তু হেকমত আবদুল্লার বাড়ি আর তার আশে-পাশের বাড়িগুলোতে সিসি টিভি খুঁজতে গিয়ে তার সেই মুডের বারোটা বেজে গেল। প্রথমত, হেকমতের বাড়ির সিসি ক্যামেরার ফুটেজ যেখানে রেকর্ড হত সেই হার্ড ড্রাইভ-ফুটেজ সব নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। তানভীররা বাড়িতে আসার আগেই এ-ব্যাপারে সে নিশ্চিত হয়েছে কিন্তু ওরা বেরিয়ে যাবার পর আশেপাশের বাসাগুলোতে ক্যামেরা খুঁজতে শুরু করে রীতিমতো ঘোল খেয়ে গেল টমি আর তার টিম।

সিসি টিভি কোথায় আছে আর কোনটা ওই বাড়ির সীমানা কভার করে কেউই সঠিকভাবে বলতে পারে না। ওই বাড়ির আশেপাশে কোন আশেপাশে সব খুঁজে সে যখন হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছে এমন সময় তার চোখে পড়লো একটা মোবাইল কোম্পানির সার্ভিসিং ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার মোড়ে। সাথে-সাথে একটা ব্যাপার মাথায় খেলে গেল তার।

এটা দিয়ে কাজ হলে হতেও পারে।

***

জালাল ট্রিগার টিপে দিতেই একটা শিহরণ খেলে গেছিল তানভীরের শরীরে। মনের কোনে হাহাকার করে উঠেছিল এক অদ্ভুত ভয়। একদিকে তার দায়িত্বে থাকা অবস্থায় একজন মানুষের মৃত্যুর দায়ভার কাঁধে নেয়ার ভয়, অন্যদিকে একমাত্র সূত্রটা হারানোর ভয়।

কিন্তু জালাল ট্রিগার টেপার সাথে সাথে হ্যামারটা সিলিন্ডারের নির্দিষ্ট জায়গায় বাড়ি মারতেই ক্লিক করে চেম্বার খালি থাকার যে-শব্দটা শুনতে পেল ও সেটা মনে হয় ওর জীবনের সবচেয়ে আকাঙ্খিত শব্দগুলোর একটা।

"হা-হা," করে হেসে উঠলো জালাল, আর রাগের সাথে তাকে টেনে নচি বিশ্বাসের সামনে থেকে সরিয়ে দিলো তানভীর।

মুখ থেকে পিস্তলের নলটা বেরিয়ে যেতেই, ফুসসস করে একটা শব্দ করে উঠলো নচি বিশ্বাস- ফোলানো বেলুন হঠাৎ ছেড়ে দিলো বাতাস বেরুনোর সময়ে যেরকম শব্দ হয় তার মুখ দিয়ে বেরুনো শব্দটা অনেকটা তেমন।

"দেখো, ব্যাটা আবার বিছানাটা নষ্ট করে ফেললো কিনা?" পেছন থেকে টিপ্পনি কেটে বলে উঠলো জালাল। তার দিকে একবার চোখ গরম করে তাকিয়ে ইকবাল আর এক সিকিউরিটি গার্ডকে বলেলো নচিকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিতে।

"নচি বিশ্বাস, তোমার সাথে আমাদের কোন শত্রুতা নেই কিন্তু তোমার কাছে যে তথ্য আছে সেটা আমাদের দরকার। আর সেটা বের করার জন্যে আমরা কোনকিছুর ধার

ধারবো না সেটা নিশ্চই বুঝতে পেরেছো তুমি?”

নচি বিশ্বাস কিছু না বলে মাথা নাড়লো। তার চোখ নিচের দিকে। “আমি খোনতা জানিয়ের না, আমি-”

“নচি, মিথ্যে কথা বলবে না। তুমি প্রথমে সব শুনলে তারপর ফট করে বলে বসলে তুমি কিছুই জানো না, এটা তো বিশ্বাসযোগ্য নয়,” রুমের একপাশ থেকে ভেসে আসা সিগারেটের গন্ধে তানভীরেরও সিগারেটে তৃষ্ণা পেয়ে বসলো। মনে হচ্ছে রক্তে নিকোটিনের নেশা আবারো পুরোপুরি পেয়ে বসেছে।

“এই শহরে অবৈধ মদ কতখানি আর অস্ত্র আর কয়টা আছে-কার কাছে আছে তুমি অবশ্যই জানো,” পেছন থেকে ইকবাল বলে উঠলো।

নচি হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে নাক-চোখের জল মুছে চোখ তুলে তাকাল। তানভীর একেবারে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। “হুজুর, আমি যদি আপনেরে খইয়ের, আপনে বড় সায়েবরে চড় মারুক্কা, আপনে খিতা মাইরবেন?”

এ-কেমন কথা। তানভীর টেবিলের অন্যপাশে দাঁড়িয়ে থাকা সুলতানকে দেখলো একবার। সুলতান রাগের সাথে তার দিকে এক পা এগিয়ে ধমক দিয়ে বলে উঠলো, “নচি, কথা না পেঁচিয়ে সোজা কথা বলো।”

নচি তাকে একবার দেখে নিয়ে তানভীরকে দেখলো। “হুজুর, এই বিষয়ে খতা কইতে অইলে আমার উফরে বড় বিপদ আইয়ের, যার কথা হেয় আমার গুরু অছিল এক কালে, এহন হেয় বিরাট কারবারি খিন্তুক...” বলে সে অবারো থেমে গেল। দুই হাত জোড় করে বলে উঠলো, “হুজুর, আমি কোন্তা কইলে আমার বাল-বাচ্চা সমেত মাইরে ফেলাইয়ের।”

“না বললে আমিই মারবো তোরে এহন-” আবার ধমকে উঠলো জালাল।

“নচি, তোমাকে আমরা বিপদে ফেলতে চাইনা কিন্তু তোমার জানা তথ্য আমাদের দরকার। তুমি আমাদেরকে স্রেফ একটা সূত্র দাও, তোমাকে আমরা বিপদে ফেলবো না,” তানভীর চিন্তিত। এতো ভয় দেখানোর পরও লোকটা কথা বলতে চাচ্ছে না, ঘটনা কি। “প্রয়োজনে তোমাকে আমরা প্রটেকশন দিবো।”

তানভীরের কথা শুনে হেসে উঠলো নচি বিশ্বাস। হেসে উঠেই সে ভয়ের সাথে হাসি থামিয়ে জালালকে দেখলো। “স্যার, আমারে পরটেকশন দেওয়ার দরখার নাই, আমি খালি আপনেগোরে কয়েখটা খতা খই, অপনেরা যে-অস্তরের খতা খইয়ের আর যেই লুকগুলান ওই লাক্কাতুরা য়াছিল, এই ব্যাপারে একজনই জানতে ফারিয়ের,” বলে সে মুখটা অপ্রয়োজনেই কিছুটা সামনে নিয়ে এলো। “খানা মাতবর,” নচি বিশ্বাস কথাটা বলতেই তানভীর ফিরে তাকাল ইকবালের দিকে। ইকবাল মাথা নেড়ে জানালো সে চেনে।

“কানা মাতবর কে? আর তার সাথে ওদের কি সম্পর্ক?” তানভীর জানতে চাইলো।

“হুজুর, আমি যদি অবৈধ অস্তর আর মদের দালাল অইয়ের, হেয় অইলো পেসিডেন্ট। হের নিজের অস্তর বানানির কারখানা আছে। আপনা লঞ্চের মেরামতি আছে। ইখতা বড় খতা, যেই আদিবাসীগো আপনেরা লাক্কাতুরায় মারুক্কা ওই লুখগুলায় তামাবিলের কাছেই পাহাড়ি মাতলা নামের এক আদিবাসীর লুখ। হেরা ভাড়ায় কামে আহে- কাম মানে খুনাখুনি-মারামারি এই গুলান। হেগোরে বাড়ায় আনা নেয়ার কাম একজনই খরিয়ের, এলা এই কানা মাতবর। ওইরহম আতে বানানি অস্তর মাতলার লুখেরাই ব্যবয়ার খরিয়ের। হেরা খুবই বালা অস্তরের কারিগর।”

“স্যার, এই ব্যাটা যার কথা বলছে সে কিন ব্রিজের অন্যপাশে কদমতলি এলাকার আন্ডারওয়ার্ল্ডের গডফাদার। সিলেট শহরে সবাই তাকে চেনে। তার বাড়িও তামাবিলের ওদিকেই। সম্ভবত সেও কোন আদিবাসী গোষ্ঠির লোক,” ইকবাল তার দুই ভ্রুর মাঝখানের তিলটা আঙ্গুলে ঘসতে-ঘসতে বলে উঠলো। তানভীর আগেও খেয়াল করেছে ছেলেটা নার্ভাস হলে দুই ভ্রুর মাঝের তিলটা তর্জনি দিয়ে ঘসতে থাকে।

“এই কানা মাতবরকে কোথায় পাওয়া যাবে?” তানভীর প্রশ্ন করলো।

“হুজুর, আমি জানি। আইজ আমি বন্দর আওয়ার ফরেই হুনিয়ের হেয় আজইকা পলিটেকনিকের লগে হের একটা কারখানা আর অপিস আছের, হেনে আইয়ার,” যেন গোপন কোন ষড়যন্ত্র করছে এরকম স্বরে বলে উঠলো নচি বিশ্বাস।

“তুমি যেহেতু জানো সে কোথায় আছে,” বলেই তানভীর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো কানা মাতবেরর সাথে কথা বলতে হবে। “তুমি আমাদেরকে নিয়ে যাবে তার ডেরায়।”

তানভীর কথাটা বলার সাথে-সাথে নচি বিশ্বাসের ষড়যন্ত্রকারী ভাব মুহূর্তের মধ্যে গায়েব হয়ে গেল। ভয়ের সাথে হাউ-মাউ করে উঠলো সে। “হুজুর, সর্বনাশ অইয়ের, হেতেরা আমারে মাইরবো, আমার পরিবারের...”

“কানা মাতবর কোথায় আছে না দেখালে আমি তোরে এহনি মারবো,” জালাল এক পা এগিয়ে এলো। “তোর কি আমারে দেইখা অ্যারেস্ট করার মতোন লোক মনে হয়?”

নচি বিশ্বাস দম দেয়া কলের পুতুলের মতো দুইদিকে মাথা নাড়লো।

“তাইলে এহনি নিয়া চল।”

নচি বিশ্বাস চিন্তিত মুখে কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে রইলো। “ঠিক অয়, আমি লই যাইয়ার, খিন্তুক আমি, দূর থেইকা দেহায়া দিয়ার হেয় খই আছে।”

“চলবে,” ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে তানভীর বলে উঠলো। “সুলতান, ইকবাল তোমরা নচিরে নিয়া গাড়িতে ওঠো। আমি আর জালাল আসছি।” সুলতান আর ইকবাল নচিকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

রুমের ভেতরে এখন শুধু তানভীর আর জালাল। জালাল তাকিয়ে আছে তানভীরের দিকে। তার একটা হাত অস্ত্রের দিকে এগোচ্ছে ওয়ালজ নাচের মুদ্রার মতো ঝড়ের বেগে তার দিকে এগিয়ে গেল তানভীর। জালালের হাত অস্ত্রের কাছে পৌছে গেছে, শূণ্যে থাকা অবস্থায় সেটার ফাঁক দিয়ে নিজের হাত গলিয়ে দিলো ও। জালাল নড়ে ওঠার আগেই তার হাত আর কাঁধ নিঁখুত আর্মলকে আটকে ফেললো তানভীর।

বিখ্যাত অমেরিকান অভিনেতা স্টিভেন সিগালের অবিষ্কার করা মার্শাল আর্টের ইতিহাসে সবচেয়ে ডেডলি আর্মলকগুলোর একটি এটি। একহাতে কব্জি ধরে অন্য হাতটা কনুই আর কব্জির উল্টোদিক দিয়ে টান দিলে হাত আর কাঁধের মধ্যে সংযোগকারী পেশীতে সরাসরি টান পড়ে। ফলে ভেঙে যেতে পারে হাত, নয়তো খুলে আসতে পারে কাঁধের হাড়।

ওসি জালালের ক্ষেত্রে অবশ্য এই দুটোর কোনটাই হলো না। তানভীর খুব বেশি চাপ না দিয়ে বরং এক ঝটকায় আটকে ফেললো তাকে। সেইসাথে ঠেলা দিয়ে তাকে মিশিয়ে দিলো দেয়ালের সাথে। একহাতে জালালকে আটকে রেখেই অন্যহাতে বের করে আনা ডেজার্ট ঈগল পিস্তলটা চেপে ধরলো জালালের কপালে।

“আরে, আরে আরে,” আর্ম লকে আটকে থাকার কারণে তীব্র ব্যথায় মুখ কুঁচকে রাখলেও জালাল হাসছে। “আরে, কমান্ডার তুমি...”

“একটু আগে কী হচ্ছিলো, জালাল?” তানভীর পিস্তলটা আরো জোরে চেপে ধরলো জালালের মুখের ওপরে। “এখানে কমান্ডার কে? তুমি যতো অভিজ্ঞ হও, সিনিয়র হও আর যাই হও। কেস যতোক্ষণ আমার কমান্ডে থাকবে, আমার কথামতো চলতে হবে। তুমি মানুষকে ধরে-ধরে ভিক্টিমাইজ করবে, আর আমি সেটা সহ্য করবো, তা হবে না। বুঝতে পেরেছো?’ একহাতে পিস্তল চেপে ধরে অন্য হাতে চাপ বাড়াতেই আবারো কুঁচকে উঠলো জালালের মুখ।

“উফ্,” জালাল নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করতেই তানভীর আরো জোরে চেপে ধরলো তাকে। “কমান্ডার, তোমার কি ধারণা, উফ্,” জালাল কথা বলার চেষ্টা করছে। “আমি আমি এই প্রথমবারের মতো পিস্তলের মুখে পড়েছি?”

“চুপ, কোন কথা শুনতে চাইনা, এবার যা করেছো, করেছো, এরকম আর যেন না হয়,” বলে তানভীর জালালকে ছেড়ে দিতেই সে চট করে সরে গেল একপাশে। ব্যথা সহ্য করতে না পেরে বসে পড়েছে টেবিলের ওপরে।

তানভীর ওর পিস্তলটা ঢুকিয়ে রাখলো হোলস্টারে। জালাল নিজের হাত-আর কাঁধ ডলছে, টেবিলের ওপরে রাখা জলের বোতলটা তার দিকে এগিয়ে দিলো তানভীর। কিছু না বলে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বোতলটা নিয়ে নিলো সে। জল খেতে-খেতে তার চেহারায় রঙ ফিরে এলো কিছুটা। জল খেয়ে মুখ মুছতে-মুছতে সে তানভীরের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো। “বাপরে কমান্ডার, তোমার হাতে জোর আছে মানতে হবে,” বলে সে হেসে

উঠলো সেই পুরনো হাসি। “পাশা স্যারের কাছে আমি তোমার অনেক নাম শুনেছি, সেই তোমাকে যখন লাক্কাতুরায় বাংলোর সামনে ভেজা বিড়ালের মতো কাঁপতে দেখলাম, আমি ভাবলাম, ব্যাপার কি, পাশা স্যারের মতো লোক তো ভুল করার কথা না। কিছু একটা তো আছে তোমার মাঝে।”

“কথা কম, জালাল ভাই,” তানভীর একটা হাত বাড়িয়ে দিলো তার দিকে। “চলো।” তানভীরের বাড়িয়ে দেয়া হাতটা দেখে একটা টিটকিরির হাসি দিলো জালাল, তারপর কী মনে করে হাতটা ধরতেই একটানে তাকে তুলে ফেললো তানভীর। “কানা মাতবররে ধরতে হবে এইবার।”

দুজনেই বাইরে এসে দেখলো নচিকে নিয়ে ইকবাল আর সুলতান দাঁড়িয়ে আছে মাইক্রোর সামনে। ওরা বের হয়ে সামনের দিকে এগোতেই তানভীর খেয়াল করলো সুলতান একটু সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে, বিশেষ করে কাঁধ ডলতে থাকা জালালের দিকে। “কি ব্যাপার? চলো,” সুলতানের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে বলে উঠলো তানভীর।

সবাই মিলে মাইক্রোতে উঠে বসতেই গাড়ি ছেড়ে দিলো ড্রাইভার রসুল মিয়া। “বল, কোনদিকে যেতে হবে?” বলে নচির কাঁধে হালকা একটা চাটি মারলো ইকবাল। বহু আগে ছোটবেলায় বাংলা বইতে একটা গল্পে পড়েছিল তানভীর, হাতে বন্দুক থাকলে নাকি নিরীহ মানুষের চোখও পশুপাখির দিকে যায়। শান্তশিষ্ট সুদর্শন ইকবালকে দেখে ওর মনে হলো জালালের গরম কিছুটা ওর মধ্যেও প্রবেশ করেছে। তা-না হলে তার মতো শান্ত মানুষ নচিকে চড়-চাপড় মারছে ব্যাপারটা ঠিক মেনে নেয়ার মতো না।

ইকবালের চাপড় খেয়ে নচি নির্দেশনা দিতে লাগলো ড্রাইভারকে। রসুল মিয়া সার্কিট হাউজের সামনে থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে চলে এলো কিন ব্রিজের গোড়ায়। গোড়ার জ্যাম ঠেলে ধীরে-ধীরে গাড়ি উঠে পড়লো ব্রিজের ওপরে। ব্রিজ পার হয়ে নিচে নামছে এমন সময় নচি বলে উঠলো, “ব্রিজ তাখি নামিয়া ডাইনে।” তার নির্দেশনা মতো গাড়ি ডানে ঘুরিয়ে দিলো রসুল মিয়া। রাস্তার ওপরে প্রচুর লোকজন, হর্ন দিলেও নড়ে-চড়ে না। রসুল মিয়া গালি বকতে-বকতে এগোতে লাগলো।

“একটা ব্যাপার খেয়াল করেছেন আপনারা কেউ,” তানভীর বলে উঠলো। “আমাদের দেশের লোকজন কোন এক অদ্ভুত কারণে রাস্তার মধ্যে দিয়ে হাঁটতে খুব পছন্দ করে। হর্ন বাজালেও সহজে সরে না। প্রথমে শুনবে, তারপর ঘুরে দেখবে, তারপর সরবে। এর কারণ কি?”

“সবতেরে নবাবের নবাব, মোগলের বংশধরতো, বেখতেই নিজেরে মোগলাই মনে খরিয়ের,” রসুল মিয়া সামনে থেকে রাগের সাথে বলে উঠলো।

"হুম্, সবাই নিজেরে মোগলাই মনে করে দেইখাই যে মন চায় এসে খেয়ে যায়। পর্তুগীজ, বৃটিশ..."

এরকম টেনস সিচুয়েশনেও হেসে উঠলো তানভীর। কথা ভুল বলেনি জালাল। ওদের মাইক্রো ডানে মোড় নিয়ে এগোচ্ছে। বেশ অনেকটা এগোনোর পর সামনে সিলেট পলিটেকনিক পড়লো। পলিটেকনিক ছাড়িয়ে ওদের মাইক্রো আরো সামনে এগিয়ে গেল। "কি ব্যাপার, কই লইয়া যাইতাছোস?" মাইক্রোর পেছন থেকে ধমকে উঠলো জালাল। এলাকাটা প্রায় নির্জন। তানভীরের নিজেরও একটু উদ্বেগ হচ্ছে।

"স্যার, মনে অয় এই ব্যাটা কই যাচ্ছে আমি বুঝতে পেরেছি," ইকবাল বলে উঠলো। "আগেও একবার একটা কাজে ওসি স্যারের সাথে আমি এখানে এসেছিলাম। ঠিকই আছে, কানা মাতবরের ডেরা এইদিকেই।"

"ওই যে," হঠাৎই বলে উঠলো নচি বিশ্বাস। ওরা যেখানটায় আছে জায়গাটা মেইন রোড ছাড়িয়ে বেশ আরেকটু সামনে। ইট বিছানো পায়ে চলা একটা পথ ধরে চলে গেছে সামনে। কয়েকটা গাছের ছোট একটা জটলামতো পার হয়ে সামনে কয়েকটা গুদাম ঘর দেখা গেল। একটা পুরনো আমলের লাল গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির সামনে বেশ কয়েকজনকে দেখা গেল দাঁড়িয়ে কথা বলছে। "ওই কালা পাঞ্জাবিই কানা মাতবর, আমি যাইয়ার?"

"আরে দাঁড়া," জটলাটা দেখিয়ে দিয়েই নচি বিশ্বাস মাইক্রো থেকে নামার জন্যে মাইক্রোর দরজার দিকে হাত বাড়িয়ে ছিল কিন্তু তার আগেই পেছন থেকে তার সাদা পোশাকের কলার ধরে ফেললো জালাল। "আগে নিশ্চিত অয়া নেই, ওইটাই আমাদের লোক।"

"ইকবাল, ভালো করে দেখো তো এই লোকই কানা মাতবর কিনা?" তানভীর বলে উঠলো।

"মনে হচ্ছে স্যার," ইকবাল সামনের দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে। "জ্বি, স্যার ওটাই।"

"বিচিরে, মানে নচিরে চেক করো, ওর কাছে থাকা মেবাইলটা রেখে দাও," তানভীর নির্দেশ দিলো ইকবালকে। "তা-না হলে মোবাইলসহ এই ব্যাটাকে ছেড়ে দিলে ওদেরকে সাবধান করে দিতে পারে।"

"হুজুর, মা-বাপের খিরা..."

"এই চুপ," ইকবাল ধমকে উঠলো। সে নচির লুঙ্গির কোঁচ থেকে তার বিরাট আকারের মোবাইল বের করে তানভীরকে দেখালো। "এটা তোমার কাছে রাখো। নচি, তুমি পরে একসময় থানায় গিয়ে ইকবালের কাছ থেকে ওটা নিয়ে যেও। আর এখন তুমি সিলেট শহর ছাড়বে না, যাও," বলতেই নচি একটানে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। তার হাঁটার

গতি দেখলে যে কেউ ভাববে অতি সম্প্রতি সে অলিম্পিকে ম্যারাথন দৌড়ে অংশ নিতে যাচ্ছে।

"জলদি চলো, কানা মাতবেরর সাথে কথা বলতে হবে। আচ্ছা এই কানা মাতবরের আসল নাম কি? আমরা তো আর তার সাথে কথা বলার সময়ে কানা মাতবর বলে ডাকতে পারবো না," তানভীর তাকিয়ে দেখলো নচি হাওয়া হয়ে গেছে। তার কাছে জানতে চাইবার আর কোন উপায় নেই।

"স্যার, আমরা কি সোজা গিয়ে তার সাথে কথা বলবো?" ড্রাইভারের পাশের সিট থেকে সুলতান জানতে চাইলো।

"নাহ, আগে আশপাশটা অবজার্ভ করে নিতে হবে," বলে ও আশেপাশে দেখলো। জায়গাটা খুবই নির্জন। "রসুল মিয়া সামনে যাও। ইকবাল ফোর্সে রিপোর্ট করেন, আমরা কোথায় আছি।"

ওদের মাইক্রো গাছের জটলা ছাড়িয়ে সামনে চলে এলো। এখন লোকগুলোকে আরো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

চারজন মানুষ। দুজন একেবারে যুবক আর দুজন বয়স্ক। বয়স্কদের ভেতরে একজন কালো পাঞ্জাবি আর সাদা পাজামা পরা, লোকটা কথা বলতে বলতেই একপাশে মুখ ঘুরিয়ে পানের পিক ফেললো। অন্য লোকটা শার্ট-প্যান্ট পরা, চোখে চশমা। তার হাতে একটা ব্রিফকেইস। "কানা মাতবর আর তার ডান হাত, জালেম মোস্তফা," ওদেরকে দেখিয়ে বলে উঠলো ইকবাল। "কানা মাতবর ক্যাডার হলে কী হবে সে অশিক্ষিত, তার সব হিসাব রাখে এই জালেম মোস্তফা। খুবই হারামি লোক। তার হারামিপনার জন্যেই মানুষে তাকে জালেম মোস্তফা ডাকে।"

"রুসুল মিয়া মাইক্রো আরো স্লো করো," ওরা বেশ খানিকটা এগিয়েছে এমন সময় লোক চারজনের ভেতরে কম বয়স্ক দুজন কথা বলে হাত নেড়ে গুদাম ঘরের মতো দেখতে জায়গাটার ভেতরের দিকে চলে গেল। বাকি দুজন, মানে কানা মাতবর আর জালেম মোস্তফা দাঁড়িয়ে থাকা লাল গাড়িটায় গিয়ে উঠলো।

"স্যার, খিতা খরিয়ের?" রসুল মিয়া জানতে চাইছে কী করবে এখন সে।

"ধীরে-ধীরে এগোতে থাকো। যদি গাড়ি ঘুরিয়ে আমাদের এদিকে আসে তাহলেও এগোতেই থাকবে। আর যদি অন্যদিকে যায় তবে ধীরে-ধীরে অনুসরণ করবে," লোকগুলো হঠাৎ গাড়িতে ওঠাতে তানভীর একটু দ্বিধায় পড়ে গেছে। একবার জালালের দিকে দেখলো। জালাল আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাত নাড়লো।

"লাল গাড়িটা চলতে শুরু করেছে। ওরা দেখলো সেটা ওদের দিকে না এসে বরং খানিকটা ঘুরে পায়ে চলা একটা পথ ধরে এগোতে শুরু করেছে। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস

ছাড়লো তানভীর। "ধীরে-ধীরে অনুসরণ করো," রসুল মিয়াকে নির্দেশনা দিয়ে ইকবালের কাছে ও জানতে চাইলো, "এদিকে সামনে কী আছে?"

"সামনে তো মনে হয় সুরমা নদী," ইকবালের গলার স্বর শুনের বোঝা যাচ্ছে সে নিশ্চিত নয়।

"আরে ধূর, সুরমা নদী তো পেছনে ফেলে এলাম," মাইক্রোর সামনে থেকে সুলতান বলে উঠলো।

"হুম্, তাইতো," ইকবাল তার তিলের ওপরে আঙ্গুল ঘসতে শুরু করেছে। "মনে হয়-" ইকবালের কথা শেষ হবার আগেই দূর থেকে দেখা গেল সামনের লাল গাড়িটা একটা ইটের দেয়ালের একপাশে নীল রঙের একটা গেটের সামনে থেমে গেল। ইটের দেয়ালের ওপাশে বেশ বড় ফ্যাক্টরি বা এরকম কিছু আছে। ওরা যেখান থেকে রওনা দিয়েছিল সেখান থেকে মাইলখানেকের মতো এগিয়ে এসেছে।

"রসুল মিয়া গাড়ি থামান," সামনে ঝোপঝাড়ের মতো একটা জায়গা। নীল গেটের সামনে দাঁড়ানো গাড়ি থেকে লোকজন বেরিয়ে আসার আগেই মাইক্রোটাকে সেটার আড়ালে থামিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলো তানভীর।

লাল গাড়িটা থেকে মোবাইলে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এলো কালো পাঞ্জাবি পরা কানা মাতবর, তার পেছনে খোলা খাতায় কিছু একটা দেখতে দেখতে এগোচ্ছে জালেম মোস্তফা। দুজনেই নীল গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো। গেটের অন্যপাশে একদিকে ফ্যাক্টরির মতো অন্যদিকে দেয়ালের মতো দেখতে লাল ইটের একটা সুন্দর বাংলো বাড়ির খানিকটা দেখা যাচ্ছে। তানভীর অনুমান করলো ওখানেই গিয়ে ঢুকেছে ওরা।

"আমরা এখন কি করবো?" সুলতানের প্রশ্নের জবাব তানভীর এক মুহূর্ত ভেবে জবাব দিলো, "অপেক্ষা, কারণ আমার মনে হয় না কানা মাতবররা খুব বেশি সময়ের জন্যে ওখানে গেছে। যদি তাই যেতো তবে গাড়িটা গেটের ভেতরে ঢোকাতো। যেহেতু ওরা গাড়ি গেটের বাইরে রেখে গেছে, তারমানে যে প্রয়োজনেই যাক ওরা দ্রুতই বেরিয়ে আসবে।"

"তারপর কানা মাতবরের সাথে কথা বলবো কিভাবে?" জালাল জানতে চাইলো।

"সেটাও ভেবেছি," তানভীর তার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো। "কানা মাতবরের যে হাবভাব দেখলাম তাতে মনে হয় না তাকে স্বাভাবিক পন্থায় ধরে বা থানায় নিয়ে চাপ দিলে কোন কাজ হবে। এই পথে ফেরার সময়েই তাকে আমরা এখানেই পাকরাও করবো," বলে মৃদু হেসে উঠলো তানভীর। "এরপর আমি ভরসা করছি জালাল ভাইয়ের ওপরে।"

তানভীরের দিকে এক মুহূর্ত অবিশ্বাসের সাথে তাকিয়ে রইলো জালাল, তারপর তার ঠোঁটে ফুটে উঠলো সেই বেপরোয়া টিটকিরির হাসি, তাতে এবার সামান্য বন্ধুত্বের ছোঁয়া।

***

অন্যদিকে টমি পোদ্দারের মুখে ফুটে উঠেছে বত্রিশ ভোল্টের হাসি। কারণ আধা ঘন্টা আগেও তার কাছে যা অসম্ভব মনে হচ্ছিলো তা এখন অনেকটাই সম্ভব মনে হচ্ছে মোবাইল কোম্পানির টাওয়ারের কারণে। মোবাইলের টাওয়ারের সামনে ম্যানটেইনেন্স ভ্যানটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওটাতে খোঁজ করে সে জানতে পারে মোবাইল টাওয়ারের স্টেশনে বসানো একাধিক ক্যামরার মধ্যে কয়েকটা ক্যামেরা প্যানারোমা অর্থাৎ তিনশো ষাট ডিগ্রী ক্যামেরা, এই ক্যামেরাগুলোতে খুঁজে দেখলে হয়তো কোন না কোন ক্যামেরাতে হেকমত আবদুল্লার বাড়ির সামনের অংশের ভিউ পাওয়া যেতে পারে।

টাওয়ারের দারোয়ানের সাথে কথা বলে মোবাইল কোম্পানির অফিস থেকে অনুমতি নিয়ে ক্যামরাগুলোর ভিউ দেখতে বসেছে টমি আর ফরেনসিকের একজন অফিসার। মোট চারটা ক্যামেরা তার মধ্যে দুটো প্যানারোমা ভিউ ক্যাপচার করে। "আপনি ওই দুটো ক্যামেরার ফুটেজ চেক করেন। আমি এই তিনটে দেখছি," বলে সে ফরেনসিকের লোকটাকে সম্ভাব্য সময় আর ফুটেজগুলো বুঝিয়ে দিয়ে নিজের ফুটেজগুলো নিয়ে বসলো। ভিডিওগুলো চলে যাচ্ছে একটার পর একটা, আধা ঘন্টা ধরে দেখতে দেখতে প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছে এমন সময় ফরেনসিকের লোকটা হঠাৎ বলে উঠলো, "স্যার, এই গাড়িটা দেখেন। হেকমত আবদুল্লার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে।"

অনেক দূর থেকে দেখা গেল একটা লাল গাড়ি বেরিয়ে এলো হেকমত আবদুল্লার বাড়ি থেকে। মোবাইল কোম্পানির টাওয়ারের ক্যামেরা বলেই এতোদূর থেকে দেখা যাচ্ছে, কোন সাধারন সিসি টিভি হলে কিছুই বোঝা যেত না। গাড়িটা বেরিয়ে উল্টোদিকে রওনা দিয়ে ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলের বাইরে চলে গেল।

"এটা অন্য ক্যামেরাতে পাওয়া যেতে পারে," বলেই এতোক্ষণ নিজে যেগুলো চেক করছিল সেটার মনিটরের সামনে চলে এলো। বেশ কিছুক্ষণ ঘাঁটাঘাটি করার পর একটা ক্যামেরাতে গাড়িটার এক পাশের সাইড ভিউ চোখে পড়লো। নির্দিষ্ট সময়ের ফুটেজটা কপি করে নিজেদের ল্যাপটপে নেয়ার পর, ফুটেজের নির্দিষ্ট জায়গার ইমেজ নিয়ে ফিল্টার করার পর ড্রাইভারের পাশের সিটে বসা একজনের চেহারা মোটামুটি পরিষ্কার বোঝা গেল। চেহারাটা দেখামাত্রই একটা শিস দিয়ে উঠলো টমি।

দীর্ঘদিন ইংল্যান্ডে ফরেনসিকের ওপর পড়ালেখা করার সময়ে টমির একটা কোর্স ছিল পৃথিবীর সব মোস্ট ওয়ান্টেড ক্রিমিনালদের কেস স্টাডির ওপরে। সেখান থেকে সে জানতে পারে পৃথিবীর সেরা অ্যান্টিক থিফদের একটা চক্রের ব্যাপারে, যে-চক্রের প্রধানের নাম 'জেড মাস্টার'। ইমেজটা দেখামাত্রই টমির মনে পড়ে গেল সেই জেড মাস্টারের কথা।

চট করে সে মোবাইলটা হাতে তুলে নিলো সে। তানভীর আর সুলতানদের সাবধান করে দিতে হবে। তারা জানেও না কিসের ভেতরে হাত দিয়েছে।

অধ্যায় চল্লিশ

সময়: ১৮০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ

পৃত্থুরা বনভূমি, কন্নোর, ভারতবর্ষ

কাঠের খুটিতে হেলান দিয়ে শামান মুখ থেকে সরু ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে একবার বিধুর দিকে দেখলো, তারপর ফিরে তাকাল ঘোষিতের দিকে।

"বিধু, তোরা দুইজন কি নিশ্চিত যে তোদের পরিবারের পূর্বপুরুষদের ভেতরে কোন সম্পর্ক নেই?" শামান ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তেই মৃদু স্বরে বলে উঠলো। বিধু আর ঘোষিত দুজনেই হাসতে-হাসতে এক অপরের গায়ে গড়িয়ে পড়ছিল আর মজা করে চামড়ার থলে থেকে বের করা গুঁড়ো নাকে টেনে নিচ্ছিলো। শামানের কথা শুনে দুজনেই চোখ গোল গোল করে তাকাল।

ওদের ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে নিজের চাবুকটাকে পালিশ করতে-করতে ধোয়ীর সাথে কথা বলছিল কালন্তি, শামানের মন্তব্য শুনে হেসে উঠলো সে। আর ধোয়ী একবার তার গোল মুখটাকে ঝাঁকিয়ে নিয়ে আবারো আগের মতো হয়ে গেল।

শামান মুখটাকে খুব গম্ভীর করে দুই হাত তুলে বলে উঠলো, "না মানে, দুজনের গায়ের রঙটাকে বাদ দিলে এতো মিল হয় কী করে!"

"ওস্তাদ দেখো-" বিধু খুব রেগে-মেগে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই সরল গোল মুখ বাঁকিয়ে ধোয়ী- যে কখনো কোন কথা বলে নো সে কথা বলে উঠলো। "লাল চুলের যোদ্ধা তো ঠিকই বলেছে। তোগো দেখলে মনে হয় জমজ ভাই। আর দুজনের গায়ের বিশ্রী গন্ধটাও প্রায় একইরকম," বলে সে শামানের দিকে ফিরে বিস্ময়ের ভান করে বলে উঠলো। "দুটোই খালি খায় আর জীবনেও মনে হয় গোসল করে না..."

প্রায় সবাই সমস্বরে হেসে উঠলো। শামান ফিরে তাকাল কালন্তির দিকে, সে হাসি থামিয়ে গম্ভীর মুখে শাক্যদের তাবুর দিকে দেখছে। ওখানেই রাজা মানরু, রাজা বিক্রম আর শঙ্করাদিত্য নিজের বাহিনীর প্রধানদের নিয়ে বন্দি লিচ্ছবী সৈন্যদের সাথে কথা বলছে।

ছিলা প্রস্তুকারীদের গ্রাম থেকে ওদেরকে ধরে আনার পর প্রথমে সৈন্যরা খুব গরম দেখিয়েছে, তারপর বিধু আর জাথুরিয়ার হাতে কয়েক ঘা খাবার পর একেবারে চুপ হয়ে গেছে। এরপরে আরো কয়েক দফা তাদেরকে ধোলাই দেয়ার পর রাজা মানরু বলেছে আগে ওদের সাথে কথা বলতে চায় সে, এসব মারামারিতে তার ঘোর আপত্তি আছে। এরপরেই রাজা বিক্রম সে আর অন্যরা মিলে কথা বলতে গেছে সৈন্যদের সাথে। আর শামানেরা অপেক্ষা করছে বাইরে।

"এতো চিন্তা করছো কেন?" কালন্তির দিকে ফিরে বলে উঠলো শামান। "অবশ্য আমার নিজেরও যে চিন্তা হচ্ছে না তা না।"

"নাহ, ভাবছি গোটা ব্যাপারটাই কি বিশ্রী তাই না," বলে কালন্তি গভীরভাবে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। "ধর্ম হলো শান্তির জন্যে অথচ ধর্ম নিয়েই কতো বিবাদ। একে অপরকে বদনাম করার জন্যে কতো আয়োজন। অথচ এই আয়োজনটা যদি মানুষ সবার মঙ্গলের জন্যে ব্যয় করতো তবে কতোই না ভালো হত।"

"হ্যাঁ, সবাই যদি এভাবে চিন্তা করতো তবে তো ভালোই হত," বলে শামানও দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। "কিন্তু মানুষ তো এভাবে চিন্তা করে না। ডুকপা লামার না জানি কী হাল?"

ওর চোখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে কালন্তি বলে উঠলো, "আশা করি সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি ডুকপা লামাকে উদ্ধার করতে পারবে, শান্তি ফিরে আসবে এই উপত্যকায়," বলে সে একটু থেমে যোগ করলো। "আর তুমি অবশ্যই একদিন খুঁজে বের করতে পাবে নিজের গোত্র, হয়তোবা নিজের সত্যিকারের পরিচয়," কালন্তি এখনো একইভাবে তাকিয়ে আছে শামানের চোখের দিকে।

আবারো একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অন্যদিকে ফিরে তাকাল শামান। মুখে মৃদু হাসি নিয়ে বলে উঠলো, "একটা সত্যি কথা বলি তোমাকে। আমি প্রথম যখন এখানে আসি এর পেছনে কয়েকটা কারণ ছিল। প্রধান কারণ ছিল ডুকপা লামা নাকি আমার আসল পরিচয় জানে। একমাত্র ডুকপা লামাই জানে আমাকে উদ্ধার করার সময়ে আমার সাথে বিজাতীয় ভাষায় লেখা যে তঞ্জুর ছিল সেটা কোথায় আছে। সেটা জানার জন্যেই মূলত আমি এখানে এসেছিলাম। কিন্তু এখানে আসার পর একটার পর একটা ঘটনার প্ররিপ্রেক্ষিতে আমার... আমার ভেতরটা আসলে বদলে গেছে।"

"কেন জানি এখন সেই ব্যাপারটা আর গুরুত্ব রাখে না। এখানে আসার পর প্রতি পদে আমি উপলব্ধি করেছি, আমি ডুকপা লামা, শন্তির মঠ আর আমার শৈশবকে কতোটা ভালোবাসি। যদিও আমি শান্তির মঠের একজন হতে পারিনি কিন্তু কেন জানি মনে হয় সেই না হতে পারাটাই আমার ভেতরের হাহাকারটাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। আমি যদি ডুকপা লামাকে উদ্ধার করে শান্তির মঠে ফিরিয়ে নিতে পারি সেটাই হবে আমার সবথেকে বড় পাওয়া। এমনকি উনি যদি কখনো আমাকে সেই তঞ্জুরের ব্যাপারে নাও বলেন তবে সেটারও কোন গুরুত্ব নেই," বলে শামান আবারো মৃদু হেসে উঠলো।

"সময় মানুষকে বদলে দেয়," বলে কালন্তি যোগ করলো। "আর মানুষকে বদলে যাওয়া মানুষের সবথেকে বড় পরিবর্তন হলো তার চাহিদাগুলো বদলে যাওয়া। আমি মনে করি..." কালন্তি কথা শেষ করতে পারলো না, তার আগেই রাজা মানরুরা যেখানে কথা বলছিল সেদিক থেকে কথোপকথনের শব্দ ভেসে এলো।

শামান তাকিয়ে দেখলো রাজা মানরু রাজা বিক্রমের সাথে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে আসছে।

"কাজ হলো?" শামান মাথা ঝুঁকিয়ে রাজা মানরুকে অভিবাদন করে জানতে চাইলো। "কিছু জানতে পারলেন?"

রাজা মানরু কিছু না বলে হেসে উঠলো, "কাজ হওয়া কি এতোই সহজ! তবে হ্যাঁ প্রক্রিয়াটা কষ্টকর হলেও শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু ব্যাপার জানতে পেরেছি"

"কিভাবে?" শামানের পাশ থেকে কালন্তি জানতে চাইলো।

"ওদের জীবনের বিনিময়ে, যাই হোক এসব বাদ দিয়ে আমরা বরং মূল বিষয়টাতে আলোকপাত করি," এবার কথা বলে উঠলো রাজা বিক্রম।

"আমরা এটা বের করতে পেরেছি, ডুকপা লামাকে রাখা হয়েছে বিধোরীর দুর্গে," বলে একটা হাত তুললো সে। "ব্যাপারটা আমার অনুমানের সাথে একেবারে মিলে গেছে। আমি এর আগে যতোবার মনে-মনে কল্পনা করেছি রাজা মানরুকে কোথায় রাখা হয়ে থাকতে পারে প্রতিবার কেন জানি আমার বিধোরীর দুর্গের কথাই মনে হয়েছে।"

"এর পেছনে বিশেষ কোন কারণ আছে?" শামান জানতে চাইলো।

"হ্যাঁ, আছে," রাজা বিক্রমের হয়ে উত্তর দিলো শঙ্করাদিত্য। "কারণ বিধোরীর দুর্গটা হলো আমাদের কন্নোরে যে-কয়টা দুর্গ আছে তার ভেতরে সবচেয়ে বড়। তবে এইটাই মূল কারণ নয়। বিধোরীর দুর্গটা উপত্যকার শেষ প্রান্ত থেকে শুরু হয়ে ওটা গিয়ে মিশেছে একটা হ্রদের সাথে, দুর্গের একটা অংশ থেকে ওই হ্রদের প্রধান জলপ্রপাতের সাথে সংযুক্ত।"

"তারমানে, বিধোরীর দুর্গের নিজস্ব জলের প্রবাহ রয়েছে," আনমনেই বলে উঠলো শামান।

"শুধু জলের প্রবাহই নয়। বিধোরীর দুর্গের এই জলের প্রবাহের সাথে সংযুক্ত রয়েছে নিজস্ব একটা অস্ত্রাগার। যদিও গত প্রায় বিশ বছর ধরে অস্ত্র নির্মাণের কাজ ওটাতে বন্ধ আছে, তবে আমার বিশ্বাস এই অস্ত্রাগারেই আবারো উরগদেরকে দিয়ে কাজ শুরু করিয়েছে লিচ্ছবীরা।"

"স্বাভাবিক," রাজা মানরু মন্তব্য করলো। "ওরা যা করতে চাইছে সেটা করার জন্যে একটা অস্ত্রাগারের চেয়ে ভালো জায়গা আর কী হতে পারে? এখন আপনারা কী করতে চান?"

"অভিযান চালাতে হবে," শামান খুটির গায়ে হেলান দিয়ে বসেছিল এতোক্ষণ। সেটা থেকে সে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। "আমি হিসেব করে দেখেছি, যদি আমরা বিধোরীর দুর্গ থেকে ডুকপা লামাকে উদ্ধার করে আনতে চাই তবে দুটো পন্থা আছে; হয় সরাসরি

আক্রমণ করতে হবে- যেটা করার সামর্থ আমাদের নেই। আর না হয় চোরাগুপ্তা অভিযান চালানো। আমাদেরকে অবশ্যই দ্বিতীয়টা করতে হবে। আর সেটাও করতে হবে আজই, আজ রাতেই।"

"দেখো যোদ্ধা, তোমার সব আগ্রহ ডুকপা লামাকে উদ্ধার করার জন্যে হতে পারে। কিন্তু আমরা সেটার পাশাপাশি ওই বুদ্ধ মুর্তিটা ধ্বংস করতে চাই। ওটাই আমাদের প্রাধান্য," শঙ্করাদিত্য বলে উঠলো, শামানের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

হাতের ধোঁয়া টানার নলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দুই পা এগিয়ে এলো শামান। "আচ্ছা, আমার তো মনে হয় আপনাদের আগ্রহ তারচেয়ে বেশি রাজা হেমচন্দ্রের ব্যাপারে," বলে সে রাজা বিক্রমের দিকে ফিরে তাকাল। "আপনারা কি ভেবেছেন বিধোরীর দুর্গে রাজা হেমচন্দ্র থাকে এটা আমি জানি না। শুনুন, আপনাদের উদ্দেশ্য যাই থাকনা কেন আমার প্রথম কাজ ডুকপা লামাকে নিরাপদে উদ্ধার করা, পরেরটা পরে," শামান শঙ্করাদিত্যের একেবারে কাছে গিয়ে তার চোখের সামনে আঙ্গুল নেড়ে কথাগুলো বলে উঠলো।

"দেখো যোদ্ধা মুখ সামলে..."

"শান্তি, শান্তি," রাজা বিক্রম ধমকে উঠলো। "শঙ্কর চুপ," বলে সে শঙ্করকে এক ধমকে চুপ করিয়ে দিলো। "লাল চুলের যোদ্ধা যেভাবে নিজের প্রাণ বাজি রেখে আমাকে উদ্ধার করেছে এরপরও তুই তার সাথে তর্ক করিস," রাজার ধমক খেয়ে শঙ্করও চুপ হয়ে গেছিল, সে আবারো মুখ তুলে বলে উঠলো, "আমি-"

"একদম চুপ," রাজা বিক্রম ধমকে উঠে শামানের দিকে ফিরে তাকাল। "দুঃখিত যোদ্ধা। ওর হয়ে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি অস্বীকার করবো না যে এই অভিযানে ডুকপা লামাকে উদ্ধার করার পাশাপশি সেই মুর্তিরও একটা গতি করতে চাই আমরা। এর সাথে রাজা হেমচন্দ্রের ব্যাপারেও আগ্রহ আছে আমাদের। তবে, সেটা পরে। আগে প্রথম দুটোর সুরাহা হোক, পরেরটা পরে দেখা যাবে," বলে সে একেবারে শামানের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলে উঠলো, "যোদ্ধা, আমি আশা করি তুমি বুঝতে পারছো যে এইবারই আমাদের শেষ একটা সুযোগ। এবার যদি লিচ্ছবী আর উরগদের কিছু একটা করতে না পারি আমরা, বিশেষ করে হেমচন্দ্রের ব্যাপারে যতোক্ষণ কোন একটা ব্যবস্থা নিতে না পারছি এই উপত্যকা নরকই রয়ে যাবে। আজকের অভিযানের পর যদি মুর্তি নষ্টও করতে পারি আমরা। সেইসাথে ডুকপা লামাকেও উদ্ধার করতে পারি, কিন্তু হেমচন্দ্রের একটা ব্যবস্থা করতে না পারলে তোমার কি ধারণা সে আমাদের ছেড়ে দিবে। এই এলাকায় বৌদ্ধ শাসন চিরতরে শেষ হবে।"

কথা বলতে বলতে রাজা বিক্রম উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। "এই অভিযানে যদি লিচ্ছবীদের শাসন অবসান করতে না পারি তবে এই এলাকা নরকই রয়ে যাবে। কারণ থারু-শাক্য বৌদ্ধ কেউই নিরাপদ তো থাকবেই না বরং সব ধ্বংস করবে হেমচন্দ্র। কাজেই এবারের

অভিযানেই সকল যন্ত্রণার অবসান করতে হবে,” বলে সে তাকিয়ে রইলো শামানের দিকে তারপর ফিরে তাকাল রাজা মানরুর দিকে।

সবাই চুপ। রাজা মানরু একবার মাথা নেড়ে বলে উঠলো, “আমি রাজা বিক্রমের সাথে একমত পোষণ করি। উনি ঠিকই বলেছেন। এবারের অভিযানেই সবকিছুর সমাধান করতে হবে। তা-না হলে আসলেই এই উপত্যকায় জ্বলতে থাকা আগুন কোনদিন নিভবে না। শান্তিপূর্ণভাবে কেউই টিকতে পারবে না এখানে। কাজেই আমার মনে হয় এক অভিযানে সব সমাধান করাটাই সবদিক থেকে ভালো হবে।”

“ঠিক আছে,” শামান বলে উঠলো। “সবাই যদি তাই মনে করে তবে তাই হবে। তবে আমারও একটা কথা আছে, আগে ডুকপা লামাকে উদ্ধার করা হবে, বাকি সব পরে হবে। যদি এতে সবাই একমত পোষণ না করে তবে আমিও আপনাদের কথা মানবো না, আপনাদেরকে সহায়তা করবো না।”

রাজা মানরু বলে উঠলো, “আমার মনে হয় যোদ্ধা ঠিকই বলেছে।”

সবাই মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতেই শামান যোগ করলো। “আরেকটা কথা, অভিযান আজ রাতেই চালাতে হবে।”

“আজকেই?” কালন্তি অবাক হয়ে বলে উঠলো। “বেলা তো প্রায় পড়তির দিকে। এরকম একটা অভিযান চালানোর জন্যে যে-ধরণের প্রস্তুতি দরকার তার কিছুই এতো অল্প সময়ের ভেতরে নেয়া সম্ভব নয়।”

“এখুনি প্রস্তুতি নিতে হবে আর অভিযানও আজ রাতেই চালাতে হবে,” শামান তাকিয়ে আছে থারু-আর শাক্যদের দিকে। অনেকেই মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাচ্ছে। শামান বুঝিয়ে বলার ভঙ্গিতে বলতে শুরু করলো। “কেন আজই সেটা আমি বুঝিয়ে বলছি। গতকাল আমরা মন্তলার হাটে অভিযান চালিয়ে রাজা বিক্রমকে উদ্ধার করে এনেছি। আজ আবার ছিলা প্রস্তুতকারীদের বাড়ি থেকে ধরে এনেছি রাজা হেমচন্দের সেনাপতির নিজের লোককে, আপনাদের কি ধারণা এরপরেও পরিস্থিতি আগের মতোই থাকবে?” প্রশ্নটা করেই ও সবাইকে এক পলক দেখে নিলো।

“অবশ্যই না। গতকালের অভিযানের পরই সব পাল্টে গেছে, আজ আমরা সেনাপতির লোকদেরকে ধরে আনতে পেরেছি, সেটা আমাদের সৌভাগ্য ছিল। তবে আজ হেমচন্দ্রের সেনাপতি যখন ধরতে পারবে যে তার লোকেরা ছিলা প্রস্তুতকারীদের বাড়ি থেকে ফিরে আসেনি, তখন কাল ঠিকই সেনাপতির বাহিনী হাজির হবে ছিলা প্রস্তুতকারীদের বাড়িতে। ওখানে কী ঘটেছে একবার বের করতে পারলে দুর্গে আর একটা মশাও ঢুকতে পারার মতো পরিস্থিতি থাকবে না। কাজেই যা করার আজই করতে হবে।”

“আমি যোদ্ধার কথা শতভাগ সমর্থন করি,” রাজা বিক্রম ঘোষণা দেয়ার মতো বলে উঠলো। যা করার আজই করতে হবে। তবে হ্যাঁ, সেটাও করা সম্ভব কারণ একটা দিক

থেকে আমরা এগিয়ে আছি। আমি এই বিধোরীর দুর্গে জন্মেছি, বড় হয়েছি। এই দুর্গের প্রতিটি ধূলিকণা আমি চিনি। সেই তুলনায় লিচ্ছবীরা এই দুর্গে একেবারেই নতুন। কাজেই আমরা চাইলে এমন কিছু করতে পারবো যা ওরা পারবে না," এই পর্যন্ত বলে সে সবাইকে সামনের দিকে এগোনোর নির্দেশ দিয়ে নিজে শঙ্করাদিত্যের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতেই শঙ্কর তার হাতে একটা তলোয়ার ধরিয়ে দিলো।

সবাইকে গোল হয়ে দাঁড়ানোর নির্দেশনা দিয়ে সে রাজা মানরুর বাড়ির সামনের মাটিতে তলোয়ারের ডগা দিয়ে সময় নিয়ে একটা দুর্গের মতো আকৃতি এঁকে ফেললো। একহাতে আহত কাঁধের অংশটা চেপে ধরে সামান্য ঝুঁকে কাজটা করলো সে।

আঁকা শেষ করে সে সবার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো, "এটা হলো বিধোরীর দুর্গের মূল অবকাঠামো," বলে সে আকৃতিটার একটা জায়গায় নির্দেশ করে বললো, "এইটা হলো দুর্গের মূল প্রবেশদ্বার যেটা একেবারে উপত্যকার নিচ থেকে শুরু হয়ে ওপরের দিয়ে উঠে যাওয়ার রাস্তা ধরে যাওয়া যায়। দুর্গটার মূল প্রবেশ পথটা বেশ দীর্ঘ আর পথটার দুইপাশের খাদও তুলনামূলক কম গভীরতা থেকে শুরু করে ধীরে-ধীরে বেশি গভীরতার দিকে এগিয়ে গেছে।"

"তারমানে পথটা ধীরে-ধীরে উঁচু হয়ে একেবারে প্রবেশ পথের মূল সিংহদ্বারে গিয়ে শেষ হয়েছে, তাইনা?" শামান প্রশ্ন করলো।

"একদম ঠিক," রাজা বিক্রম যে তলোয়ারের চোখা প্রান্তটা দিয়ে দেখাতে লাগলো। "এটা হলো দুর্গের মূল আকৃতি। মূল দুর্গটার তিনপাশে আছে তিনটে সুউচ্চ বুরুজ। এই বুরুজগুলো মূলত দুর্গের গুরুত্বপূর্ণ লোকজনের বাসস্থান। তিনটে বুরুজের মাঝখানে এই জায়গাগুলো হলো দুর্গের সামরিক ব্যারাক, রাজার মহাল, খাবার ব্যবস্থা," একটা-একটা করে দেখাতে লাগলো সে। "আর এই জায়গা দিয়ে এগোলে দুর্গের নিচের একটা প্রান্ত গিয়ে মিশেছে দুর্গ সংশ্লিষ্ট জলধারার সাথে। এটা অনেকটা দুর্গের পাতাল বলা চলে। এই অংশেই সেই অস্ত্রাগার আর অস্ত্রাগারের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকজনের থাকার ব্যবস্থা। আমার বিশ্বাস এই জায়গাতেই সেই মুর্তি নির্মাণের কাজ চলছে, এখানটাতেই বন্দি করে রাখা হয়েছে ডুকপা লামাকে।"

"সবই বুঝলাম, কিন্তু এরপর আমরা কিভাবে কি করবো?" শামান জানতে চাইলো রাজা বিক্রমের দিকে তাকিয়ে।

রাজা বিক্রম হেসে উঠলো। "আমি যে-মুহূর্তে শুনলাম ডুকপা লামাকে বিধোরীর দুর্গে বন্দি করে রাখা হয়েছে, সেইসাথে রাজা হেমচন্দ্রও অবস্থান করছে এই দুর্গেই, প্রথমে আমি খুশি হয়ে উঠেছিলাম তারপরের মুহূর্তে বেজার। আগে বেজার হবার কারণটা বলে নেই। বিধোরীর দুর্গ অত্র মুল্লুকের সবচেয়ে সুরক্ষিত দুর্গ। এখানে প্রহরীর নজর এড়িয়ে একটা বেড়ালেরও ঢোকারও উপায় নেই।"

রাজা বিক্রমের কথা শুনতে শুনতে শামানের ভ্রু কুঁচকে উঠেছে। “আর খুশি হবার কারণটা?”

“খুশি হবার কারণ হলো, আগেই বলেছি আমি এই দুর্গেই জন্মেছি, এতেই বড় হয়েছি। কাজেই এই দুর্গের প্রতিটা অংশ আমি চিনি। সকল দুর্গের মতোই এই দুর্গেরও কিছু গোপনীয়তা আছে। আছে চোরাগুপ্তা গোপন পথ। কাজেই সেগুলোর সন্ধানও জানা আছে আমাদের,” বলে রাজা বিক্রম হেসে উঠলো।

“যা বলতে চাইছেন পরিষ্কার করে বলুন,” এবার কালন্তি বলে উঠলো। সবাই কৌতুহলের সাথে তাকিয়ে আছে রাজা বিক্রমের দিকে।

সবার কৌতুহলি দৃষ্টির সামনে রাজা বিক্রম একটু নাটকীয়ভাবে বলে উঠলো, “আমার একটা পরিকল্পনা আছে। সেটা ঠিকমতো অনুসরণ করতে পারলে আমরা যা করতে চাচ্ছি সেটা ঠিকই সম্পন্ন করতে পারবো।”

অধ্যায় একচল্লিশ

বর্তমান সময়

কিনব্রিজ এলাকা, সিলেট

তানভীরের পরিকল্পনার বারোটা বেজে গেছে। ওর হিসেব অনুযায়ী কানা মাতবর আর তার লোকেরা ফ্যাক্টরি এলাকার ভেতরে ঢোকার কিছুক্ষণের ভেতরেই বেরিয়ে আসার কথা কিন্তু প্রায় চলিশ্ল মিনিট বসে থেকেও কারো কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

"স্যার, আর কতোক্ষণ বসে থাকবো?" ইকবাল একটু অধৈর্য হয়ে বলে উঠলো। তানভীর জবাব না দিয়ে ঘড়ি দেখলো।

"আমি বেরুচ্ছি," বলে জালাল এক হাতে মাইক্রোর দরজা খুলে ফেললো। "কানা মাতবর সম্ভবত আমাদের মাইক্রোকে অনুসরণ করতে দেখেছে। সে যদি অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে যায় আমরা টেরও পাবো না।"

জালালকে বাধা দিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তানভীর কিন্তু জালালের শেষ কথাটা শুনে থেমে গেল ও। ভুল বলেনি জালাল। কারণ হাজার হলেও এটা ওই লোকগুলোর এলাকা। এখানে আরো লম্বা সময় বসে থাকাটা ওর কাছেও বোকামি মনে হচ্ছে ।

"চলো, বাউন্ডারির ভেতরে ঢুকে দেখতে হবে। কিন্তু সবাই সাবধান। সুলতান আর জালাল, আপনারা দুজনেই মনে রাখবেন আমাদের উদ্দেশ্য হলো তথ্য বের করা, কাজেই প্রয়োজন না হলে যেকোন ধরণের গন্ডগোল আমরা এড়িয়ে যাবো। মনে থাকবে?"

দুজনেই মাথা নেড়ে সায় জানাতেই ওরা বেরিয়ে এলো মাইক্রোর বাইরে। তানভীর সবার সামনে, ওকে কভার করে সুলতান, আর তাকে কভার করে জালাল আর ইকবাল। বাউন্ডারির ধার ঘেঁষে সামনের দিকে এগোতে লাগলো ওরা। প্রায় গেটের কাছে পৌছে গেছে এমন সময় লোকজনের কথা-বার্তার আওয়াজ পাওয়া গেল। অসহায়ের মতো এদিক-সেদিক তাকিয়ে ও সবাইকে আড়াল নেয়ার নির্দেশ দিয়ে নিজে লুকিয়ে গেল একটা ঝোপের আড়ালে।

একদমই নিরাপদ নয় জায়গাটা। ও আর সুলতান দুজন লুকানোর জন্যে যথেষ্টও নয়। তার ওপরে ঝোপের অন্যপাশেই বড় ড্রেন। একটু অসাবধান হলেই পা হড়কে ড্রেনে পড়ে যাবে। ঝোপের আড়ালে লুকিয়েই ইশারায় শান্ত থাকতে বললো ও সুলতানকে। সেইসাথে দেখে নিলো জালাল আর ইকবাল দুজনে দুটো গাছের আড়ালে লুকিয়েছে। এভাবে বোকার মতো মাইক্রো থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে নিজেকে মনে-মনে গালি দিলো ও। এখন যদি কানা মাতবরেরা গাড়িতে উঠে চলে যায় তবে ওদেরকে হয়তো চোখে পড়বে

না, তবে মাইক্রোটা চোখে পড়ে যাবে, আর যদি এখানে বেশিক্ষণ অবস্থান করে তাহলেও ওরা ধরা পড়ে যাবে।

এতোকিছু চিন্তা না করে লোকগুলোর দিকে মনোযোগ দিলো তানভীর। পাঁচ- ছয়জনকে দেখা যাচ্ছে সামনে। কানা মাতবরকে দেখা গেল একপাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। আর তার সামনে দাঁড়ানো জালেম মোস্তফা, আর অন্য লোকটাকে দেখা না গেলেও তানভীর পরিষ্কার শুনতে পেল, ইংরেজিতে কথা বলছে তারা দুজনে। ব্যাপার কি? ইংরেজিতে কথা বলছে কেন। মাথাটা একটু উঠিয়ে সামনে দেখতে যাবে মৃদু বুম-বুম শব্দে পকেট চেপে ধরলো ও। মোবাইলে কল এসেছ। সাবধানে শরীর সামলে পকেট থেকে মোবাইল বের করে দেখলো টমির কল। এখন কথা বলার প্রশ্নই আসে না। কলটা কেটে দিলো ও।

"স্যার লাল পিঁপড়া, কামড়ে একেবারে..." রাগের সাথে সুলতানের দিকে ফিরে তাকে চুপ করার জন্যে আঙ্গুল তুলতেই তারস্বরে মোবাইল বেজে উঠলো সুলতানের। দুজনেই চমকে উঠলো। তবে তাদের চেয়ে বেশি চমকে উঠেছে সামনে দাঁড়ানো লোকগুলো।

তানভীর বুঝলো লুকিয়ে থেকে আর লাভ নেই, ঝট করে উঠে দাঁড়ালো ও ঝোপের আড়াল থেকে, সেইসাথে হাত বাড়ালো পিস্তলের দিকে। ওকে দেখে কানা মাতবরের মুখ থেকে টুপ করে সিগারেটটা পড়ে গেল মাটিতে, তার পাশে দাঁড়ালো জালেম মোস্তফাও চমকে উঠেছে। তবে ওদের চেয়ে বেশি চমকে উঠেছে তানভীর, কারণ কানা মাতবর আর জালেম মোস্তফার ঠিক সামনেই সাদা চামড়ার বিশালদেহি একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। এখানে অন্তত সাদা চামড়ার কাউকে আশা করেনি তানভীর।

ও যেমন চমকে গেছে ওকে দেখে একইরকম চমকে উঠেছে লোকটাও। কিন্তু ও নড়ে ওঠার আগে লোকটাই নড়ে উঠলো। তানভীর টান দিয়ে নিজের পিস্তলটা বের করে আনছে লোকটা দুই পা এগিয়ে এসে খপ করে ধরে ফেললো ওর হাত। অন্যহাতে একটা ঘুসি মারলো ওকে। দক্ষতার সাথে একেবারে শেষ মুহূর্তে ঘুসিটা এড়িয়ে গেল তানভীর। লোকটা শরীরের ভারসাম্য একটু হারিয়ে ফেলতেই বাউলি কেটে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মানুষটার গলা লক্ষ্য করে একটা কারাতে চপ মারলো ও। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলো খুব সহজেই ওর হাতটা ধরে ফেললো মানুষটা, তারপর অবলীলায় শূণ্যে তুলে ফেললো ওকে।

কোন মানুষের শরীরে এরকম অবিশ্বাস জোর থাকতে পারে বললে হয়তো বিশ্বাস করতো না ও। এমনকি নিজেকে শূণ্যে আবিষ্কার করেও ব্যাপারটা ঠিক মেনে নিতে পারছে না। অসহায়ের মতো হাত পা নাড়তে-নাড়তে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলো ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ওকে ধরে থাকা সাদা লোকটাকে গুলি করলো সুলতান। গুলির ধাক্কায় ওকে মাটিতে ফেলে দিয়ে দুই পা পিছিয়ে গেল প্রায় সাড়ে ছয় ফুটি মানুষটা। মাটিতে পড়ে মুহূর্তের জন্যে ব্যথার চোটে তানভীরের মনে হলো, ওর মেরুদন্ড দুই ভাগ হয়ে গেছে। সমস্ত মনের জোর এক করে এক ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো ও। গুলি খেয়েও

লোকটার প্রায় কিছুই হয়নি। নিশ্চই বুলেট প্রুফ ভেস্ট বা এরকম কিছু পরে আছে সে। জ্যাকেটের আড়াল থেকে নিজের পিস্তল বের করে আনছে মানুষটা।

অন্যদিকে কানা মাতবরের সাথের লোকেরাও যার যার অস্ত্র বের করে আনছে। পেছন থেকে গুলির শব্দে চমকে উঠলো ও। ইকবাল আর জালাল গুলি করতে শুরু করেছে। মুহূর্তের জন্যে ওর মনে হলো এই ক্রশ ফায়ারের মধ্যে পড়ে মরতে হবে। কিন্তু সেই বিশালদেহি লোকটাকে সুলতানের দিকে অস্ত্র তাক করতে দেখে সোজা সুলতানকে লক্ষ্য করে লাফ দিলো ও। তাকে নিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল ঝোপঝাড়ের ওপরে। সেখান থেকে গড়িয়ে পড়লো দেয়ালের পাশের শুকনো ড্রেনে।

“সুলতান, ঠিক আছো?” সুলতান মাথ নেড়ে সায় জানাতেই তানভীর সোজা হলো। ওপর থেকে সমানে গুলির শব্দ ভেসে আসছে। ও মাথা তুলতেই দেখলো সেই লাল গাড়িটা ঘুরতে শুরু করেছে। “জালাল,” চিৎকার করলেও কোন কাজ হলো না। সমানে গুলি করে চলেছে জালাল। সুলতানকে প্রথমে নালার ভেতর থেকে ঠেলে ওপরে উঠিয়ে দিলো ও। তারপর নিজে উঠে এসে সোজা হতেই ওদের সামনে দিয়ে হুঁশ করে বেরিয়ে গেল লাল গাড়িটা। পিস্তল তুলেও নামিয়ে নিলো ও। এই অ্যাঙ্গেল থেকে তীব্র বেগে ছুটতে থাকা গাড়িতে গুলি লাগাতে পারবে না। তারচেয়ে সুলতানের দিকে ইশারা করে পিস্তল বাগিয়ে সামনে এগোল ও।

জালাল আর ইকবালও বেরিয়ে এসেছে গাছের আড়াল থেকে। একটু আগে যেখানে কানা মাতবর আর তার লোকেরা দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে এসে দেখলো গুলি খেয়ে মাটিতে পড়ে আছে কানা মাতবর আর তার দুই সঙ্গী। আরেকজন আহত অবস্থায় কাতরাচ্ছে। দৌড়ে এগিয়ে আসা ইকবালকে বললো ড্রাইভার রসুল মিয়াকে মাইক্রো নিয়ে আসতে। লাল গাড়িটার পিছু নিতে হবে, সেইসাথে সাবধান করে দিতে বললো অত্র এলাকার ফোর্সদের।

লোকজনের গলার আওয়াজ শুনে তাকিয়ে দেখলো নীল গেটটা দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারছে শ্রমিক গোছের লোকজন। সুলতানকে বললো ওদেরকে সামলাতে। আর নিজে এসে হাঁটু গেড়ে বসে গেল কানা মাতবরের পাশে।

উল্টোপাল্টা গুলি চলার সময়ে অন্তত তিনটে গুলি লেগেছে লোকটার গায়ে। মুখের কশা দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। বেশিক্ষণ বাঁচবে না। লোকটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো, “মাতবর, এরা কারা? কি হচ্ছিলো এখানে?” জানে বৃথা প্রশ্ন কিন্তু তবুও জলতে ভেসে যাওয়া লোকজনের মতোই খড়কুটো আঁকড়ে ধরার চেষ্টা তানভীরের। কানা মাতবর ওর দিকে তাকিয়ে একটা হাত তুললো। তানভীর হাতটা বাড়িয়ে দিতেই সেটা ধরে ফেললো সে।

“স্যার, ওরা যাবার সময়ে আমাদের মাইক্রোর চাকা পাঙচার করে দিয়ে গেছে,” পেছন থেকে ইকবাল এসে জানালো। কিন্তু সেটা কানে ঢুকলো না ওর। কানা মাতবর কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে, লোকটার একেবারে মুখের কছে কান নিয়ে এলো ও। অস্ফুট

হলেও পরিষ্কার শুনতে পেল একটা শব্দ, ‘টাই... টাই... টাইটানিক’ কানা মাতবরের মুখ দিয়ে এক ঝলক রক্ত বেরিয়ে আসতেই চোখ বন্ধ হয়ে এলো তার।

“লোকটা কি টাইটানিক বললো?” ওর পেছনে এসে দাঁড়ানো জালাল বলে উঠলো।

“তাই তো মনে হলো,” তানভীর কানা মাতবরের হাতটা ছেড়ে দিয়ে বসে পড়লো মাটিতে। রক্তাক্ত হাতে নিজের মুখ মুছে ইকবাল আর জালালের দিকে তাকিয়ে ও চিন্তিত মুখে জানতে চাইলো, “টাইটানিক আবার কি?”

অধ্যায় বিয়াল্লিশ

সময়: ১৮০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ

বিধোরীর দুর্গ, কন্নোর, ভারতবর্ষ

গায়ের পোশাকটা বেশ শক্ত হয়ে এঁটে বসেছে বিধুর গায়ে। অস্বস্তির সাথে খানিকটা নড়ে-চড়ে উঠলো সে। ভারি শরীরটা নড়ে ওঠার কারণে ছোট ঘোড়ার গাড়িটাও কট-কট করে সামান্য নড়ে উঠলো। সামনে থেকে প্রায় সাথে সাথেই কেউ একজন গাড়ির কাঠের শরীরে দুই-তিনটা থাবা মেরে চুপ থাকতে বললো।

“আচ্ছা, আচ্ছা,” বলে বিধু স্থির হয়ে বসার চেষ্টা করলো। কিন্তু স্থির হওয়াটা ওর জন্যে আরো কঠিন। কারণ একদিকে ঘোড়ার গাড়ির ভেতরে জায়গা খুবই কম, তাতে আবার বসেছে দুইজন মানুষ, সেইসাথে ভেতরে রাখা হয়েছে এক বস্তা ধনুকের ছিলা। তাতেও তেমন একটা সমস্যা হত না কিন্তু যে-লিচ্ছবী সৈনিকের পোশাক বিধু গায়ে চড়িয়েছে লোকটা ছিল তারচেয়ে অনেক বেশি হ্যাঙলা-পাতলা, এর ফলে বিরাট চওড়া শারীরিক আকৃতির বিধুর গায়ে একেবারে এঁটে বসেছে পোশাকটা।

“পোশাকটা গায়ে চেপে বসেছে, তাইনা?” বিধুর সামনে থেকে জাথুরিয়া মৃদু হেসে বলে উঠলো।

কিছু না বলে বিধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে যতোটা সম্ভব না নড়ে-চড়ে পোশাকটাকে গায়ে ঢিলে করার চেষ্টা করছে।

“বেশি টেনো না,” জাথুরিয়া বললো। “তাতে আবার ছিঁড়ে যেতে পারে। আমার হয়েছে উল্টা,” বলে সে নিজের গায়ে চড়ানো ঢলঢলে পোশকটা দেখালো, ওটা অনেকখানি ঢিলে হয়ে আছে। ঢলঢলে পোশাকটা দেখিয়ে মৃদু হাসলো সে।

“এই শালারা এইগুলা কী গায়ে দেয়। আমি সিংহল রাজার ওইখানে কাম করছি, আসাম-ত্রিপুরার রাজার সেনাগো লগে কাম করছি এইরহম বাজে পোশাক আর দেহি নাই,” বিধু রাগের সাথে গজ গজ করে উঠলো। ওর কথার কোন জবাব না দিয়ে জাথুরিয়া ঘোড়ার গাড়ির কাঠের ফোকরে চোখ রেখে বোঝার চেষ্টা করছে কতোটুকু অগ্রসর হলো ওরা।

“কদ্দুর?” বিধু জানতে চাইলো।

“এহনো দেরি আছে, ওইযে দুর্গ দেহা যায়, আমগো দল মাত্র খাড়াই বাইয়া উঠতে শুরু করছে,” জাথুরয়িা বাইরে দেখতে দেখতে জানালো। ছিলা প্রস্তুতকারীদের গ্রাম থেকে লিচ্ছবীদের দলটাকে ধরে আনার পর ওদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী শামান আর রাজা বিক্রম মিলে পরিকল্পনা করেছে আজকের অভিযানের। সেই পকিল্পনার অংশ হিসেবেই ওরা

তিনটে দলে ভাগ হয়ে হানা দিবে বিধোরীর দুর্গে। একটা দলের নেতৃত্বে থাকবে শামান, অন্যটার নেতৃত্বে কালন্তি আর সবশেষে মূল দলের নেতৃত্বে আছে রাজা বিক্রম নিজে। এই শেষ দলেই স্থান হয়েছে বিধুর।

এই দলটা সংখ্যায় কম কিন্তু এই একটা মাত্র দলই অপহৃত সৈন্যদের পোশাক গায়ে চড়িয়ে ছদ্মবেশে প্রবেশ করবে দুর্গের মূল ফটক দিয়ে। ওদের দলে আছে তিনটে ঘোড়া আর একটা ঘোড়ার গাড়ি। তিন ঘোড়ার একটায় রাজা বিক্রম লিচ্ছবী সৈন্যের ছদ্মবেশে, বাকি দুটো ঘোড়ায় আরো দুজন সৈনিক। ঘোড়ার গাড়িতে বিধু আর জাথুরিয়া।

জাথুরিয়া ফোকর থেকে চোখ সরিয়ে ফিরে তাকালে বিধুর দিকে। "বিধু, যদিও আমগো পরিচয় অল্প সময়ের কিন্তু তোমারে আমার একটা কথা বলার আছে," বলে সে যেন একটু অস্বস্তির সাথে নড়ে উঠলো। "আমি আসলে কুনোদিনই নিজের সেনার বাইরে কেউরেই বিশ্বাস করি নাই। আর এই কারণেই শুরু থাইক্কা থারুরা তো বটেই দলের বাকিগো লগেও আমার ব্যবহার খুব একটা ভালা ছিল না। কিন্তু ওইদিন মন্তলার হাটে আমার ভুল ভাঙছে। আমি বুঝতে পারছি আসলে মানুষের লগে মানুষে সম্পর্ক গোত্র-ধর্ম-জাতি দিয়া নির্ধারণ হয় না। ওইদিন মন্তলার হাটে তুমি আমারে প্রাণে না বাঁচাইলে আমার লাশ এতোক্ষণে চিল-কাউয়ায় খাইতো। আমি, আমি-" জাথুরিয়ার গলা বুজে এসেছে।

তার দিকে তাকিয়ে বিধু বড় ক'রে একটা হাই ছাড়লো। "আহ-" হাই ছেড়ে সে জিভের ওপরের অংশ আর তালুর সাথে লাগিয়ে টক-টক করে অদ্ভুত এক শব্দ করলো। "আমি আসলে বুঝতে পারতাছি তোমারে আমার এখন খুব ভালো কিছু কওয়া উচিত কিন্তু হাছা কথা অইলো আমি না এই গুলান ঠিক পারি না," বলে সে হেসে উঠলো।

জাথুরিয়া একটু অবাক হয়ে তার দিয়ে তাকিয়ে আছে। বিধু হেসে ওঠার একটু পর সেও হেসে উঠলো।

বাইরে থেকে কারো শিসের শব্দ শোনা গেল, সেই সাথে মৃদু কিন্তু গম্ভীর স্বরে সতর্ক করে দেয়া হলো ওদেরকে, সবাই যেন সাবধান থাকে, কারণ দুর্গের মূল ফটকের কাছে চলে এসেছে ওদের দল। এবারই প্রমাণ হয়ে যাবে এতো সাবধানতা- এতো পরিকল্পনা সব কাজে, লাগবে নাকি বিফলে যাবে।

ওরা আরেকটু এগোতেই মূল ফটকের সামনে থেকে একজন পাহারাদার হাঁক দিয়ে থামালো ওদেরকে। এবার ঘোড়ার গাড়ির ফোকরে চোখ লাগালো বিধু। রাতের আবছা অন্ধকার কেটে গিয়ে মশালের আলোয় উদ্ভাসিত ফটকের সামনের অংশ। সেখানে প্রহরারত দশ-পনেরোজন সৈনিক। তাদের ভেতর থেকে একজন ওদেরকে থামতে ইশারা করতেই রাজা বিক্রম এগিয়ে গেল সামনের দিকে। তার পরনে লিচ্ছবী সৈন্যদের পোশাক, মাথায় শিরণাস্ত্র আর কৃত্রিম তারের ঝুল দিয়ে মুখ প্রায় পুরোটাই ঢাকা।

সে সামনে এগিয়ে জোরের সাথে বলে উঠলো, “কি ব্যাপার, পথ আটকানো হচ্ছে কেন, দেখতে পাচ্ছো না রাজার মূল দলের সৈনিকদের জন্যে মালামাল আনা হয়েছে?” রাজা বিক্রম স্থানীয় লিচ্ছবী ভাষায় কথা বলে উঠলো। তার গলা একেবারেই অকম্পিত, ঠিক একজন বাহিনী প্রধান তার অধীনস্থদের সাথে যেভাবে কথা বলে সেও ঠিক সেভাবে কথা বলছে।

“তা-তো বুঝলাম, কিন্তু এই রাতের বেলা কেন?”পাহারাদারদের নেতা সামনের দিকে এগিয়ে এলো। “আর তোমাদের দলনেতা কোথায়?”

রাজা বিক্রম ঘোড়া থেকে না নেমে ঘোড়ার মুখ সামান্য সরিয়ে পাহারাদারদের নেতার মুখোমুখি হয় বলে উঠলো, “আমাদের দেরি হয়েছে কারণ আমাদের সাথের দুই সৈনিক অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তাদেরকে বৈদ্যখানায় নিয়ে সুস্থ হবার পর আসতে হয়েছে। আর নেতা গেছে তার,” বলে রাজা বিক্রম পাহারাদারদের প্রধানের দিকে তাকিয়ে একটা হাসি দিলো। “দেরি হচ্ছে দেখে তার আর ভালো লাগছিল না, তাই গেছে আর কি, বোঝনা?” সেনাপতির সহকারির বিশেষ বিশেষ জায়গায় যাবার অভ্যেস আছে এটাও ওরা অপহৃত সৈনিকদের কাছ থেকেই ওরা জানতে পেরেছে।

পাহারাদারদের নেতা এক মুহূর্ত গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে রইলো রাজা বিক্রমের দিকে। তারপর হেসে উঠলো সে, তার সাথে গলা মেলালো দলের বাকিরা। “যাও যাও, যে-দেরি করেছো তাতে আইজ সেনাপতি তোমাদের গর্দান নিবে,” বলে সে নিজের লোকদেরকে নির্দেশ দিলো ফটক খুলে দেবার জন্যে।

রাজা বিক্রম একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তার দলের দিকে ফিরে ইশারা করলো। ফোকরের ভেতর থেকে বিধু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। ওদের দলের ঘোড়াগুলো ফটক দিয়ে প্রায় ঢুকে গেছে এমন সময় পাহারাদারদের প্রধান চিৎকার করে উঠলো, “এই থামো।”

রাজা বিক্রমসহ বাকিরা এগিয়ে গেছিল বেশ খানিকটা, সেই সাথে ঘোড়ার গাড়িটাও, বহু কষ্টে রাশ টেনে থামিয়ে দেয়া হলো ওটাকে। রাজা বিক্রম নিজের দলের বাকিদের দিকে ফিরে তাকাল, ব্যাপার কি? ওদেরকে এভাবে থামানো হলো কেন, তবে কি ওরা সন্দেহ করেছে কিছু একটা!

***

কালো জলের বুক চিরে খুব ধীরে-ধীরে বয়ে চলেছে ততোধিক কালো একটা বস্তু। খুব কাছ থেকে পরখ করলে হয়তো এই কালো বস্তুটাকে একটা ভেলা বলে চালিয়ে দেয়া যেত। কিন্তু যেভাবে ডালপালা আর কালো কাপড় দিয়ে ভেলাটাকে ওপর থেকে প্যাঁচানো হয়েছে তাতে আর-দশটা ভাসমান কাঠের গুড়ির এলোমেলো টুকরো ছাড়া অন্যকিছু কোনভাবেই বলা সম্ভব নয়।

তীব্র স্রোতের টানে জলধারা দিয়ে নানা ধরণের গাছের গুড়ি, ঝোপ-ঝাড়সহ আরো অনেক কিছু ভেসে চলেছে জলপ্রপাতের দিকে। এই ভাসমান জিনিসগুলোর ভেতরে খুবই সাধারণ দেখতে এলোমেলো গাছের গুড়ির ভেতরেই অবস্থান করছে কয়েকজন মানুষ।

জলধারাটা আসলে একটা বড় নদীর মতো হলেও এতে স্রোতের টান আর জলের উত্থান-পতন অনেক বেশি। তবে জলের বুক চিরে বয়ে চলা কালো বস্তুটার ভেতরে অবস্থানরত মানুষগুলোর জন্যে ব্যাপারটা ভালোই হয়েছে। কারণ এই স্রোত আর জলের শব্দ না থাকলে কোনভাবেই তারা নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারতো না।

যদিও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে হলে তাদেরকে এখনো আরো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। সেইসাথে মোকাবেলো করতে হবে আরো বড়-বড় বেশ কয়েকটা সমস্যার। তবুও একটা ভালো ব্যাপার হলো; শত্রুপক্ষের চোখ ফাঁকি দিয়ে তারা জলধারার মূল স্রোতের উৎস থেকে রওনা দিয়ে এই পর্যন্ত পৌছাতে পেরেছে। ভাসমান ভেলাটা বিশেষভাবে বানানোই হয়েছে আজকের অভিযানের জন্যে। একেবারে শুকনো এক ধরণের বিশেষ কাঠের গুড়ি পাশাপাশি বসিয়ে তাতে কাঠের তক্তা জোড়া লাগানো হয়েছে, আবার সেইসাথে প্রতিটা গুড়ির মাঝামাঝি রাখা হয়েছে ফাঁক যাতে ভেলায় বসে থাকা লোকগুলো সেই ফাঁকের ভেতর দিয়ে বৈঠা চালিয়ে সামনে এগোতে পারে কিংবা স্রোতের বিপরীতে যেকোন দিকে যেতে পারে।

ভেলায় অবস্থানরত মানুষগুলো এই মুহূর্তে তাই করছে। কিন্তু ওপরে গাছের ডাল-বাকল আর পাতা দিয়ে ঢেকে রাখাতে সেটার নিচে শুয়ে শক্তিশালী স্রোত ঠেলে নির্দিষ্ট দিকে এগিয়ে চলেছে মানুষগুলো। ভেলায় এই মুহূর্তে অবস্থান করছে কালন্তি, শঙ্করাদিত্য, ধোয়ী আর শঙ্করাদিত্যের বাহিনীর চারজন শাক্য সৈন্য। মূলত সৈন্যরাই নিজেদের সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছে ভেলাটার নিয়ন্ত্রণে রাখার।

“আমরা কি সঠিক দিকে যাচ্ছি, নাকি ভুল পথে এগিয়ে-” কালন্তি ওর ঘাড়ের ওপরে এসে পড়া শঙ্করাদিত্যের উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলার মাঝপথে ওকে থামিয়ে দিলো মানুষটা। তার ঠোঁটে এক আঙ্গুল, আর দৃষ্টি ডালপালার ফাঁক দিয়ে সামনের দিকে। কথার জবাব না পেয়ে আবছা অন্ধকারের মধ্যেই ধোয়ীর দিকে ফিরে তাকাল কালন্তি। ধোয়ীর গোল মুখে কোন ভাব নেই। গাছের গুড়ির মতো শক্তিশালী দুইহাতে ভেলার নিয়ন্ত্রক হাল ধরে আছে সে। কালন্তির দিকে তাকিয়ে একবার শঙ্করাদিত্যেকে দেখিয়ে শান্ত থাকতে ইশারা করলো ধোয়ী।

কিন্তু কালন্তি অতোটা শান্ত থাকতে পারছে না। রাজা বিক্রম আর শামানের পরিকল্পনা অনুযায়ী ওরা তিনটে দলে ভাগ হয়ে রওনা দিয়েছে বিধোরীর দুর্গের উদ্দেশ্যে। তিনটে দলের ভেতরে ওদের দলটা দ্বিতীয়, কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ওদের দলটা বিধোরীর দুর্গ সংলগ্ন জলধারা হয়ে দুর্গের নিচের গোপন পথে দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করবে। আর শামানরা আসবে পাহাড় বেয়ে অন্যপথে।

ওরা জলধারা বেয়ে রওনা দেয়ার সময়ে শুরুটা হয়েছিল বেশ চমৎকার কিন্তু কিছুদূরে এগোনোর পরেই স্রোতের টান শুরু হতেই ওরা বিপদে পড়ে যায়। কিছুদূর পর্যন্ত একেবারে টালমাতাল এগোতে থাকে, ওদেরকে ভেলা বাইতেও হচ্ছিলো খুব সাবধানে, কারণ খুব বেশি নড়াচড়া করলে দুর্গের ওপর থেকে অস্বাভাবিক কিছু নড়তে দেখলে প্রহরারত সৈন্যদের টের পেয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। তাই খুব সাবধানে ওরা নৌকা নিয়ন্ত্রণ করে এগোতে থাকে।

কিন্তু দুর্গের প্রায় কাছাকাছি এসেও দুর্গের ভেতরে গোপনে প্রবেশ করার সেই সুরঙ্গমুখ খুঁজে বের করতে পারেনি শঙ্করাদিত্য, তাই কালন্তি বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে। কারণ একবার যদি ওরা গুহামুখটা খুঁজে না পেয়ে আরো এগিয়ে যায় তবে সমস্যা হবে। এমনকি বেশি এগিয়ে গেলে স্রোতের তীব্র টানে জলপ্রপাত দিয়ে গড়িয়ে পড়ে প্রাণটা হারানোরও সম্ভাবনা আছে।

“কিছু পেলেন?” আবারো শঙ্ককরাদিত্যের দিকে ফিরে জানতে চাইলো কালন্তি। ভেলার ওপরে ঝোপ-ঝাড়ের ভেতরে কেমন জানি দম বন্ধ লাগছে তার। ছোটবেলায় কুয়োর ভেতরের সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার পর থেকে যেকোন বদ্ধ জায়গায় অনেক কষ্ট হয় ওর, দম বন্ধ লাগে। এই জায়গাটাও ব্যতিক্রম নয়। জবাব না পেয়ে অস্থির হয়ে সে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই শঙ্করাদিত্য প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, “ওই যে, ওখানটাতের আছে মায়া-করণের গুহার মুখ,” বলে সে কালন্তির দিকে ফিরে হেসে উঠলো, তার হাসিতে গুহামুখ খুঁজে পাবার স্বস্তি।

শঙ্করাদিত্যের হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ সন্দিহান ভঙ্গিতে ফিরে তাকাল কালন্তি। “কোথায়? কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না,” কালন্তির দিকে খেয়াল নেই শঙ্করাদিত্যের, সে ভেলা বাহকদের নির্দেশনা দিতে ব্যস্ত।

শঙ্করাদিত্যের নির্দেশনা শেষ হতেই ধোয়ীসহ বাকিরা মিলে ভেলা ঘোরাতে শুরু করলো। ভেলার এক প্রান্ত অনেকটাই ঘুরে গেছে, বাকি অংশটাও ধীরে-ধীরে ঘুরতে শরু করলো।

শঙ্করের দিকে তাকিয়ে কালন্তি বলে উঠলো, “আপনি সত্যি করে বলুন তো আপনি কি নিশ্চিত ছিলেন গুহাটা কোথায় আছে?”

কালন্তির কোঁচকানো ভ্রুর দিকে তাকিয়ে দূর্বল ভঙ্গিতে হেসে উঠলো শঙ্করাদিত্য, “আরে, বলে কি! আমি-বিক্রম দাদা, আমরা এসব গুহা-গলি ঘুপচিতে খেলতে-খেলতেই বড় হয়েছি, চিনবো না?” শঙ্করের কথা মোটেও বিশ্বাস হলো না কালন্তির। সে রাগের সাথে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই শক্তিশালী ধাক্কায় কেঁপে উঠলো পুরো ভেলা। ভেলাটার পেছনে ভেসে আসছিল বিরাট একটা গাছের গুড়ি, ভেলাটাকে হঠাৎ ঘুরিয়ে দেয়াতে সেটা স্রোতের বেগের সাথে পূর্ণ শক্তিতে ধেয়ে এসে বাড়ি মেরেছে ভেলার গায়ে। ধাক্কাটা এতোই জোরে লেগেছে যে ভেলার ওপরে সাজানো ঝোপ ঝাড়ের একটা অংশ

ছিটকে পড়ে গেল জলতে। যে-যেখানে ছিল প্রায় সবাই গড়িয়ে পড়েছে একে অন্যের গায়ের ওপরে।

কালন্তি শঙ্করাদিত্যের সাথে কথা বলছিল, এমন সময় ধাক্কা লাগাতে সে ছিটকে পড়লো ধোয়ীর গায়ে। ভেলায় ধাক্কা লাগায় ভারসাম্য টলে উঠলেও ভেলার হাল ছাড়েনি ধোয়ী কিন্তু কালন্তি প্রায় উড়ে এসে তার ওপরে পড়াতে হাত থেকে হালটা ছুটে গেল। সাথে সাথে ঝটকা দিয়ে ঘুরে গেল ভেলার মুখ, স্রোতের তীব্র টানে ওটা কোনাকুনি ছুটে গিয়ে মূল স্রোত থেকে সরে এগিয়ে চললো পাহাড়ি দেয়ালের দিকে। প্রায় কোনরকম সাবধান হবার সুযোগ না দিয়ে ভেলাটা আছড়ে পড়লো পাহাড়ি দেয়ালে। শক্তিশালী স্রোতের ধাক্কায় প্রায় বোমা বিস্ফোরণের মতো ভেঙে টুকরো-টুকেরো হয়ে গেল ভেলাটা।

অধ্যায় তেতাল্লিশ

বর্তমান সময়

শাহী ইদগাহ, সিলেট

রাগের চোটে নিজেকে তানভীরের একটা বোমা মনে হচ্ছে, যেকোন সময় বিস্ফোরিত হতে পারে এমন এক বোমা। কানা মাতবরের বাহিনীর সাথে ওদের গোলাগুলিতে কানা মাতবরের মৃত্যুর পর ওর সাথে কথা হয়েছে টমির। আর টমির সাথে কথা বলার পরই কানা মাতবরের ওখানে থাকা সাদা চামড়ার বিশালদেহি লোকটার উপস্থিতির রহস্য পরিষ্কার হয়েছে ওর কাছে। সেই থেকে রাগে জ্বলছে ওর গা।

জোরকদমে ল্যাবের করিডর ধরে সামনে এগোচ্ছে তানভীর। একটু আগেই সে এক সিকিউরিটিকে প্রশ্ন করে জেনে নিয়েছে পুলিশ হাসপাতাল থেকে ল্যাবে নিয়ে আসা ডক্টর মিতায়নকে কোথায় রাখা হয়েছে। এখন ডক্টর মিতায়নের রুমের দিকেই এগিয়ে চলেছে সে।

সকালবেলা পুলিশ হাসপাতাল থেকে বের হবার পর ওর কাছে মনে হয়েছে পুলিশ হাসপাতালে সিকিউরিটির অবস্থা বেশি সুবিধের না। কাজেই ডক্টর মিতায়নকে সেখানে রাখাটা ঠিক হবে না। সেইসাথে তার শারীরিক পরিস্থিতি অনেকটাই উন্নত হবার ফলে তাকে সরিয়ে নির্মাণাধীন ল্যাবের মেডিকেল সেন্টারের একটা কেবিনে ট্রান্সফার করার সিদ্ধান্ত জানিয়েছিল ও নিজেই। সেখানেই রাখা হয়েছে ডক্টর মিতায়নকে।

রাগের সাথে ঝটকা দিয়ে ডক্টরের কেবিনের ভেতরে প্রবেশ করলো ও। ওর পেছনে প্রায় দৌড়ে আসছিল সুলতান, তার থেকেও খানিকটা পেছনে জালাল।

ডক্টর মিতায়নের কেবিনে প্রবেশ করে একবার চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিলো তানভীর। এই রুমটা অনেকটা পুলিশ হাসপাতালের রুমটার মতোই, তবে আকারে কিছুটা ছোট। রুমের ভেতরে রাখা ছোট কটের মতো বিছানার একটায় বসে শায়লা আর তার মা গল্প করছিল, অন্যদিকে বিছানায় আধাশোয়া হয়ে থাকা ডক্টরকে মুখে তুলে কিছু একটা খাইয়ে দিচ্ছিলো লায়লা। ওকে প্রবেশ করতে দেখে সবাই থেমে গেল, ফিরে তাকাল ওর দিকে।

"তানভীর ভাই," শায়লা কট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তানভীর ধমকে উঠলো, "শায়লা, তোরা বাইরে যা, ডক্টরের সাথে আমার কথা আছে।"

"এই ছেলে, তুমি এভাবে কথা বলছো কেন?" নিজের স্বাভাবিক উদ্ধত ভঙ্গিতে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো লায়লা-শায়লার মা। তবে সে কথা শেষ করার আগেই প্রায় চিৎকার করে উঠলো তানভীর। "আউট।"

"দেখো তুমি যদি," মহিলা কিছু বলার আগেই শায়লা তাকে টানতে-টানতে নিয়ে বেরিয়ে গেল। "মা, চলো আমরা.."

"লায়লা তুমিও," একটা আঙ্গুল তুলে লায়লাকেও বেরুতে বললো ও। "আমরা কিছু প্রফেশনাল কথা বলবো, তোমার না থাকাই ভালো।" লায়লা তানভীরের দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর কিছু না বলে বাটিটা টেবিলে নামিয়ে রেখে একটা টিস্যু তুলে নিয়ে ডক্টরকে ধরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

"কি ব্যাপার কমান্ডার, শুনলাম..."

"আপনি জানতেন, তাইনা ডক্টর?" একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো তানভীর। নিজের হোলস্টার থেকে পিস্তলের খাপটা মুক্ত করে রেখে দিলো পাশের টেবিলের ওপরে।

"কি জানতাম আমি, কমান্ডার?" ডক্টরের চেহারা সকাল থেকে ভালো দেখাচ্ছে। গায়ের রঙও উজ্জ্বল হয়েছে, সেইসাথে শেভ করাতে তাকে পরিচ্ছন্নও লাগছে।

"জেড মাস্টার," তানভীর ডক্টরের একেবারে চোখের গভীরের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো। "জেড মাস্টারের ব্যাপারটা আপনি জানতেন কিন্তু সকালে আপনি বলেন নি। আর কি-কি লুকাচ্ছেন আপনি আমাদের কাছ থেকে, বলেন তো?" বলেই তানভীর একটা হাত তুলে ডক্টরের দিকে নির্দেশ করে বললো, "দয়া করে এখন বলবেন না যে আপনি জেড মাস্টারের ব্যাপারে কিছুই জানতেন না"

"আমি জানি না বা জানতাম না সেটা বলবো না কিন্তু আমি জানতাম সেটাও বলবো না," ডক্টরের গলার অনেকটাই নরম হয়ে গেছে। তানভীর কিছু বলার আগেই ডক্টর বলে উঠলো, "আচ্ছা কমান্ডার, জেড মাস্টারের ব্যাপারে আপনারা কি নিশ্চিত?"

"দেখুন ডক্টর, কথা ঘোরাবেন না। ঘোলা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে আপনি যদি নিজেকে বাঁচাতে চান তবে একটা কথা বলি, আপনাকে আমি অন্তত ছাড়বো না," বলে একবার সুলতান আর জালালকে দেখে নিয়ে যোগ করলো। "অবশ্যই, আমরা নিশ্চিত নই কিন্তু আজ দুপুরে জেড মাস্টারের ডান হাত রাশিয়ান দানব শেখারভের সাথে মোলাকাত হয়েছিল আমাদের। আর সত্যি কথাটা বলি, সেই মোলাকাত মোটেই সুখের ছিল না বলাই বাহুল্য। একেবারেই অপ্রস্তুত অবস্থায় আমরা তার সামনে পড়ে গেছি। এই ঘটনাটা ঘটতো না, যদি আপনি আমাকে সকালবেলা কথোপকথনে সময়ে জেড মাস্টারে ব্যাপারটা একবারও উল্লেখ করতেন।"

"হেকমত আবদুল্লাহ গন, ব্ল্যাক বুদ্ধা গন, আমার সঙ্গীসাথীদের কারো খবর নেই, আপনাদের কথা থেকে যা বুঝতে পারছি আরো একটা মেজর ক্লু আপনারা হারিয়ে বসেছেন, তাহলে আমাকে বলেন কমান্ডার এরপর কি আমার পালা?" ডক্টরের কথার জবাবে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তানভীর কিন্তু তাকে থামিয়ে দিলো ডক্টর। "কমান্ডার, আপনি আমাকে একটা কথা বলেন তো, জীবনের ঝুঁকিতে থাকা একজন মানুষ কখন

আপনার সাথে কোন তথ্য শেয়ার করতে চাইবে না?” বলে সে নিজেই যোগ করলো। “যখন সে-ব্যাপারটা নিয়ে নিজেই নিশ্চিত থাকবে না, তখন।”

“কিন্তু আপনি জানতেন, একেবারে সঠিক না জানলেও অন্তত অনুমান করতে পেরেছিলেন, তাইনা,” বলেই রাগের সাথে ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়ালো তানভীর। “আশ্চর্য কান্ড, ডক্টর। আপনি-,” রাগের সাথে থাবা দিয়ে টেবিলের ওপর থেকে একটা জলের বোতল মাটিতে ফেলে দিয়ে ফিরে তাকাল ডক্টরের দিকে।

ডক্টরও রাগের সাথে ঝটকা দিয়ে ফেলে দিলো গায়ের ওপরের চাদরটা, উঠে দাঁড়িয়ে সোজা তাকাল তানভীরের দিকে। এই প্রথমবারের মতো ডক্টরকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেল তানভীর, সেইসাথে অবাক হয়ে খেয়াল করলো ডক্টরের উচ্চতা একেবারেই কম। “কমান্ডার, আমি আপনাকে কিভাবে বেঝাবো যে-লোকটার সাথে আমি এতোদিন কাটিয়েছি সে আসলে কুখ্যাত একজন আন্তর্জাতিক অপরাধি। যেখানে আমি নিজেই নিশ্চিত ছিলাম না,” বলে সে তানভীরের সামনে থেকে সরে গেল খানিকটা,” একটু খুঁড়িয়ে হেঁটে গিয়ে দাঁড়ালো জানালার পাশে। বাইরের দিকে তাকিয়ে যখন কথা বলতে শুরু করলো কণ্ঠস্বর খানিকটা উদাস শোনালো।

“টেড চ্যাঙ নামের যে-মানুষটার সাথে আমার তিন বছর ধরে পরিচয়, আমি তাকে বন্ধুর চেয়ে কোন অংশে কম মনে করতাম না। সত্যি কথা হলো, সে ছিল আমার বন্ধু যার প্রতিটা কাজ আমাকে মুগ্ধ করতো। তার জ্ঞান, তার প্রজ্ঞা তার জীবনবোধ, এমনকি তার নেতৃত্ব ইত্যাদি প্রতিটি ব্যাপারে সে ছিল আমার হিরো। আমি শুধু তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম আর চিন্তা করতাম এই মানুষটা আসলে কী দিয়ে তৈরী। তবে শেষ দিকটায়...” এই পর্যন্ত বলে ডক্টর ফিরে তাকাল তানভীরের দিকে। একবার তানভীর তারপর জালালকে একবার দেখে নিয়ে সে আবারো বাইরের দিকে তাকিয়ে বলে চললো, “শেষ দিকটায় এসে তার চেহারা পুরোপুরি পরিবর্তিত হতে শুরু করে। সে শর্ট টেম্পার্ড হয়ে যচ্ছিলো। ব্ল্যাক বুদ্ধা আবিষ্কারের সময়টাতে যেন অস্থির হয়ে উঠেছিল সে। তখনই তার আসল চেহারা আমি খানিকটা দেখতে পাই। মানুষটার জীবনবোধ ঠিক যতোটা প্রখর ছিল তেমনি তার ভেতরের পশুত্বও তেমনটাই হিংস্র ছিল।”

“আপনি তাহলে নিশ্চিত ছিলেন না যে টেড চ্যাঙ নামের যে-মানুষটার সাথে আপনি কাজ করছেন সে আসলে আন্তর্জাতিক অ্যান্টিক চোরাচালানি জগতের একজন কুখ্যাত মানুষ, যাকে সবাই জেড মাস্টার নামে চেনে,” তানভীর জানতে চাইলো।

“আমি কিভাবে নিশ্চিত হবো, বলেন। যেখানে ইন্টারপোলের মতো সংগঠনের কাছে জেড মাস্টারের কেন ছবি নেই, নেই কোন সঠিক শারীরিক বিবরণ,” ডক্টর খানিকটা উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলো।

“তাহলে কখন তার ওপর আপনার সন্দেহ গিয়ে পড়ে?” তানভীর শান্তভাবে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছে।

“আপনাদেরকে তো বলেছিই আসামে উলফাদের একটা সিস্টার টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের সাথে আমাদের টক্কর লেগেছিল। এক পর্যায়ে ওদের একটা দল ধরা পড়ে যায় আমাদের হাতে, তিনজনের একটা দল। একটা মেয়ে, দুটো ছেলে। আমি প্রথমেই তাকে বলি, ওদেরকে আসামিজ অথরিটির হাতে তুলে দিতে কিন্তু টেড সেটা করতে নারাজ ছিল। সে নিজে ওদের কাছ থেকে তথ্য বের করার জন্যে চাপ দিতে শুরু করে,” বলে ডক্টর কাঁধ ঝাঁকালো। “সোজা কথায় বলতে গেলে ওদেরকে টর্চার করতে শুরু করে। তখনই আমার খানিকটা সন্দেহ লাগে। কারণ আমি জানতাম টেডের কোন পুলিশ বা মিলিটারি ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল না। কিন্তু সে যেভাবে ওদেরকে টর্চার করতে শুরু করে তাতে আমার সন্দেহ লাগে। আমি এক পর্যায়ে তার স্যাটেলাইট ফোন ঘাঁটার সুযোগ পেয়ে ওটা চেক করে কল লিস্টে একজনের নাম দেখতে পাই, শেখারভ।”

“রাশান এক্স প্যারামিলিশিয়া, ওর সাথেই আজ সকালে আমাদের মোলাকাত হয়েছিল,” তানভীর আনমনেই বলে উঠলো। সাথে-সাথে ওর মনে পড়ে গেল সকালে দেখা বিশালাকায় লোকটার কথা। অজান্তেই একটা হাত চলে গেল গলায়। তানভীর সবসময় নিজেকে শারীরিকভাবে শক্তিশালী ভাবতো, আন-আর্মড কমব্যাটে ডাবল ব্ল্যাকবেল্ট জেতার পরে একটা সময় মনে হত শরীরিক শক্তিতে কিংবা আন-আর্মড কমব্যাটে কেউ ওকে হারাতে পারবে না কিন্তু আজ সকালে সেই লোকটা ওকে একটা শিশুর মতোই শূণ্যে তুলে ওর সেই আত্মবিশ্বাসে বিরাট একটা চিড় ধরিয়ে দিয়েছে। শারীরিকভাবে এতোটা অসহায় কখনো লাগেনি ওর।

“হ্যাঁ, ওই নামটা টেডের স্যাটেলাইট ফোনের লিস্টে দেখার সাথে সাথে আমার সন্দেহ প্রকট হয়। কারণ আমি জানতাম জেড মাস্টারকে আজ পর্যন্ত কেউই কখনো ধরতে পারেনি। তবে ইন্টারপোলের এক অপারেশনে জেড মাস্টারের রাশান সঙ্গী শেখারভ প্রায় ধরা পড়ে গেছিল। তখনই শেখারভ লোকটার চেহারা ইন্টারপোলের কাছে ফাঁস হয়ে যায়। সেখান থেকেই সবাই জানে জেড মাস্টারের একজন রাশান সহকারি আছে। আমি নিজে অ্যান্টিক জগতের মানুষ তাই এই তথ্যটা অন্তত আমার বেশ ভালোভাবেই জানা ছিল,” ডক্টর একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলো।

“তো যাই হোক, এরপর থেকে আমি একদিকে তার ওপরে নজর রাখতে থাকি। একটা সময় সবকিছু বিবেচনা করে বুঝতে পারি টেড চ্যাঙের জেড মাস্টার হবার একটা সম্ভাবনা আছে। কারণ এসব বিষয়ে আগাদ জ্ঞান থেকে শুরু করে তার আন্তর্জাতিক কানেকশন ইত্যাদি সব মেলে। এর পাশাপাশি সে নিজেও একটা বিরাট আন্তর্জাতিক সংস্থার একটা অংশের প্রধান। কাজেই তার এই পরিচয়ের আড়ালে জেড মাস্টার হিসেবে অপারেট করাটা তার জন্যে অবশ্যই সম্ভব। তবে সত্যি কথা হলো, মন মানতে চাইছিল না, হাসিখুশি টেড চ্যাঙ, সন্ন্যাসীদের মতো ধ্যানী টেড চ্যাঙ আসলে জেড মাস্টার, ভাবতেই পারছিলাম না আমি। তাই ঠিক করি আগে ব্ল্যাক বুদ্ধা উদ্ধার হয়ে যাক, এরপরে দেশে ফিরে যা করার করবো কিন্তু দেশে ফেরার পথে সে আমাকে ড্রাগ পুশ করে ঘুম

পাড়িয়ে দেয়। এরপর যখন জ্ঞান ফেরে সে সম্ভবত আমাকে মেরেই ফেলতো যদি না আমাদের ওপরে আক্রমণ হত।"

"তার মানে তো আপনাদের ওপরে আক্রমণ হয়ে আপনার জন্যে ভালো হয়েছে। আপনি প্রাণে বেঁচে গেছেন," অনেকক্ষণ পর জালাল বলে উঠলো।

"প্রফেসর-" তানভীর কিছু বলার আগেই ডক্টর এমন এক কান্ড করলো কেউ ভাবতেও পারেনি সে এমন করবে, বিশেষ করে তানভীর।

ডক্টর মিতায়ন দুই পা এগিয়ে এসে তানভীরের একটা হাত ধরে ফেললো। "কমান্ডার, আমি একজন সেল্ফ-মেইড ম্যান। ট্রাইবাল কমিউনিটির ছোট্ট এক গ্রাম থেকে উঠে এসে আজকের অবস্থানে এসেছি আমি স্রেফ নিজের চেষ্টা আর পরিশ্রমের জোরে। আজ পর্যন্ত আমি কাউকেই কোনকিছুর জন্যে অনুরোধ করিনি। কারো কাছে কোনকিছুর জন্যে হাত পাতিনি। আজ আপনার কাছে হাত পাতছি। আমি জানি টেড চ্যাঙ অর্থাৎ জেড মাস্টার এই শহরের চৌহদ্দির ভেতরেই আছে, কারণ আমার বিশ্বাস সে বেঈমানির শিকার হয়েছে নিজের লোকদের হাতেই... এবং তার সাথে ব্ল্যাক বুদ্ধাও আছে। আপনি ব্ল্যাক বুদ্ধা উদ্ধার করে টেড চ্যাঙকে গ্রেপ্তার করুন। তা-না হলে একদিকে ইতিহাসের এই মূল্যবান অংশটুকু চিরতরে হারিয়ে যাবে, অন্যদিকে আমাকে সে বাঁচতে দেবে না। আমাকে তো সে মেরে ফেলবেই সেইসাথে আমার পরিবারকেও। জেড মাস্টারের ইতিহাস ঘেঁটে দেখুন, সে আজ পর্যন্ত তার সাথে বিরুদ্ধচারণ করা কাউকেই বাঁচতে দেয়নি। প্রত্যেককে সে পরিবারসহ নিঃচিহ্ন করেছে। আমি জানি সে যদি একবারর এই শহরের গন্ডি থেকে বেরুতে পারে তবে পৃথিবীর যেখানেই যাই সে আমাকে বাঁচতে দেবে না, সেইসাথে লায়লাকেও-" ডক্টর মিতায়নের চোখ থেকে এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো তানভীরের হাতে।

তানভীর দুইবার মুখ খুললো কথা বলার জন্যে কিন্তু কিছু বলতে পারলো না। তৃতীয়বারের সময় সফল হলো সে, "ডক্টর-" কিন্তু কথা শেষ করার আগেই হন্তদন্ত হয়ে রুমের ভেতরে এসে ঢুকলো এক সিকিউরিটি গার্ড।

"টমি স্যার আপনাকে আর জালাল স্যারকে এক্ষুণি মিটিং রুমে যেতে বলেছেন"

অধ্যায় চুয়াল্লিশ

সময়: ১৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ

বিধোরী দুর্গ, কন্নোর, ভারতবর্ষ

ভেলাটা পাহাড়ি দেয়ালের গায়ে আছড়ে পড়ার ঠিক আগ মুহূর্তে ধোয়ীকে জাপটে ধরে জলতে লাফ দিয়েছিল কালন্তি। কিন্তু জলতে পড়ার সাথে সাথেই দুজনে আলাদা হয়ে যায়। হুপ-হাপ কয়েক ঢোক জল গিলে নাক-মুখ জলের ওপরে তুললো কালন্তি। একটু দূরেই দেখতে পেল ধোয়ী একটা ভাসমান গুড়ি ধরে ভেসে আসছে ওর দিকে। গুড়িটা ওর পাশে দিয়ে যাবার সময়ে ও সেটাকে ধরে ফেললো, দুজনে মিলে ভেসে যেতে লাগলো জলপ্রপাতের দিকে।

ধোয়ী সামনেই একটা পাথর দেখিয়ে চিৎকার করে উঠলো। সাবধান করে দেবার আগেই পাথরটা চলে এলো নাগালের মধ্যে। দুজনে প্রায় একইসাথে গুড়িটা ছেড়ে দিয়ে পাশ দিয়ে যাবার সময়ে ধরে ফেললো পাথরটাকে। ওটাকে ধরে হাঁপাতে লাগলো। আশেপাশে তাকিয়ে দেখেতে পেল না কাউকে।

“এখন, কি করা?” সদা শান্ত ধোয়ী হাঁপাতে-হাঁপাতে জানতে চাইলো কালন্তির কাছে। জল থেকে মুখ তুলে হাঁপাচ্ছিলো কালন্তি। তাকিয়ে দেখলো দূরে পাহাড়ের গায়ে কালো গুহামুখটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ওই পর্যন্ত পৌছাবে কিভাবে। “আমাদেরকে কিছুটা সাঁতার

কেটে মূল স্রোত থেকে সরে যেতে হবে। তারপর কিনারার দিকে এগোতে পারলে স্রোতের টানও কম লাগবে, সেইসাথে গুহামুখটার কাছে পৌছানোর একটা ব্যবস্থা হলে হয়েও যেতে পারে," আমি সরে গিয়ে দেখি স্রোতের টান কেমন। বলেই কালন্তি শরীরটাকে ঢিলে করে বুক ভরে দম নিলো।

পাথরটার গা ঘেঁষে শরীরটাকে ঢিলে করে দিয়ে ধোয়ীর একটা হাত ধরে চিৎকার করে উঠলো, "এখন," বলে দুজনে একসাথে পাথরটার গায়ে পা দিয়ে ঠেলা দিয়ে সরে এলো বেশ খানিকটা তারপর টানা কিছুক্ষণ স্রোতের বিপরীতে সাঁতরে চলে এলো পাহাড়ের কিনারার দিকে। পাহাড়ের কাছাকাছি যেতেই স্রোতের তীব্র টান কমে আসতে লাগলো। আরো খানিকটা কিনারায় যেতেই পায়ের নিচে মাটি পেল ওরা। জল থেকে ধীরে-ধীরে হেঁটে চলে এলো গুহা মুখটার কাছে। গুহার বেশ অনেকটা ভেতরে এসে জল থেকে মাটিতে উঠে এলো দুজনে।

তীব্র স্রোত, সাঁতার আর সব মিলিয়ে কাহিল করে ফেলেছে দুজনকেই। গুহার ভেতরে খালের মতো জলধারার অন্যপাড় থেকে কেউ একজন নাম ধরে ডেকে উঠলো ওদেরকে। কালন্তি তাকিয়ে দেখলো শঙ্করাদিত্য আর তার দুই সঙ্গী। বাকি দুজন মনে হয় ভেসে গেছে স্রোতের টানে। ওদের উদ্দেশ্যে একবার হাত নেড়ে আবারো মাটিতে শুয়ে পড়লো কালন্তি। মনের কোনে চিন্তার ঝড়, ওরা তো জল থেকে উঠে আসতে পেরেছে কিন্তু শামানদের কী অবস্থা কে জানে।

***

শামান অবশ্য এই মুহূর্তে ওপরে ওঠা নিয়ে চিন্তত নয় বরং সে নিচে নামা নিয়ে বেশি ভয় করছে।

স্মৃতি হবার পর থেকেই নিজেকে পাহাড়ের বুকে আবিষ্কার করেছে শামান, পাহাড়েই বেড়ে ওঠা, পাহাড়েই চড়ে বেড়ানো, পাহাড়কে নিজের সবচেয়ে আপন মনে করা শামানের কাছে এই মুহূর্তে পাহাড়কেই সবচেয়ে বড় শত্রু মনে হচ্ছে।

রাজা বিক্রমের সাথে বিধোরীর দুর্গ আক্রমণের বিশদ পরিকল্পনা করার সময়ে শামান জানতো আসলে যতোই পরিকল্পনা করা হোক, ব্যাপারগুলো এতোটা সহজ হবে না, মাঠে নামার পর পরিকল্পনার অনেক অংশই কাজে লাগবে না। কিন্তু সে নিজে এভাবে পাহাড়ের বুকে ফেঁসে যাবে, এটা কল্পনাতেও আসেনি ওর।

পরিকল্পনাটা ছিল খুবই সুন্দর, ওরা তিনটে দল তিন দিক দিয়ে দুর্গে প্রবেশ করবে। বিধোরীর দুর্গটা একটা পাহাড়ের একপাশে অবস্থিত। এটার একদিকে পাহাড়, অন্যদিকটা একটা জলধারার দিয়ে জলপ্রপাতের সাথে সংযুক্ত। আর তাই ওদের পরিকল্পনাটাও ছিল রাজা বিক্রম মূল ফটক দিয়ে লিচ্ছবী সৈন্যদের ছদ্মবেশে প্রবেশ করবে, কালন্তি আর শঙ্করাদিত্য প্রবেশ করবে জলের অংশটুকু দিয়ে, আর শামানেরা জঙ্গলের অন্যপাশের

উপত্যকা দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে আসবে বিধোরীর দুর্গের পাশের পাহাড়ের ওপরে, তারপর নেমে আসবে খোলা শৈলশিলায়। শৈলশিলার এদিক দিয়ে দুর্গে প্রবেশ করার একটা গোপন পথ আছে। এই তথ্যটা রাজা বিক্রমই ওদেরকে জানিয়েছে। আর এ-কারণেই পাহাড়ের এদিক দিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেয় শামান।

এই সিদ্ধান্ত নেয়ার পেছনে কিছু কারণ ছিল। প্রথমত, সম্পূর্ণ অভিযানে যারা আছে তাদের মধ্যে শামানই পাহাড়ে চড়তে সবচেয়ে বেশি দক্ষ। বাকিদের মধ্যে ওর দলে স্থান পেয়েছে ঘোষিত- কারণ ঘোষিত ভালো পাহাড় বাইতে পারে। তাছাড়া ওদের সাথে আছে আরো চারজন থারু আর শাক্য সৈন্য। ঘোষিত এই শৈলশিলার পথটা খুব ভালো চেনে- সেইসাথে এদিক দিয়ে দুর্গের ভেতরে যাবার পথটাও তার চেনা।

সব ঠিকমতোই চলছিল এতোক্ষণ। বরং বলা চলে ওদের প্রত্যাশার চেয়েও বেশি সফলতার দিকে এগোচ্ছিলো অভিযান। ওরা প্রথমে থারুদের গ্রাম থেকে একসাথে রওনা দিয়ে নির্দিষ্ট জায়গাতে এসে আলাদা হয়ে যার-যার মতো নির্দিষ্ট পথে এগোতে থাকে। শামানরা প্রথমে জঙ্গুলে পথ পাড়ি দিয়ে চলে আসে উপত্যকার মাঝামাঝি। তারপর উপত্যকার নির্দিষ্ট অংশে এসে পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করে। ওদের ধারণা অনুযায়ী যতোটা সময় লাগবে ব'লে মনে করেছিল তারচেয়ে বেশি সময় লাগে কিন্তু পাহাড় বেয়ে উঠতে কোন ঝামেলা হয়নি। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় পাহাড় বেয়ে নামার সময়ে।

একদিকে পাহাড়ের যে অংশটা দিয়ে ওরা উঠে এসেছে সেই অংশটা অনেক বেশি ঢালু, কিন্তু যেদিক দিয়ে নামতে হবে সেদিকটা অনেক বেশি খাড়াই। এ-কারণেই দুর্গের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যেই দুর্গের এই অংশটাকে এভাবে সাজানো হয়েছে। কিন্তু শামানরা দলে যারা আছে তারা প্রত্যেকেই পাহাড়ে চড়তে ওস্তাদ, একরণে কষ্ট হলেও তারা শামানের নেতৃত্বে সামান্য উপকরণ নিয়েই পাহাড় বেয়ে ধীরে-ধীরে নেমে আসতে শুরু কওে ওরা। বেশ অনেকদূর নামার পরে শৈলশিলার বেড়িয়ে থাকা জিভের মতো জায়গাটার ওপরের চূড়ার একটা অংশ থেকে পরিষ্কার দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে ওঠে ওরা। কিন্তু আরেকটু নিচে নামতেই মুখের হাসি উবে যায় সবার।

কারণ ওদের নিচে শৈলশিলার বেরিয়ে থাকা জিভের ওখানে মানুষের নড়াচড়া টের পাওয়া যাচ্ছে। আরেকটু ভালোভাবে খেয়াল করতেই এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে নিচে আসলে আগুন জ্বলছে, আর আগুনের আশেপাশে যে নড়া-চড়া চোখে পড়ছে সেটা যে লিচ্ছবীদের প্রহরারত সৈনিক সেই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

এখন নামাটাই বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ একদিকে পাহাড়ের খাড়াই এতোটাই বেশি যে, ওটা থেকে শৈলশিলায় নামাটা ঝুঁকির ব্যাপার, তার ওপরে নিঃশব্দে নামাটা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু ওরা নামতে গিয়ে শব্দ হলেই নিচের প্রহরারত সৈনিকেরা টের পেয়ে

যাবে। আর একবার টের পেয়ে তারা যদি দুর্গের ভেতরে খবর পাঠিয়ে দেয় তবেই সর্বনাশ।

ওরা সবাই শরীরে দড়ি বেঁধে সারি দিয়ে সাবধানে নেমে আসছিল, নিচের আলোটা দেখে থেমে যায়। এখন কী করবে বুঝতে না পেরে সবাই চুপ করে আছে, কিন্তু ওদের অবস্থান এমন, এখানে খুব বেশিক্ষণ চুপচাপ অপেক্ষা করা যাবে না। শামান একবার সাবধানে উঁকি দিয়ে নিচে দেখলো, তারপর ওপরের দিকে তাকিয়ে পথপ্রদর্শক শাক্য সৈন্যের দিকে ফিরে ইশারা করলো একবার।

শামানের ঠিক পেছনেই ছিল ঘোষিত, তার পেছনে অন্যরা। কোনমতে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘোষিতের কাছে শামান নিজের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করলো। শামানের পরিকল্পনা শুনে বেশ আপত্তির সাথে মাথা ঝাঁকালো ঘোষিত, "অনেক বেশি ঝুঁকি অয়া যায়। যদি ওরা লোক বেশি থাহে তবে?"

"এছাড়া আর কোন উপায় আছে?" একটু রাগের সাথেই জানতে চাইলো শামান। ঘোষিত কোন জবাব না দিয়ে চুপ হয়ে রইলো। পরিকল্পনা মাফিক দুজনেই খুব সাবধানে অন্যদের সাথে সংযুক্ত দড়িটা খুলে ফেললো। শামান ঘোষিতকে বললো সাবধানে সে যেন পরিকল্পনাটা অন্যদের জানিয়ে দেয়।

পরিকল্পনা হলো; যেহেতু সবাই একে-একে নিচে নামতে পারছে না, কাজেই শামান আর ঘোষিত কোন শব্দ না করে আরেকটু নিচে নেমে যাবে, সেখান থেকে ওরা লাফিয়ে নামবে নিচের শৈলশিলাতে, যেখানে লিচ্ছবী সৈন্যরা আগুন পোহাচ্ছে। তারপর ওরা দুজনে মিলে ওদেরকে ক্ষান্ত দেয়ার পর বাকিরা নেমে আসবে ধীরে-ধীরে। তবে এতে অনেকগুলো সমস্যা। একে তো ওদের দুজনকে দড়ি ছাড়াই অনেকটা পথ নামতে হবে, যেটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। অন্যদিকে ওরা নিচে নেমে যদি দেখে সৈন্য সংখ্যা অনেক বেশি, তবে ওরা সৈন্যদেরকে ক্ষান্ত দেয়ার আগে ওরাই দুজনকে ক্ষান্ত দিয়ে দিবে।

তবে বেশি ভেবে লাভ নেই, শামানের বক্তব্য, যা করার দ্রুত করতে হবে, তা-না হলে ওদের সব পরিকল্পনাই ব্যর্থ হবে। ওরা খুব সাবধানে নামতে লাগলো নিচের দিকে। শামান আগে-আগে নামছে, ওর ঠিক পেছনেই ঘোষিত। পথ যেমনটা খাড়া ঠিক তেমনি ওরা যতোই সাবধানে নামুক পায়ের সাথে লেগে ঝুড়-ঝুড় করে বালির মতো পিছলে যাচ্ছে পা। শামান খানিকটা নেমে ঘোষিতকে সাবধান করার জন্যে মুখটা ঘোরাতেই দেখতে পেল ঘোষিত শরীরের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টালমাতাল করছে। যদিও খাড়া পথ তাও শামান দ্রুত চেষ্টা করলো তার কাছে পৌছে তাকে ধরার জন্যে কিন্তু সেটা করার আগেই, ঘোষিত পা পিছলে সোজা ছুটে এলো ওর দিকে। পূর্ণ বয়স্ক একজন মানুষের ছুটে আসার বেগ সামলানোর মতো জায়গায় নেই ওরা। ফলে যা হবার তাই হলো। ঘোষিত পা পিছলে ছুটে এলো শামানের দিকে, ওকে নিয়ে গড়িয়ে পড়তে শুরু করলো নিচের দিকে।

না চাইতেও শামানের গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো আর্তচিৎকার। ঘোষিতকে প্রায় আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে ধরে দুজনেই ছুটে চলেছে নিচের দিকে। এই গতিতে নিচে পড়লে ভর্তা হয়ে যেতে হবে। খাদের প্রায় কিনারায় পৌছে গেছে, শামান এক হাতে খাদের কিরারা ধরে ফেললো, ওর অন্যহাতের সাথে ঝুলছে ঘোষিত।

দুজনেই হাঁপড়ের মতো হাঁপাতে লাগলো নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে, যদিও নিচে তাকায়নি তবুও নিচ থেকে ভেসে আসা উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে শামান অনুধাবন করলো আর লুকিয়ে লাভ নেই, ধরা পড়ে গেছে ওরা। কোনমতে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘোষিতের দিকে একবার ইশারা করেই তাকে ছেড়ে দিলো ও। ঘোষিতকে নিচের দিকে ছুঁড়ে দিয়েই বুক ভরে একবার দম নিয়ে নিজের হাত আলগা করে দিলো ও। মুহূর্তের জন্যে শরীরটা শূণ্যে ঝুলে থেকেই ধুপ করে একটা শব্দের সাথে শামান নিজেকে আবিষ্কার করলো শৈলশিলার জ্বিভের মতো জায়গাটায়। প্রাথমিক পতনের ধাক্কা সামলে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে, দুই হাতে বেরিয়ে এসেছে উন্মুক্ত জোড়া হিস্বা।

মুহূর্তের মধ্যে ও দেখলো, ওর থেকে আরেকটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে ঘোষিত, কিন্তু সে এখনো তলোয়ার বের করতে পারেনি। ওদের একপাশে একটা ছোট অগ্নিকুন্ড জ্বলছে, ওটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে দুজন লিচ্ছবী সৈন্য। আরো দুজন বসে আছে। সবাই ওদের দিকে তাকিয়ে আছে অবাক বিস্ময়ে। আকাশ থেকে এভাবে মৃত্যুদূত পতিত হবে ভাবতেও পারেনি কেউ। প্রায় হাওয়ার বেগে শামান এগিয়ে গেল ওদের দিকে।

প্রথম একজনের হাতে লাকড়ির মতো কিছু একটা ছিল, ওর কাতানার উল্টো পিঠের বাড়িতে সেগুলো উড়ে গেল, উড়ন্ত জিনিসগুলো ভেদ করে আবারো কাতানার উল্টো পিঠ গিয়ে আঘাত করলো লোকটার ঘাড়ে। দাঁড়িয়ে থাকা দ্বিতীয় জন তলোয়ার বের করার আগেই বসে থাকা অন্য সৈন্য ভারি কিছু একটা ছুঁড়ে মারলো শামানের দিকে। ভারি মাটির বাসনের মতো জিনিসটা উড়ে এসে ওর বুকের সাথে লেগে টুকরো হয়ে গেল, ওটার ধাক্কা সামলানোর আগেই দ্বিতীয় জনের লাথি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল ও। এক হাত থেকে ছুটে গেল কাতানা। জিনিসটার দিকে হাত বাড়াবে তার আগেই, দ্বিতীয়জন যমের মতো ওর একেবারে ওপরে এসে দাঁড়ালো। লোকটা ভারি একটা পাথর তুলে ধরেছে মাথার ওপরে, শামান অপর হাতে নিজের কাতানা তুলে ধরলো, লোকটাও নিজের পাথরটা তুলে ধরেছে পেছন থেকে একটা তলোয়ারের মাথা তার পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো।

লোকটা গড়িয়ে পড়ে গেল মাটিতে, পেছনে ঘোষিতকে দেখতে পেল ও, তলোয়ারটা টান দিয়ে বের করে নিতে। শামানও কাতানা হাতে উঠে দাঁড়িয়ে দুজনেই ফিরে তাকাল বাকি দুই সৈন্যের দিকে। দুজনেই প্রস্তুত, একজনের হাতে তলোয়ার আর অন্যজনের হাতে বিরাট আকারের একটা ধুনক। দ্বিতীয় লোকটা ধনুক তুলে ধরতেই শামানের হাতের কাতানা ছুটে গিয়ে তার গলায় বিঁধলো, অন্য লোকটাকে শামান আর ঘোষিত মিলে কাবু করে বেঁধে ফেললো। তারপর বাকিদেরকে ইশারা করলো নেমে আসার জন্যে।

“রক্তগঙ্গা হয়া গেছে,” ঘোষিত আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো তাকে হাতের ইশারায় চুপ থাকতে বলে ও ইশারা করলো গুহার ভেতরে পথ দেখানোর জন্যে। এই পর্যন্ত পৌছাতে পেরেছে ওরা কিন্তু এবার শুরু হবে মূল অভিযান, দেখা যাক সামনে কী অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে।

ঘোষিত সামনে এগোতেই বাকিদেরকে সাবধানে পেছন-পেছন আসার জন্যে ইশারা করে সামনে এগোল শামান।

অধ্যায় পয়তাল্লিশ

বর্তমান সময়

নির্মাণাধীন ল্যাব, শাহী ঈদগাহ, সিলেট

সিকিউরিটির লোকটা যখন দৌড়ে এসে জানালো টমি ওকে আর জালালকে জরুরিভিত্তিতে কনফারেন্স রুমে যেতে বলেছে তখনো তানভীর ডক্টর মিতায়নের চোখের দিকেই তাকিয়ে ছিল।

ডক্টরের চোখের করুণ আকুতির কী জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারছে না তানভীর। "ডক্টর, আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করবো," বলে ও এক সেকেন্ডও দাঁড়ালো না, জালালকে বের হবার জন্যে ইশারা করে দ্রুত পদক্ষেপে চলে এলো রুমের বাইরে। রুমের বাইরে এসে সোজা হেঁটে চলে এলো কনফারেন্স রুমে। সেখানে, সবাই অপেক্ষা করছিল ওদের দুজনার জন্যে, দুজনেই রুমে প্রবেশ করে দুটো চেয়ার টেনে বসে পড়লো।

"কি ব্যাপার, টমি? আপডেট জানাও।"

"স্যার, গরম খবর আছে," বলে সে উত্তেজনার সাথে আবারো সেই প্রজেক্টরের স্ক্রিন ওপেন করলো। "জেড মাস্টারের ব্যাপারে ইন্টারপোলের কাছে তথ্য চেয়েছিলাম আমরা। ওদের পাঠানো ইনফো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে পাশা স্যারের মাধ্যমে। জেড মাস্টারকে অ্যান্টিক চোরাচালানির জগতে জীবন্ত কিংবদন্তি বলা হয়ে থাকে। বিশেষ করে এশিয়ান অ্যান্টিকের জগতে তার সমকক্ষ নাকি কেউই নেই। লাউস, কম্বোডিয়া ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, নেপাল ও চায়নার কিছুটা অংশ তিব্বতসহ ভারতের কিছুটা অংশের আন্তর্জাতিক চোরাচালানের একছত্র অধিপতি। এশিয়ান মাফিয়া, দুর্নীতিবাজ পুলিশ, এমনকি অনেক দেশের সরকারের ভেতরেও নাকি তার লোক আছে। আন্তর্জাতিক অ্যান্টিক চোরাচালানির মার্কেটে এশিয়ার এই অংশটাকে বলা হয়ে থাকে করিডর আর এই করিডরের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণকারী সে।"

"টমি, তুমি কি এখানে জেড মাস্টারের গুনকীর্তন শোনানোর জন্যে আমাদেরকে ডেকে এনেছো?" ধমকে উঠলো তানভীর।

"না, বস। এই তথ্যগুলো দিলাম কারণ জেড মাস্টারকে বুঝতে হলে এটা জানতে হবে। আমি সংক্ষেপ করবো, তবে জেড মাস্টারের ব্যাপারে আরেকটা তথ্য না বললেই নয়, জেড মাস্টার আসলে কে, সে দেখতে কেমন, কী তার ব্যাকগ্রাউন্ড কেউই জানে না। এমনকি ইন্টারপোলের কাছেও তার কোন পরিচয় নেই। শুধুমাত্র একবারই সে ইন্টারপোলের কাছে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে, সেবারই তার একান্ত সহাকারি

শেখারভকে দেখতে পেয়েছিল ইন্টারপোল। অত্যন্ত ক্ষমতাধারী, ভয়ঙ্কর হিংস্র আর চতুর এই জেড মাস্টার। সবসময় সবকিছু নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখে। কথিত আছে, সে যতোবার যতোজনের সাথে কাজ করেছে, কাজ শেষে কাউকেই বাঁচিয়ে রাখেনি। এমনকি এদের ভেতরে কয়েকজনকে পরিবারসহ গায়েব করে দিয়েছে।"

টমির শেষ কথাটা শুনে তানভীরের বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো। নিজেকে সামলে নিয়ে সামনে তাকাতেই দেখতে পেল জালাল একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। দুজনেই সুলতানের পরবর্তী প্রশ্নে সামনের দিকে মনোযোগ দিলো।

"আচ্ছা, তুমি অনেকগুলো দেশের নাম বললে, বাংলাদেশের নাম তো বললে না?" সুলতান জানতে চাইলো।

"কারণ এতোদিন পর্যন্ত জেড মাস্টারকে কখনো বাংলাদেশে অপারেট করতে শোনা যায়নি। এইবারই সম্ভবত সে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে অপারেট করছে। কারণ বিখ্যাত ব্ল্যাক বুদ্ধার পেছনে লেগেছে সে।"

"শুধু লাগেই নি, সম্ভবত সে ভারত আর বাংলাদেশের মতো দুটো দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর একেবারে নাকের ডগায় বসে ডক্টর মিতায়নকে ব্যবহার করে শেষ পর্যন্ত ব্ল্যাক বুদ্ধা উদ্ধার করেছে সে। এরপরে কী হয়েছে সেটা আমরা জানি না তবে যে-তথ্য আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। এবং," বলে একটা আঙ্গুল তুললো তানভীর। "সম্ভবত আমরাই প্রথমবারের মতো যেভাবেই হোক জেড মাস্টারের সবচেয়ে কাছাকাছি পৌছাতে পেরেছি। আমরাই মনে হয় জানি জেড মাস্টার আসলে কে।"

"টেড চ্যাঙ," আনমনেই বলে উঠলো জালাল।

"একদম ঠিক, ডক্টর মিতায়নের ভাষ্য যদি সঠিক হয় তবে, টেড চ্যাঙই হলো জেড মাস্টার। টেড চ্যাঙ তার আসল পরিচয় কিনা কে জানে তবে এই নামের আড়ালে লুকিয়ে থাকা মানুষটাই সম্ভবত জেড মাস্টার। তার জ্ঞান, তার প্রজ্ঞা তার আন্তর্জাতিক কানেকশন, অ্যাকাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড মেলালে এটাই মনে হচ্ছে এখন পর্যন্ত। আশ্চর্য! এশিয়ার সবচেয়ে বড় আর্কিওলজিক্যাল সংস্থার প্রধানের ছদ্মবেশে সে কতোদিন এই কুকাজ করে বেড়াচ্ছিলো। টমি তুমি, পাশা স্যারসহ ইএএফের প্রধান বাবুল আহমেদ স্যারকে জানাও ব্যাপারটা। উনাদেরকে বলো ইন্টারপোলকে এই ব্যাপারে জানাতে। সেইসাথে পুরো সিলেট শহরে টেড চ্যাঙ মানে জেড মাস্টার আর তার সহকারি শেখারভের ছবি সার্কুলেট করো। ডক্টর হারিয়ে যাবার কিছু সময় পর থেকেই পুরো শহর ব্লুকেডের আন্ডারে আছে। কাজেই তারা এখনো এই শহর ছেড়ে যেতে পারেনি। আমি জেড মাস্টারকে চাই।"

"বস," বলে টমি একটা হাত তুললো। "তুমি যা-যা নির্দেশ দিলে সেগুলোর প্রথম অংশটা অবশ্যই করবো। কিন্তু দ্বিতীয় অংশটার প্রয়োজন হবে ব'লে মনে হয়না। তবে সেটাতে

আমি পরে আসছি আগে বলে নেই কানা মাতবরের ফ্যাক্টরির লোকদেরকে জেরা করে আমরা জানতে পেরেছি, ফ্যাক্টরির ভেতরের বাংলোটাতে কয়েকদিন ধরে বেশকিছু বিদেশী অবস্থান করছিল। কানা মাতবরের লোকেরাই তাদেরকে পাহারা দিয়ে রাখতো। ওরা গত তিনদিন ধরে ওখানে অবস্থান করছিল। সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জেড মাস্টার কোথায় আছে না জানলেও সে আজ সন্ধ্যার পরে কোথায় থাকতে পারে সে-ব্যাপারে একটা ধারণা আমরা বের করতে পেরেছি।"

"মানে?" তানভীর উত্তেজনার চোটে একবার জালালের দিকে তাকিয়ে আরেকবার সুলতানকে দেখলো ও। সুলতান মাথা নেড়ে আশ্বাস দিলো ওকে। টমি ভুল বলেনি।

ওদিকে তানভীরের উত্তেজনা টমি খেয়াল করেনি, সে তার মতোই বলে চলেছে। "এই ব্যাপারে অবশ্য আমার নিজের খুব বেশি ক্রেডিট নেই। প্রায় পুরো ক্রেডিটটাই ইন্সপেক্টর ইকবালের। আপনারও খানিকটা আছে," বলে সে তানভীরকে দেখালো।

"টমি, নাটকীয়তা বাদি দিয়ে কাজের কথা বল," তানভীরের নিজেকে একটু অধৈর্য লাগছে। "এর মানে কি?"

"মানে হলো 'টাইটানিক'," বলে টমি একটু সাসপেন্স আনার জন্যে একটু থামলো। থেমে মৃদু হাসিমুখে সবাইকে একবার করে দেখে নিয়ে সে তানভীরের দিকে তাকাতেই জলদি পারবর্তী স্লাইডে চাপ দিলো। "কানা মাতবর মারা যাবার আগে আপনাদেরকে বলে গেছিল 'টাইটানিক'। আপনাদের মধ্যে যেখানে গোলাগুলি হয়েছে সেখানে পরবর্তীতে খুঁজে দেখার সময়ে ওখানে আমরা একটা কার্ড পাই। সেই কার্ডটার পেছনেও হাতে লেখা ছিল টাইটানিক শব্দটা। সম্ভবত এই কার্ডটাই কানা মাতবর দিতে যাচ্ছিলো শেখারভদেরকে।"

"টাইটানিক বালটা আসলে কি, সেইটা কও," টমির লেকচার আর সহ্য করতে না পেরে জালাল রাগের সাথে ধমকে উঠলো।

"টাইটানিক হলো একটা জাহাজ। জাহাজ বললে আসলে ভুল বলা হয়, জিনিসটা একটা লঞ্চ, রিভারক্রুজ টাইপের একটা লঞ্চ। অনেকটা ভাসমান কমিউনিটি সেন্টারের মতো। সাধারণ একটা জাহাজকেই এক স্থানীয় ব্যবসায়ি খুব সুন্দর করে সাজিয়েছে। ওটাতে একটা রেস্টুরেন্ট আছে ডেকের ওপরে, গান-বাজনা হয়, আবার খাবার ব্যবস্থাও আছে। তবে ওটা জাহাজের মূল জিনিস না। জাহাজটাতে বিভিন্ন ধরণের পার্টি আয়োজন করা হয়। বিয়ের জন্যে একটু ছোট কিন্তু জন্মদিন, গায়ে হলুদ ইত্যাদি নানা ধরণের ছোট-খাট পার্টির জন্যে ঠিক আছে। কিন ব্রিজের নিচ থেকে ছাড়ে ওটা। পার্টির লোকজন উঠলে পরে জাহাজটা মূল নদীতে চলে যায়। সেখানে পার্টি চলে, পরে আবার তাদেরকে এনে নামিয়ে দেয়া হয় শহরের কাছে বন্দর এলাকার আশেপাশে। এই লঞ্চটাকেই নাম দেয়া হয়েছে টাইটানিক।"

"ব্ল্যাক বুদ্ধা আর জেড মাস্টারের সাথে এই টাইটানিকের সম্পর্ক কি?" সুলতান জানতে চাইলো।

"বুঝতে পারছো না," টমি উত্তর দেয়ার আগেই তানভীর বলে উঠলো। "যদি আমরা গল্পটা এভাবে সাজাই, টেড চ্যাঙ মানে জেড মাস্টার বাংলাদেশ আর আসামের অথরিটিকে ধোঁকা দিয়ে ডক্টর মিতায়নকে ব্যবহার করে ব্ল্যাক বুদ্ধা উদ্ধার করে দেশে ঢুকলো, তাদেরকে আবার সাহায্য করছিল হেকমত আবদুল্লাহ। তো ওরা দেশে ঢোকার পরে সম্ভবত হেকতমত আবদুল্লার লোকেরা ওদেরকে ধোঁকা দিয়ে মুর্তিটা কেড়ে নিতে চাইছিল। তখন শেখারভেরা তাকে খুন করে ব্ল্যাক বুদ্ধা হাতিয়ে নেয়। এরপরে সম্ভবত কানা মাতবরের সাথে ওদের একটা চুক্তি হয় যে, সে ওদেরকে প্রটেকশন দিবে সেইসাথে সম্ভবত টাইটানিকে করে কোন একটা অনুষ্ঠানের সুযোগে ওদেরকে শহরের বাইরে বের করে দিয়ে আসবে। ওই সময়ে আমরা গিয়ে পড়ি অন স্পটে। খানিকটা গোল বেঁধে যায় আর কানা মাতবর মারা পড়ে। এখন প্রশ্ন হলো, কানা মাতবর মারা পরার পরেও ওরা টাইটানিকের পরিকল্পনা ঠিক রাখবে কিনা?" কথাগুলো অনেকটা আনমনেই বলে উঠলো তানভীর। বলেই টমির দিকে ফিরে জানতে চাইলো, "টমি, তুই খোঁজ লাগা টাইটানিক এখন কোথায়, আর তাতে আজ কোন অনুষ্ঠান আছে কিনা?"

"আছে বস, ইতিমধ্যেই খোঁজও লাগানো হয়েছে সেইসাথে লোকও লাগানো আছে। ওরা টাইটানিকের ওপরে নজর রাখছে। টাইটানিক এখন কিন ব্রিজের নিচেই আছে। ওটা সাজানো হয়েছে বেশ চমৎকার করে কারণ আজ নাকি ওতে সিলেটের কোন ব্যবসায়ির মেয়ের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান আছে," বলে সে একটু দ্বিধার সাথে যোগ করলো।

"বস, যদি কিছু মনে না করো তবে ছোট মুখে একটা বড় কথা বলি, যদি আমার ধারণা ভুল না হয় তবে কানা মাতবর মারা যাবার পরেও অবশ্যই আজকে টাইটানিকটা শেখারভরা ব্যবহার করার চেষ্টা করবে। কারণ টাইটানিকের মালিক কানা মাতবর ছিল না। সে সম্ভবত টাইটানিকের মালিকের সাথে ওদেরকে একটা চুক্তি করে দিয়েছিল। কাজেই কানা মাতবর মারা গেলেও ওরা টাইটানিকের পরিকল্পনা বাদ দিবে না, কারণ আ জবড় ধরণের অনুষ্ঠান আছে টাইটানিকে। মানে ওটা শহর ছেড়ে বেরুবে। অনুষ্ঠানের আড়াল নিয়ে টাইটানিকে উঠে ওরা মাঝ নদীতে অন্য কোন মাধ্যমে সরে পড়ার চেষ্টা করবে ওখান থেকে। আর টাইটানিকের ব্যাপারটা যে কানা মাতবর মারা যাবার আগে আমাদের বলে গেছে ওটাও ওদের জানার কোন কারণ নেই কাজেই আমার বিশ্বাস আজ টাইটানিকে কিছু একটা ঘটবেই।"

তানভীর একটু চিন্তা করে ফিরে তাকাল জালালের দিকে। একটা ম্যাচের কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছে সে। "জালাল ভাই, আপনার কি মনে হয়?"

"টাইটানিকের মালিকরে ধইরা প্যাদানি দেয়া যায় না আগে-ভাগে?"

“না, সেই উপায় নেই। প্রমাণ কি আমাদের হাতে? মালিক যে-ই হোক স্রেফ অস্বীকার করবে সে। সেইসাথে ওদেরকে সাবধান করে দেয়ার একটা সম্ভাবনাও আছে। কাজেই এটা বাদ,” এবার সুলতান যোগ করলো।

“তাইলে আর কি টাইটানিক যেমন ডুবছিল একশ বছর আগে, ওই জেড মাস্টার না কি বাল, ওগোরে ধরইরাও ওমনে চুবাইতে হবে সুরমার জলতে, তাইলেই জড মাস্টারগিরি ছুইট্টা যাবে,” বলেই তার মুখে ফুটে উঠলো সেই বিখ্যাত হাসি।

তানভীরও মৃদু হেসে বলে উঠলো, “তাহলে, চলেন পরিকল্পনাটা ঠিক করে ফেলি।”

অধ্যায় ছেচল্লিশ

সময়: ১৮০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ

বিধোরী দুর্গ, কন্নোর, ভারতবর্ষ

পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসম্ভব সাবধান থাকার চেষ্টা করছে করছে রাজা বিক্রম।

তবে খুব বেশি সাবধান থেকে কোন লাভ নেই, এটা সে খুব ভালোই জানে। এ-কারণেই সে সাবধানতার চেয়ে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে জায়গামতো পৌঁছানোর ব্যাপারটা। তাছাড়া যেহেতু তারা লিচ্ছবী সৈন্যদের পোশাক পরে আছে কাজেই কোন সাবধানতার ধার না ধরে বরং বেশ বীরদর্পে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে।

বিধোরীর দুর্গের মূল ফটক দিয়ে প্রবেশ করার পর দুর্গের মূল ফটকের প্রহরীরা ওদেরকে পেছন থেকে ডেকে রাত হবার কারণে শব্দ কম করতে সচেতন করে দেয়। ওরা কাউকে বিরক্ত করবে না এই প্রতিজ্ঞা করে দুর্গে প্রবেশ করে বেশ খানিকটা ঘোড়া আর ঘোড়ার গাড়িতে করে এগিয়েছে। তারপর নিয়ম মাফিক সেগুলোকে আস্তাবলে রেখে এখন বীরদর্পে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। যদিও দুর্গে প্রায় সবাই ঘুমন্ত তবুও রাজা বিক্রম, বিধু, জাথুরিয়া আর দলের বাকিরা তাদের অভিনয়ে কোন খুঁত রাখতে চাইছে না। তারা একইরকম বীরদর্পে এগিয়ে সোজা চলে এলো রাজা হেমচন্দের থাকার জায়গার দিকে। দুর্গের মূল আঙ্গিনা থেকে ওপরের দিকে উঠে গেছে তিনটে বুরুজ। সামনে এগিয়ে একটা বুরুজের একেবারে নিচে চলে এলো ওরা।

স্বাভাবিক নিয়মে এখানে রাজার বাসস্থানের নিচে বেশ কিছু প্রহরী থাকার কথা, কিন্তু একজনকেও দেখা গেল না। রাজা বিক্রম বেশ অবাক হয়ে আশেপাশে ফিরে তাকাল, দুয়েকবার এদিক সেদিক দেখে নিয়ে যখন নিশ্চিত হলো কেউই নেই অবাক হয়ে ফিরে তাকাল নিজের লোকদের দিকে।

“ব্যাপার কি হুজুর? পাহারাদারেরা সব গেল কই?” বিধু বেশ বিস্ময়ের সাথে জানতে চাইলো একটু হালকা হবার সুযোগ পেয়েই সে নিজের পোশাক টেনে আলগা করার চেষ্টা করছে। রাজা বিক্রম তার দিকে তাকিয়ে কিছু না বলে একবার তাকে দেখে নিয়ে আরেকবার জাথুরিয়ার দিকে ফিরে ওপরের দিকে তাকাল। ওপর থেকে হালকা আলো ভেসে আসছে।

“চলো সবাই,” বলে সে সামনে হাঁটতে শুরু করলো। বিধু একবার জাথুরিয়ার দিকে তাকিয়ে সবাইকে ইশারা করলো ওপরের দিকে ওঠার জন্য। পুরো দুর্গের তিনটে সুউচ্চ বুরুজের দুটোতে মূলত বাসভবন। একটাতে রাজা থাকতো আগে, অন্যটাতে উচ্চ পদস্থ

অফিসারেরা। আর শেষটাতে যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ক আলোচনা হয়- মানে দরবারের কাজ চলে। রাজা বিক্রম আগেই অপহৃত সৈনিকদের সাথে কথা বলে নিশ্চিত করেছিল যে রাজা হেমচন্দ্র তার পুরো পরিবার নিয়ে এখনো চলে না এলেও সে নিজে উত্তরের বুরুজটাতে বসবাস করছে আর তাই বিক্রমের পরিকল্পনা ছিল সর্ব উত্তরের বুরুজে ছদ্মবেশে প্রবেশ করে রাজা হেমচন্দ্রকে বন্দি করে তারপর রওনা দিবে গুহার দিকে, যেখানে মুর্তি নির্মাণ চলছে। ইতিমধ্যে জলপথে গুহা দিয়ে আর পাহাড়ি পথে বাকিরা চলে এলে সবাই মিলে সম্মিলিত আক্রমণের মাধ্যমে ডুকপা লামাকে উদ্ধার করে মুর্তি আর বন্দি রাজাকে নিয়ে সরে পড়বে।

রাজা বিক্রম আর তার বাহিনী সাবধানে ওপরে ওঠার রাস্তা ধরে একে একে তিনধাপ ওপরে উঠে এলো। এবার সবশেষ ধাপে উঠতে হবে, তারা পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে আছে। কিন্তু ওপরে উঠে এসে ওরা কারো ছায়া পর্যন্ত দেখতে পেল না।

“কাহিনী কি? রাজার কামরার বাইরেও কেউ নাইকা,” বিধুর কথাকে পাত্তা না দিয়ে রাজা বিক্রম এক টানে খাপ থেকে বের করে আনলো নিজের তলোয়ার, তারপর এক ধাক্কায় খুলে ফেললো কামরার দরজা। দরজাটা খুলেই সে ভেতরে ঢুকে পড়লো। তার ঠিক পেছনে-পেছনে ঢুকলো জাথুরিয়া আর বিধু।

ভেতরের কামরা একবারে খালি, বিছানাটা এলোমেলো হয়ে আছে, পাশেই তস্তরির ওপরে রাখা মদের পানপাত্র। রাজা বিক্রম কিছু একটা দেখতে পেয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল। পানপাত্রের পাশেই সিলমোহর ভাঙা গোল মতো কিছু একটা রাখা। সেটা পড়ে রাজা বিক্রম রাগে প্রায় লাফিয়ে উঠলো।

“ব্যাপার কি হুজুর?” বিধু জানতে চাইলো। কিন্তু তার আগেই দ্রুততার সাথে রাজা বিক্রম সবাইকে বেরুনোর নির্দেশ দিলো। “জলদি চলো, আপাতত পরিকল্পনা মাঠে মারা গেছে, রাজা হেমচন্দ্র বিশেষ সন্দেশ পেয়ে গুহা পরিদর্শনে গেছে। জলদি আমাদেরকে সেখানে যেতে হবে। সাবধান করে দিতে হবে অন্যদেরকে। কে জানে এরই মধ্যে তারা পৌছে গেছে কিনা,” বলেই সে দৌড়াতে শুরু করলো, বাকিরা অনুসরণ করলো তাকে।

***

গুহার ভেতরে প্রবেশ করে জলাধারাটা বেশ কিছুদূর পর্যন্ত বেশ স্রোতস্বীনির মতোই এগিয়েছে কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে কমে এসেছে ওটার বেগ। জলধারার যেখানে একেবারে সরু হয়ে এসেছে সেখানে পৌছে লাফিয়ে পার হয়ে এলো ধোয়ী আর কালন্তি।

অন্যপাড়ে অপেক্ষা করছিল শঙ্করাদিত্য আর তার সাথে দুজন। তারাও সবাই ভিজে চুপচুপে হয়ে গেলেও এখন অনেকটাই শুকিয়ে এসেছে। তবে কালন্তি ওদেরকে দেখে একটু অবাক হয়েই জানতে চাইলো, “আপনাদের সাথের আরেকজন কোথায়?”

শঙ্করাদিত্য মাথা নাড়লো। "ও গুহা পর্যন্ত পৌছাতে পারেনি, তার আগেই ভেসে গেছে স্রোতের টানে, ও সাঁতার জানতো না খুব একটা," বলে সে আফসোসের সাথে একবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে সবাইকে একবার দেখে নিয়ে বলে উঠলো, "আমাদের ভেতর থেকে একজন হারিয়ে গেছে। তার জন্যে আমরা প্রার্থনা করবো, কিন্তু পরে। এখন আমাদেরকে এগোতে হবে রাজা বিক্রমের পরিকল্পনা অনুয়ায়ি। প্রথমেই সবাই নিজের পোশাক আর অস্ত্র ঠিক-ঠাক করে নাও।"

শঙ্করাদিত্যের কথামতো সবাই যার যার অস্ত্র পরীক্ষা করে নিলো। সবার অস্ত্র পরীক্ষা শেষ হতেই সে বলতে লাগলো, "সবার কি আমাদের পরিকল্পনার কথা মনে আছে, নাকি আবারো আমাকে বলতে হবে?"

কালন্তি একবার মাথা নেড়ে বলে উঠলো, "আমার মনে হয় কালক্ষেপণ না করে আমাদের বরং সামনে এগোনো উচিত। এখান থেকে আমরা কোনদিকে যাবো?"

শঙ্করাদিত্য তার সাথে সহমত পোষণ করে জবাব দিলো, "উত্তম কথা। এখান থেকে আমাদেরকে ওপরের দিকে উঠতে হবে। প্রথমত আমরা দুর্গের যেদিক দিয়ে প্রবেশ করেছি সেটা পূর্ব দিকে, আর আমাদেরকে যেতে হবে উত্তর-পূর্ব দিকে। যতোই ওপরের দিকে উঠতে থাকবো ততোই আমরা মূল গুহার দিকে এগোতে থাকবো, কিন্তু সেইসাথে আমাদের ঝুঁকির মাত্রাও বাড়তে থাকবে কারণ ওপরে ওঠার সাথে-সাথে লোক সমাগমও বাড়বে। আমার ধারণা লিচ্ছবীরা এখনো জানেই না যে এদিক দিয়ে দুর্গের সাথে মূল জলপ্রপাতের সংযোগ আছে। তবে এই জায়গাটায় আমরা ছোটবেলা প্রায় খেলতে আসতাম। তবে এরপরে এমনকি আমরাও আর বহু বছর এদিকটাতে আসিনি। কাজেই সদ্য দুর্গ দখল করা লিচ্ছবীদের জন্যে এদিকটার ব্যাপারে জানাটা অসম্ভব। চলো চলো," বলে সে সবাই তাড়া দিয়ে সামনের দিকে এগোতে লাগলো। সবার সামনে সে, তার পেছনে কালন্তি, সাথেই ধোয়ী, আর ধোয়ীর পেছনে বাকি তিনজন।

ওরা জলধারার সাথে সংযুক্ত গুহা থেকে ভেতরের দিকে চলে এলো। ভেতরের দিকে এগোনোর সাথে ধীরে-ধীরে ওপরের দিকে উঠতে লাগলো। দ্রুতই চারপাশের প্রাকৃতিক চুনাপাথর বদলে গিয়ে মানুষের হাতের কাজ বাড়তে লাগলো। টানা অনেকখানি এগিয়ে শঙ্করাদিত্য ওদেরকে থামতে বললো। একটু আগে পর্যন্ত গুহা থেকে অদ্ভুত এক ধরণের আলো আসছিল কিন্তু এখন প্রায় অন্ধকার। শঙ্করাদিত্য সামনে থেমে গলা বাড়িয়ে কিছু একটা দেখলো, তারপর মাথা নেড়ে সবাইকে সতর্ক করে দিলো, সামনেই একটা বড় খাদ আছে সবাই যেন সাবধানে পার হয় ওটা।

শঙ্করাদিত্য সেটা পার হতেই, কালন্তি দেখলো খাদটা বেশি চওড়া না, দুই কি তিন ফিটের মতো হবে, অন্ধকার গুহার ভেতরে ততোধিক অন্ধকার একটা মুখ হা করে আছে। সে কান পেতে অনুমান করলো ওটার নিচ থেকে কুল-কুল জলের শব্দ ভেসে আসছে। একে-একে সবাই লাফিয়ে পেরিয়ে এলো ওটা। খাদটা পার হতেই সামনে সরু কার্নিশের মতো

দেখা গেল। আবারও সবাইকে সাবধানে পার হবার নির্দেশ দিলো শঙ্করাদিত্য। ওরা আগে থেকেই এই অন্ধকারের কথা মাথায় রেখে চকমকি পাথর আর হাতে বানানো মশাল নিয়ে এসেছিল কিন্তু ভেলা ভেঙে ওগুলো সব গেছে। এখন অন্ধকারের ভেতরে চোখ সওয়ানো আলোই ভরসা।

গুহার ভেতরের সরু কার্নিশটা পার হতেই সামনের দিকে যেতে লাগলো, পথও চওড়া হয়ে আসতে লাগলো সেইসাথে সামনে দেখা গেল মানুষের হাতে কেটে বসানো পাথরের পথ। সবাই পথটা দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো, কারণ হাতে বানানো পথ মানেই হলো দুর্গের মোটামুটি ভেতরে চলে এসেছে ওরা।

শঙ্করাদিত্যের দিকে তাকিয়ে কালন্তি দেখলো তার চোখেমুখেও স্বস্তির ছায়া। সামনে পথটার শেষ মাথা থেকে হলদে এক ধরণের আলো ভেসে আসছে। “মনে হচ্ছে পৌছে গেছি,” বলে সে সামনের দিকে এগোতে এগোতে হঠাৎ দৌড়াতে লাগলো। বাকিরাও দ্রুত এগিয়ে দেখলো শঙ্করাদিত্য সামনে পৌছে হতাশার সাথে শব্দ করে উঠলো।

“কি ব্যাপার, হলো কি?” প্রশ্নটা করেই শঙ্করাদিত্যের পরে কালন্তিই প্রথম দেখতে পেল জিনিসটা। পথটার শেষ মাথায় গোলমতো একটা প্রবেশ দরজা, সেটার অন্যপাশে দেয়ালে ঝোলানো একটা মশাল থেকে ভেসে আসছে হলদে আলো। ওটাই দুর্গের মূল অংশ। ওদিকে দিয়ে প্রবেশ করেই মূল দুর্গ সংলগ্ন গুহায় পৌছাতে হবে কিন্তু সেটা করতে হলে আগে ওদেরকে মূল অংশে প্রবেশ করতে হবে।

ওরা আগে যা ভেবেছিল সেটা এখন ভুল মনে হচ্ছে। সম্প্রতি দুর্গ দখল করলেও লিচ্ছবীরা ঠিকই বের করতে পেরেছে দুর্গের নিচের জলধারার সাথে দুর্গের মূল অংশের সংযোগ আছে। আরে সে-কারণেই প্রবেশ পথের ওখানে মোটা মোটা লোহার শিক লাগিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে পথটা।

শঙ্করাদিত্য অসহায়ের মতো তাকিয়ে আছে লোহার শিকগুলোর দিকে, তার দিকে ফিরে কালন্তি বলে উঠলো, “এবার কি করবো আমরা?” শঙ্করাদিত্য কোন জবাব না দিয়ে সামনের লোহার দরজার মতো জিনিসটা পরীক্ষা করছে। লোহার শিকগুলো পরীক্ষা করে সে আফসোসের সাথে মাথা নাড়লো, “অসম্ভব, এগুলো উপযুক্ত যন্ত্রপাতি পেলেও একদল মানুষের এক হপ্তা লাগবে ভাঙতে। আর আমাদের কাছে তো তীর-ধনুক আর তরবারি ছাড়া কিছুই নেই।”

“তাই বলে, তাই বলে... এতোদূর পর্যন্ত এসে আমরা থেমে যাবো?” কালন্তির নিজের কাছে নিজেকেই অত্যন্ত অসহায় লাগছে। সে পাগলের মতো হাতড়াচ্ছে লোহার শিকগুলোতে।

“উপায় আছে,” বলে সামনে দিকে এগিয়ে এলো সদাশান্ত ধোয়ী। সামনের দিকে এসে সে নিজের গাছের গুড়ির মতো মোটমোটা হাতগুলো দিয়ে লোহার শিকের ওপরে হাত বুলাতে

লাগলো। পুরো দরজার মতো জিনিসটা পরীক্ষা করে সে সন্তুষ্টির হাসি দিলো ওদের দিকে তাকিয়ে। কালন্তি খুব অবাক হয়ে গেল ধোয়ীর হাসি দেখে, এই জীবনে সে কোনদিন ধোয়ীকে হাসতে দেখেছে ব'লে মনে পড়লো না। "আসলেই উপায় আছে?" সে কৌতুহলের সাথে জানতে চাইলো।

কচুপাতার ওপরে জলের ফোঁটা পড়লে ঠিক যেভবে জল মুহূর্তের জন্যে স্থির থেকে লহমার ভেতরে গড়িয়ে পড়ে যায় তেমনি মুহূর্তের জন্যে হাসিটা ধোয়ীর মুখে স্থির থেকে চট করে নেই হয়ে গেল। "উপায় আছে, আমার বাবা ছিল লোহার কারবারি, আমি ছোটবেলা থেইক্কা হের লগে কাম করতাম। হেয় এইসব দরজা বানানির ওস্তাদ আছিল। এই দরজাগুলা কুনোভাবেই ভাঙা সম্ভব না," বলে সে সবাইকে দেখলো।

"তাহলে তুমি না এইমাত্র না বললে উপায় আছে, এখন আবার বলছো উপায় নেই, তাহলে কিভাবে সম্ভব?"

"দরজা ভাঙ্গা সম্ভব না," ধোয়ী শান্ত স্বরে জবাব দিলো। "কিন্তু কব্জা ভাঙা সম্ভব, কারণ এই দরজাগুলা একটা চাইরকোনার উপরে বসায়া পাথরের ভিতরে গজাল দিয়া লাগায়া দেয়া হয়। আমরা যদি দরজার হেই গজালগুলা বাইর করতে পারি তয় না ভাঙতে পারলেও হেইগুলা কেমনে বাইর কইরা আনা যাবে আমি জানি, আর হেইগুলা খুললেই-"

"দরজা খুলে আসবে," বলেই শঙ্করাদিত্য এগিয়ে গেল দরজাটা দিকে সবাই খোঁজ," কিছুক্ষণের ভেতরেই দরজার দুপাশে দুটো করে চারটা এরকম কব্জা আবিষ্কার হলো। আরো আধাঘন্টার ভেতরে নির্দিষ্ট জায়গাগুলো থেকে নিজের বড় ছুড়ি দিয়ে দক্ষ হাতে বহু কষ্টে গজালগুলো খুলে আনতেই দরজাটা একপাশে হেলে পড়লো। এরপরে সবাই মিলে দরজাটা টেনে ধরতেই ধীরে-ধীরে একপাশে বেঁকে যেতে শুরু করলো সেটা। বাকিরা টেনে ধরে রাখলো আর এক একে অন্যরা পার হয়ে এলো। সবার শেষে পার হলো ধোয়ী।

টানা কাজ করতে করতে তার চেহারা লাল হয়ে উঠেছে। সে কাজ সেওে অন্যদিকে আসতেই খুশির চোটে তাকে জড়িয়ে ধরলো কালন্তি, "সাবাশ ধোয়ী, তুমি না থাকলে..." সে কথা শেষ করার আগেই পেছন থেকে বিজাতীয় ভাষায় ওদেরকে ধমকে উঠলো কেউ। সবাই ফিরে তাকাল সেদিকে।

চারজনের একটা সস্বস্ত্র সৈনিক দল। কালন্তি চট করে ফিরে তাকাল শঙ্করাদিত্যের দিকে। দুর্গে প্রবেশ করার খুশিতে কেউই খেয়াল করেনি কিন্তু লিচ্ছবী সৈনিকদের টহলরত দলের সামনে পড়ে গেছে ওরা।

***

কালন্তিদের দুর্গে প্রবেশ করতে যে-পরিমাণ কষ্ট করতে হয়েছে সেই তুলনায় বলতে গেলে শামান আর ঘোষিতেরা খুব সহজেই প্রবেশ করতে পেরেছে দুর্গের ভেতরে। সেই শৈলশিলাতে লাফিয়ে পড়ে তৎক্ষণাত আগুন পোহাতে থাকা প্রহরারত সৈনিকদের সাথে লড়াইয়ের পর ওরা তেমন একটা বাঁধার সন্মুখীন হয়নি। জীবিত সৈনিককে ওখানেই বেঁধে রেখে ওরা সাবধানে শৈলশিলার ওদিক দিয়ে ভেতরের দিকে প্রবেশ করে।

"ঘোষিত, তুমি ভালোভাবে চেনো তো জায়গাটা?" গুহা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করার পর কেন জানি ঘোষিতের চেহারা দেখে শামানের মনে হলো সে জায়গাটা ঠিকমতো চিনতে পারছে না। কিছুদূরে প্রবেশ করে থেমে গেছে ওরা, কারণ ওদের দলে সবার সামনে ছিল ঘোষিত, তার পেছনে শামান আর শামানের পেছনে দলের বাকিরা। শৈলশিলার প্রবেশ পথের ওখান দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেই প্রথমে ওরা দেখতে পায় ভেতরটা একেবারেই প্রাকৃতিক চুনাপাথরে নির্মিত। কিন্তু ওরা যতোই ভেতরে প্রবেশ করতে থাকে মানুষের হাতের কাজ বাড়তে থাকে। মূল দুর্গে প্রবেশ করার পথের কাছেই এসে থেমে গেছে ঘোষিত, আর সেটা দেখে কেন জানি সন্দেহ হচ্ছে শামানের ঘোষিত আদৌ দুর্গের ভেতরটা ঠিকমতো চেনে কিনা।

"ঘোষিত," মৃদু স্বরে ধমকে উঠলো শামান। থেমে দাঁড়িয়ে দেয়ালে হাত বুলাতে বুলাতে বিড়বিড় করে কী কী সব যেন বলছিল ঘোষিত। "বলছি তুমি চিনতে পারছো তো?"

ঘোষিত কিছু না বলে সোজা ফিরে তাকাল শামানের দিকে। "আরে ওস্তাদ," বিধুর কাছে শুনে সেও শামানকে ওস্তাদ ডাকতে শুরু করেছে। "কী যে কও চিনবাম না। এইসব জাগাত কতো স্মৃতি," বলে সে আবারো দেয়ালে হাত বুলাতে লাগলো। শামান দেখলো ঘোষিতের চোখে জল।

ঘোষিতের কাঁধে একটা হাত রাখলো শামান। "আমি বুঝতে পারছি তোমার খারাপ লাগছে। পুরনো স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছে কিন্তু আমাদেরকে এখন যেতে হবে। তুমি ঠিকমতো চিনতে পারবে তো?" ঘোষিত হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে নিজের চোখ মুছে শামানের দিকে তাকিয়ে একটা হাসি দিলো। সেই পুরনো দুষ্টু হাসি। হাসি দিয়ে সে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি আর মধ্যমা দিয়ে তুড়ি বাজালো। "চুটকির মধ্যে লয়া যাবো গুহাত, কারণ এইহান থিইক্কা ওইহানে যাওনের গুপন রাস্তা আছে, চলো চলো," বলে সে প্রবেশ পথটা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেই চট করে থেমে গেল।

শামান ও ঠিক পেছনেই ছিল, ঘোষিত থেমে যেতেই প্রায় ধাক্কা লাগতে যাচ্ছিলো তার সাথে, তাকে একহাতে থামিয়ে দিলো ঘোষিত, অন্যহাতে একটা আঙ্গুল মুখের সামনে তুলে ধরে চুপ থাকতে বললো। জায়গাটা খুব একটু অন্ধকার না আবার একেবারে পরিষ্কারও নয়। দূর থেকে মশালের আবছা আলো আসছে। সেই আলোতে দেখা গেল ওদের সামনে দিয়ে টহলরত সৈনিকদের ছোট একটা দল কথা বলতে বলতে চলে গেল।

“সাবধানে,” সৈনিকেরা চলে যেতেই ওরা চট করে বেরিয়ে এলো মূল পথটাতে। ওটা ধরে সাবধনে এগোতে লাগলো সামনের দিকে। বেশ অনেকটা এগোনোর পর ঘোষিত বলে উঠলো, “যদি আমার ভুল না অয় এইহানে একটা গুদাম ঘর থাকুনের কথা,” বলে সে একটা পাথরের দরজার সামনে থেমে গেল। দরজাটা খানিকটা ঠেলে সরিয়ে দিতেই খুশি হয়ে সে বলে উঠলো, “আছে, বলে সে ভেতরে পা রাখতে গিয়েই, “ও মাগো,” বলেই ভেতরের অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

ঘোষিতের পেছনেই ছিল শামান, সে হঠাৎ সামনে হারিয়ে যেতে দেখলো ঘোষিতকে। “এই ঘোষিত, ঘোষিত?” কোন সাড়া নেই। শামান এদিক সেদিক তাকাল লোকটা মুহূর্তের ভেতরে স্রেফ হারিয়ে গেল নাকি ভেতরে। “এই ঘোষিত?” শামান ভয় পাচ্ছে ওরা যেভাবে খোলা জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছে, আবারো যেকোন সময় টহলদার সৈনিকেরা চলে আসলে মহা বিপদ হবে। যা আছে কপালে ভেবে পাথরের দরজাটা ঠেলে সরিয়ে দিতেই নিচ থেকে ঘোষিতের মৃদু কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। “ওস্তাদ সাবধানে। জায়গাটা অনেক নিচা, তয় একটা মই আছে, ওইটা ধইরা নাইম্মো।”

শামান দরজাটা আরেকটু টেলে সরিয়ে দিয়ে দেখতে পেল দরজার অন্যপাশে বিরাট একটা কামরা। বিরাট বললেও আসলে কম বলা হয়, প্রায় একটা মাঠের সমান হবে। দরজা থেকে বেশ নিচে ওটার মেঝে। মেঝেতে হাত পা ছাড়িয়ে বসে আছে ঘোষিত, ওকে উঁকি দিতে দেখে হাতের ইশরায় কোনদিকে মইটা আছে সেটা দেখালো। ওর পেছনের লোকদেরকে সাবধানে আসতে বলে মই দিয়ে নামতে লাগলো শামান, সেইসাথে এটাও বুঝতে পারলো একটু আগে আসলে ঘটেছিল কি। এই গুদাম ঘরে আর ফসল মজুদ করা হয় না। কামরটা খালিই পড়ে আছে। ঘোষিত একটু আগে ভেতরে প্রবেশ করতে গিয়ে আচমকা ঢুকে পড়াতে সোজা নিচে পড়ে গেছে।

ওর মই বেয়ে নিচে নেমে দেখতে পেল ঘোষিত গাই-গুঁই করতে করতে উঠে দাঁড়িয়েছে।

“তুমি ঠিক আছো?” শামান জানতে চাইলো।

মাথা নেড়ে সে বলে উঠলো, “এক্কেরেই না, হাড্ডি ভাঙ্গে নাই তয়, মাংস সব থেতলাইয়া গেছে।”

“মাংস জাহান্নামে যাক, আপাতত হাড্ডি না ভাঙলেই চলবে,” ঘোষিতের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি দিয়ে সামনে এগোতে বললো শামান। ঘোষিত মুখে কপট রাগের একটা ভঙ্গি করে হাঁটতে লাগলো। কিছুক্ষণের ভেতরেই প্রাচীন গোলাঘরটা পার হয়ে ওরা অন্যদিকে চলে এলো। এখানে আগের মতোই ছোট একটা পাথরের দরজা সরিয়ে ওরা একটা প্যাঁচানো সিঁড়িঘরের মতো জায়গায় এসে থামলো।

“এইহান থাইক্কা প্রথমে ওপরে উঠতে অইবো,” বলে ঘোষিত আঙ্গুলের ইশারায় ওদেরকে নিয়ে ওপর দিকে চলে এলো। শামানের একটা হাত কাতানার বাটে প্রস্তুত, কারণ যেকোন

সময় ওরা টহলরত সৈনিকদের সামনে পড়ে যেতে পারে। ওরা খানিকটা ওপরে উঠতেই দেখলো লম্বা পথের দুই পাশে সারি-সারি কামরা।

"এইগুলাতে আগে-চাকর বাকরেরা থাকতো। এহন মনে অয় লিচ্ছবী সৈনিকেরা থাকে। সবাই সাবধানে একেবারে শব্দ না কইরা এইটা পার হইতে হবে," হাতের ইশারায় সাবধান করে দিয়ে পার হতে লাগলো ওরা পথটা। প্রায় শেষ প্রান্তে চলে এসেছে, এমন সময় অর্ধনগ্ন এক সৈনিক হাই ছাড়তে ছাড়তে একেবারে ওদের সামনে পড়ে গেল।

মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালো সবাই। সবার আগে ছিল শামান সে-ই নড়ে উঠলো। সৈনিকটা একহাতে নিজের নিম্নবস্ত্র সামলে নিয়ে মুখ খুললো চিৎকার দেয়ার উদ্দেশ্যে কিন্তু তার আগেই শামান পৌছে তার কাছে। তলোয়ার বের করার সময় নেই, তাই সামনে এগিয়েই এক হাতে খপ করে সৈনিকের খোলা মুখটা ধরে ফেললো এক হাতে, অন্য হাতে চট করে তার কাঁধ জড়িয়ে ধরে ঘুরিয়ে ফেললো, হাঁটুর পেছনে লাথি মারতেই হাঁটু ভেঙে বসে পড়লো লোকটা। শামান লোকটার জড়িয়ে ধরা কাঁধ থেকে হাত ছুটিয়ে গলা পেঁচিয়ে ধললো। লোকটা নিজেকে ছাড়ানোর জন্যে জোরাজুরি করছে, গলা ধরা হাতে চাপ বাড়ালো শামান। লোকটা যতোই জোরাজুরি করে শামান ততোই চাপ বাড়াতে লাগলো, সবশেষে কনুইয়ের উল্টো অংশ দিয়ে জোর চাপ দিতেই কট করে একটা শব্দ হলো। সেই সাথে ঢলে পড়লো মানুষটা। লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো শামান।

"মেরে ফেললাম কিনা কে জানে," বলে ও জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে আশেপাশে দেখে নিলো। "একে জলদি বেঁধে ফেলো, যেকোন মুহূর্তে আবার কেউ চলে আসতে পারে," বলে শামান জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলো, মনে মনে ভাবছে, বড় বাঁচা বেঁচে গেছে। এই লোকটা একবার চিৎকার করতে পারলে আর দেখতে হত না। "এখান থেকে গুহাটা আর কতো দূরে?" শেষ প্রশ্নটা ও উচ্চারণ করলো ঘোষিতকে উদ্দেশ্য করে।

"কাছেই হউনের কথা," ওদের সাথে আসা সৈনিকেরা লোকটাকে বেঁধে ফেলেছে।

"এহন কি করতাম এরে?" একজন জানতে চাইলো। শামান দ্রুত ভাবছে। ওরা সৈনিকদের বসবাসের জায়গার একেবারে শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। "একে এখানে রাখা যাবে না, তুলে নাও। দেখি, " বলে সে সামনে এগোতে লাগলো পথের শেষ প্রান্তে একটা বড় পিপের মতো দেখে নির্দেশ দিলো অজ্ঞান সৈনিকটাকে ওটার ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলতে। ওরা জায়গাটা থেকে বেরিয়ে আসছে হঠাৎ ঘোষিত থেমে গেল।

"ওস্তাদ, বলে সে পাশে দেখালো। সৈনিকদের বসবাসের জায়গাটার একেবারে শেষ প্রান্তে যেখানে পথটা শেষ হয়েছে সেখানে একটা বড় লোহার দরজা ভেজানো অবস্থায় আছে। "এইটারে আটকায়া দিবো নাকি?"

শামান ভেবে দেখলো বুদ্ধিটা খারাপ না, এটাকে ঠিকমতো আটকাতে পারলে ঘুমন্ত সৈনিকরা জেগে উঠলেও ওরা যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে যেতে পারবে না। "আটকাও," শামান নির্দেশ দিতেই তিনজনে মিলে লোহার শিকের মতো দেখতে দরজাটা টেনে আটকে দিলো। ওটা টানার সময় কচ-কচ শব্দ হলেও কেউ এলো না। দরজাটা আটকে দিয়ে লোহার শিকল দিয়ে পেঁচিয়ে বড় দেখে একবটা গজাল মেরে দিলো ওরা বিপরীত দিক দিয়ে। সম্ভবত এভাবেই দরজাটা আটকানো হয়, কিন্তু ওরা কাজটা এমনভাবে করলো যাতে ভেতর থেকে ওটা সহজে খোলা না যায়।

দরজা আটকে দিয়ে ওরা সোজা রওনা দিলো ঘোষিতের দেখানো পথে। আরো বেশ অনেকটা এগোনোর পর পথটা ধীরে-ধীরে নিচে নামতে লাগলো। যতোই নিচের দিকে নামছে ততোই একদিকে জলের কুল-কুল শব্দ বাড়ছে আর অন্যদিকে কিসের যেন একটা হুম-হুম শব্দ ভেসে আসছে।

দেয়ালের গায়ে জায়গায়-জায়গায় মশাল লাগানো, সেই আলোতে পথ দেখে এগোতে লাগলো ওরা। আরেকটু নিচের দিকে নামার পর দেয়ালের রং ধীর-ধীরে লালচে থেকে সাদা হতে শুরু করলো। শামান হাত দিয়ে দেখলো দেয়াল থেকে সাদা মতো কী যেন হাতে উঠে আসছে, সম্ভবত প্রাকৃতিক চুনা ।

"ওস্তাদ, জলাধারের গুহাটা সামনেই," ঘোষিতে ফিসফিসে গলা ভেসে এলো শামানের পেছন থেকে। অবশ্য সে না বললেও চলতো, কারণ সামনেই মানুষের হাতে গড়া পথ শেষ হয়ে প্রাকৃতিক কাঠামো প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে। পথটার ঠিক শেষ প্রান্তে বড় একটা দরজার মতো। ওটার চারপাশে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য পিপেসহ নানা ধরণের জিনিস।

ওরা দেয়ালের ধার ঘেঁষে আরেকটু এগোনোর পর দেখতে পেল পথের শেষ মাথায় যেটা দেখা যাচ্ছে ওটা আসলে কোন দরজা নয়, বরং অনেকটা বড় আকারের ফোকরের মতো, ফোকরটার সামনে কোমরে কৌপিন জড়ানো মুখে সাদা আর লালচে রঙ মাখানো, মাথায় অদ্ভুত সাপের মতো দেখতে মস্তকাবরন পরা কয়েকজর প্রহরী স্থির পাথরের মুর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে।

"উরগ," শামানের ঠিক পেছনে থেকে আবারো ঘোষিতের ফিসফিসে গলা ভেসে এলো। "এহন কী করুম? গুহায় ঢুকতে অইলে তো এগো সামলাইতে অবো, কিন্তু শব্দ না কইরা তো হেইটা সম্ভব না।"

শামান ঘোষিতের কথা শুনছে কিন্তু তার দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে চারপাশে। সবশেষে ওর দৃষ্টি এসে স্থির হলো ওদের সামনে সারি দিয়ে সাজানো পিপের ওপরে। মৃদু হাসি ফুটে উঠলো ওর মুখে। "ব্যবস্থা পেয়েছি।"

***

অস্ত্রধারী সৈনিকদের দলটার সামনে পড়ে যেতেই প্রাথমিকভাবে একটু চমকে উঠলেও শঙ্করাদিত্যের মুখে ফুটে উঠলো মৃদু হাসি, ঠিক এমনটাই চেয়েছিল ওরা। কিন্তু তার মুখের হাসি মুছে গেল কারণ সে তলোয়ার বের করার আগেই তার দিকে এগিয়ে এসেছে প্রথম সৈনিক।

শঙ্করাদিত্য নিজের তলোয়ারটা প্রায় বের করে এনেছে, তার আগেই খোলা তলোয়ারটাকে নিজের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে আনমনেই চোখ বন্ধ করে ফেললো সে। কিন্তু শপাং করে একটা শব্দের সাথে প্রহরীদের দলনেতার তলোয়ার ধরা হাতটা থেমে গেল শঙ্করাদিত্যের মুখের কাছাকাছি এসে। কালন্তি চাবুক ছুঁড়ে দলনেতার হাতটা আটকে দিয়েছে।

কালন্তি দলনেতার হাতটা আটকে দিয়ে ধোয়ীর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠলো। “ধোয়ী, এক্ষুণি।”

গোলগাল চেহারার ধোয়ী মুহূর্তের মধ্যে সামনের দিকে এগিয়ে এলো। সে এমনকি তার তলোয়ারে হাতও দেয়নি। প্রহরীদের দলনেতার তলোয়ার ধরা হাতটা বন্দি হয়ে ছিল কালন্তির চাবুকের মাথায়। টানাটানি করেও সে ওটা খুলতে পারছিল না। ধোয়ী এগিয়ে এসে নিজের থামের মতো মোটা একটা হাত দিয়ে খপ করে দলনেতার হাতটা ধরে নিজের দিকে নিয়ে এলো। চাবুক থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে একটানে তুলে ফেললো মাথার ওপরে। সোজা ছুঁড়ে দিলো এগিয়ে আসতে থাকা বাকি তিন প্রহরীর দিকে।

দলনেতা লোকটা উড়ে গিয়ে দুজনকেসহ গড়িয়ে পড়ে গেল মাটিতে। বাকি এক প্রহরী এগিয়ে আসছিল ওদের দিকে, সে চট করে থেমে গেল। ধোয়ী বের করে আনলো নিজের তলোয়ার।

ওর ঠিক পেছন থেকে চিৎকার করে উঠলো শঙ্করাদিত্য, “কোন রক্তপাত নয়।”

ধোয়ীর মুখে ফুটে উঠলো সামান্য হাসি, এগিয়ে আসা প্রহরী লোকটা তলোয়ার বাগিয়ে ধরে দুই পা পিছিয়ে গেল। কিন্তু তার সাথে উঠে দাঁড়ালো বাকি প্রহরীদের একজন। দুজনেই এবার সাহস পেয়ে এগিয়ে আসতে শুরু করলো ধোয়ীর দিকে। দুপাশ থেকে দুজনে ঘিরে ধরলো তাকে। কালন্তি এগিয়ে যাচ্ছিলো তার দিকে, একটা হাত তুলে ধোয়ী মানা করলো।

একদিকে দুজন সৈনিক পড়ে আছে মাটিতে। অন্যদিকে দাঁড়িয়ে আছে শঙ্করাদিত্য, কালন্তি আর ওদের দলের বাকিরা। আর অন্যদিকে ধোয়ীকে ঘিরে আছে দুই সৈনিক। দুই সৈনিক কিছু করার আগেই তাদের একজনের দিকে ধেয়ে গেল সে, লোকটা আক্রমণ ঠেকানোর জন্যে একটু পিছিয়ে যেতেই একপাশে কাত হয়ে খানিকটা সরে গেল সে। অন্যদিকে পেছনের প্রহরী এগিয়ে এলো এই সুযোগে, এগোতে থাকা লোকটার পেটের নিচের অংশে

উল্টো পায়ে লাথি মারলো সে, লোকটা লাথি খেয়ে বাঁকা হয়ে যেতেই তার তলোয়ারের হাতল বসিয়ে দিলো লোকটার কপালে, কাটা গাছের গুড়ির মতো ধাম করে পড়ে গেল লোকটা।

নিজের সঙ্গীকে ধোয়ীর সাথে মারামারি করতে দেখে, চট করে এগিয়ে এলো দ্বিতীয় প্রহরী। ধোয়ী তখনো প্রথম প্রহরীকে আঘাত করে সোজা হতে পারেনি তার আগেই প্রথম প্রহরী এগিয়ে এসে তলোয়ার চালালো ধোয়ীকে উদ্দেশ্য করে, মাথাটাকে একপাশে কাত করে সেই আঘাত এড়িয়ে গেল সে, কোপটা বিফলে যেতেই অন্য লোকটা শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো, এই সুযোগে চট করে তার কোমরের কাছটা ধরে প্রচন্ড শক্তিতে লোকটাকে দেয়ালের ওপরে আছড়ে ফেললো সে।

দলনেতা আর এক প্রহরী টক্কর খেয়ে আগেই অজ্ঞান হয়ে গেছিল, এবার বাকি দুজনকে কাত করে শঙ্করাদিত্যের দিকে ফিরে ভাবলেশহীন কণ্ঠে ধোয়ী বলে উঠলো, "রক্ত পড়ে নাই মনে হয়, আর দুই চাইর ফোঁটা পড়লে আমার কিছু করার নাই।"

শঙ্করাদিত্য একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে নিজের লোকদের দিকে ফিরে নির্দেশ দিলো, যার যার কাজে লেগে পড়তে। ধোয়ীর সামনে এসে কালন্তি খানিকটা রাগের সাথেই বলে উঠলো। "খুব বাহাদুরি দেখানো হলো, না? কি দরকার ছিল একা সবগুলারে সামলানোর?"

ধোয়ী কিছু না বলে ভাবলেশহীন মুখে তাকিয়ে রইলো কালন্তির দিকে, একটু পরে ধীরে-ধীরে তার মুখে ফুটে উঠলো মৃদু হাসি। কালন্তি ফিরে তাকিয়ে দেখলো শঙ্করাদিত্য তার কাজে লেগে গেছে। তাকে উদ্দেশ্য করে কালন্তি বলে উঠলো, "আমাদের জলদি করা উচিত।"

"হ্যাঁ," নিজের হাতের কাজ করতে করতে শঙ্করাদিত্য জবাব দিলো। "আমার দুঃশ্চিন্তা হচ্ছে বাকিরা কী করছে?" বলেই সে নিজের কাজ সেরে সোজা হয়ে চট করে একটা দড়ির ফাঁস পরিয়ে দিলো কালন্তির হাতে।

অধ্যায় সাতচল্লিশ

বর্তমান সময়

বন্দর এলাকা, সিলেট

"জালাল ভাই," নাইট গ্লাসে চোখ রাখা তানভীর মৃদু স্বরে পাশে বসা ওসি জালালকে ডাক দিলো। কোন উত্তর নেই। "জালাল ভাই," আবারো একই স্বরে বলে উঠলো ও। এবারও কোন জবাব নেই। নাইট ভিশন থেকে চোখ সরিয়ে পাশে তাকিয়ে দেখলো জালাল উদ্দিন হাতে জ্বলন্ত সিগারেট ধরে মৃদু নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। "এই মিয়া," বলে ও নিজের কনুই দিয়ে একটা খোঁচা দিলো জালালের পাঁজরে।

প্রায় লাফ দিয়ে উঠে বসলো জালাল, হাতের জ্বলন্ত সিগারেট টপ করে পড়ে গেল কোলের ওপরে। থাবা দিয়ে সিগারেরটা তুলে নিয়ে ফেলে দিলো জানালার বাইরে। তারপর হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে ছাই ঝাড়তে লাগলো কোল থেকে। "ধূর মিয়া, দিলা তো সিগারেটটা ফলাইয়া।"

"আরে ভাই, আপনে কি পাগল নাকি?" তানভীর রাগের সাথে বলে উঠলো। "আমি এইখানে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিগত কয়েক বছরের ভেতরে সবচেয়ে বড় ম্যান হান্ট অপারেশন চালাতে যাচ্ছি- তাও আবার অফিশিয়াল অনুমতি ছাড়া, আর আপনে আছেন আপনার বিড়ি নিয়া!"

"ওহহো, বেহুদা বিড়ি লইয়া চিল্লাইলাম, ঘুমটা যে ভাঙ্গাইছো সেইটা তো মাথায়ই আসে নাই," বলে সে হেসে উঠলো।

"জালাল ভাই, ফাইজলামি রাখেন, সত্যি কথা বলেন। কাজটা কি ঠিক হলো?" তানভীর আবারো চোখের সামনে নাইট গ্লাস তুললো। ওদের থেকে শ'পাঁচের গজ দূরেই আলোর বন্যায় ভাসছে সিলেট শহরের প্রমোদতরী 'টাইটানিক'।

ওটার দিকে তাকিয়ে তানভীর সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে নিলো ও আরেকবার। কনফারেন্স রুমে সব পরিকল্পনা করার পর অপারেশন শুরু করতে যাবার আগে কিছু ঝামেলা হয়েছে। ওরা সব ঠিক করার পর পাশা স্যারকে জানানোতে সে ওদেরকে মৌখিকভাবে বলে দেয় ওদের কাছে যেটা ভালো মনে হয় সেটাই করার জন্যে। কিন্তু ইএএফের প্রধান বাবুল আহমেদ সব শোনার পর বেঁকে বসে। সে জানায় ইএএফের সহায়তা ছাড়া জেড মাস্টারের মতো একজন অপরাধিকে ধরতে যাওয়াটা ওদের জন্যে একেবারেই ঠিক হবে না। সাথে সে শর্ত দিয়ে দেয়, ইএএফের মাধ্যমে অপারেশনটা তখনই চালানো হবে, যতোক্ষণ না সে সিলেট শহরে এসে পৌছাচ্ছে, বাবুল আহমেদের সাথে কথা বলে তানভীর বুঝতে পারে আজ রাতের ভেতরে তার সিলেট পৌছানোর কোন

সম্ভাবনা নেই। বাবুল আহমেদ সরাসরি ওদেরকে নির্দেশ করে যে টাইটানিকের ওপরে শুধুমাত্র নজর রাখা আর অথরিটিকে ইনফর্ম করা ছাড়া ওরা যেন আর কিছু না করে।

তাৎক্ষণিকভাবে বাবুল আহমেদের নির্দেশ মেনে নেয়া ছাড়া তানভীরের কোন উপায় ছিল না। কিন্তু তার সাথে কথা শেষ হবার পর গা জ্বলতে থাকে ওর। তখনই হুট করে সে সিদ্ধান্ত নেয়, জাহান্নামে যাক বাবুল আহমেদ। অপারেশন ওরা চালাবেই। দলের সবাই এক বাক্যে মেনে নেয় ওর কথা। ওরা অথরিটিকে ইনফর্ম না করেই টাইটানিকে পরিস্থিতি বুঝে অপারেশন চালানোর ব্যাপারটা একরকম পাকা করে বন্দরে চলে আসে দুটো গাড়িতে ক'রে। একটা গাড়ি টাইটানিকের কাছেই আছে। আরেকটা গাড়ি কিছুটা দূরে রেখে গত এক ঘন্টা ধরে নজর রেখে চলেছে ওরা টাইটানিকের ওপরে।

"জালাল ভাই, কিছু বলেন। জীবনের প্রথম অ্যাসাইনমেন্টে এভাবে উপরওয়ালার নির্দেশ ভঙ্গ করতে যাচ্ছি, ব্যাপারটা কি ঠিক হচ্ছে?" জালালের দিকে ফিরে তাকাল তানভীর। সে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে নতুন একটা সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত। জালাল উদ্দিনের বুক পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নিয়ে নিজেও একটা ঠোঁটে লাগালো তানভীর।

"হায়না চিনো তানভীর?" জালাল উদ্দিন খুব দার্শনিক ভঙ্গিতে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলতে লাগলো।

"ধূর মিয়া, রাখেন আপনার দার্শনিক মার্কা কথাবার্তা, আমি আছি টেনশনে," বলে তানভীর কড়া করে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে গিয়ে খক-খক করে কেশে ফেললো। "আর কি সব সিগারেট রাখেন, এমন কড়া সিগারেট খান ক্যামনে? বেনসন রাখতে পারেন না?"

"শোন, দার্শনিক মার্কা কথা না, দুনিয়াটা কেমন জানো? দুনিয়াটা হইলো এমন এক জায়গা যে তোমারে অনেক ভালো ভালো কথা শেখাবে, আর তুমি যদি সেইসব ভালো কথাগুলা শুইন্না সেইমতো চলতে থাকো, তোমাকে বলবে বলদ। আর তুমি যদি সব ভালো কথা শুইন্না তোমার নিজের মতোন চলো আর সফল হও তাইলে তোমারে স্যালুট দিবো ওই ভালো কথা শিখাইছে যে মানুষগুলা তারাই," বলে সে তানভীরের দিকে ফিরে যোগ করলো। "কাজেই নিজের কাম করো। যেইটা ভালো বুঝছো করো। যদি সফল হও তাইলে তুমি নায়ক, আর যদি বিফল হও তাইলে তুমি তো তুমি, আমগোরও খবর আছে। হা-হা।"

"হুমম, বুঝেছি," তানভীরের কপালে চিন্তার ভাঁজে আরেকটা নতুন রেখা যোগ হলো। এতোক্ষণ এই ব্যাপারটা ঠিক ওর মাথাতে আসেনি। এতোক্ষণ ভাবছিল ওর নিজের ক্যারিয়ার ঝুঁকিতে ফেলেছে, এখন জালালের কথায় বুঝতে পারলো নিজের সাথে-সাথে পুরো টিমের ক্যারিয়ারেরও বারোটা বাজবে যদি ওরা কোন ভুল করে।

"জালাল ভাই, এই ব্যাপারটাই আমার বেশি খারাপ লাগছে, যদি উল্টা-পাল্টা কিছু হয় তবে আমি তো ডুববোই সাথে আপনাদেরকে নিয়ে ডুববো," তানভীরের মুখ থেকে

বেরিয়ে আসা ধোঁয়ার সাথে তীব্র দুশ্চিন্তাও যেন বাতাসে পাখা মেলছে।

"তুমি এতো নরম মন নিয়া পুলিশে আসলা কিভাবে?" জালাল তার স্বভাবসুলভ টিটকিরির ভঙ্গিতে জানতে চাইলো।

"আমি তো পুলিশ না ভাই," তানভীর সামান্য হেসে জবাব দিলো।

"রাখো মিয়া," জালাল ছাই ফেললো জানালার বাইরে। "ওই ক্রিমিনাল অ্যানালিসিস-ফ্যানালিসিস যাই কও, বেলা শেষে সবাই আমরা পুলিশ। তবে একটা কথা বলি তানভীর, তুমি আসলেই ভালো মানুষ। দুনিয়া যতোই চাপ সৃষ্টি করুন না ক্যান নিজের ভেতরের এই সত্তাটা নষ্ট হইতে দিও না। আমি এইটা সবচেয়ে ভালো বুঝি। কারণ আমি যখন ফোর্সে জয়েন করি আমিও তোমার মতোই ছিলাম। দিন গেছে আর চারপাশে দেখছি দুনিয়ার যতো দুঃখ কষ্ট, যন্ত্রণা আর ঝামেলা সব ভালো মানুষগুলার কান্ধে আইসা পড়ে। তাই একটা সময় সচেতনভাবে আমি খারাপ হইতে শুরু করি। এর ফলে কী হইছে জানো, আমি পরিবার থাইক্কা দূরে সইরা গেছি, সমাজ থাইক্কা দূরে সইরা গেছি, সবচেয়ে বড় কথা আমি নিজের কাছ থিইক্কা নিজে দূরে সইরা গেছি। একটা কথা কি জানো, চিটংবাজি-বাটপারি-ধান্দাবাজি রক্তের ভিতরে না থাকলে খারাপ হইয়াও তুমি খুব বেশি দূরে যাইতে পারবা না। তোমার বিবেক হইয়া যাবো তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু। আমারে দেখ, আমি এমনে যেমনই আছিলাম, ভিতরে ভিতরে ছিলাম একটা ভালো মানুষ। সচেতনভাবে খারাপ হইতে গিয়া না থাকছি ভালো মানুষ, না হইতে পারছি খারাপ। নিজেই হইয়া গেছি নিজের সবচেয়ে বড় শত্রু। হা-হা," প্রাণ খুলে হেসে উঠলো জালাল।

তার সাথে হাসিতে যোগ দিলেও মনের ভেতরে ভাবনার ঝড় বয়ে চলেছে তানভীরের। হাসতে হাসতেই ওর দিকে ফিরে জালাল বলে উঠলো, "তুমি কি জানো কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কারের সময়ে কী করছিল? তার জাহাজ তখন আটলান্টিকের এমন এক জায়গায় যেখান থিইক্কা ফিরা যাবার মতোও খাবার জাহাজে নাই। মানে ফিরতে গেলেও মরতে হবে আর সামনে কি আছে কেউই জানে না। তখন সে কি করছিল জানো?" বলে সে একটু চুপ হয়ে রইলো। মাথা নাড়লো তানভীর, জানে না ও।

"তখন সে করলো কি, আরো বেশ কিছু খাবার জলতে ফালায়া দিলো," বলে হেসে উঠলো জালাল।

"কেন?" অবাক হয়ে জানতে চাইলো তানভীর।

"এর উত্তর খুব ভয়ঙ্কর। কলম্বাস তার নাবিকদেরকে এমন এক অবস্থায় নিয়া গেল যাতে তারা খুব ভালো কইরা জানে তারা ফিইরা যাইতে পারবো না। কাজেই তখন একটাই রাস্তা খোলা থাকলো হেগো সামনে-"

"সামনে এগোনো," আনমনে বলে উঠলো তানভীর। তারপর ফিরে তাকাল জালালের দিকে।

“একদম ঠিক, এইটা দেইখাই সব শ্রমিক প্রাণপনে ঝাঁপায়া পড়লো যাতে...” জালাল কথা শেষ না করে তাকিয়ে রইলো তানভীরের দিকে। খর-খর করে উঠলো তানভীরের রেডিও।

“বস, লঞ্চে মুভমেন্ট দেখা দিয়েছে। ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেকোন মুহূর্তে ছেড়ে দিতে পারে ওটা,” সুলতানের ভেসে আসা কথাগুলো শোনামাত্রই নাইট গ্লাসে চোখ লাগিয়েছে তানভীর। জাহাজে লোকজন ওঠা কমে গেছে। ভাব দেখে মনে হচ্ছে অনুষ্ঠানের লোকজন বেশিরভাগই জাহাজে উঠে গেছে। “সুলতান, তুমি জাহাজের আশেপাশেই থাকো। যেকোন সময় যাতে জাহাজে উঠে বসতে পারো। বলেই ও টমিকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো, “টমি, তোমার থারমাল স্ক্যান কী বলে?”

টমির কোন জবাব পাওয়া গেল না। “টমি, টমি।”

“ওহহ, বস থার্মাল স্ক্যানে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আমার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই মুহূর্তে ইকবাল আপনাকে দিতে পারবে।”

“ইকবাল, অস্বাভাবিক কিছু?”

“না, স্যার কিছুই তো...” ইকবালের কথা শেষ হবার আগেই জাহাজের ভেঁপু বেজে উঠলো, প্রায় সাথে সাথেই তানভীর নাইট ভিশন থেকে চোখ সরিয়ে সামনে তাকাল। লঞ্চটা আস্তে-আস্তে নড়তে শুরু করেছে। বন্দর ছেড়ে যাবার সিগন্যাল। “কমান্ডার, ওরা লঞ্চে ওঠার তক্তা সরিয়ে ফেলছে। আমি কি...”

“এক্ষুণি উঠে পড়ো, সুলতান। আমি আর জালাল তোমাকে অনুসরণ করছি,” কথা বলতে বলতেই জালালের দিকে ইশারা করলো ও বের হবার জন্যে। “টমি, তুমি লাইনে থাকো, ইকবাল তোমার জাহাজে ওঠার দরকার নেই। বরং আমাদের সাহায্য লাগতে পারে। কাজেই তুমি কোস্ট গার্ডকে খবর দিয়ে রাখো, প্লাস লোকাল থানাতেও ইনফর্ম করে রাখো,” কথা বলতে বলতেই দৌড়াতে শুরু করেছে তানভীর। ওদের থেকে হাজার খানেক গজ দূরে লঞ্চটা নড়তে শুরু করেছে। “টকিতে আর কথা বলা যাবে না। হেডসেট লাগাও সবাই, টকি আর অস্ত্র সামলে রাখো, যেন কেউ কোন সন্দেহ না করে জাহাজে-” প্রাণপনে দৌড়াতে শুরু করেছে ওরা। জালাল এগিয়ে গেছে ওর থেকে বেশ খানিকটা। কথা বলতে বলতে পিছিয়ে পড়েছে তানভীর।

টকিটা কোমরে রাখার সময় নেই, তানভীর ওটা ফেলে দিয়ে সর্বোচ্চ গতিতে দৌড়াতে লাগলো। এভাবে গাধার মতো দেরি করাতে মনে-মনে গালি দিচ্ছে নিজেকে। এখন যদি সময়মতো জাহাজে উঠতে না পারে তবে ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে, অপারেশন শুরু হবার আগেই খতম। সব চিন্তা বাদ দিয়ে দৌড়ানোতে মনোযোগ দিলো ও। লঞ্চটা এখনো পুরোপুরি চালু হয়ে উঠতে পারেনি। ওর থেকে বেশ খানিকটা এগিয়ে যাওয়া জালালকে

দেখতে পেল পায়ে চলা পথটা ধরে দৌড়াতে-দৌড়াতে ফুটপাথের রেলিং টপকে অন্যপাশে চলে গেল। তারপর এক লাফে চড়ে বসলো লঞ্চের পেছনের ডেকে।

দৌড়ের গতি আরো বাড়িয়ে দিলো তানভীর। লঞ্চটা এখন প্রায় পুরোদমে জল কেটে সরে যেতে শুরু করেছে। ঠিক জালালের মতো করেই রেলিং টপকালো ও। জাহাজটা অনেকখানি সরে গেছে, লাফিয়ে পেরুতে পারবে কিনা ভাবতে গিয়ে মূল্যবান আরো একটা সেকেন্ড নষ্ট করে ফেললো ও। তানভীর ফুটপাথের রেলিঙের অন্যপাশের সরু জায়গাটাতে কয়েক পা পিছিয়ে এলো তারপর প্রাণপণে দৌড় দিয়ে শূণ্যে লাফিয়ে পড়লো।

থিওরি অব রিলেটিভিটি বলে সময়ের নাকি অনেক রকমফের হয়। ভ্রমের বশে মানুষ একই সময়কে অনেক অল্প সময় মনে করে। আবার কখনো কখনো একই সময় মনে হয় যেন অনেক লম্বা হয়ে গেছে। লাফ দেয়ার পর তানভীরের কাছেও তাই মনে হলো। ও যেন টাইম লুপের ভেতরে চলে গেছে। অনন্ত কাল ধরে লাফিয়ে পার হচ্ছে রাস্তা আর জাহাজের মাঝখানের দূরত্বটুকু। ওর হাত জায়গামতো পৌছানোর আগে ধাম করে মাথা বাড়ি খেল জাহাজের ডেকের একেবারে নিচের প্রান্তে। সাথে সাথে রক্ত বেরিয়ে এলো ভ্রুর ওপর থেকে। একটা চোখ প্রায় বন্ধ হয়ে এলো ওর। কিন্তু খপ করে ডান হাতে রেলিঙ ধরে ফেলার আগেই হাতটা পিছলে গেল ওর রেলিং থেকে। হাত সরে যেতেই শরীরটা নিচের দিকে পিছলে যেতে শুরু করলো। আনমনেই ওর দৃষ্টি চলে গেল নিচের দিকে।

প্রায় ঝড়ের বেড়ে ঘুরতে-ঘুরতে জল কাটতে থাকা প্রপেলারগুলো যেন দাঁত বের করে হাসছে ওকে গিলে খাবার জন্যে। নিজের অজান্তেই তানভীরের গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো চিৎকার।

অধ্যায় আটচল্লিশ

সময়: ১৮০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ

বিধোরী দুর্গ, কন্নোর, ভারতবর্ষ

উরগ প্রহরীদের কাজটা খুবই কঠিন, যতোক্ষণ তাদের ওপরে প্রহরার দায়িত্ব থাকবে ততোক্ষণ তাদেরকে স্রেফ মুর্তির মতো স্থির থেকে দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। কোনরকম নড়া-চড়া কিংবা অন্যকিছু করার নিয়ম নেই, এমনকি তাদের নিজেদের প্রহরার জন্যে নির্দিষ্ট এলাকা থেকে চোখ পর্যন্ত সরানো যাবে না। ব্যাপারটা শুনতে খুব ভয়ঙ্কর শোনায়, কিন্তু সত্যি কথা হলো উরগদের জন্যে ব্যাপারটা অতোটা কঠিন নয়।

কারণ ছোটবেলা থেকে তাদের সমাজে যার যে কাজ সেটা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় গোত্র প্রধানের পরিবার থেকে, আর সেভাবেই ছোটবেলা থেকেই গড়ে তোলা হয় তাদের । কাজেই প্রহরী, যোদ্ধা, পূজারি যে-পেশাতেই থাকুক ছোটবেলা থেকেই তাদেরকে ওভাবে গড়ে তোলা হয়ে থাকে। তার ওপরে আরো দুটো ব্যাপার কাজ করে। একেতো সর্প মাতার ওপরে তাদের ভক্তির সীমা পরিসীমা নেই। দ্বিতীয়ত, তারা কাজে নামার আগে বিশেষ করে যেসব কাজে অতিরিক্ত শারীরিক শ্রমের দরকার হয় সেসব কাজে তারা সর্প মাতার লেহনী থেকে প্রস্তুতকৃত বিশেষ তরল গ্রহণ করে শরীরে। যেটা তাদেরকে শারীরিক ও মানসিকভাবে অন্যদের থেকে অনেক বেশ সহনশীল আর একাগ্র করে তোলে।

চারজন উরগ প্রহরী জলগুহার দ্বার প্রান্তে একেবারে স্থির দাঁড়িয়ে প্রহরারত। শুধু চোখের পলক ছাড়া আর কোন নড়াচড়া নেই। এমন সময় একজন প্রহরী খানিকটা নড়ে উঠলো, কারণ তার চোখে অদ্ভুত এক নড়াচড়া ধরা পড়েছে। সে নির্দিষ্ট দিকে তাকানোর আগেই ঘর-ঘর শব্দ ভেসে এলো, সেইসাথে বাকি প্রহরীদেরও প্রায় সবাই দেখতে পেল জলগুহার সামনের রাস্তাটার দুপাশে সাজিয়ে রাখা পিপেগুলোর একটা কোনভাবে স্থানচ্যুত হয়ে গড়িয়ে আসছে গুহার দিকে। যদিও প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় সবাই নিজেদের বিশেষভাবে প্রস্তুত বর্শা তাক করে ফেলেছিল সম্ভাব্য শব্দের উৎস লক্ষ্য করে কিন্তু পিপেটাকে গড়িয়ে আসতে দেখে সবার সতর্ক ভাবটা হালকা হয়ে গেল।

কারণ ব্যাপারটা একেবারে নতুন নয়। মাঝে মাঝে এরকমটা ঘটে। একটার ওপরে রাখা আরেকটা পিপে গড়িয়ে পড়ে, কিংবা জলগুহায় জলের উত্থান-পতনের কারণেও অনেক সময় পিপে গড়িয়ে পড়ে। পিপেটা গড়িয়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে, হালকা চালে একজন উরগ প্রহরী পা দিয়ে ঠেকিয়ে দিলো ওটাকে। সে পাশের জনের দিকে ফিরে ওটাকে সোজা করে একপাশে সরিয়ে রাখার নির্দেশ দিলো।

পাশের প্রহরী এগিয়ে এসে তাদের হাতে ধরা বিশেষ বর্শাটা দিয়ে পিপের গায়ে টোকা দিতেই ঠক-ঠক শব্দ করে উঠলো। অন্য আরেক প্রহরী পিপেটাকে সোজা করার জন্যে হাত বাড়ালো কিন্তু বর্শার ডগা দিয়ে টোকা দেয়া প্রহরী হঠাৎ সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবারো বর্শা দিয়ে ঠক-ঠক করে টোকা দিলো। তার হিসেবে পিপেটা খালি হবার কথা কিন্তু খালি পিপের গায়ে টোকা দিয়ে যেরকম শব্দ হবার কথা এটাতে তেমন শব্দ হয়নি, সে প্রহরীদের নেতার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুললো কিন্তু তার আগেই দেখতে পেল আরো দুটো পিপে গড়িয়ে আসছে। সবাই সেদিকে ফিরে তাকাল, সাথে-সাথে প্রথম পিপেটার একপাশ কড়াৎ করে আলগা হয়ে ওটার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো কাতানা ধরা একটা হাত।

তৃতীয় প্রহরী পিপেটাকে সোজা করার জন্যে খানিকটা ঝুঁকে হাত বাড়িয়েছিল কিন্তু তার আগেই শামানের কাতানা ধরা হাতটা বেরিয়ে এসে ওটার চোখা ডগা সোজা ঢুকে গেল প্রহরীর গলায়। তৃতীয় প্রহরীকে আহত হতে দেখে দ্বিতীয় জন ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের বর্শা

তাক করার আগেই তার গায়ের ওপরে এসে পড়লো আরেকটা পিপে। সেইসাথে শামান পিপের আবরণ ভেঙে উঠে দাঁড়ালো। প্রহরীদের নেতা তার সঙ্গীকে সামনের দিকে এগোতে বলে নিজে হাত রাখলো কোমরে রাখা বিশেষ শিঙ্গার ওপরে, সবাইকে সাবধান করে দেবার জন্যে কিন্তু শামানের সাথে আসা দক্ষ তীরন্দাজের তীর হাত সহ শিঙ্গাটাকে ভেঙে ঢুকে গেল ভেতরে। আরেকটা তীর এসে ঢুকলো তার গলায়।

নেতার সঙ্গী ততোক্ষণে এগিয়ে এসেছে, তার হাতে লম্বা বর্শা। সেটাকে বাগিয়ে ধরে দক্ষতার সাথে ওটার ডগাটা সে চালিয়ে দিলো শামানের পেট লক্ষ্য করে কিন্তু অবাক হয়ে দেখলো বর্শাটার ডগা শামানের পেট স্পর্শ করার আগেই শামানের কাতানার এক কোপে ওটার কাঠের হাতলটা দু-টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ে গেল ফলাটা। সেইসাথে শামানের কাতানার ডগাটা বাতাস কেটে থেমে গেল একেবারে তার গলার কাছে।

কাতানাটাকে প্রহরীর গলায় চেপে ধরে তাকে চুপ থাকার ইশারা করে পেছন দিকে ফিরে হাত নাড়লো শামান। পেছন থেকে ছুটে এসে মাটিতে পড়ে থাকা একজন আর এই প্রহরীর মুখ চামড়ার ফালি দিয়ে বেঁধে ফেললো, যাতে ওরা কোন শব্দ করতে না পারে। বাকি দুজন মৃত প্রহরীকে দ্রুত সরিয়ে ফেলে এই দুজনকেও হাত পা বেঁধে পিপের ভেতরে ভরে ওগুলোকে একপাশে দাড়ঁ করিয়ে দিলো ওরা কিছুক্ষণের ভেতরে।

কাজ শেষ করে হাফ ছাড়লো ওরা। "যাক কেউ আসেনি এই সময়ের ভেতরে। এখন দ্রুত ভেতরে ঢুকতে হবে," নিজের লোকদের উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলেই সে ঘোষিতের দিকে ফিরে বললো, "আগের পরিকল্পনা অনুযায়ীই জলগুহার ভেতরে ঢুকবো আমরা। জলগুহার ভেতরে ঢুকে পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবো," ওর লোকেরা মাথা নাড়তেই শামান সবাইকে অস্ত্র প্রস্তুত করতে বলে নিজের হাতে ধরে রাখা কাতানাটা একবার শূণ্যে ঘুরিয়ে মাথা নিচু করে ঢুকে পড়লো জলগুহার ভেতরে।

গুহার ভেতরে ঢুকেই মশালের আলো এড়িয়ে একপাশে রাখা কিছু বস্তার মতো দেখতে জিনিসের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো শামান। হাতের ইশারায় নিজের লোকদেরকেও আড়াল নিতে বলে সে বস্তার আড়ালের একপাশ থেকে উঁকি দিলো মূল গুহার দিকে। জায়গাটাকে গুহা না বলে এটাকে বলা উচিত মাঠ। কারণ প্রায় একটা মাঠের সমানই বড় গুহাটা।

গুহাটা প্রাকৃতিক সৃষ্টি আর মানুষের হাতের এক অদ্ভুত সমন্বয়। জায়গায়-জায়গায় জ্বলতে থাকা মশালের কারণে এটার প্রাকৃতিক ও মানুষ সৃষ্ট সৌন্দর্য দুটোই বেশ ভালোভাবে ধরা পড়ছে শামানের চোখে। গুহাটার একপাশে কোনার দিকে ওপর থেকে জল গড়িয়ে এসে বিরাট আকারের এক ঝর্ণার মতো সৃষ্টি করেছে, সেটার শব্দে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে ভেতরের অন্যান্য শব্দ। ঝর্ণা দিয়ে বিরাট বেগে আসা জলের স্রোতের প্রায় পুরোটাই বয়ে চলেছে গুহার অন্যদিকে। গুহামুখটা একেবারে খোলা সেদিকে। খোলা অংশের নিচ দিয়ে জলধারা গড়িয়ে পড়ে বিরাট একটা জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে।

প্রায় মোচাকৃতির গুহাটার বাকি সবকিছু মনুষ্য সৃষ্টি। প্রাকৃতিক ঝর্ণাটার দিকে তাকাতেই শামান দেখতে পেল ওটার সামনে হাতে বানানো একটা মুর্তি। ছোটবেলা থেকেই নানা ধরণের মুর্তি দেখেই বড় হয়েছে শামান কিন্তু এরকম বহু মাথাওয়ালা মুর্তি এর আগে কখনো দেখেনি ও।

“সর্প দেবতার মুর্তি,” শামানের পাশ থেকে ফিস-ফিস করে বলে উঠলো ঘোষিত। “উরগদের সর্প মাতা,” ঘোষিত একেবারে ফিসফিসে গলায় বললেও তার দরকার ছিল না। কারণ পাহাড়ি ঝর্ণা আর জলপ্রপাতের তীব্র শব্দে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে অনান্য সব শব্দ।

শামান চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল আবারো সাবধানে উঁকি দিয়ে গুহার দিকে ফিরে তাকাল। ঝর্ণার সামনে অবস্থিত মুর্তিটার ঠিক সামনেই দেখতে পেল একজন মানুষ উবু হয়ে বসে আছে, তাই লোকটা কে ঠিক বোঝা গেল না। মুর্তিটার সামনে থেকে ওর দৃষ্টি সরে গেল গুহার অন্য প্রান্তে। অদ্ভুত দেখতে চামড়ার আকৃতির পর্দা জোড়া লাগানো একটা জিনিস চোঙের মতো সরু হতে-হতে গিয়ে ঢুকেছে একটা মাটির গোলচে চুলার মতো জিনিসের ভেতরে। অনেকটা এই জিনিসের মতোই কিন্তু ছোট আকৃতি শামান এর আগেও দেখেছে লোহার কাজ করার দোকানে। কিন্তু সেগুলো আকারে অনেক ছোট হয়ে থাকে, এটা ওগুলোর চেয়ে আকারে ঠিক তিনগুন।

চুলার মতো জিনিসটার ওখানে কিছু শিকলের মতো ঝুলছে। সেইসাথে ভারি জিনিস টেনে তোলার জন্যে গোল চাকা। শামানের দৃষ্টি চলে গেল শিকল দিয়ে আটকে রাখা মাথাটার অন্যপ্রান্তে। ওখানে শিকলের শেষ মাথায় ঝুলছে আগাগোড়া ধূসর কাপড়ের পট্টি দিয়ে মোড়ানো একটা বিরাট মুর্তি। জিনিসটাকে শিকলের গোল চাকতির শেষ প্রান্তে বসিয়ে টেনে নামানো হচ্ছে একটা কাঠের বিরাট বাক্সের ভেতরে।

“বুদ্ধের অন্ধকারের অবতার,” শামান আনমনেই বলে উঠলো। কিন্তু ওর জন্যে আরো বড় চমক অপেক্ষা করছিল, মুর্তিটা কাঠের বাক্সের ভেতরে নামিয়ে ওটাকে ঢেকে ডালা বসিয়ে দিলো দুজন উরগ সৈনিক। তাদের ঠিক উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আছে একজন বয়স্ক মানুষ। কাঠের বাক্সের ওপরে ডালা বসানো হতেই মানুষটা মুখ ফেরালো এদিকে।

সাথে-সাথে শামানের মনে হলো দম বন্ধ হয়ে আসছে ওর। মানুষটা আর কেউ না, ডুকপা লামা। ডুকপা লামার পরনে ভেড়ার পশমের তৈরী পোশাক। একটা লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। শেষবার ডুকপা লামার সাথে শামানের দেখা হয়েছিল তিন বছর আগে। এই মুহূর্তে তাকে দেখে মনে হচ্ছে তিন বছরের হিসেবে তার বয়স বেড়ে গেছে অনেকটাই। চোখ দুটো একেবারে লাল হয়ে গর্তে ঢুকে আছে, যদিও ভারি পোশাকে ঢাকা শরীর কিন্তু তাতেও বোঝা যাচ্ছে বেশ রোগা-পাতলা হয়ে গেছে সে।

ডুকপা লামা আর বাক্সটাকে ঘিরে ছিল বেশ কয়েকজন উরগ সৈনিক। হঠাৎ তারা দুইভাগে ভাগ হয়ে দুদিকে সরে গেল। কারণটা কি দেখার জন্যে ফিরে তাকাল শামান, একজন মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে ওদের দিকে। মানুষটাকে সামনে থেকে দেখতে না পেলেও

পেছন থেকে তার পরণের পোশাক দেখা মাত্রই অনুমান করতে পারলো শামান। এই মানুষটাই এতোক্ষণ উঁবু হয়ে বসেছিল সেই সর্প মুর্তিটার সামনে। মানুষটা মুর্তি রাখা কাঠের বাক্সটার সামনে গিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে দেখে নিলো একবার, তারপর সে হাসিমুখে ফিরে তাকাল ডুকপা লামার দিকে। এতোক্ষণে মানুষটাকে ভালোভাবে দেখতে পেল শামান। দেখার সাথে সাথে বুঝতে পারলো এই লোকটা একজন উরগ ওঝা। তার কপালে লাল কাপালিক চিহ্ন আঁকা, গলায় মোটা মালা আর হাতে একটা পাতলা কাঠের লাঠির মতো জিনিস ধরা।

শামান ভালোভাবে দেখার আগেই চোখ ফিরিয়ে নিলো। অনেক দেখেছে এবার কাজে নামতে হবে। ঘোষিতের দিকে ফিরে ও বললো, "আমরা দুইদলে ভাগ হয়ে দুদিক দিয়ে এগোব। গুহার ভেতরে প্রহরীদের সংখ্যা খুব বেশি না। আমার মনে হয় না আমরা যদি সংঘবদ্ধভাবে আক্রমণ করি তবে তাদেরকে কাবু করাটা অতো বেশি ঝামেলার হবে।"

"বাকিদের জন্যে অপেক্ষা-" ঘোষিত কথা শেষ করার আগেই শামান বলে উঠলো, "কোন দরকার নেই বরং আমরা বেশি অপেক্ষা করলেই সমস্যা বাড়বে। তারচেয়ে এক্ষুণি কাজে নামতে হবে," বলে সে বুঝিয়ে দিলো সবাইকে কিভাবে কী করতে হবে। তারপর দলের দুজনকে ঘোষিতের সাথে দিয়ে বাকি দুজনকে নিয়ে ও রওনা দিলো নির্দিষ্ট দিকে।

পরিকল্পনা খুব সহজ, গুহার ভেতরে উরগ প্রহরী যারা আছে বেশিরভাগই গুহার মাঝামাঝি ওঝা আর ডুকপা লামার কাছাকাছিই আছে। ওরা দুই দলে ভাগ হয়ে দুদিক থেকে আক্রমণ চালাবে। একদলে শামান আর একজন সৈন্য তলোয়ার হাতে আক্রমণ করবে, অন্যদলে ঘোষিত আর অন্যজন প্রহরী একইভাবে তলোয়ার হাতে আক্রমণ চালাবে, দুই দলেই বাকি একজন তীরন্দাজ ওদেরকে পেছন থেকে সহায়তা করবে।

শামান নিজের দলের লোকদেরকে নিয়ে গুহার অন্ধকারের আড়াল নিয়ে চলে এলো সেই প্রাকৃতিক ঝর্ণার কাছাকাছি। ওটার জলের স্রোতের আড়ালে নিজেদেরকে লুকিয়ে ফেললো ওরা। ঝর্ণার রাশি-রাশি জলের আড়াল থেকে আবছাভাবে দেখতে পেল সেই ওঝা লোকটা ডুকপা লামাকে নিয়ে বড় সর্প মুর্তিটার দিকে এগিয়ে আসছে। শামান নিজের লোকদেরকে ইশারায় সাবধান করে দিয়ে নিজের কাতানার হাতল শক্ত করে চেপে ধরলো আঙ্গুলগুলো। ওরা আরেকটু এগিয়ে এলেই আক্রমণ চালাবে ও।

সামনে এগোতে-এগোতে হঠাৎ থেমে গেল তারা। অনেক লোকজনের পায়ের আওয়াজ ভেসে এলো জলগুহার প্রবেশ পথের কাছ থেকে। শামানও সেদিকে তাকিয়ে দেখতে পেল প্রায় আধ ডজন প্রহরীসহ কেউ একজন প্রবেশ করেছে গুহার ভেতরে। জলধারার আড়াল থেকে ঠিক পরিষ্কার দেখতে না পেলেও এটা বুঝতে পারলো কিছু একটা হয়েছে।

"রাজা হেমচন্দ্র এসময়ে গুহায় কেন?" পাশ থেকে ওর দলের একজন কথা বলে উঠলো। শামান চমকে উঠে তার কাছে জানতে চাইলো, "তুমি নিশ্চিত ওটা রাজা হেমচন্দ্র?" সৈনিক মাথা নেড়ে হ্যাঁ-সূচক জবাব দিলো। শামান অবাক হয়ে ফিরে তাকাল সেদিকে।

ওর সমস্ত পরিকল্পনা উল্টে-পাল্টে গেছে রাজার আগমনে। রাজা হেমচন্দ্র নিজের প্রহরীদেরকে নিয়ে সোজা চলে গেল সেই বাক্সটার কাছাকাছি। সেটাতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ডুকপা লামার কাঁধে একটা হাত রেখে হাসিমুখে কিছু একটা বলে উঠলো। ডুকপা লামা কোন জবাব দেয়ার আগেই জোরে চাপ দিয়ে তাকে বসিয়ে দিলো হাঁটু গেড়ে। প্রহরীদের ভেতরে কেউ একজন একটা বিরাট তলোয়ার এগিয়ে দিলো রাজার দিকে। শামান নিজের অজান্তেই এক পা এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

"আমাদেরকে এক্ষুণি আক্রমণ করতে হবে," শামানও বের করে এনেছে নিজের কাতানা। কিন্তু রাজা হেমচন্দ্র তলোয়ারটা বাগিয়ে ধরে চিৎকার করে ভাঙা গলায় কিছু একটা বলে উঠলো।

"হুজুর, ওরা জানে আমরা এখানে আছি," শামানের পাশ থেকে ওর সৈনিকদের একজন বলে উঠলো। "এক্ষুণি আমরা আত্মসমর্পণ না করলে তবে ওরা বুড়ো মানুষটাকে মেরে ফেলবে।" সৈনিকের কথা পুরোপুরি শেষ হবার আগেই জলের জলধারা ভেদ করে লাফিয়ে গুহার মেঝেতে নেমে গেল শামান।

"আমি আত্মসমর্পণ করছি," বলে ও নিজের হাতের কাতানাটা বাড়িয়ে ধরে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

অধ্যায় উনপঞ্চাশ

বর্তমান সময়

সুরমা নদীর ওপরে, সিলেট

কানের সাথে লাগানো ঘড়ির ব্যাটারির মতো দেখতে কমিউনিকেশন ডিভাইসটার একদিকে চাপ দিয়ে ওটাকে চালু করতেই খুবই সামান্য- প্রায় চোখে দেখা যায়না- এরকম একটা আলো জ্বলে উঠলো। সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে যেন চুল ঠিক করছে এমনভাবে জিনিসটা কানে পরে নিলো সুলতান।

ওর দিকে তাকিয়ে থাকা এক বয়স্ক মুরুব্বির দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে নিজের ব্লেজারের ওপরের দুটো বাটন বন্ধ করে দিলো ও। কোনভাবেই ওর বিকট দর্শন দুই পিস্তলের একটা কারো চোখে পড়লেই হলো, নরক নেমে আসবে লঞ্চে।

পকেট থেকে মোবাইল বের করে যেন ওটাতেই কথা বলছে এমন ভঙ্গিতে মোবাইলটা কানের পাশে লাগিয়ে কথা বলতে লাগলো ও। বার কয়েক চেষ্টা করে কোন সাড়া না পেয়ে কানের ডিভাইসটা সে হাতের আড়াল করে আবার বের করে আনলো। ব্যাপার কি, হেড-সেটটা কি কাজ করছে না, নাকি উচ্চ শব্দের কারণে সে কিছু শুনতে পাচ্ছে না। ও আশে-পাশে তাকাল।

এই মুহূর্তে সে অবস্থান করছে লঞ্চটার দ্বিতীয় ডেকে। তানভীর নির্দেশ দেয়া মাত্রই যেন খুব ব্যস্ত ভঙ্গিতে দৌড়ে আসছে এমন একটা ভাব করে লঞ্চ ছাড়ার ঠিক আগ মুহূর্তে লঞ্চে উঠে এসেছে সে। উঠেই নিচের ডেকে আড়াল না পাওয়াতে চলে এসেছে লঞ্চের দ্বিতীয় তলায়। এখানে অনেক লোকজন বসে আছে, চেয়ারে লঞ্চের ডেকে ইত্যাদি-ইত্যাদি জায়গায়। উচ্চ শব্দের সাথে বাজছে হিন্দি সিনেমার গান।

লঞ্চটার বিভিন্ন দিকে যতোদূর দৃষ্টি যায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েছে সুলতান। সেইসাথে মনে-মনে এটার মালিকের রুচির প্রশংসা করেছে ও। কারণ লঞ্চটা একেবারেই সাধারণ লঞ্চ, আকারেও খুব একটা বড় না কিন্তু সাজানো হয়েছে খুব সুন্দর করে। ভেতরটা দেখলে মনে হবে কোন দামি কমিউনিটি সেন্টার কিংবা ফাইভ স্টার হোটেলের ভেতরে চলে এসেছে।

দ্বিতীয় তলায় শব্দের অত্যাচার থেকে বাঁচতে ওপরের তিন নম্বর ডেকে চলে এলো সুলতান। এখানেই হলুদের মূল অনুষ্ঠান সঞ্চালিত হবে মনে হচ্ছে কিন্তু এখনো প্রস্তুতি পুরোপুরি সম্পন্ন হয়নি। রেস্টুরেন্টের মতো বসার সারি দেয়া চেয়ারের সামনে বিরাট

আকারের একটা স্টেজ বানানো হয়েছে, সেটাকে এখন মুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে ফুল দিয়ে। কাজ প্রায় শেষের দিকে।

এই জায়গাটা অপেক্ষাকৃত নির্জন দেখে কানে পরানো হেড-সেটটা আবারো খুলে ভালোভাবে কানে লাগালো ও। এবারও কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে মনে মনে গালি দিয়ে উঠলো ও। ব্যাপার কি, কেউ সাড়া দিচ্ছে না, নাকি মেশিন কাজ করছে না, বুঝতে পারছে না ও। আবারো জিনিসটাকে বের করে আনবে কিনা ভাবছে তার আগেই পাশ থেকে বেশ ভারি একটা গলা বলে উঠলো, "আফনে কেডায় আইয়ার? আফনেরে তো চিনতায় ফারিয়ের না?"

সুলতান পাশ ফিরে দেখলো মুরুব্বি কিসিমের দেখতে বয়স্ক এক লোক ওকে উদ্দেশ্য করে কিছু একটা বলেছে। কিন্তু লোকটা একেবারে খাস সিলেটি ডায়লেক্টে কথা বলায় কিছুই বুঝতে না পেরে হা করে তাকিয়ে রইলো ও।

***

রেলিং চেপে ধরা হাতটা পিছলে যেতেই এক টানে প্রায় ফিটখানেক নিচে নেমে গেল তানভীর। পা দিয়ে শরীরটা আটকানোর চেষ্টা করেও কোন লাভ হলো না। সোজা ধেয়ে চললো নিচের দিকে। যেই মুহূর্তে ও ভাবছে আর কিছুই করার নেই হঠাৎ ওর শরীরটা আটকে গেল।

মাথা তুলে দেখলো লঞ্চের রেলিঙের ওপরে ঝুঁকে ওর লেদার জ্যাকেটের কলার ধরে ফেলেছে জালাল। কিন্তু ধরে রাখতে পারবে না, জালালের হাতটা পিছলে যাবার আগেই রেলিঙের সামান্য ওপরে পা'টাকে একটুখানি বাঁধিয়ে ওপরের দিকে ঠেলা দিলো তানভীর নিজের শরীরটাকে, সেইসাথে জালাল যতোটা পারলো টান দিলো ওকে। শরীরটা একটু উঁচু হতেই খপ করে একটা রেলিঙ ধরে ফেললো ও। আরো একটু উঁচু হতেই জালালের জন্যে খানিকটা সুবিধে হলো, জোরে টান দিলো সে। এবার পা দিয়ে রেলিঙের নাগাল পেতেই তানভীর শরীরটাকে টেনে নিয়ে এলো রেলিঙের ওপরে, তারপর দুজনেই গড়িয়ে পড়ে গেল ডেকে।

প্রাণপনে হাঁপাচ্ছে। "ওই মিয়া, ছোটবেলায় তোমগো স্কুলে লঙ জাম্প আছিল না? আট্টু হইলে তো-"

"ছিল দেখেই তো বেঁচে গেলাম আজ," তানভীর উঠে বসলো। অনেক কাজ পড়ে আছে।

"তাইলে মনে অয় দৌড়ের কোন খেলা ছিল না," তানভীরের বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরে উঠে বসলো জালাল। "বাপরে, বিড়ি খাইতে খাইতে শ্যাষ আমি। একটু কিছু করলেই জান বের হয়ে যায়।"

"জালাল ভাই, চলো। কপাল ভালো, লঞ্চের পেছনে কেউ ছিল না, না হলে," পকেট থেকে হেড-সেট বের করে কানে লাগাতে লাগাতে বলতে লাগলো তানভীর। "মনে হয় সবাই সামনের দিকে অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত।"

জালাল উঠে দাঁড়িয়ে তার কোটের ভেতর থেকে অস্ত্র বের করার জন্যে হাত দিতেই তানভীর তার হাতটা ধরে ফেললো। "মনে নেই? কোন অবস্থাতেই অস্ত্র বের করা যাবে না। এমনিতেই পাবলিক বলয়ের ভেতরে আছি, তার ওপরে একবার প্যানিক ছড়ালে উপায় থাকবে না আর। হ্যালো, হ্যালো," হেডসেটে সুলতানের সাথ যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে লাগলো ও।

ওপাশ থেকে সুলতানের অস্থির গলা ভেসে আসতেই স্বস্তির একটা পরশ, বয়ে গেল তানভীরের শরীরে। "হ্যালো সুলতান, তুমি ঠিক-ঠাক উঠতে পেরেছো?... গুড, আমরা লঞ্চের পেছন দিকে আছি। এক কাজ করো, তুমি কোন ফ্লোরে আছো এখন?"

সুলতান জবাব দিতেই ও বলে উঠলো ভেরি গুড, তুমি তৃতীয় ডেক থেকে সার্চ শুরু করবে, প্রথমে তৃতীয় ডেক পুরোটা সার্চ করবে, তারপর দ্বিতীয়টাতে নামবে, নিচেরটা আমরা দেখছি," বলেই আবারো মনে করিয়ে দিলো। "মনে আছে তো, অস্ত্র বের করবে না, খুব সাবধানে সহজাত ভঙ্গিতে চলাচল করো। এমনভাবে মুভ করো যেন গেস্ট, কেউ কিছু জানতে চাইলে বলবে ওয়াশরুম খুঁজছো। ওকে," বলেই ও জালালকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো।

"জালাল ভাই, নিচের ডেকটাই সবচেয়ে বড়, কাজেই আমি আপনি এটাই থরোলি চেক করবো। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে ওই ব্যাটারা থাকলে নিচের ডেকেই আছে। আপনি ডান দিক দিয়ে দেখেন আমি বাম দিক দিয়ে দেখছি।"

জালাল মাথা নেড়ে সায় জানাতেই দুজন দুদিকে ছড়িয়ে পড়লো। তানভীর চলে এলো পেছনের ডেকের একেবারে ডান দিকে।

লঞ্চটাতে হালকা চালে একবার চোখ বুলিয়ে তানভীর মনে-মনে বলতে বাধ্য হলো লঞ্চের ভেতরের ডেকোরেশন অসাধারণ। বাম দিকে এগিয়ে কন্ট্রোল রুমের কাছে চলে এলো। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল ভেতরে দুজন মেকানিক কাজ করছে। একজন মেকানিক গজ-গজ করে কী যেন বলছে অন্যজন আরো রাগের সাথে চেঁচিয়ে জবাব দিলো। কিন্তু দুজনের কারো কথাই ইঞ্জিনের শব্দের কারণে বুঝতে পারলো না ও।

ওখান থেকে সরে এসে রওনা দিলো নিচের ফ্লোরের সামনের অংশে।

***

মুরুব্বি লোকটাকে দেখে হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইলো সুলতান। লোকটা আবারো তড়-বড় করে কী জানি বলছে কিছুই বুঝতে পারলো না ও। লোকটা কি বলছে মাথায় ঢুকছে না। আচমকাই ওর চোখ চলে গেল স্টেজের দিকে, সেখানে ফুলের ব্যাকগ্রাউন্ডের সামনে বড় করে লেখা হয়েছে 'হলুদ সন্ধ্যা' তার ঠিক নিচেই একটা ছেলে আর একটা মেয়ের হৃদয় আকৃতির ছবি লাগানো হয়েছে। মেয়েটার ছবির নিচে তার নাম লেখা কনি।

"চাচা আমি কনির বা..." বলেই আটকে গেল ও। মেয়েটাকে দেখে মনে হচ্ছে ওর চেয়ে অনেক ছোট হবে, তাই বান্ধবি বলতে গিয়েও থেমে গিয়ে বলে উঠলো। "আমি কনির বড় বোন, ঢাকা থেকে এসেছি।"

"ঢাকা থনে?" বলে লোকবটা খুবই অবাক হয়ে ফিরে তাকাল আরেকজনের দিকে। "কনি তো জিন্দেগিতেও ঢাকাত..."

"আরে চাচা আজকাল কি বন্ধু-বড় বোন এসব সরাসরি হয় নাকি? আমি কনির ফেসবুক বড় বোন," বলেই আর অপেক্ষা না করে চাচার মুখের দিকে তাকিয়ে একটা হাসি দিয়ে রওনা দিলে ডেকের ভেতরের দিকে।

পেছনে শুনতে পেল চাচা অন্য লোকটার কাছে জানতে চাইছে, "কিয়ের বুক?" অন্য লোকটা মনে হয় তাকে কিছু একটা বুঝিয়ে বললো, শুনে চাচা বলতে লাগলো, "খিতা যে হুনিয়ের সময়ের লগে!" দুজনেই এই বিষয়ে জরুরি আলোচনা শুরু করে দিলো।

সুলতান ওদের কাছ থেকে বেশ অনেকটাই দূরে সরে এসেছে এমন সময় খর-খর করে উঠলো ওর কানের হেডসেট। "হ্যালো, হ্যালো, কমান্ডার," অস্থির হয়ে বলতে লাগলো ও। বিপরীত পাশ থেকে তানভীরের গলা ভেসে আসতেই স্বস্তির পশর বয়ে গেল ওর শরীরে। "কমান্ডার, আপনারা ঠিক আছেন? এতো দেরি হলো... আচ্ছা... আমি তৃতীয় ডেকে আছি... ঠিক আছে... আমি এই দুটো ডেক চেক করে দেখছি," বলে ও অন্যপাশের কথা শুনতে লাগলো। "মনে থাকবে কমান্ডার, কোন অস্ত্র প্রদর্শন করবো না, চাল-চলন স্বাভাবিক রাখবো, আর সন্দেহজনক কিছু পেলে সবার আগে আপনাকে জানাবো। ওকে," শেষের কথাগুলো মুখের কাছে হাত চাপা দিয়ে বললো ও যাতে কারো কানে না যায়। কথা শেষ করে ও পুরো ডেকটাতে চোখ বুলালো একবার।

নিচের ডেকটা মনে হয় সবচেয়ে বড়, দ্বিতীয় ডেকটা তারচেয়ে ছোট, আর সবার ওপরের ডেকটা সবচেয়ে ছোট। রেস্টুরেন্টের মতো খানিকটা জায়গা সাজানো হয়েছে, ছোট একটা মঞ্চের মতো আর খাবার সার্ভ করার ব্যবস্থা, এই হলো তৃতীয় ডেক। এক চক্কর দিতেই এই ডেক পরীক্ষা করা শেষ হয়ে গেল।

প্যাঁচানো সিঁড়ি বেয়ে সুলতান নেমে এলো নিচের দিকে। এই ডেকটা দুইভাগে ভাগ করা। একদিকে যাত্রিদের থাকার জন্যে ছোট-ছোট কয়েকটা কেবিন, অন্যদিকে লাউঞ্জের মতো বসার ব্যবস্থা। লাউঞ্জটাতে একটা চক্কর দিয়ে সুলতান চলে এলো ছোট-ছোট

কেবিনগুলোর সামনে। বেশিরভাগ কেবিনই বন্ধ। দুটো কেবিনের দরজা খোলা দেখে ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখে মনে হলো বিয়ে বাড়ির লোকজনই ওগুলোর ভেতরে সাজগোজ-মেহেদি লাগানো এসব নিয়ে ব্যস্ত। বাকি তিনটে কেবিনের সামনে এসে দেখলো দরজার নিচ দিয়ে কোন আলো আসছে না। তারমানে ওগুলোর ভেতরে কেউই নেই। তবু প্রতিটা কেবিনের সামনে কিছুক্ষণ অবস্থান করে বোঝার চেষ্টা করলো ভেতরে কোন সাড়া-শব্দ আছে কিনা। কিন্তু কোন শব্দ না পেয়ে বুঝলো ওগুলোর ভেতরে আসলে কেউই নেই।

কেবিনগুলো চেক করে চলে এলো ডেকের পেছন দিকে। "কমান্ডার, দুটো ডেকই পরীক্ষা করে দেখলাম কিন্তু কোনটাতেই সন্দেহজনক কিছু নেই," সুলতান একটু হতাশ হয়েই তানভীরকে রিপোর্ট করলো। "ঠিক আছে কমান্ডার, আমি এখানেই অবস্থান করছি। আপনারা নিচের ডেক পুরোটা পরীক্ষা করে ওপরে চলে আসুন তারপর আমরা পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নিবো আসলে কী করা যায়।

তানভীরের সাথে কথা শেষ করে সুলতান ডেকের দিকে ফিরে তাকাল। ওদের লঞ্চ সিলেট শহর ছাড়িয়ে গভীর নদীর দিকে চলে এসেছে। এখনো শহরের আলো দেখা যাচ্ছে সুরমা নদীর দুপাশে তবে কমে এসেছে অনেক। ডেকের সামনের অংশ থেকে ভেসে আসছে হই হুল্লোড়ের শব্দ, তারমানে মূল অনুষ্ঠান মনে হয় শুরু হয়ে গেছে। ডেকের ওপরে দাঁড়িয়ে জলের দিকে ফিরে তাকাল। আলো ঝলমলে লঞ্চটা জল কেটে এগিয়ে চলেছে, আশেপাশের কোথাও থেকে সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ ভেসে আসছে। হঠাৎ সিগারেটের তৃষ্ণা পেয়ে বসলো ওর। ব্লেজারের পকেট থেকে সিগারেটে প্যাকেট আর লাইটার বের করে ঠোঁটে লাগালো সুলতান। লাইটার দিয়ে ধরাতে গিয়ে কয়েকবার খস-খস করলো কিন্তু আগুন ধরলো না।

বিরক্ত হয়ে লাইটারটা পকেটে রেখে সিগারেটরে ধোঁয়ার গন্ধ কোথা থেকে আসছে সেদিকে এগোল। ডেকের একেবারে কিনারায় আরেকটা ছোট্ট কেবিনের মতো। দরজাটা সামান্য খোলা, সেটার ভেতর থেকে ধোঁয়ার গন্ধ ভেসে আসছে। মনে-মনে সুলতান ভবলো এই কামরাটা তো আগে চোখে পড়েনি। ওটার দিকে এগিয়ে যেতেই ভেতর থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বরটা শুনে একটু চমকে উঠলো ও। আরো ভালোভাবে শোনার জন্যে কান পাতলো। কথাগুলো শুনতে-শুনতে প্রথমেই মনে হলো কমান্ডারকে জানাতে হবে।

কিন্তু কিছু করার আগেই ধাম করে দরজাটা খুলে গেল, দরজায় দেখা গেল দুজন মানুষ। একজনের পরনে গ্যাবাডিন প্যান্ট আর ফতুয়া, অন্যজনের পরনে হাফ হাতা শার্ট আর লুঙ্গি। এই দুজনই কথা বলছিল। সুলতানকে দরজার ওপর প্রায় ঝুঁকে থাকতে দেখে একজন ধমকে উঠলো, "এই, এইনে কি?"

সুলতান একটু আমতা আমতা করে জবাব দিলো সে ওয়াশরুম খুঁজছিল। দুজনেই একে অপরের দিকে দেখলো। বোঝাই যাচ্ছে, দুজনার একজনও ওর কথা বিশ্বাস করেনি। গ্যাবাডিন প্যান্ট লুঙ্গিওয়ালার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, "ধরের এইয়ারে।"

লোকটার কথা কানে যেতেই সুলতানের একটা হাত চলে গেছিল ব্লেজারের ভেতরে থাকা পিস্তলের বাটের ওপরে, কিন্তু ওটা বের করে আনার আগেই ধপ করে নিভে গেল পুলো লঞ্চের সব আলো। সেইসাথে তীব্র কট-কট শব্দের সাথে থেমে গেল ইঞ্জিন। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ডেকের ওপরে গড়িয়ে পড়ে গেল সুলতান। ওর গায়ের ওপরে এসে পড়লো লোক দুজনার একজন।

***

অন্যদিকে তানভীর আর জালাল পড়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে।

নিজেদের ভেতরে কথা শেষ হতেই জালাল আর তানভীর ছড়িয়ে পড়েছে দুইদিকে। ইঞ্জিন রুম পার হয়ে তানভীর চলে এলো নিচের ডেকের মাঝামাঝি। এই ডেকের বেশিরভাগ অংশই জাহাজের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট। সামনের দিকে অনুষ্ঠানের আয়োজক আর যাত্রিদের জন্যে রিসিপশন ও বসার জন্যে লাউঞ্জের মতো আছে। ইঞ্জিন, পাওয়ার কন্ট্রোল, স্টোর রুম, কিচেন সবই নিচের ডেকে অবস্থিত। ইঞ্জিন রুম পার হয়ে তানভীর চলে এলো কিচেনে। সেখানে জানালা দিয়ে দেখলো প্রচুর ব্যস্ততার সাথে শেফ থেকে শুরু করে বাবুর্চিরা কাজ করছে। কিচেন পার হয়ে লাউঞ্জের কাছাকাছি এসে থেমে গেল। ও যে-অংশ চেক করছে সেখানে সন্দেহজনক কিছুই পায়নি। ও লাউঞ্জের কাছাকাছি এসে দেখলো জালাল ইতিমধ্যেই লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে আছে।

“জালাল ভাই,” মৃদু স্বরে ডাক দিলো ও। ওকে দেখে এদিকে ফিরে তাকাল জালাল। “কি ব্যাপার, তুমিও চলে এসেছো। কিছু পেয়েছো?’

মাথা নেড়ে না বললো তানভীর। “কিছুই তো পেলাম না। আপনি?” জালাল পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে এনেছে। “একটা ইন্দুরও নাই এই লঞ্চে। চলো পিছন দিকে যাইয়া বিড়ি খাইয়া মাথা ঠান্ডা করতে হবে।”

এমন সময় হেড-সেটে সুলতান কথা বলে উঠলো। ওর সাথে কথা শেষ করে জালালের দিকে তাকিয়ে তানভীর হতাশ হয়ে মাথা নাড়লো, “সুলতানও কিছু পায়নি। আমরা কি ভুল করলাম, জালাল ভাই?”

“কিছুই তো বুঝতাছি না, সুলতান কই?”

“সুলতান ওপরে দ্বিতীয় ডেকে আছে,” বলে একটু ভেবে জালালকে বললো ও। “এক কাজ করি চলেন পেছন দিকে না গিয়ে ওপরে দ্বিতীয় ডেকে চলে যাই। ওইখানে গিয়ে তিনজনে মিলে পরামর্শ করে পরবর্তী কী করবো সেটা ঠিক করতে হবে। কি বলেন?”

“আমারও মনে হয় সেইটাই ভালো হবে,” বলে জালাল হাঁটতে শুরু করলো। ওকে অনুসরণ করলো তানভীর। “যেহেতু আগের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হয়নি কাজেই নতুন

করো-” জালাল কথা শেষ করার আগেই ধপ ক’রে পুরো লঞ্চের আলো নিভে গেল। “কি ব্যাপার-” তানভীর কথা শেষ করার আগেই হঠাৎ তীব্র শব্দের সাথে থেমে যেতে লাগলো লঞ্চটা। সামলানোর চেষ্টা করেও নিজেকে সামলাতে পারলো না ওরা। তানভীর গড়িয়ে পড়লো জালালের ওপরে, দুজনে মিলে গড়াগড়ি খেতে লাগলো করিডরে।

“ঘটনা কি, আলো সব নিভে গেল তারপর আবার- আপনি ঠিক আছেন, জালাল ভাই?” জালালকে উঠে বসতে দেখে জানতে চাইলো তানভীর।

মাথা নেড়ে জালাল জবাব দিলো, ঠিক আছে সে, উঠে বসেই প্রথমে নিজের পিস্তল দুটো পরীক্ষা করে বলে উঠলো, “ঘটনা অবশ্যই খারাপ। কারণ তা-না হলে এভাবে মাঝ নদীতে লঞ্চ থেমে যাবার কোন কারণই নেই। চলো দেখি-” বলেই জালাল উঠে দাঁড়িয়ে একটা হাত বাড়িয়ে দিলো তানভীরের দিকে। তানভীর সেটা ধরতেই একটানে তাকে উঠিয়ে ফেললো ওপরে। “আচ্ছা-” তানভীর কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই স্পিকারে একটা গলা ভেসে এলো।

“আমি লঞ্চের প্রধান সারেং বলছি, সাময়িক অসুবিধার জন্যে প্রথমেই আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, হঠাৎ আমাদের ইঞ্জিনে গোলযোগ-” সারেং বলে চলেছে তানভীর জালালের দিকে তাকিয়ে আধো অন্ধকারের ভেতরে বলে উঠলো, “মরার ওপরে খাড়ার-” তানভীর ওর কথা শেষ করার আগেই জালাল একটা হাত তুলে থামিয়ে দিলো ওকে।

তানভীর একটু অবাক হয়েই বলে উঠলো, “কি ব্যাপার, ভাই-”

“শশশ,” জালাল একটা হাত তুলে থামিয়ে তো দিলোই সেইসাথে কান পেতে কিছু একটা শোনার চেষ্টা করছে। “শুনতে পাচ্ছো?” তার প্রশ্ন শুনে তানভীর একটু বোকার মতো তাকিয়ে রইলো। সেও মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করলো কিন্তু কানে এলো না কিছুই। “কই কিছুই তো-” বলতে গিয়েও থেমে গেল। কিছু একটা যেন কানে আসছে ওরও। মৃদু একটা গুঞ্জনের মতো। প্রথমবার অস্পষ্টভাবে কানে এলেও সারেঙের কণ্ঠস্বর ছাড়িয়ে এবার পরিষ্কার শুনতে পেল একটা মৃদু গুঞ্জনের শব্দ। “এটা তো...”

“একদম ঠিক, অবশ্যই এটা একটা শেলো নৌকা অথবা কোন মটরওয়ালা নৌকার শব্দ,” বলে তানভীরের দিকে ফিরে তাকাল জালাল। “তারমানে বুঝতে পেরেছো শালাদের পরিকল্পনা-”

“চলেন চলেন জলদি চলেন, মনে হচ্ছে শব্দটা-”

“লঞ্চের পেছন দিক থেকে আসছে,” তানভীরের কথাটা সম্পূর্ণ করে দিলো জালাল। ইতিমধ্যেই সে রওনা দিয়েছে লঞ্চের পেছন দিকে। তানভীরও দ্রুতবেগে অনুসরণ করলো তাকে। জাহাজের কেবিন এলাকা ছাড়িয়ে ওরা চলে এলো লঞ্চের পেছন দিকে। কিন্তু লঞ্চের পেছন দিকে কিছুই নেই। “ব্যাপার কি, এখানে তো-” জালাল তার বক্তব্য শেষ করার আগেই তানভীর থমিয়ে দিলো তাকে। মৃদু একটা ভট-ভট শব্দ শুনতে পেয়েছে ও।

আর সেটা ভেসে আসছে লঞ্চটার কোন এক পাশ থেকে। “জালাল ভাই, এদিকে,” বলেই হোলস্টার থেকে বের করে আনলো নিজের পিস্তল। জালালের দিকে তাকিয়ে দেখলো সেও বের করে এনেছে নিজের পিস্তল। দুজনেই খুব সাবধানে পা টিপে চলে এলো একপাশে।

জায়গাটা জাহাজের একবারে কোনায়। এখান থেকে ওপরে ওঠার জন্যে প্যাঁচানো একটা সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরের দিকে। সেটা থেকে একটু দূরত্ব বজায় রেখে জাহাজের একপাশে উঁকি দিলো তানভীর, ওর ঠিক পেছনেই জালাল। সরু সিঁড়িটা দুজনকে আড়াল করার জন্যে যথেষ্ট নয়। তাই একজনের পেছনে আরেকজন অবস্থান করছে। দুজনেই নিজেদেরকে যথা সম্ভব আড়াল করে উঁকি দিলো সামনের দিকে।

লঞ্চের একপাশে একটা সাদা রঙের নৌকো বেঁধে রাখা হয়েছে। অন্ধকারের ভেতরে হলেও তানভীর অনুমান করলো সাদা রঙের নৌকো যেহেতু তারমানে এটা সাধারণ কাঠের নৌকা না, সম্ভবত প্লেক্সিবোর্ডের ইঞ্জিন লাগানো নৌকো। জিনিসটা নৌকো আর স্পিডবোটের মাঝামাঝি একটা জিনিস। অল্প দূরত্বে যাতায়াতের জন্যে খুব কাজের। নৌকাটা যেখানে বেঁধে রাখা সেখানেই লঞ্চের রেলিঙের সাথে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন মানুষ, এদের ভেতরে একজনের মাথা বাকি সবাইকে ছাড়িয়ে উঠে গেছে আধ-হাত ওপরে। “শেখারভ,” আনমনেই বলে উঠলো তানভীর। অত্যন্ত মনোযোগের সাথে দুজনেই তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। দ্বিতীয় একজন ব্যক্তি উঠে আসছে, বাচ্চা কোলে নেয়ার মতো করে রেলিঙের ওপর দিয়ে তাকে টেনে ওপরে তুলে ফেললো শেখারভ। “এটা কে?”

“তারচেয়ে বড় কথা, ওইটা কি?” ওর পাশ থেকে জালাল ফিস-ফিস করে বলে উঠলো। মানুষ দুজন রেলিঙের এপাশে উঠে আসতেই নৌকায় বসা লোক দুজন একটা চেইনের সাথে আটকানো কাঠের একটা কফিনের মতো দেখতে বাক্স রেলিঙের সাথে আটকানো কপিকলের মতো চেইনের সাথে আটকে দিলো। কপিকলের চেইনের সাথে বাক্সটা আটকে দিতেই একপাশে দাঁড়ানো দুজনে টেনে তুলতে লাগলো জিনিসটা।

“ব্ল্যাক বুদ্ধা,” আনমনেই বলে উঠলো তানভীর।

“হতে পারে, আবার নাও পারে,” জালাল বলে উঠলো। “জিনিসটার ভেতরে ব্ল্যাক বুদ্ধা থাক আর না-ই থাক শেখারভ তো আছেই আর শেখারভের সাথে ওটা টেড চ্যাঙ মানে জেড মাস্টার হবার সম্ভাবনাই বেশি।”

“কি করবো আমরা তাহলে?” তানভীর জালালের কাছে পরামর্শ করার সুরে জানতে চাইলো। “আমার মনে হয় সবচেয়ে সেরা সিদ্ধান্ত হবে, ইকবালকে কল করে কোস্টগার্ডকে সতর্ক করে দেয়া। আর কোস্টগাডর্ না আসা পর্যন্ত আমরা জাহাজেই ঘাপটি মেরে বসে থাকবো। কারণ লঞ্চে অনেক সাধারণ লোকজন আছে কিছু করতে গেলে যদি গুলি চলে তবে ওদের ক্ষতি হতে পারে।”

“আমারও মনে হয় এটাই ঠিক হবে,” ওরা উঁকি দিয়ে দেখলো রেলিঙের এপাশে থাকা লোকগুলো চেইনের সাথে আটকানো বাক্সটা টেনে তুলে ফেলেছে প্রায়। জালালকে সিঁড়িতে অপেক্ষা করতে বলে ও সরে এলো খানিকটা। মোবাইল বের করে কল দিলো ইকবালকে। কথা প্রায় শেষ করে এনেছে এমন সময় ধপ করে আলো জ্বলে উঠলো।

হঠাৎ করে তানভীর একেবারে ফাঁকা জায়গায় পড়ে গেল, এমনভাবে আলো জ্বলে উঠবে ভাবতেই পারেনি ও। জালালের দিকে তাকিয়ে দেখলো জালাল এখনো সিঁড়ির পেছনেই অবস্থান করছে। সন্তপর্নে সরে আসার জন্যে ইশারা করলো ও জালালকে। লঞ্চের অন্যপাশে লোকজনের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। তারমানে লোকগুলো এগিয়ে আসছে এদিকেই। জালাল অনেকটাই সরে এসেছে এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে চেঁচিয়ে উঠলো কে যেন, প্রায় সাথে সাথেই ধুপধাপ আওয়াজের সাথে প্যাচানো সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়লো একজন মানুষের দেহ, তাকে অনুসরণ করলো আরেকজন।

দুজনেই সিঁড়ি বেয়ে ছিটকে এসে পড়লো ডেকের ওপরে। তাদের পেছন পেছনে ডেকের ওপরে লাফিয়ে নামলো আরেকজন মানুষ। জিন্স আর ব্লেজার পরা মানুষটার হাতে বিরাট একটা পিস্তল। সেটা তুলে মাটিতে পড়ে থাকা মানুষটার দিকে তুলে শাসিয়ে কিছু একটা বলেই লাথি মারলো সে। তারপর হঠাৎ হুঁশ হতেই সে আশেপাশে তাকিয়ে বেকুব বনে গেল।

একদিকে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে জালাল আর মোবাইল হাতে তানভীর, অন্যদিকে ডেকের কোনার দিকে একটা বড় কাঠের বাক্স মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুজন মানুষ, তাদের ঠিক সামনেই আরো তিনজন। আর এই দুইদলের ঠিক মাঝখানে পিস্তল হাতে বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে সুলতান।

সময় যেন থমকে গেল মুহূর্তের জন্যে।

অধ্যায় পঞ্চাশ

সময়: ১৮০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ

জলগুহা, বিধোরীর দুর্গ, কন্নোর, ভারতবর্ষ

আত্মসমর্পণের প্রায় সাথে সাথে উরগ আর লিচ্ছবী সৈনিকদের কয়েকজন এগিয়ে এসে শামানের হাত থেকে কেড়ে নিলো কাতানা। সেইসাথে ওর পিঠে রাখা খাপ থেকেও বের করে নিলো অন্য কাতানাটা। একটু আগে ঠিক যেভাবে ডুকপা লামাকে চাপ দিয়ে বসিয়ে দিয়েছিল, ঠিক সেভাবেই চাপ দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দেয়া হলো ওকে।

রাজা হেমচন্দ্র আর তার পেছন পেছনে এগিয়ে এলো সেই উরগ ওঝা। শামান ওদের কারো পরোয়া না করে সরাসরি তাকিয়ে আছে ডুকপা লামার দিকে। সেও এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শামানের দিকে। শামান দেখলো বুড়ো মানুষটার চোখে প্রথমে খেলে গেল অদ্ভুত এক শূণ্যতা, পরমুহূর্তে শামানকে চিনতে পেরে তার মুখে ফুটে উঠলো আনন্দের হাসি। শামানও মৃদু হেসে উঠলো তাকে উদ্দেশ্য করে।

থুতনির কাছটায় সামান্য খোঁচা খেয়ে শামান মুখ তুলে তাকাল ওপরের দিকে। রাজা হেমচন্দ্র নিজের হাতে ধরা তরবারিটা শামানের থুতনির নিচে ঠেকিয়ে ওপরের দিকে ঠেলা দিয়ে উঁচু করে ধরেছে শামানের মুখটা। তারপর ধীরে ধীরে সেটা দিয়ে শামানের মাথায় পেঁচিয়ে রাখা কাপড়টাতে টান দিয়ে সরিয়ে দিতেই শামানের লাল চুলগুলো ছড়িয়ে পড়লো মুখ আর কাঁধের ওপরে।

“লাল চুলের যোদ্ধা,” বলে উঠলো রাজা হেমচন্দ্র। তার ভাষা কিছুটা ভাঙা-ভাঙা হলেও শামান বুঝতে পারলো। “কন্নোরের মাটিতে পা দেয়ার পর থেকেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এখানকার মাটি,” বলে সে তলোয়ারের ডগা দিয়ে সামান্য বাড়ি মারলো শামানের মুখের একপাশে। রাগের সাথে শামান তাকাল রাজা হেমচন্দ্রের দিকে।

“শশশ,” মুখ দিয়ে অনেকটা সাপের মতোই হিসহিসে শব্দ করে সামনে এগিয়ে এসে শামানের ঠিক সামনে ওরই মতো হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো উরগদের ওঝা। সামনা-সামনি লোকটাকে দেখে একটু আবাক হয়ে গেল শামান। দূর থেকে লোকটার উদ্ভট পোশাক, জটা ধরা চুল আর সাজগোজ দেখে ভেবেছিল লোকটা বুঝি আর দশটা কাপালিকের মতোই হবে, কিন্তু কাছে থেকে তাকিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মানুষকে অবিষ্কার করলো ও। সেই উদ্ভট সাজ-পোশাকের আড়ালে সম্পূর্ণ শান্ত আর বুদ্ধিমান এক জোড়া চোখ তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

সেই চোখ জোড়ায় ভিন্ন এক ধরণের কৌতুহল। "লাল চুল আর নীল চোখের মানুষ সত্যিই তাহলে আছে দুনিয়াতে," বলে ওঝা শামানের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তার হাতের লাঠিটা দিয়ে ওর চুলগুলোকে খানিকটা নেড়ে দেখলো। শামানের হাত বন্ধ থাকার পরও রাগের সাথে মুখের একপাশ দিয়ে ঝাপটা মারলো ও।

"অনেক রাগ আর জেদ এই শরীরে," বলে সে মুহূর্তের জন্যে চোখ বন্ধ করে বলে উঠলো, "দেখিতো এই মাথার ভেতরে কী আছে?" বলেই ওঝা এমন এক কাজ করলো মোটেই আন্দাজ করতে পারেনি শামান। কথাটা শেষ হবার আগেই সে নিজের লম্বা-লম্বা আঙ্গুল আর হাতের তালু দিয়ে খপ করে চেপে ধররো শামানের মাথাটা। মাথাটা চেপে ধরার সাথে-সাথেই জোরে একটা চাপ দিলো সে। সুক্ষ একটা ব্যথার সাথে আপনাতেই চোখ বন্ধ হয়ে এলো ওর। মাথার ভেতরে কেমন জানি একটা ঘোলাটে ভাব ছড়িয়ে পড়লো, সেইসাথে চোখের সামনে ভেসে উঠলো সেই উপত্যকা, ঘুরে বেড়ানো লাল চুলের মানুষগুলো, ছোটবেলায় মঠের দৃশ্যাবলী, যুদ্ধ হানা-হানি।

ঝট করে হাত সরিয়ে নিলো ওঝা। মুখ তুলে তাকাল শামান। ঘোরটা কেটে গেছে। এই ব্যাটা কি আসলেই ওর মন পড়ছিল নাকি সম্মোহিত করে ফেলেছিল ওকে।

ওঝা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। "অনেক তেজ তোমার ভেতরে, যোদ্ধা," বলে সে নিজের মুখটা এগিয়ে আনলো শামানের দিকে। "তবে এগুলোর কোনটাই মূল কথা নয়। মূল কথা হলো শূণ্যতা, অসীম শূণ্যতা তোমার ভেতরে যোদ্ধা," শামান লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে আবারো ঘোরের ভেতের চলে যাচ্ছিলো রাজা হেমচন্দ্রের ধমকে ঘোরটা কেটে গেল ওর।

"এই, এতো কথা কিসের?" বলে সে নিজের লোকদের দিকে ফিরে বলে উঠলো। "শেষ করো এইগুলারে, আর পুরা জলগুহা খুঁজে দেখো এদের সাথে আরো কেউ থাকতে পারে।"

রাজা হেমচন্দ্রের শেষ কথাটা শোনামাত্রই শামানের মুখটা ঘুরে যাচ্ছিলো যেদিকে ঘোষিত আর ওর লোকেরা লুকিয়ে আছে সেদিকে, কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো, তার আগেই ওঝা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রাজার দিকে ফিরে বলে উঠলো, "এই যোদ্ধা ওটার জন্যে এখানে আসেনি," বলে সে কাঠের বাক্সটা দেখালো। সে এসেছে ওর জন্যে," যদিও কথাটা যথেষ্ট শক্তভাবেই বলেছে কিন্তু শামানের কাছে মনে হলো ওঝা ডুকপা লামাকে দেখানোর সময়ে তার গলায় শ্রদ্ধা ফুটে উঠলো। কিন্তু রাজা হেমচন্দ্রের গলায় কোন ভাব নেই বরং সে আবারো রাগের সাথে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই আবারো জলগুহার মুখের দিকে মানুষের পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। উপস্থিত প্রায় সবাই সেদিকে ঘুরে তাকাল, শামানও ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো।

প্রথমেই চোখে পড়লো সবার মাথা ছাড়িয়ে ওপরের দিকে উঠে গেছে শান্ত-শিষ্ট গোলগাল চেহারার ধোয়ীর মাথা। তাকে দেখতে পেয়ে মুহূর্তের জন্যে খুশির ঝিলিক বয়ে গেল

শামানে ভেতরে কিন্তু সাথে সাথে ওর মুখের হাসি বন্ধ হয়ে গেল ধোয়ীর হাতের দিকে চোখ পড়তে, হাতদুটো দড়ি দিয়ে বাঁধা, ঠিক তার পাশে পাশেই এগিয়ে আসছে কালন্তি, তার হাতও একইভাবে দড়ি দিয়ে বাঁধা। তাদের সাথে আরো একজন বন্দি আছে। আর ওদেরকে হাঁটিয়ে নিয়ে আসছে আরো চারজন লিচ্ছবী সৈনিক।

সৈনিকেরা ওদের কাছে এসে থেমে গেল। দুই বন্দিকে দড়ি ধরে টেনে একপাশে সরিয়ে সৈনিকদের দলনেতা সামনের দিকে এগিয়ে এলো। রাজা হেমচন্দের দিকে ঝুঁকে কুর্নিশ করতেই সে প্রায় গর্জন করে উঠলো। "ব্যাপার কি? এদেরকে কোত্থেকে ধরে এনেছিস?"

"হুজুর এরা পাতাল জলপথ দিয়ে মনে হয় ওপরে উঠে এসেছিল," লিচ্ছবী সৈনিকদের নেতা রাজা হেমচন্দ্রের সামনে একেবারে নত হয়ে আছে। "আমরা এদেরকে পাতাল পথের প্রবেশদ্বারের কাছ থেকে ধরেছি।"

"কারা এরা?" রাজা দুই বন্দির দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো। কিন্তু কেউ জবাব দেয়ার আগেই পেছন থকে প্রায় ছুটে সামনে এগিয়ে এলো ওঝা। সে সামনে এগিয়ে একেবারে সোজা গিয়ে দাঁড়ালো কালন্তির সামনে। কথা নেই বার্তা নেই একটানে সে কালন্তির চুল খুলে দিয়ে ওগুলো সামান্য নেড়ে কী জানি দেখলো। কালন্তি ঝটকা দিয়ে নিজেকে পিছিয়ে নিলো।

ওঝা কালন্তির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ রাজা হেমচন্দ্রের দিকে ফিরে বলে উঠলো, "এই মেয়ে সাধারণ কেউ না এ অবশ্যই..." সে কথা শেষ করতে পারলো না তার আগেই কালন্তি প্রায় লাফিয়ে এগিয়ে এলো তার দিকে। নিজের হাতের দুই কব্জির সাথে জড়ানো দড়িটা একটানে খুলে নিয়ে ওটা দিয়ে পেঁচিয়ে ধরলো ওঝার গলায়। কালন্তি এক ঝটকায় দড়িটা গলায় পেঁচিয়ে ধরে তাকে একপাশে কাত করে ফেললো, "তুই একদম ঠিক বলেছিস, আমি কালন্তি, থারু রাজা মানরুর মেয়ে," বলেই সে প্যাঁচানো দড়িটা দিয়ে ওঝাকে আরো জোরে চেপে ধরার আগেই খিপ্র গতিতে হাতের সরু লাঠিটা দিয়ে কালন্তির পেটে খোঁচা মরলো ওঝা।

তীব্র ব্যথা পেলেও কালন্তি তাকে ছেড়ে দিলো না বরং প্যাঁচানো দড়িটা ধরে একপাশে বিশেষ ভঙ্গিতে কোমর বাঁকিয়ে একপাশে ছিটকে ফেললো সে ওঝাকে।

ওঝা মাটিতে পড়ে যেতেই সময় যেন থমকে দাঁড়ালো। কালন্তি আর ওঝার ব্যাপারটা এতো দ্রুত ঘটেছে যে কেউই মুহূর্তের জন্যে বুঝতেই পারেনি আসলে কী ঘটেছে। বন্দিনী হঠাৎ এভাবে হাত বাঁধা অবস্থায় ওঝাকে আক্রমণ করলো কিভাবে। কিন্তু ওঝা মাটিতে পড়ে যেতেই প্রথমেই অচলবস্থার নিরসন ঘটালো ধোয়ী। সেও ঠিক কালন্তির মতোই হাতে নামে মাত্র পেঁচিয়ে রাখা দড়িটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে এলো শামানের দিকে। শামানকে ধরে রাখা দুই প্রহরীকে দুই হাতে শূণ্যে তুলে নিয়ে তাদেরকে প্রায় ছুঁড়ে মারলো শামানদেরকে প্রহরারত বাকি লিচ্ছবী সৈন্যদের দিকে। সেইসাথে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলো সে।

একইসময়ে তীক্ষ্ণ একটা শিস বাজালো লিচ্ছবী সৈন্যদের ছদ্মবেশে থাকা শঙ্করাদিত্য। সাথে সাথে শামানের লোকেরা, ধোয়ী কলন্তি আর ঘোষিতসহ সবাই সতর্ক হয়ে উঠলো। প্রত্যেকেই বের করে আনলো নিজের অস্ত্র।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো শামান। এটাই ছিল ওদের পরিকল্পনা; কালন্তি আর শঙ্করাদিত্যদের দলটার ওপরে দায়িত্বই ছিল, ওরা পাতালের পথ দিয়ে প্রবেশ করে পথিম্যধ্যে যদি কোন সৈন্যদলের সামনে পড়ে তবে তাদের পোশাক লুট করে দলের দুয়েকজনেকে বন্দি দেখিয়ে বাকিরা লিচ্ছবী সৈন্যদের বেশে ওরা পৌছে যাবে জলগুহায়। এরপরে যা করার করবে। আর বাস্তবেও ঘটেছে তাই। ওরা জলগুহার কাছাকাছি পৌছেই দেখতে পায় রাজা হেমচন্দ্রের লোকেরা শামানকে বন্দি করেছে। আর তাই ওভাবে প্রবেশ করে ওদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে।

শামান উঠে দাঁড়িয়েই সোজা আক্রমণের নির্দেশ দিলো। ও আর ঘোষিত বাদে বাকি প্রায় সবাই সশস্ত্র। ওর নির্দেশ পাওয়া মাত্রই শঙ্করাদিত্য আর কালন্তির নেতৃত্বে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লো লিচ্ছবী আর উরগদের ওপরে। শামান আক্রমণের নির্দেশ দিয়েই ফিরে তাকাল ডুকপা লামাকে বন্দি করে রাখা সৈন্যদের দিকে। তিনজন সৈনিক ঘিরে আছে তাকে, তাদের মধ্যে একজন তাকে কাঁধের কাছের কাপড় ধরে টেনে তুলছে ওপরে। শামান মাটি থেকে একটা বর্শা উঠিয়ে নিলো। উরগদের বর্শা, ওর কাতানার মতোই হালকা। জিনিসটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে সেটা ছুঁড়ে মারলো ডুকপা লামাকে ধরে থাকা সৈনিকের দিকে। বর্শাটা সোজা গিয়ে খুলির একপাশে গেঁথে গেল লোকটার। শামান আশেপাশে তাকাল নিজের অস্ত্রের খোঁজে।

ওর জোড়া কাতানার একটা রাজা হেমচন্দ্রের হাতে, অন্যটা আরেক প্রহরীর হাতে। রাজাকে তার সৈনিকেরা ঘিরে ধরেছে গোল বলয়ের মাঝে, তারপর তারা দ্রুত সরে যাবার চেষ্টা করছে জলগুহার প্রবেশ পথের দিকে। শামান একবার তাদেরকে দেখলো আরেকবার দেখলো ডুকপা লামাকে প্রহরারত সৈনিকদের। সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো, আগে ডুকপা লামাকে উদ্ধার করতে হবে। হাঁটুর নিচে খোপের ভেতর থেকে ছুরিটা বের করে আনলো। ওর দিকে এগিয়ে আসা এক উরগ প্রহরীর পেট ফাঁসিয়ে দিয়ে সামনে এগোতে লাগলো ও। কিন্তু বেশি এগোনোর আগেই ও দেখলো ওদের চারপাশে যুদ্ধ চলছে কিন্তু সংখ্যায় কম হবার কারণেই হোক আর অন্য কারণেই হোক ওদেরকে দ্রুত ঘিরে ফেলছে লিচ্ছবী আর উরগ সৈনিকেরা। মুখের ভেতর আঙ্গুল পুরে দিয়ে জোরে শিস বাজালো ও। প্রতিউত্তরে গুহার এক ধার থেকে ভেসে এলো একইরকম শিসের শব্দ।

সাথে সাথে ওর সাথে লড়াইরত এক উরগ সৈনিকের মাথায় ঢুকে গেল একটা তীর। ঘোষিতের দল আক্রমণ চালিয়েছে। গুহার আড়ালে লুকিয়ে থাকা ঘোষিতের দলটা রীতিমতো হই-হই করে ঝাঁপিয়ে পড়ে যোগ দিলো ওদের সাথে। শঙ্করাদিত্যকে চিৎকার করে ও নির্দেশ দিলো রাজা হেমচন্দ্রকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে যে দলটা ওদেরকে ফেরাতে। শামান ফিরে দেখলো ডুকপা লামাকে এখনো টেনে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে

দুই সৈনিক। ওর সামনে যে পড়ছে তাদেরকে মেরে কেটে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো ও।

হঠাৎ সেই ওঝা এসে পড়লো ওর সামনে। তার হাতে সেই লাঠি। শামান মৃদু হেসে উঠলো তার দিকে তাকিয়ে। কিন্তু ও সাবধান হবার আগেই লোকটা আক্রমণ চালালো। লাঠির প্রথম দুটো আঘাত শরীর বাঁকিয়ে এড়িয়ে গেল ও। কিন্তু তৃতীয় আঘাতটা এসে পড়লো ওর চিবুকের ওপরে। সাথে সাথে জ্বলে উঠলো যেন জায়গাটা। নিশ্চই এই ব্যাটা ওঝা কিছু একটা ব্যবহার করছে লাটিতে, আর লাঠিটাও সাধারণ কিছু না। আরেকবার লাঠির আঘাত এসে পড়ার আগেই সরে গেল ও। "আচ্ছা তুমি তাহলে শুধু ওঝা নও, যোদ্ধাও।"

ওঝা কোন জবাব না দিয়ে দুইবার লাঠিটাকে নিজের মাথার ওপরে ঘোরালো। তার নড়া-চড়া দেখেই বোঝা যায় কতোটা দক্ষ সে।

শামান মাটিতে একটা গড়ান দিয়ে এগিয়ে গেল তার দিকে। ওর হিসেবে ওঝা সাবধান হবার আগেই নিচ থেকে ছুরি চালিয়ে ফাঁসিয়ে দিবে লোকটার পেট কিন্তু ছুরি চালানোর আগেই সে দেখলো ওঝা সাবধান হয়ে গেছে। একটা হাঁটু দিয়ে পেটটা তো আগলে ফেলেছেই সেইসাথে সে লাঠিটা চালিয়ে দিয়েছে শামানের গলা লক্ষ করে। কোনমতে একপাশে সরে গেলেও শামান যখন উঠে দাঁড়ালো তখন দেখতে গেলা ওর গলা জা¡লা করছে। এবার বুঝতে পারলো ঘটনা কি। ওঝার লাটিটার সাধারণ চেহারার আড়ালে ওটা আসলে একটা অস্ত্র। ওটাকে নির্দিষ্টভাবে চালালে ওটার ভেতর থেকে ফলা বেরিয়ে আসে। আরেকটু হলেই ওঝা ফাঁসিয়ে দিয়েছিল ওর গলাটা।

রাগের সাথে গলাটা একটু ডলে নিয়ে ও ওঝার দিকে চোখ তুলে তাকাল। "ঠিক আছে, তবে তোমার মতোই খেলা চলুক," বলেই ও আগের মতো লাফ দিলো ও মাটিতে কিন্তু এবার এক গড়ান দিয়ে উঠে বসে আক্রমণ না চালিয়ে বরং বসা থেকেই এক লাফে উঠে গেল শূণ্যে। ওপরে ঝুলতে থাকা খিলের একটা ধরে শূণ্যে ঝুলে পড়লো ও। তারপর ওপর থেকে এক পা নামিয়ে আনলো ওঝার কাঁধের ওপরে। ওঝার কাঁধের হাড় ভাঙার শব্দ পরিষ্কার শুনতে পেল ও। সেইসাথে দেখতে পেল ওঝার শরীরের বাম পাশটা ঝুলে পড়লো, ডান হাতে এখনো লাঠিটা ধরা।

শামান এবার একপাশে সরে গিয়ে বাম দিক থেকে আক্রমণ চালালো। কোনরকম চালাকির ধারেকাছে না গিয়ে চতুর লোকটার বুকের ভেতরে বসিয়ে দিলো নিজের ছুরিটা তারপর লাফিয়ে সরে এলে একপাশে। ছুরিটা ঢুকে যেতেই সে ঢুলে পড়লো মাটিতে, একটু আগে শামান যেভাবে হাঁটু গেড়ে বসে ছিল সেভাবে হাঁটু গেড়ে বসে সে মুখ তুলে তাকাল ওর দিকে। ঠোঁটের কোণ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়লো। "যোদ্ধা, তুমি জানো না, কতো বড় বোকামি করছো," বলেই সে কেশে উঠলো। আরো রক্ত গুড়িয়ে পড়লো মুখ থেকে। মাটিতে ঢলে পড়লো ওঝা।

লোকটাকে পড়ে যেতে দেখে ও ফিরে তাকাল ডুকপা লামার দিকে। এখনো তাকে দুই পাশ থেকে ধরে আছে দুই উরগ সৈন্য। তিনজনেই এতোক্ষণ তন্ময় হয়ে দেখছিল ওঝা আর শামানের যুদ্ধ। ও ফিরে তাকাতেই একজন হাত তুলতে গেল কিন্তু তার আগেই লাফ দিলো শামান। ওঝার বুক থেকে বের করে নেয়া ছুরিটা লোকটার দিকে ছুঁড়ে মারলো। লোকটা ঘায়েল হয়ে যেতেই দ্রুত নড়ে উঠলো দ্বিতীয় জন, সে হাতের তলোয়ারটা ডুকপা লামার দিকে তুলতে যাবে তার আগেই একটা তীর এসে বিঁধলো তার কপালে। ছিটকে পড়ে গেল সে। শামান ফিরে দেখলো ঘোষিত, তার হাত থেকে নামিয়ে নিচ্ছে ধনুকটা। একবার ওর দিকে হাত নেড়ে ও এগিয়ে ধরে ফেললো ডুকপা লামাকে।

বয়স্ক মানুষটা কাঁত হয়ে বসে পড়লো মাটিতে। শামান গিয়ে আস্তে ক'রে বসিয়ে দিলো তাকে। ডুকপা লামা স্রোতরে মতো ঘামছেন। "শামান, তুমি..." কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো সে, তার আগেই সে হঠাৎ কেঁপে উঠলো। শামান দেখলো ছোট্ট সজারুর কাঁটার মতো চিকন ফলা বেরিয়ে আছে ডুকপা লামার বুকের একপাশ থেকে। চট করে ফিরে দেখলো ওঝা আবারো উঠে বসেছে, তার হাতে ধরা সেই লাঠিটা। শামান ফিরে তাকাতেই দেখলো একটা তীর গিয়ে বিঁধলো ওঝার বুকে। ঘোষিতের কাজ। কিন্তু ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে।

ডুকপা লামার দিকে ফিরে চিৎকার করে উঠলো শামান। "না..." প্রাণপনে চেঁচিয়ে উঠলো ও। ডুকপা লামার মুখ পান্ডুর হয়ে গেছে। একটা আঙ্গুল তুলে সে শামানকে শান্ত থাকতে বললো। "শামান," খুবই শান্ত স্বরে ডেকে উঠে চুপচাপ কথা বলে গেল সে কিছুক্ষণ। ধীরে-ধীরে তার গলা জড়িয়ে আসতে লাগলো। কথা শেষ হতে হতেই চুপ হয়ে গেল মানুষটা। ছোটবেলার পর এই প্রথমবারের মতো ডুঁকড়ে কেঁদে উঠলো শামান। পৃথিবীতে ওর একমাত্র আপনজনটাও বিদায় নিলো। যাকে বাঁচাতে এসেছিল ও, পারেনি তাকে ফিরিয়ে নিতে। পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে ও। প্রিয়জন হারানোর বেদনা আর পরাজয়ের গ্লানিতে কেঁপে-কেঁপে কাঁদতে লাগলো ও।

অধ্যায় একান্ন

বর্তমান সময়,

সুরমা নদীর ওপরে, সিলেট

ট্রেনিং আর অভিজ্ঞতা দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস।

প্রথমটা মানুষকে যেকোন কাজের উপায় বলে দেয়, আর দ্বিতীয়টা করে তোলে দক্ষ। তানভীরের ট্রেনিং যতোই আন্তর্জাতিক মানের হোক না কেন বিপজ্জনক মিশনে শত্রুর মোকাবেলা করার অভিজ্ঞতা জালালের অনেক বেশি।

শেখারভদের দল আর ওদের মাঝে আচমকা সুলতান এসে পড়তেই সবার প্রথমে সে-ই সচেতন হয়ে উঠলো। "সুলতান নিচু হও," বলেই সে বের করে আনলো নিজের পিস্তল, ওটা বেরিয়ে আসার সাথে সাথে সে গুলি করলো শেখারভদের উদ্দেশ্যে।

লঞ্চের কোনায় ঠিক যেখানে অবস্থান করছিল শেখারভসহ দলের বাকিরা সেদিকে গুলি করতেই ওরা এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু ওদের কাউকে উদ্দেশ্য করে জালাল গুলি ছোড়েনি, সে গুলি করেছিল দেয়ালে ঝোলানো বড় একটা ফায়ার এক্সটিংগুইশারকে উদ্দেশ্য করে। যদিও সে গুলি করেছিল ওটার মাঝ বরাবর কিন্তু গুলিটা মাঝ বরাবর না লেগে গিয়ে লাগলো এক্সটিংগুইশারের মুখে আটকানো পাম্পারের মতো জিনিসটাতে। প্রায় সাথে সাথে ওটা বিস্ফোরিত হয়ে ধোঁয়ার মতো গ্যাস ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো, আর হঠাৎ ফোলানো বেলুনের মুখ খুলে দিলে যেভাবে ওটা শূণ্যে ছুটতে শুরু করে, ঠিক ওমনি এক্সটিংগুইশারটা বাতাসে বেলুনের মতো বিক্ষিপ্তভাবে ছুটতে শুরু করলো।

এক্সটিংগুইশারটা প্রথমে দেয়ালের হুক থেকে ছুটে গিয়ে সোজা নেমে এলো মাটির দিকে, তারপর মাটিতে একটা ড্রপ খেয়ে ওটা ছুটে গেল শেখারভদের দিকে। কিন্তু তারা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ওখানে ছিল শুধু কাঠের বাক্সটা বহন করতে থাকা লোক দুজন। এক্সটিংগুইশারটা মাটিতে ড্রপ খেয়ে ছুটে গিয়ে বাড়ি খেল কাঠের বাক্সটা বহন করতে থাকা একজনের পায়ে। লোকটা দাঁড়ানো অবস্থা থেকে ধাম করে মাটিতে পড়ে যেতেই অন্য লোকটাও ভারসাম্য রাখতে না পেরে বাক্সটা নিয়ে পড়ে গেল।

অন্যদিকে জালাল চিৎকার করা মাত্রই সুলতান মাটিতে শুয়ে পড়ে এক গড়ান দিয়ে সরে গেছে একদিকে। সামান্য উঁচু হয়েই আবারো পিস্তল তুললো শত্রুদের দিকে। রূপালি চুলের লোকটাকে এক ঝলক দেখতে পেয়ে তার দিকেই পিস্তল তুললো ও, কিন্তু লোকটা তার চেয়ে অনেক বেশি ফাস্ট। লোকটা সামনে থাকায় চায়নিজ মতো লোকটাকে সরিয়ে নেয়ার জন্যে ধরেছিল, কিন্তু সুলতানকে পিস্তল তুলতে দেখে সে সোজা গুলি করলো

সুলতানের দিকে। গুলিটা সুলতান আর শেখারভের মাঝখানে সেই প্যাঁচানো সিঁড়িতে লেগে ছিটকে গেল অন্যদিকে।

সুলতান দুটো গুলি করলেও একটাও লাগাতে পারলো না জায়গামতো। শেখারভের সাথের লোকগুলো গুলি করতেই আড়াল নিলো ও ডেকের ওপরে রাখা একটা বড় জেনারেটরের আড়ালে। কিন্তু ওটাই কাল হলো ওর জন্যে। অন্য কোন আড়াল না পেয়ে ঝোঁকের বসে জেনারেটরের আড়ালে শুয়ে পড়তেই ওটার ওপরে একের পর এক গুলি এসে লাগলো, সেইসাথে সমানে স্পার্ক করতে লাগলো জেনারেটরের এখানে ওখানে। একদিকে সমানে গুলি এসে লাগছে, তাই নড়ার উপায় নেই, অন্যদিকে জেনারেটর দেখে মনে হচ্ছে যেকোন এটাতে আগুন ধরে যেতে পারে। তীব্র আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো সুলতান, “কমান্ডার।”

গোলাগুলি শুরু হতেই তানভীর ডেকের ওপরে রাখা কয়েকটা বালির বস্তার মতো জিনিসের আড়ালে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। লঞ্চের ভারসাম্য ঠিক করার জন্যে দড়ি দিয়ে বেঁধে ভেজা বালির বস্তাগুলো ঝুলিয়ে দেয়া হয় একদিকে। বস্তাগুলো সম্ভবত ওখানে রাখা হয়েছে এই কাজের জন্যেই। গোলাগুলি শুরু হতেই তানভীর দেখতে পেলো আড়াল নেয়ার জন্যে এরচেয়ে ভালো জায়গা এই মুহূর্তে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই সাথে সাথে একটা ডাইভ দিয়ে লাফিয়ে ওটার আড়ালে চলে আসে তানভীর। কিন্তু প্রথমে যেটা খেয়াল করেনি সেটা হলো বস্তাগুলো পরিমাণে অনেক কম তাই এগুলো রাখার স্তপের উচ্চতাও অনেক কম। তাই নিজের শরীরকে পুরোপুরি ওটার আড়ালে লুকিয়ে রাখা অত্যন্ত কঠিন হবে।

তবে এক অর্থে ও ভাগ্যবান। কারণ গুলি শুরু হলেও আর ও যেখানে লুকিয়ে আছে সেই জায়গাটা মোটামুটি ডেকের শেষ প্রান্তে হওয়াতে ওর দিকে নজর দেয়নি তেমন কেউ। বরং ও বস্তার আড়ালে লাফিয়ে পড়েই অন্যদিকে চোখ তুলে দেখতে পেল রূপালি চুলের শেখারভ টেড চ্যাঙকে টেনে অন্যদিকে নিয়ে যাচ্ছে ও। ঠিকমতো পরিস্থিতি বুঝে ওঠার আগেই দুই পক্ষ থেকেই গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। সাথে সাথে মাথা নামিয়ে ফেললো তানভীর।

তিনটে ব্যাপার মাথার ভেতরে পাক দিয়ে উঠছে ওর। প্রথমত, নিজের দলের মানুষ দুজনার নিরাপত্তা। কারণ ও দেখেছে জালাল আর সুলতান দুজনার কেউই ভালোভাবে আড়াল নিতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, শেখারভেকে ও দেখেছে টেড চ্যাঙকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে জাহজের এপাশে, সম্ভবত ওখানে নৌকাটা এখনো বাধা আছে, কাজেই পরিষ্কার বোঝা যায় ওরা পালানোর চেষ্টা করবে নৌকো নিয়ে, পালিয়ে কতোদূরে যেতে পারবে সেটা প্রশ্ন নয়, কিন্তু পালানোর চেষ্টা করবে। তৃতীয়ত, গোলাগুলি শুরু হতেই জাহাজের অন্য অংশ থেকে ভেসে আসছে আতঙ্কিত লোকজনের কণ্ঠস্বর, যদিও এখনো কেউই এদিকে অসেনি, কিন্তু কৌতুহলবশত লোকজন এখানে কী হচ্ছে দেখার জন্যে অবশ্যই আসবে। সেক্ষেত্রে ক্রশ ফায়ারের ভেতরে পড়লেই অকারণে বৃথা প্রাণতো যাবেই জেড মাস্টারের

লোকেরা নিরীহ মানুষদেরকে জিম্মী করতে পারলে ওরাই বিপদে পড়বে। তার মানে যা করার এক্ষুণি করতে হবে।

তানভীর মাথা তুলে জালালকে কিছু একটা বলতে যাবে তার আগেই অন্যদিকে থেকে ভেসে এলো সুলতানের তীব্র চিৎকার। তানভীর দেখলো সুলতান একটা জেনারেটরের আড়ালে বসে আছে, গুলি লেগে সমানে স্পার্ক করছে জেনারেটর। মনে-মনে আঁতকে উঠলো ও, একবার ফুয়েল লিক হলেই আগুন ধরে যাবে ওটাতে। জীবনে এমন অসহায় খুব কমই বোধ করেছে ও। "জালাল ভাই," চিৎকার করে উঠলো ও। জবাবে জালাল কিছু বলার আগেই কয়েক রাউন্ড গুলির শব্দ ভেসে এলো।

"তানভীর," জালালের চিৎকার শুনে বস্তাগুলোর ফাঁক দিয়ে মুহূর্তের জন্যে তাকে দেখতে পেল ও। কিন্তু সে কী বলছে বোঝার আগেই একটা ঘসটানোর শব্দে অন্যদিকে ফিরে তাকাল। বাক্সটা টেনে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে। তারমানে শেখারভ, আর তার বস জেড মাস্টার বাক্সটা নিয়ে কেটে পড়তে চাইছে। ওরা বাক্সটা সরানোর চেষ্টা করছে, তারমানে এখুনি সময়। যদিও গুলি ভেসে আসছে ও জালালের দিকে ফিরে ইশারা করে তিনটে আঙ্গুল দেখালো। জালালও মাথা নেড়ে সায় দিতেই দ্রুতবেগে একটা একটা করে আঙ্গুল নামিয়ে আনলে শেষ আঙ্গুলটা নামাতেই দুজনে একসাথে আড়ালের পেছন থেকে হাত উঁচু করে গুলি করতে শুরু করলো। একইসাথে জালাল চিৎকার করে সুলতানকে জেনারেটরের আড়াল থেকে সরে আসার জন্যে নির্দেশ দিলো।

সুলতান এক গড়ান দিয়ে জেনারেটরের আড়াল থেকে সরে এসে জালাল যে ডেক চেয়ারটার আড়ালে লুকিয়ে আছে সেটার আড়ালে চলে এসে পাগলের মতো হাঁপাতে লাগলো। কিন্তু জালাল আর সুলতান দুজনেই স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়ার আগেই তানভীরের নির্দেশ ভেসে এলো ওকে কভার করার জন্যে।

"কমান্ডার, ব্যাপারটা, অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে," সুলতান একবার অন্যপাশে দেখে নিয়ে বলে উঠলো।

"সময় নেই," তানভীরের গলা ভেসে এলো। "এখন কিছু করতে না পারলে আর হবে না, ওরা পালাবে, আর নিরীহ লোকজন এসে পড়বে যেকোন সময়। আমি তিন গুনতেই তুমি আর সুলতান একসাথে গুলি করতে শুরু করবে," বলেই সে ওদেরকে কোন সুযোগ না দিয়ে গুনতে শুরু করে দিলো, "তিন, দুই এক," তানভীরের গোনা শেষ হতেই সুলতান আর জালালের পিস্তলে নরক নেমে এলো। জালাল ডেক চেয়ারটার আড়াল থেকে মাথা তুলে গুলি করতে লাগলো আর সুলতান চেয়ারের এক পাশে ঝুঁকে দুই পিস্তল থেকেই গুলি উগড়ে দিতে শুরু করলো লোকগুলোর দিকে।

"সাবধান, তানভীরের গায়ে যেন না লাগে," গুলি করতে করতেই সুলতানকে সাবধান করে দিলো জালাল। মাথা নেড়ে সায় জানালো সুলতান।

ওরা দুজনে গুলি শুরু করার আগেই কাউন্টডাউন করার সময়েই নিজের ডেজার্ট ঈগল বের করে এনেছিল তানভীর। জালাল আর সুলতান গুলি শুরু করতেই আড়াল থেকে একটা ডাইভ দিয়ে বেরিয়ে এলো ও পিস্তল হাতে। জালালরা যেদিক থেকে গুলি করছে ও সম্পূর্ণ অন্যদিকে বেরিয়ে এসেছে। বেরিয়ে এসেই সেকেন্ডেরও কম সময়ের ভেতরে পরিস্থিতি যাচাই করে নিলো ও। শেখারভ কিংবা চ্যাঙের ছায়াও দেখা যাচ্ছে না।

তবে অন্য লোকগুলোর ভেতরে একজন পা ভেঙে পড়ে আছে অন্য একজন বাক্সটা টেনে সরিয়ে ফেলছে। আর দুজন গুলি করছে আড়াল থেকে। তানভীর আরেকটা ডাইভ দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গেল, তারপর জালাল আর সুলতানের সম্ভাব্য গুলির লাইন এড়িয়ে লাফ দিলো। বেশ খানিকটা এগিয়ে এসে একেবারে জাহাজের কোনার দিকে গড়িয়ে এলো ও। মাটিতে নামার সাথে-সাথেই পিস্তল তুলে গুলি করলো সামনের দিকে। বাক্স টানতে থাকা লোকটা পড়ে গেল। শেখারভদের বাকি দুই সঙ্গীর একজন গুলি করছিল জালালদের দিকে সে পিস্তল ঘুরিয়ে তানভীরের দিকে আনার আগেই তার মাথা বিস্ফোরিত হলো ফাটা তরমুজের মতো।

সঙ্গীর বিস্ফোরিত মস্তকের গলে যাওয়া মগজের ছিটে মুখে লাগতেই অন্যজন আধ বসা অবস্থা থেকে পড়ে গেল মাটিতে, তানভীরকে এগিয়ে আসতে দেখে উল্টো ঘুরে দৌড় দিলো প্যাসেজটা ধরে। তানভীর পিস্তল তুললেও দ্বিধায় পড়ে গেল এভাবে পালাতে থাকা মানুষটার পিঠে গুলি করবে কিনা, কিন্তু ওকে যাতনার হাত থেকে মুক্তি দিয়ে জলতে লাফিয়ে পড়লো মানুষটা। সরু প্যাসেজটা ধরে এগিয়ে যেতেই কেউ যেন ভোতা একটা শাবলের এক প্রান্ত সর্বশক্তিতে বসিয়ে দিলো ওর পেটে, আঘাতেই তীব্রতা সহ্য করে ওঠার আগেই একই পরিমাণ শক্তির সাথে আরেকটা আঘাত এসে লাগলো ওর বুকের ডানপাশে ফুসফুসের ওপরে।

তীব্র ধাক্কার চোটে প্রায় উড়ে গিয়ে ধাক্কা খেল ও লঞ্চের কাঠের দেয়ালের সাথে। মাথাটা ডুগডুগির মতো বাড়ি খেল কাঠের সাথে। ধপ করে সরাসরি ডেকের ওপরে বসে পড়লো ও। হাত থেকে ছুটে গেছে ডেজার্ট ঈগল। ফুসফুসের ওপরে বুলেটপ্রুফ ভেস্টে গুলি লাগলেও আঘাতের চোটে প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসছে, নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে মনে হচ্ছে যেন গলা দিয়ে আগুন টানছে। চোখেও ঝাপসা দেখছে খানিকটা। কিন্তু এটা দেখতে পেল দানব আকৃতির লোকটা এগিয়ে আসতে-আসতে আবারো পিস্তল তুলেছে ওর দিকে। এবার আর বুলেট প্রুফ জ্যাকেট বাঁচাতে পারবে না, বরং কপালে একটা গুলি করে দিলেই শেষ হবে খেলা।

পাগলের মতো পিস্তলটা ধরার জন্যে হাত বাড়ালো ও, প্রায় পৌছে গেছে ওর হাতটা দুলে উঠলো লঞ্চের একপাশ। পিস্তলটা সরে গেল আরো খানিকটা, তানভীরও বসা থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল, ফিরে তাকিয়ে দেখলো শেখারভও দাঁড়ানো অবস্থা থেকে পড়ে গেছে। তানভীর পিস্তলটা ধরার জন্যে শোয়া থেকে বাউলি কেটে এগিয়ে গেল বেশ অনেকটা, হাতে চলে এসেছে পিস্তলটা।

ওটা হাতে নিয়ে ঘুরে বসেই দেখলো শেখারভও পিস্তল তুলেছে ওর দিকে। দুজনেই গুলি করলো কিন্তু তার আগেই আবারো দুলে উঠলো লঞ্চ, প্রায় সাথে সাথেই ভট-ভট শব্দের সাথে নৌকাটা সরে যেতে লাগলো। শেখারভের গুলি তানভীরের পেছন দিকে গিয়ে লাগলো সেই জেনারেটরটার ওপরে, আর তানভীরের গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে লাগলো শেখারভের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা টেড চ্যাঙের গায়ে। শেখারভকে সামনে এগিয়ে দিয়ে পেছনে রেলিঙে হেলান দিয়ে সব লক্ষ্য করছিল জেড মাস্টার, গুলি খেয়ে খানিকটা পিছিয়ে গেল সে। তারপর টুপ করে পড়ে গেল জলতে। সেদিকে আড়চোখে দেখে নিয়ে শেখারভের দিকে পিস্তল তাক করলো তানভীর, কিন্তু গুলি করার আগেই জেনারেটর বিস্ফোরণের তীব্র ধাক্কায় ছিটকে গিয়ে পড়লো শেখারভের গায়ের ওপরে।

দুজনেই গড়িয়ে পড়ে গেল ডেকের ওপরে। যদিও একের পর এক আঘাতে আহত তবুও শেখারভের ওপরে পড়ার সাথে সাথেই তার ডান হাতের নার্ভ পয়েন্টে একটা ছোট কারাতে চপ মারতেই পিস্তলটা পড়ে গেল লোকটার হাত থেকে। লোকটাকে কোন সুযোগ না দিয়ে সাথে-সাথে তার মাথা-কাঁধ আর হাত মোচড় দিয়ে স্প্যানিশ কুস্তির কায়দায় চেপে ধরলো তানভীর। মাটিতে শোয়া অবস্থায় হ্যান্ড টু হ্যান্ড কমব্যাটে এই বিশেষ হেড-লকটা খুবই কাজের জিনিস। শেখারভকে আটকে দিয়ে খুশি হয়ে উঠতে যাচ্ছিলো তানভীর কিন্তু সকালের মতো সেই তীব্র আতঙ্কের সাথে অনুভব করলো শূণ্যে উঠে যাচ্ছে সে। অবিশ্বাস্য শারীরিক শক্তির বলে শোল্ডার লক অবস্থায় থাকার পরেও শেখারভ ওকে শূণ্যে তুলে ফেলছে।

খানিকটা উঠে বসেই শরীরটাকে সে ছেড়ে দিলো নিচের দিকে। ফলে তার শরীরের অর্ধেক নিচে অবস্থান করা তানভীর একদিকে বাড়ি খেল ফ্লোরে, অন্যদিকে শেখারভের ভারি শরীরের চাপে দম বন্ধ হয়ে এলো ওর। তবে এখানেই শেষ নয় অধিক আতঙ্কের সাথে ও অনুভব করলো শেখারভ নিজেকে ছাড়িয়ে তো নিয়েছেই সেইসাথে নিজের মোটা মোটা আঙ্গুলগুলো দিয়ে চেপে ধরেছে ওর মাথার দুই পাশ। একবার সুযোগ পেলে এই লোক স্রেফ চেপেই মেরে ফেলবে ওকে। টেকনিকসহ সব ভুলে গিয়ে নিজের দুই হাত আলগা করে ফেললো তানভীর, পায়ে গুঁজে রাখা ছুরিটা এক হাতে বের করে এনে সেটা বসিয়ে দিলো শেখারভের গলায়। কিন্তু ছুরিটা গলায় না লেগে ওটা বসে গেল লোকটার কাঁধের ওপরে।

সাথে সাথে ওকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে খানকিটা পিছিয়ে গেল তানভীর, শরীরটাকে সোজা করে খানিকটা ঝুঁকে দাঁড়ালো। শেখারভও এক হাতে কাঁধ থেকে ছুরিটা বের করে ছুঁড়ে ফেলে দিলো ডেকে, তারপর সোজা ঝাঁপিয়ে পড়লো তানভীরের ওপরে।

জায়গাটা খুবই সরু তবুও শেখারভতে সোজা ছুটে আসতে দেখে একপাশে খানিকটা চেপে গেল তানভীর। ছুটে আসা শেখারভকে একপাশে চাপিয়ে দিয়ে নিজের একটা পা তুলে শরীরটাকে অ্যাক্রোবেটিক ভঙ্গিতে খানিকটা শূণ্যে তুলে ফেললো তারপর ডান পা টা নামিয়ে আনলো ছুটন্ত শেখারভের উরু ওপরে। মোটেই এরকম কোন আঘাত আশা

করেনি সে, পুরোপুরি চমকে উঠলো মানুষটা। ছুটে আসার গতি তো কমলোই এক হাঁটু ভেঙে বসে পড়লো সে। তানভীর ফ্রি স্টাইল কিকের ভঙ্গিতে পায়ের ব্লেডটা চালিয়ে দিলো তার গলা বরাবর। এই কিকটাকে বলে 'ব্রুস লি কিক'।

তবে শেখারভের ওপরে পুরোপুরি কাজে লাগলো না কিকটা। কারণ তানভীর লাথিটা মারলেও পা-টাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার সময়ে সে এক হাতে ধরে ফেললো তানভীরকে। পা-টা ধরে শক্ত হাতে টান দিতেই তানভীর ছিটকে চলে এলো শেখারভের ওপরে। তাকে শক্ত হাতে জড়িয়ে ধরে একদিকে ছুটে গেল শেখারভ। দুজনে মিলে গড়িয়ে পড়লো সেই ডেকের কোনায় যেখানে একটু আগে গোলাগুলি হয়েছে।

তানভীর দেখলো পিস্তল হাতে জালাল আর সুলতান দাঁড়িয়ে আছে, কথা বলছে লঞ্চের লোকজনের সাথে- গোলাগুলির শব্দ শুনে ওরা নিশ্চই ছুটে এসেছে কী হয়েছে জানার জন্যে। ওরা দুজনে ছিটকে গিয়ে ওখানে পড়তেই সবাই চমকে উঠলো। জালাল আর সুলতান পিস্তল তুললো কিন্তু জড়াজড়ি অবস্থায় গুলি করার প্রশ্নই আসে না। ডেকের ওপরে পড়তেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো তানভীর, হাতের ইশারায় গুলি করতে মানা করলো ওদেরকে। শেখারভও উঠে দাঁড়িয়েছে, রক্তাক্ত চেহারা বিভৎস দেখাচ্ছে তার।

দুজনে উঠে দাঁড়াতে তানভীরই প্রথম আঘাত করলো এবার। মাটিতে ডাইভ দিয়ে এগিয়ে শেখারভের প্যান্টের বেল্ট চেপে ধরলো একহাতে, অন্য হাতে শরীটাকে ব্যালেন্স করে মটিতে কব্জি ঘুরিয়ে পেছন থেকে টান দিলো তাকে। এটাকে বলে ব্যাক হিপ থ্রো। টান খেয়ে পুরোপুরি উল্টে গিয়ে অনেক পিছিয়ে একপাশে ছিটকে সরে গেল শেখারভ।

তার কাঁধের একপাশের হাড় সরে গিয়ে একটা হাত অকেজো হয়ে ঝুলছে একপাশে, মারামারিতে আর পারবে না বুঝতে পেরে সে অন্য ভালো হাতটা দিয়ে নিজের জুতোর একপাশ থেকে বের করে আনলো ছোট একটা পিস্তল, ওটা তাক করলো তানভীরের দিকে। তবে সে গুলি করার আগেই প্রায় একইসাথে জালাল আর সুলতানের গুলি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে। কপাল আর গলা থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসছে রক্ত।

শেখারভকে গুলি খেতে দেখে ডেকের ওপরে বসে পড়লো তানভীর। শরীরে এক বিন্দু শক্তিও আর অবশিষ্ট নেই। সে প্যাঁচানো সিঁড়ের গায়ে হেলান দিয়ে দম ফিরে পাবার চেষ্টা করতে লাগলো। আশেপাশে লোকজন অনেক কথা বলছে, জালাল সুলতান জানতে চাইছে ও ঠিক আছে কিনা। জবাব না দিয়ে চোখ বন্ধ করে রইলো ও। কোস্ট গার্ড এসেছে কিনা কে জানে তবে ও এটা জানে ব্ল্যাক বুদ্ধা সম্ভবত উদ্ধার হয়েছে, গুলি খেয়ে জলতে পড়ে গেছে টেড চ্যাঙ ওরফে জেড মাস্টার। আর তার সহকারি শেখারভের মৃতদেহ পড়ে আছে চোখের সামনেই।

এখন ওর ছোট্ট একটা কাজ আছে তবে সেটার আগে, একটু নিঃশ্বাস নিতে চায় ও। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আনন্দে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে চায়। বেঁচে থাকার আনন্দ।

অধ্যায় বায়ান্ন

সময়: ১৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ

বিধোরী দুর্গ, কন্নোর, ভারতবর্ষ

জলগুহার একদিকে যখন শামান ডুকপা লামাকে উদ্ধার করতে ব্যস্ত, অন্যদিকে তখন চলছে ভিন্ন নাটক।

শঙ্করাদিত্য দেখলো রাজা হেমচন্দ্রকে প্রহরীদের দল ঘিরে ধরে দ্রুত তাকে সরিয়ে ফেলছে জলগুহার প্রবেশ পথের দিকে। শঙ্করাদিত্য পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে একবার দেখে নিলো চারপাশ। শামান এগিয়ে চলেছে ডুকপা লামার দিকে, কালন্তি আর ধোয়ী সহ দলের বাকিরা লড়াই করছে উরগ আর লিচ্ছবী সৈন্যদের সাথে। এই সুযোগে একবার যদি রাজা হেমচন্দ্র বাইরে চলে যেতে পারে তবে সব শেষ হয়ে যাবে। শঙ্করাদিত্য ইশারায় কালন্তিসহ আরো দুজনকে বললো তাকে অনুসরণ করতে। তারা পাঁচজনে মিলে সোজা গিয়ে অবস্থান নিলো জলগুহার মুখের কাছে। রাজা হেমচন্দ্রের বাহিনী তাকে নিয়ে জলগুহার মুখের কাছে পৌছাতেই দেখতে পেলো সেখানে আগে থেকেই অবস্থান নিয়ে আছে ওরা। রাজার প্রহরীদের প্রথম আংশটা ঝাঁপিয়ে পড়লো ওদের ওপরে। সংখ্যায় বেশি হওয়াতে তারা সহজেই একপাশে সরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে নিয়ে গেল রাজা হেমচন্দ্রকে নিয়ে।

নিজের ওপরে এসে পড়া এক সৈনিককে শেষ করে দিয়ে তাকে সরিয়ে রাগের সাথে কালন্তির দিকে ফিরে ইশারা করলো শঙ্কর। কিন্তু কালন্তি আরেকজনের সাথে যুদ্ধে ব্যস্ত। শঙ্করাদিত্য দুই সৈনিকের সাথে লড়াই করতে করতে বেরিয়ে এলো জলগুহা দিয়ে। বাইরে এসে সে ভেবেছিল দেখতে পাবে জলগুহা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে রাজা হেমচন্দ্রের বাহিনী কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখলো সেখানে ঘটছে আরেক কান্ড। রাজা হেমচন্দ্রের বাহিনী জলগুহা থেকে বেরুতেই রাজা বিক্রম আর বিধুদের দলের সামনে পড়ে গেছে।

রাজাবিক্রমের দল একপাশ থেকে বিক্রমের সাথে আক্রমণ চালালো হেমচন্দ্রের বাহিনীর ওপরে, অন্যদিকে পেছন থেকে শঙ্করাদিত্য আর কালন্তিদের দলের আক্রমণে দুই দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে কিছুক্ষণের ভেতরেই রাজা হেমচন্দ্র দলের বাকিদের সাথে আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে বন্দি হলো রাজা বিক্রমের হাতে।

শঙ্করাদিত্য তাকে চেপে ধরে নিয়ে এলো রাজা বিক্রমের সামনে। "এখনো পুরা বিধোরী আমার লোকজনে ভরা। তোমরা..."

রাজা হেমচন্দ্রের মুখের ওপরে হেসে উঠলো বিধু। “বন্দি হইয়াও তেজ কমে না,” বলে সে জাথুরিয়ার দিকে ফিরে সামান্য মাথা নোয়লো। একটু এগিয়ে এসে রাজা হেমচন্দ্রের হাত থেকে শামানের তলোয়ারটা নিয়ে নিলো জাথুরিয়া। ওটাকে ধরিয়ে দিলো রাজা বিক্রমের হাতে।

“হেমচন্দ্র, কন্নরের রাজা হিসেবে এই এলাকাতে অনুপ্রবেশ ও সকল হত্যাকান্ডের জনে দায়ি করে আমি তোমার মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করছি,” রাজা বিক্রম শামানের কাতানাটা তুলে কোপ মারলো রাজা হেমচন্দ্রের গর্দানে। কালন্তি বাঁধা দেয়ার জন্যে এগিয়ে এসেছিল কিন্তু ওরা সবাই থেমে গেল গুহার ভেতর থেকে ভেসে আসা আর্তনাদের শব্দে।

“ওস্তাদের গলা না?” বলে বিধু একবার কালন্তিকে দেখে আরেকবার জাথুরিয়ার দিকে ফিরে দৌড় দিলো জলগুহার দিকে।

ভেতরে প্রবেশ করে দেখতে পেল ভেতরে ছোটছোট খন্ডযুদ্ধগুলো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শামান ডুকপা লামার মৃতদেহ কোলে নিয়ে বসে আছে। স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইলো সে। শামান ডুকপা লামার মুতদেহ বুকে জড়িয়ে বসেই আছে। বিধুর পাশে এসে দাঁড়ালো রাজা বিক্রম, কালন্তি, শঙ্করাদিত্য, জাথুরিয়া আর ঘোষিত।

“এমনটা তো হবার কথা ছিল না,” রাজা বিক্রম বেশ শান্ত স্বরে বলে উঠলো। তার দুই হাতে দুটো কাতানা। একটা সে পেয়েছিল হেমচন্দ্রের হাত থেকে, অন্যটা জলগুহার প্রবেশ পথের কাছে কুড়িয়ে পেয়েছে। দুই কাতানার একটা দিয়ে অন্যটার মাথায় বাড়ি মারতেই আগুনের ফুলকি উঠলো। নিজের লোকদের দিকে, বিশেষ করে শঙ্করাদিত্যের দিকে ইশারা করে সে এগিয়ে যেতে লাগলো শামানের দিকে।

ডুকপা লামার মৃতদেহ বুকে জড়িয়ে ধরে একটা হাত তুলে থামতে বললো তাকে। ডুকপা লামাকে সম্মানের সাথে মাটিতে শুয়িয়ে দিয়ে সোজা ফিরে তাকাল রাজা বিক্রমের দিকে। “এমনটা হবার কথা ছিল না, তাইনা?” বলে সে দুই পা এগিয় এলো রাজা বিক্রমের দিকে। “কিন্তু আসলে এমনটাই তো হবার কথা ছিল, তাইনা?” রাজা বিক্রমের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

রাজা বিক্রম মুহূর্তের জন্যে হতবিহ্বল ভাব ধরতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলো। হেসে উঠলো শামানের দিকে তাকিয়ে। “ওই বুড়োটা,” সে মাটিতে থাকা ডুকপা লামার মৃতদেহটা দেখালে। “মরার আগে সব বলে গেছে তোমাকে তাইনা?” কথাটা বলে সে হাতের কাতানা তুলতেই সক্রিয় হয়ে উঠলো তার লোকেরা। রাজা বিক্রম ইশারা করতেই তারা ঘিরে ধরলো বিধু, ঘোষিত, জাথুরিয়া আর কালন্তিকে। শঙ্করাদিত্য একেবারে অসতর্ক অবস্থায় পেছন থেকে নিজের তলোয়ার চেপে ধরলো কালন্তির ঘাড়ে।

শামান এগোতে গিয়েও থেমে গেল। কারণ এখন ও এগোলেই ওর লোকদের ক্ষতি করা হবে। কিন্তু রাজা বিক্রম থামলো না। সে এগিয়ে এসে শামানের কাতানাটাই ওর বুকে

ঠেকালো, যেটা সে হেমচন্দের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। এটা দিয়ে হেমচন্দ্রের মস্তক ছিন্ন করেছে। "ঠিক ধরেছো যোদ্ধা, তুমি বুদ্ধিমান। তুমি এখন এগোনোর চেষ্টা করলেই মেরে ফেলা হবে তোমার লোকদের। বুকে ঠেকানো কাতানাটা দিয়ে চাপ দিয়ে শামানকে মাটিতে বসিয়ে দিলো সে।

"শুরু থেকেই পুরো ব্যাপারটার পেছনে আসলে তুমিই ছিলে, তাইনা?" শামান জানতে চাইলো।

"মৃত্যুগামী মানুষের শেষ ইচ্ছে যদি এটাই হয়, তবে সত্যিই বলবো। আমিই ছিলাম এসব শুরুর পেছনে," বলে সে বাকিদের দিকে দেখে নিয়ে শামানের দিকে ফিরলো একবার। "তবে সব কিছুই শুরুর পেছনে দায়ি এই ধাতু," বলে সে শমানের জোড়া কাতানা দিয়ে আবারো আরেকদফা আগুনে ফুলকি ছোটালো। "আর ওই মুর্তি," বলে সে বাক্সটা দেখালো।

"মৌর্য রাজা বৃহদ্রথকে হত্যা করে শুঙ্গ সেনাপতি পুশ্যমিত্র যখন ভারতবর্ষ দখল করে নিলো তখনই আমি জানতাম যতোই পরে হোক শুঙ্গরা নিজেদের থাবা এই কন্নোর পর্যন্ত বিস্তার করবেই। কাজেই আগে থেকেই আমি ভাবছিলাম কিছু একটা করবো যাতে শুঙ্গদের সাথে একটা মিত্রতে আসা যায়। এমন সময় আমার উপদেষ্টা আমাকে জানায় পৃথিবীতে বিলুপ্তপ্রায় এক ধাতু আছে যেটা দ্বারা নির্মিত কিছু অস্ত্র আছে তিব্বতের শান্তির মঠে, আর সেটার কিছ্টা অংশ আছে উরগদের কাছে। আর তাই আমিই সিদ্ধান্ত নেই পুরনো শত্রু লিচ্ছবী আর উরগদের সাথে মিলে বুদ্ধের অন্ধকারের অবতারের কাহিনীটাকে ফিরিয়ে আনবো। আর সেটা ভেট হিসেবে পাঠাবো শুঙ্গ রাজাকে," এই পর্যন্ত বলে সে ফিরে তাকাল কালন্তির দিকে। "সেইসাথে বৌদ্ধ থারু জাতির প্রত্যেকের কর্তিক মস্তক উপহার দেবো এই অন্ধকারের অবতারের সাথে।"

"কিন্তু ঘটে উল্টোটা। ঠিক?" শামান বলে উঠলো।

"হ্যাঁ, আমি সব ঠিক করার আগেই লিচ্ছবী আর উরগরা মিলে শুঙ্গদের সাথে চুক্তি করে আমাকেই উৎখাত করে দেয়। আর কপালের এমন ফের যে-থারুদের সবাইকে খুন করার কথা ছিল সেই থারুদেরই আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় আমার লোকদের।"

"খুনি," হিস-হিস করে বলে উঠলো কালন্তি। "এ-কারণেই আমি বাবাকে বলেছিলাম তোদেরকে আশ্রয় দিয়ে সাহায্য না কওে, সব ক'টাকে ধরে গাছের সাথে ঝুলিয়ে দিতে। তোরা এখনো মরবি। মরার আগে হেমচন্দ্র ভুল বলেনি। বিধোরী এখনো লিচ্ছবী সৈন্যে ভরা। ওরা তোদেরকে কুচকাটা করবে।"

"কিছুই করতে পারবে না," বলে রাজা বিক্রম হেসে উঠলো। "কারণ জলগুহায় ঢোকার পথ আমরা বন্ধ করে দিয়ে এসেছি। সেইসাথে দুর্গের বন্দিশালা খুলে বের করে দেয়া হয়েছে সব শাক্য সৈন্যদেরকে ওরা এতোক্ষণে অবশিষ্ট লিচ্ছবী সৈন্যদেরকে কচুকাটা

করছে। আর একটা ব্যাপার তোমাদেরকে জানাই, এখানে আসার আগে শুঙ্গদের সাথে আমার পুরনো চুক্তি ফেরত হয়েছে। আমার রাজ্যের একটা অংশ থারুদের কর্তিত মস্তক, আর বুদ্ধের অন্ধকারের অবতারের বিনিময়ে ওরা আবার আমাকে সাহায্য করবে কারণ লিচ্ছবী আর উরগদের সাথে ওদের বনছিল না। কাজেই-" বলে সে কাতানা তুলে শামানের গলায় ঠেকালো। "এবার বিদায় বেলা, যোদ্ধা। তুমি না থাকলে এসবের কিছুই হত না," রাজা বিক্রম বলতেই শামান তাকে থামিয়ে দিলো।

"একটা কথা যে বুদ্ধের অন্ধকারের অবতারের জন্যে এতো কিছু আমি সেটা একবার দেখতে চাই," শামান তাকিয়ে আছে রাজা বিক্রমের চোখের দিকে।

রাজা বিক্রম একবার শামানকে দেখে নিয়ে আরেকবার ফিরে তাকাল শঙ্করাদিত্যের দিকে। শঙ্করাদিত্য মানা করছে। কিন্তু সেটা না শুনে সে ফিরে তাকাল শামানের দিকে। "ঠিক আছে," বলে সে নিজের লোকদের দিকে ফিরে ইশারা করলো বাক্সটাকে নিয়ে আসার। কয়েকজন শাক্য সৈন্য মিলে বাক্সটা এনে রাখলো ওদের মাঝেখানে। বাক্সটার ডালা তুলে ভেতর থেকে খড় সরাতে শুরু করলো দুজনে। সবাই কৌতুহলি দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বিধু হঠাৎ প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলো। সবাই তার দিকে ফিরে তাকানোর আগেই তাকে ধরে রাখা সৈন্যের থেকে নিজের হাত ছুটিয়ে দৌড় দিলো শামানের দিকে। রাজা বিক্রম সহ সবাই তাকিয়েছিল কাঠের বাক্সটার দিকে, হঠাৎ বিধু নড়ে ওঠাতে কেউ কিছু করে ওঠার আগেই নিজের ভারি শরীরটা নিয়ে দৌড়ে এগোল সে শামানের দিকে।

প্রায় ওদের কাছে পৌছে গেছে রাজা বিক্রম কাতানা তুললো তাকে উদ্দেশ্য করে কিন্তু সেটা নামিয়ে আনার আগেই দৌড়াতে দৌড়াতে এক ঝটকায় তাকে ফেলে দিয়ে শামানের দিকে লাফ দিলো সে।

আধবসা শামানকে জড়িয়ে ধরে ছিটকে পড়লো জলপ্রাপাতের জলতে। কেউ ওদেরকে আটকানোর আগেই জলপ্রপাতের তীব্র জলের স্রোতে ভেসে ওরা সাদা ফেনার সাথে মিশে গিয়ে হাজার ফিট নিচে শূণ্যতার মাঝে ছিটকে পড়লো দুজনেই।

অধ্যায় তিপ্পান্ন

বর্তমান সময়

আম্বরখানা, সিলেট

"তানভীর, তুমি ঠিক আছো?" অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভ করতে থাকা জালাল ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে ঝিমোতে থাকা তানভীরকে উদ্দেশ্য করে জানতে চাইলো। "হুম?" ঝট করে সোজা হয়ে বসে তানভীর। একবার বাইরে দেখলো তারপর জালালের দিকে ফিরে সামান্য মাথা নেড়ে আবারো বাইরে ফিরে তাকাল।

রাত শেষ, তবে ভোরের আলো ফুটতে এখনো বেশ দেরি আছে। ছোটবেলায় তানভীর নানীর মুখে নানা ধরণের কিসসা শোনার সময়ে কখন যেন শুনেছিল দিনের দুটো সময় খুব অশুভ। বিকেল আর সন্ধ্যের সন্ধিক্ষণে একটা সময় থাকে যখন দিনের আলো শেষ হয়ে গিয়ে সন্ধ্যের অন্ধকার ফুটে ওঠে। আরেকটা সময় হলো, ভোরবেলা যখন রাতের আধার শেষ হয়ে গিয়ে সকালের আলো ফুটে ওঠে। এই দুটো সময়ে অন্ধকার নাকি সবচেয়ে গাঢ় হয়, এই দুটো সময়ে পৃথিবীর সব অশুভ শক্তি নাকি একসাথে মুক্তি পায়। তবে এসব কথা কখনোই বিশ্বাস করেনি তানভীর, আজো করে না। বরং এই মুহূর্তে শারীরিকভাবে নিঃশ্বেষিত মনে হলেও মনের কোনে বিস্মিত এক আনন্দ ভর করেছে ওর।

লঞ্চের ডেকে শেখারভের সাথে মারামারির পরে প্রায় তিন ঘন্টার মতো সময় পার হয়েছে। জালাল, সুলতান আর ইকবালের জন্যে সময়টা খুব ব্যস্ততার হলেও তানভীরের জন্যে সময়টা একরকম ফ্রি ছিল। শেখারভ মারা যাবার পর সুলতান আবারো ইকবালের সাথে যোগাযোগ করে কোস্টগার্ডকে একেবারে সঠিক লোকেশন জানাতেই একটু পরেই তারা কয়েকটা স্পিড বোট আর নিজেদের লঞ্চ নিয়ে এসে ওদের লঞ্চটাকে ঘিরে ফেলে।

ওরা নিজেরা প্রাথমিক চিকিৎসা নেয়ার পর যে-কয়জন মারা গেছে তাদের মৃতদেহ উদ্ধার করা সহ জাহাজের সারেঙ ও বাকিদেরেকে গ্রেপ্তার করা হয়। কারা-কারা এই ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল সেটা ওদেরকে জেরা করে বের করা হবে। টেড চ্যাঙের দেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি, সম্ভবত স্রোতের টানে সেটা অন্যদিকে চলে গেছে। তাকে খোঁজার জন্যে লোক লাগানো হয়েছে। তবে ওদিককার ব্যাপারগুলো সামলানোর পর সুলতান আর ইকবালকে কোস্ট গার্ডের সাথে দায়িত্ব দিয়ে জালাল আর তানভীর শেখারভের মৃতদেহ অর ব্ল্যাক বুদ্ধার বাক্সটা নিয়ে তানভীরের নির্দেশে জালাল আর ও যাচ্ছে শাহী ঈদগাহের ল্যাবে।

তানভীরের পরিকল্পনা হলো, শেখারভের মৃতদেহ পুলিশ কিংবা ইএএফের হাতে দেয়ার আগে নিজেরা পরীক্ষা করে দেখতে চায় ওরা। আর সেই সাথে ব্ল্যাক বুদ্ধা রাখা বাক্সটাও খোলেনি কিংবা ওটা উদ্ধার হয়েছে এটাও কাউকে জানায়নি। ওরা তীরে আসার পরে একটা পুলিশ অ্যাম্বুলেন্স খবর দিয়ে সেটাতে মৃতদেহ আর বাক্সটা তুলে নিয়ে জালাল আর ও চলেছে ল্যাবের দিকে।

"শেখারভের দেহ আর ব্ল্যাক বুদ্ধার ব্যাপারে তুমি কাউকে কিছু জানালে না, পুলিশ বাদই দিলাম ইএএফকে তো অন্তত জানানো উচিত ছিল, নাকি?' ড্রাইভ করতে করতে আনমনেই বলে উঠলো জালাল।

"হুম," বলে তানভীর লম্বা হাই ছাড়লো। ওর হাতে একটা চিকন ছুরি- যেটাকে স্টিলেটো বলে। টাইটানিকে মারামারির সময়ে শেখারভ ওটা ডেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। পরে তানভীর খুঁজে বার করে নিয়ে এসেছে। স্টিলেটোটা বাম হাতে নিয়ে ডান হাতের আঙুল দিয়ে ভ্রুর ওপরে কাটা জায়গার ব্যান্ডেজটা আলতো করে পরীক্ষা করে দেখলো তানভীর।

"খবরটা এখুনি চাউর করতে চাচ্ছি না কয়েকটা কারণে। প্রথমত, ওই বাক্সের ভেতরে আদৌ ব্ল্যাক বুদ্ধা আছে কিনা এটা তো আমরা শতভাগ নিশ্চিত নই। তাই আমি আগে ডক্টর মিতায়নকে দিয়ে ওটা পরীক্ষা করাতে চাই, তারপর অথরিটিকে জানাতে চাই। যেহেতু এটা একটা সেনজিটিভ কেস কাজেই ভুল খবর এক্সপোজ না করাই বেটার হবে," বলে তানভীর একটু থেমে যোগ করলো।

"আরেকটা ব্যাপার, জালাল ভাই। তুমি তো জানোই ব্ল্যাক বুদ্ধা একটা অমূল্য জিনিস, আন্তর্জাতিক মার্কেটে এটার দাম কতো হবে কেউই বলতে পারে না। কাজেই এই জিনিসটা যে-কারো হাতে তুলে দেয়া যাবে না। ওই বাক্সের ভেতরে," বলে তানভীর অ্যাম্বুলেন্সের লাশের সিটের নিচে রাখা বাক্সটা দেখিয়ে বলে উঠলো, "ব্ল্যাক বুদ্ধা যদি আসলেই থেকে থাকে ওটার ব্যাপারে কাউকেই আমি বিশ্বাস করি না। এমনকি পুলিশ কিংবা ইএএফকেও না। কাজেই বাক্সের ভেতরে ব্ল্যাক বুদ্ধাই আছে, ব্যাপারটা নিশ্চিত হবার পর ওটা আমি একমাত্র পাশা স্যারের হাতে তুলে দিবো। কাজেই আগে নিশ্চিত হই, তারপর আমি কল দিবো পাশা স্যারকে। কি বলো?"

"ঠিক আছে," বলে জালাল অ্যাম্বুলেন্সটাকে একটানে ল্যাবের পাথর বিছানো পথ ধরে টেনে নিয়ে সোজা চলে এলো নির্মাণাধীন ল্যাবের প্রবেশ পথের কাছে। সিট থেকে বাইরে নেমে শরীর টান টান করে কয়েক দফা আড়মোড়া ভাঙলো জালাল। "শরীরের বারোটা বেজে গেছে, জিনিসটা পাশা স্যারের হাতে তুলে দিয়ে লম্বা একটা ঘুম দিতে হবে," বলে ও পাশাপাশি হাঁটতে থাকা তানভীরের পিঠে একটা চাপড় মারলো। "কমান্ডার, তুমি আজ যা দেখালে না, ওই রাশিয়ান দানবকে এভাবে হারিয়ে দিলে! ব্যাপারটা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারতাম না," বলে সে হেসে উঠলো।

তানভীরও মৃদু হসে রক্ত মুছলো নিজের মুখ থেকে। “হারালাম আর কই? আপনারাই তো গুলি করে শেষ করলেন ব্যাটাকে। ব্যাপার কি, গার্ডেরা কই?” প্রবেশ পথের সুইং ডোর ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলো ওরা।

“সব ঘুমাচ্ছে,” বলে জালাল আর তানভীর দ্রুত হঁটতে লাগলো। “এক অর্থে ভালোই হয়েছে। সবার অলক্ষ্যে কাজ সারতে পারবো।” দুজনে সোজা চলে এলো ডক্টর মিতায়নের কেবিনের সামনে। রিসেপশনে কেউই নেই। ডক্টরের দরজার বাইরে গার্ডটা একটু দূরে সরে ওদের দিকে পিঠ দিয়ে মুখ ঢেকে শুয়ে আছে। গার্ডকে দেখে মৃদু হেসে উঠলো জালাল।

“বলেছিলাম না, সব ব্যাটা ঘুমাচ্ছে, চলো প্রফেসর মিতায়ন সব শুনে খুব খুশি হবে, বেচারা তো-” জালাল রুমের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লো, সাথে তানভীরও।

ভেতরটা একেবারে অন্ধকার। এমনকি ডিম লাইটও জ্বলছে না, শুধু প্রফেসরের বিছানার কাছে বাইরের জানালা দিয়ে আসা মৃদু আলো চোখে পড়লো।

“প্রফেসর,” তানভীর বলে উঠলো। “প্রফেসর মিতায়ন? অপনার জন্যে সুসংবাদ আছে। ব্ল্যাক বুদ্ধা উদ্ধার হয়েছে, সেইসাথে মারা পড়েছে জেড মাস্টার আর তার সহযোগী।”

“কে কমান্ডার নাকি?” বিছানার কাছ থেকে ঘুম জড়ানো গলা ভেসে এলো। চাদরে মোড়ানো মানুষটা উঠে বসছে ধীরে ধীরে। উঠে বসতে-বসতে সে বলে উঠলো, “এতো রাতে, ব্যাপার কি?”

“প্রফেসর ব্ল্যাক বুদ্ধার উদ্ধার হয়ে...” তানভীর কথা শেষ করার আগেই কেবিনের বাতি ধপ করে জ্বলে উঠলো। সাথে সাথে পেছন ফিরে জালাল আর ও দেখতে পেল। দেয়ালের সাথে গা ঘেঁেষে দাঁড়িয়ে আছে কালো মুখোশধারী চারজন সস্বস্ত্র মানুষ। তাদের ঠিক মাঝখানে নিচু টুলে মুখ হাত-পা বেঁধে বসিয়ে রাখা হয়েছে তিনজনকে। এর মধ্যে লায়লার কপালের পাশে পিস্তল চেপে ধরে আছে একজন মুখোশধারী।

“আমি জানতাম কমান্ডার, আপনি পারবেন,” আবারো কণ্ঠস্বরটা ভেসে আসতেই তানভীর আর জালাল একসাথে সেদিকে ফিরে তাকাল। জালালের একটা হাত চলে গেলে অস্ত্রের ওপরে। সাথে-সাথে গুলির শব্দে কেঁপে উঠলো পুরো রুম। জালাল পেট চেপে ধরে গড়িয়ে পড়লো তানভীরের ওপরে। জালালকে সামলাতে গিয়ে ফ্লোরের ওপরে পড়ে গেল তানভীরও।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে জালালকে সোজা করে চেপে ধরলো তার ক্ষতস্থান। হর-হর করে রক্ত বেরিয়ে আসছে তার পেট থেকে। “প্রফেসর আপনি পাগল হয়ে গেলেন নাকি, আপনি...” হতভম্ভ তানভীর কথা শেষ করার আগেই ডক্টর মিতায়ন বিছানা থেকে উঠে এসে, ধোঁয়া বেরুতে থাকা পিস্তলটা মাটিতে চেপে ধরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো ওদের সামনে।

“প্লিজ কমান্ডার, এরকম বি-গ্রেড হিন্দি সিনেমার নায়কদের মতো কথা বলবেন না, আপনার মতো স্মার্ট মানুষের সাথে ব্যাপারটা একেবারেই যায় না,” বলে সে ওদের সামনে দুই পা ভাঁজ করে বসে পড়লো। হাতের পিস্তল আর মুখ-চোখের অভিব্যক্তি বাদ দিলে তার পরনে সেই আগের পোশাক, একই মানুষ। কিন্তু সেটা পুরোপুরিই বদলে গেছে। আগের সেই ভদ্র চোখ আর অসহায় অভিব্যক্তির জায়গা দখল করেছে হিংস্র এক জোড়া কালো চোখের মণি আর মুখের নগ্ন উল্লসিত অভিব্যক্তি। “আর প্লিজ দয়া করে প্রফেসর বলবেন না, ডক্টর বলতে পারেন কারণ ডিগ্রী তো আছেই আমার। আমি প্রফেসর নই। প্রফেসর ছিল টেড চ্যাঙ, সম্ভবত তাকে মেরে ফেলেছেন আপনারা। ভালোই হয়েছে, বেচারা ভালো মানুষটা বহুত যন্ত্রণা ভোগ করেছে আমাদের কারণে,” বলে সে মৃদু হেসে উঠলো।

“এর মানে কি ডক্টর? টেড চ্যাঙ, টেড চ্যাঙ তো...” তানভীরের মাথায় সব ঘোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

“আহা, বেচারা কমান্ডার! জীবনে প্রথমবারের মতো টেবিল ছেড়ে মাঠে নেমেছে,” মিতায়ন তার হাতের পিস্তলটা তানভীরের থুতনিতে চেপে ধরে ওর হাত থেকে স্টিলেটোটা কেড়ে নিলো। “তার ওপরে প্রথম কেসেই পুরনো প্রেমিকার সাথে মোলাকাত,” বলে সে চুক-চুক করে শব্দ করে উঠলো মুখ দিয়ে।

“প্রেমিকদেরকে নিয়ে এই এক সমস্যা। এই বলদগুলোকে দিয়ে যা খুশি করানো যায়,” বলে সে ঝট করে উঠে দাঁড়ালো। “আরে বলদ, টেড চ্যাঙ ছিল সত্যিকারের আর্কিওলজিস্ট, সে-ই ছিল সত্যিকারের প্রফেসর, ব্ল্যাক বুদ্ধার ব্যাপারে জানা, তিব্বতের সেই কাতানা থেকে মেসেজ উদ্ধার করা, মোট কথা এই ব্ল্যাক বুদ্ধা অভিযান ছিল পুরোপুরি প্রফেসর টেড চ্যাঙের ব্রেইন চাইল্ড, আর আমি ছিলাম আয়োজক। কারণ আমি স্কলার নই, আমি আসলে...”

“জেড মাস্টার,” তানভীর হতভম্ভ হয়ে বলে উঠলো। “তুমিই আসল জেড মাস্টার।”

“একদম ঠিক, কমান্ডার,” জেড মাস্টার উঠে দাঁড়িয়ে পিস্তলের নলটা চেপে ধরলো তানভীরের খুলির ওপরে। “আমিই জেড মাস্টার। যার কোন নাম, পরিচয় নেই, নেই কোন চেহারা। কারণ কি জানো, আমি যখন যেখানে যে কাজ করি একেবারে নিখুঁতভাবে করি। সময় নিয়ে নিজের আলাদা পরিচয় দাঁড় করিয়ে এমনভাবে করি যেন কোন ট্রেস না থাকে কারো। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অপারেশন ছিল ব্ল্যাক বুদ্ধা। আর তাই এর প্রস্তুতিও নিতে হয়েছে সেভাবে। ভার্সিটির শিক্ষক হয়ে, বিয়ে করে,” বলে সে ফিরে তাকাল মুখ- হাত পা বাঁধা লায়লার দিকে। “তবে এই ব্যাটা শেখারভ বেঈমানি না করলে সবই ঠিকমতোই হত। যাই হোক তুমি অনেক ভালো কাজ করেছো কমান্ডার। আমার এই বিরক্তিকর বিয়ে যে এতো ভালো কাজে দিবে আগে বুঝতে পারিনি,” সে লায়লার দিকে তাকিয়ে আছে। “এই বিয়েটা নিখূঁত একটা পরিচয় দিয়েছে আমাকে, তারপর সব

হারানোর পর কমান্ডারকে কাজে লাগিয়ে ব্ল্যাক বুদ্ধা উদ্ধারের জন্যেও কাজে দিয়েছে," বলে সে লায়লার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো।

"তারমানে এই পুরোটা সময় তুমি আসলে..." তানভীর খুবই অসহায় বোধ করছে। জালালের চোখ বন্ধ হয়ে এসেছে। পেট দিয়ে সমানে বেরুচ্ছে রক্ত। কিছুক্ষণের ভেতরে চিকিৎসা না দিলে মারা যাবে মানুষটা।

"এতো খারাপভাবে বলো না কমান্ডার। হ্যাঁ, আমি সব সাজিয়ে পরিকল্পনা করে ব্ল্যাক বুদ্ধা উদ্ধার করে যখন শেষ হাসিটা হাসবো তখন এই ব্যাটা শেখারভ আর হেকমত মিলে আমার সাথে বেঈমানি করে। শেখারভ আসলে ব্ল্যাক বুদ্ধা একাই মেরে দিতে চেয়েছিল। হেকমতও তাই চেয়েছিল, ফলে দুজনে মিলে আমার সাথে বেঈমানি করে প্রথমে, তারপর একে অপরের সাথে। আমি যখন রিক্ত নিঃস্ব আহত অসহায় হয়ে মরতে বসেছিলাম তখন তুমি ফেরেশতার মতো হাজির হলে কমান্ডার। আমাকে হেকমত আর শেখারভের কবল থেকে উদ্ধার করলে। তারপর আমার হয়ে শেখারভ আর প্রফেসরকে মেরে উদ্ধার করে আনলে ব্ল্যাক বুদ্ধা," বলে সে নিজের লোকদের একজনের দিকে ফিরে ইশারা করলো।

লোকটা একবার মাথা নেড়ে বেরিয়ে গেল। "কমান্ডার, তুমি আমার এতো উপকার করলে এর বিনিময়ে আমি তোমাকে প্রাণ উপহার দিবো। আর সেইসাথে তোমার বন্ধুর অবস্থা তো দেখছোই। আমি আমার লোকদের নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাবো। একবার ভেবেছিলাম, সবাইকে মেরে রেখে যাবো পরে ভাবলাম দরকার কি, আমার যে চেহারা তোমরা দেখেছো সেটা তো আমি বদলেই ফেলতে পারবো। আর ব্ল্যাক বুদ্ধা হাতে এলে এতো টাকা আসবে যে... যাই হোক তোমাকে আমি কিছু করবো না। তবে তোমাকে আমি অপশন দিচ্ছি; ল্যাবের সব লোক বন্দি আর অজ্ঞান। তোমার বন্ধুর অবস্থা খারাপ, তোমার হাতে অপশন আছে দুটো। হয় আমার পিছু নেয়া অথবা তোমার বন্ধুকে বাঁচানো। এখন তোমার ইচ্ছে," বলেই সে ইশারা করতেই একজন এসে ওদের মোবাইল অস্ত্র সব নিয়ে নিলো। ওদেরকে রুমে রেখে বেরিয়ে যাচ্ছে ডক্টর মিতায়নের দিকে ফিরে তানভীর বলে উঠলো। "'তুমি পৃথিবীকে বদলাতে না পারলে পৃথিবী তোমাকে বদলে দিবে' এটা তোমরই কথা ছিল তাইনা?"

মিতায়ন বেরিয়ে যেতে-যেতে পেছন ফিরে মদৃ হেসে উঠলো, "হ্যাঁ কমান্ডার, এটা আমারই ডায়লগ ছিল। শুধু এটাই না আমি টেড চ্যাঙের ব্যাপারে যা-যা বলেছি সবই আসলে আমার নিজের কথা," বলে সে তানভীরের দিকে ফিরে বলে উঠলো। "জীবনের চড়াই উৎরাইয়ে আমার সবচেয়ে বড় উপলব্ধিগুলো বলেছি তোমাকে, মনে রাখতে পারলে তোমারও কাজে লাগবে কমান্ডার," বলে সে তানভীরের দিকে ফিরে একবার চোখ টিপে লায়লার দিকে ফিরে একটা ফ্লাইং কিস দিয়ে বলে উঠলো, "গুড বাই, মাই লাভ। ভেবেছিলাম তোমাকে আর তোমার বদমেজাজি মা-টাকে শেষ করে দিয়ে যাবো, সাথে বাই প্রোডাক্ট হিসেবে তোমার বোনটা মারা পড়তো। কিন্তু তোমরা সবাই বেঁচে গেলে

কমান্ডারের কারণে, ওর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার কারণে," বলে সে তানভীরকে দেখিয়ে মৃদু হেসে ধাম করে বন্ধ করে দিলো দরজাটা।

জালালের পেট চেপে ধরে একবার অসহায়ভাবে লায়লা-শায়লা আর ওদের মাকে দেখলো তানভীর। তারপর জালালকে মাটিয়ে শুয়িয়ে দিয়ে চলে এলো জানালার কাছে। জেড মাস্টারের লোকেরা সবাই চড়ে বসতেই অ্যাম্বুলেন্সটা চলতে শুরু করলো।

মাটিতে শুয়ে থাকা জালাল হঠাৎ চোখ খুলে হেসে উঠলো। তানভীর অবাক হয়ে ফিরে তাকাল তার দিকে। ওর অবাক মুখের দিকে আধো খোলা চোখে তাকিয়ে জালাল বলে উঠলো, "গুলি খাইলে তাহলে এমন লাগে। জীবনে এতো গুলি করছি কিন্তু গুলি খাই নাই এর আগে," বলে সে চোখ বন্ধ করে ঢলে পড়লো মাটিতে।

একবার তাকে দেখে আরেকবার অপসৃয়মান অ্যাম্বুলেন্সটার দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে রাগের সাথে দেয়ালে লাথি মারলো তানভীর।

ওকে পুরোপুরি বোকা বানিয়েছে জেড মাস্টার। ওর বোকামির জন্যেই পালিয়ে যেতে পেরেছে সে, ওর বোকামির জন্যেই মরতে বসেছে জালাল।

এসবকিছুই ঘটেছে একমাত্র ওর বোকামির জন্যে।

অধ্যায় চুয়ান্ন

সময়: ১৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ

পৃথুরা বনভূমি, কন্নোর, ভারতবর্ষ

নিজেকে শামানের পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বোকা মনে হচ্ছে।

তার মতো যোদ্ধার জন্যে শরীরিক আঘাত যতোটা না প্রাণঘাতী, তারচেয়ে অনেক বেশ প্রাণঘাতী মানসিক আঘাত। একটার পর একটা মানসিক আঘাত শামানকে একেবারে কাবু করে ফেলছিল। বিশেষ করে ডুকপা লামার মৃত্যু ওকে কেমন জানি ভাবলেশহীন করে ফেলেছিল। রাজা বিক্রম যখন যখন ওর মৃত্যু ঘোষণা করলো ব্যাপারটা আমলেই না নিয়ে অনেকটা যেন ভবিতব্যকে মেনে নিয়েছিল শামান। আর তাই বিধুকে নিজের দিকে ছুটে আসতে দেখেও কোন গা করেনি ও।

বিধু সোজা ছুটে এসে ওকে জড়িয়ে ধরে জলতে পড়ে যাবার সাথে সাথেই জলগুহার প্রপাতের স্রোতের টানে অনেকখানি সরে আসে। বিধু এক হাতে শক্ত করে ধরে রাখে শামানকে। অপর হাতটা প্রথমে জলতে নাড়ানোর চেষ্টা করে বুঝলো কোন লাভ হবে না। সেইসাথে সাঁই সাঁই শব্দের সাথে জলতে ছোট ছোট মাছের লেজ নাড়ানোর মতো ছুপ-ছুপ শব্দ শুনতেই বুঝতে পারলো ওদের চারপাশে তীর এসে লাগছে। জলতে সাঁতার কাটার চেষ্টা না করে বরং নিজেকে স্রোতের হাতে ছেড়ে দিলো। দুজনেই খড়কুটোর মতো ভেসে চললো প্রপাতের দিকে। প্রাপাতের প্রায় কিনারায় পৌছে বিধুর মনে হলো ওর শরীরটা শূণ্যে ঝুলে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর নিচে পড়তে শুরু করলো।

একে তো অন্ধকার, তার ওপরে জলের ঝাপটা, সেইসাথে পতনের বেগ সব মিলিয়ে ওর মনে হতে লাগলো নিজের ওপরে নরক নেমে এসেছে। পড়তে পড়তেই একবার আশেপাশে দেখার চেষ্টা করলো কিন্তু শামানের চিহ্নও দেখতে পেল না। একটু পরেই তীব্র ধাক্কার সাথে সে অনুভব করলো জল একেবারে গিলে নিলো ওকে। জলের অনেকটা গভীরে ডুবে গিয়ে আবারো ভেসে উঠলো সে। ভেসে উঠতেই জলের ওপরে মাথা তুলে স্রোতে ভেসে যেতে যেতে প্রাণপণে দম নিতে লাগলো। একইসাথে স্বস্তি আর ব্যথার অনুভূতিতে আচ্ছন্ন পুরো শরীর।

স্বস্তির কারণ প্রাণে বেঁচে গেছে, প্রপাতের নিচে লাফিয়ে পড়ে কোন পাথরে লেগে ভর্তা হয়নি বা জলের আঘাতে ফুসফুস ফেটে মরেনি এতেই খুশি ও। জলের স্রোতে ভেসে যেতে-যেতে আশেপাশে তাকাল কিন্তু কোন মানুষের আকৃতি চোখে পড়লো না।

না আছে, ওর থেকে বেশ অনেকটা দূরে ওরই মতো স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে লম্বা একটা মানব আকৃতি। শামান কিনা ঠিক বুঝতে পারলো না বিধু। ওটা আদৌ মানুষ কিনা সেটাও ঠিক পরিষ্কার হলো না ওর কাছে।

একইভাবে আরো বেশ খানিকটা ভেসে যাবার পর স্রোতের টান কিছুটা কমে এলে নিজেকে খানিকটা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলো বিধু। শরীরের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতেই সে ধীরে-ধীরে সাঁতরাতে শুরু করলো লম্বা আকৃতিটার দিকে। একটু-একটু করে বেশ কিছুক্ষণ সাঁতরে অবশেষে কাছাকাছি পৌছাতে পারলো ও। ওটা শামান নিশ্চিত হবার পর বুঝতে পারলো দেহটা যেভাবে স্রোতের টানে এগিয়ে চলেছে তাতে মনে হয় না তার হুঁশ আছে। আরেকটু এগিয়ে একটা পাথরের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময়ে খপ করে সে ধরে ফেললো শামানের কাঁধের কাছটায়। একহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে অন্যহাতে অল্প-অল্প করে সাঁতরে অবশেষে যখন তীরে এসে উঠতে পারলো শরীরের বল আর ফুসফুসের দম দুটোই শেষ। কোনমতে প্রথমে শামানকে তীরের ঘাসের বিছানার ওপরে শুইয়ে দিয়ে অন্ধকার খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে দম নিতে নিতে বিধুর মনে হলো আসলে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার চেয়ে আনন্দের আর কিছু হতে পারে না।

নিজেকে খানিকটা ধাতস্থ করে একটু বল ফিরে পেতেই সে হাঁটু গেড়ে বসে হামাগুড়ি দিয়ে চলে এলো শামানের কাছে। বুকে কোন ওঠা-নামা নেই শামানের। নাকের কাছে আঙ্গুল ধরেও সে বুঝতে পারলো না নিঃশ্বাস বইছে কিনা। মাথার সামনের দিকের কোন একটা ক্ষত থেকে রক্ত গড়িয়ে মুখ ঢেকে গেছে।

"ওস্তাদ," বলে প্রায় চিৎকার করে উঠে বিধু শামানের বুকের ওপরে মাথা ঠেকিয়ে কান পাতলো বুকের শব্দ শোনার জন্যে। প্রথমে কিছুই শুনতে পেল না সে, তবে মনোযোগ দিয়ে শোনাতে মৃদু ধুক-পুক কনে এলো তার। সোজা হয়ে বসে বুকের ওপরে দুই হাতে চাপ দিতে শুরু করলে বিধু। একবার, দুইবার, তিনবার চাপ দেয়ার পর তৃতীয়বারের সময়ে মুখ থেকে একগাদা জল উগড়ে দিয়ে খক-খক করে কেশে উঠলো শামান।

"ওস্তাদ, ওস্তাদ," বলে ডেকে উঠলো বিধু। শামান তখনো কেশে চলেছে। আনমনেই তার একটা হাত চলে গেল মাথার ক্ষতের কাছে। চোখ মেলে আশেপাশে দেখলো সে, পরিস্থিতি বুঝতে পারছে না। "ওস্তাদ, " আবারো ডেকে উঠলো বিধু। বিধুর ডাক শুনে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো শামান। মুখ তুলে বিধুকে দেখে চিনতে পারার সাথে সাথে দুই হাতে তার গলা চিপে ধরলো। "বিধু হারামজাদা, কেন পালালি ওখান থেকে, কেন?" রাগ আর ক্ষোভের সাথে চিৎকার করে উঠে আরো জোরে বিধুর গলা চেপে ধরলো ও। ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু তফাতে সরে গেল বিধু।

"কি দরকার ছিল পালানোর?" শামানের গলায় হাহাকার। "বাকি সবাইকে বিপদে ফেলে, কি দরকার ছিল আমাকে বাঁচানোর?" বলেই দুইহাতে মুখ চেপে ধরে কান্নায় ভেঙে

পড়লো শামান। মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে তীব্র ক্ষোভ আর হতাশার সাথে চিৎকার করে উঠলো ও।

বিধু ওর দিকে এগিয়ে যেতেই এক হাত তুলে তাকে থামতে বললো শামান। "এই সব আমার কৃতকর্মের ফল। এইসব ঘটেছে আমার কারণে," শামান কান্না থামিয়ে বলে উঠলো। "আমি না পেরেছি ডুকপা লামাকে বাঁচাতে, না পেরেছি থারুদের সাহায্য করতে, না পেরেছি বুদ্ধের অন্ধকারের অবতারকে নষ্ট করতে। উল্টো আমার কারণেই আজ এতোগুলো মানুষের সব শেষ হলো, আমার কারণেই এই সব সর্বনাশের সূত্রপাত," বলেই আবারো কান্নায় ভেঙে পড়লো শামান।

বিধু এগিয়ে এসে পাশে বসে একটা হাত রাখলো শামানের কাঁধে "ওস্তাদ, নিজেরে দোষ দিও না। তুমি তো চাইছিলা সব ঠিক করতে," বলে ও থেমে গিয়ে যোগ করলো। "দোষ যদি কারো থাকে তয় সেইটা আমারো আছে, আমগো সবারই আছে। তয় এইগুলা কোন কথা না। সব দোষ ওই ব্যাটা বিক্রমের। ওই হারামজাদাই এইসব ঘটনার সূত্রপাত করছে। ওই হারামজাদাই বুদ্ধের অবতার বানানির চিন্তা করছে, ওই হারামজাদই ডুকপা লামারে বন্দি করছে, এরপরে নিজে বিপদে পইড়া তোমারে দিয়ে কাম উদ্ধার করাইছে," বলে সে আবারো থেমে যোগ করলো, "খালি তুমারে দিয়া না আমগোরেও সবাইরে হেয় ব্যবহার করছে।"

চট করে বিধুর দিকে ফিরে তাকারো শামান। রক্ত জল আর অশ্রুতে ভিজে একাকার ওর চেহারা। "ডুকপা লামা আমার হাতে, আমার সামনে মারা গেছে, আমি কিছ্ ুকরতে পারিনি এইটা নিয়ে আমি বাকি জীবন কিভাবে কাটাবো, এরচেয়ে মরে যাওয়াই ভালো ছিল," শামান আবারো ভেঙে পড়তে যাচ্ছে।

"না ওস্তাদ, এইটা ভুল কইলা," সে শামানের কাঁধে রাখা হাতটা ধরে মৃদু চাপড় দিলো। "তোমার এহনো বাঁচার মতোন বড় কারণ আছে," বলে সে শক্ত ক'রে একটা ঝাঁকি দিলো শামানকে। "তুমি ভুইলা গেছো ওই হারামজাদা রাজা বিক্রম তোমারে কী করছে। হেয়ই ডুকপা লামার মৃত্যুর কারণ। হের হাতেই কালন্তি, ধোয়ী, ঘোষিত বন্দি আছে। বুদ্ধর অবতারও হের হাতে। তুমি যদি কিছু না করো হেরা সবাই মরবো। বুদ্ধের অন্ধকারের অবতার শুঙ্গদের হাতে পৌছায়া যাবো। আর সবচেয়ে বড় কথা তুমি যদি কিছু না করো তয় আবারো এই উপত্যকায় রক্ত গঙ্গা বইবো, থারুরা সবাই মারা পড়বো।"

"আমাদের এক্ষুণি থারুদের গ্রামে পৌছানো উচিত," বিধু থামতেই শামান বলে উঠলো। এক হাতে চোখ মুখের রক্ত মুছে নিয়ে বলে উঠলো। রাজা মানরুকে সাবধান না করলে থারুরা সবাই নিঃশেষ হবে," বলে সে উঠে দাঁড়াতে গিয়েও টলে পড়ে গেল। বিধু তাকে একহাতে ধরে ওঠালো।

"থারুদের গ্রাম এখান থেকে কোনদিকে হতে পারে?" শামান প্রশ্ন করলো বিধুকে উদ্দেশ্য করে। কিন্তু সেটার উত্তর না দিয়ে বিধু নিজের কোমর বন্ধনি খুলে নিয়ে সেটা জলতে

ভিজিয়ে শামানের মুখ মুছে দিয়ে ওটা বেঁধে দিলে শামানের মাথার ক্ষতের ওপরে।

“এখন ঠিক লাগছে?” বিধু জানতে চাইলো। শামান জিনিসটাকে মাথার ওপরে নেড়েচেড়ে বসিয়ে দিয়ে জলতে হাত ডুবিয়ে আজলা ভর্তি জল নিয়ে মুখে ছিটিয়ে ঢক-ঢক করে গিলে নিলো বেশ অনেকটা। সে পরিচ্ছন্ন হয়ে বিধুর দিকে তাকিয়ে দেখলো সে চোখের সামনে হাত ভাঁজ কর তারা মাপছে। শামান ফিরে তাকাতেই সে কথা বলে উঠলো।

“আমরা এখন যেখানে আছি এই জায়গাটা জঙ্গলের কিনারায় নদীর পাড় থেইক্কা কিছুডা দূরে। মনে অয় এই জায়গাডার কাছাকাছি কোনখান থাইক্কাই কালন্তি আর ধোয়ীরা শঙ্করাদিত্যের লগে বিধোরীতে ঢুকছিল। কাজেই আমার মনে অয় আমরা এহন আছি থারুগর গ্রাম থাইক্কা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। তারমানে,” বলে সে আবারো হাত উঠিয়ে মাপ-জোখ করে বলে উঠলে, “আমরা যদি থারুগর গ্রামে পৌছাইতে চাই তাইলে আমগোর এর উল্টাদিকে যাইতে অইবো। মানে এহান থেইক্কে উত্তর-পূর্ব দিক বরাবর, মানে ওইদিকে,” বলে জঙ্গলের দিকে দেখালো। “ওস্তাদ তুমি ঠিক আছো? হাঁটতে পারবা?”

শামান একটা ঝোপের ভেতর থেকে একটা ডাল টেনে বের করে ওটার পাতা আর ছোট ডাল টেনে ছিড়ে ফেলে দিতে দিতে বলে উঠলো, “আমি ঠিক নাই, তবে হাটতে পারবো। হাঁটতে হবে,” বলে সে বিধুর দিকে ফিরে জানতে চাইলো। “তোর শরীরের অবস্থা কি?”

বিধু আড়মোড় ভেঙে বলে উঠলো, “আমার তো মনে অয় শরীরের একটা আড্ডিও আস্তা নাই, তয় আমিও হাটতে পারাম। চলো, দেরি করলেই দেরি,” বলে সে আবারো চোখের সামেন হাত উঠিয়ে মাপ-জোক করতে শুরু করলো। আর শামান সেদিকে তাকিয়ে বিরক্তির সাথে মাথা নেড়ে হাঁটতে লাগলো। শামানকে এগোতে দেখে মাপ-জোখ বাদ দিয়ে তাকে অনুসরণ করতে শুরু করলো বিধু।

কিন্তু বিধুর নির্দেশিত পথে মাইলের পর মাইল এগিয়েও কোন কাজ হলো না। জঙ্গলের পথে অন্ধকারের ভেতরে অচেনা জায়গায় ওরা পথ হারিয়ে ফেললো নাকি অন্য কোন ভুল হয়েছে ঠিক পরিষ্কার হচ্ছে না শামানের কাছে। একে তো আহত অসুস্থ শরীর, তার ওপরে আবার মানসিক যাতনা, সেইসাথে যোগ হয়েছে থারুদের গ্রামে পৌছানোর তাড়া, সব মিলিয়ে শামানের কাছে মনে হতে লাগলো ওর দম বন্ধ হয়ে আসছে। হাঁটতে-হাঁটতে একটা গাছের শেকরের ওপরে বসে পড়লো সে। একটা হাত তুলে বিধুকেও থামার জন্যে ইশারা করলো।

“আমার মনে হয় কিছু একটা ভুল হয়েছে,” শামান হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠলো। “হিসেব বলে এতোক্ষণ তো থারুদের গ্রামে পৌছে যাবার কথা কিন্তু এখনো পরিচিত এলাকা চোখেই পড়লো না,” শামান দুই হাতে ধরে মাথা থেকে পট্টিটা খুলে নিয়ে এলো। ওটাকে আবারো চিপে নিয়ে বেঁধে ফেললো মাথায়। ক্ষতটা ঠিক কোথায় হয়েছে বুঝতে পারলেও খালি হাতে ওটাকে ধরার সাহস করলো না। যদিও পট্টিটা লাগানোতে রক্ত বন্ধ হয়েছ কিন্তু মাথার ভেতরে একটা দপদপে যন্ত্রণার মাত্রা বেড়েই চলেছে।

“আমার তো হিসাবে ভুল ওয়ুনের কথা না,” বিধুও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু সে উৎসূক নয়নে ঘাড় ঘুরিয়ে এদিকে-সেদিকে দেখার চেষ্টা করছে। যদিও অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না আশেপাশে কোথাও। “ওস্তাদ, রাত প্রায় শেষের দিকে। আমার মনে অয় আমরা এহন এইহানেই বিশ্রাম নেই। ভোরের আলো ফুটতে শুরু করলেই পথ খুঁইজা বাইর করন অনেক সহজ অয়া যাবে।”

শামান বিধুর কথার সাথে একমত হলেও ওর মন মানছে না। কারণ ওর মনে হচ্ছে রাজা বিক্রমের লোকদের বিধোরীর দুর্গের দখল নেয়া হয়ে যেতেই প্রথমেই ওরা আক্রমণ চালাবে থারুদের গ্রামে। আর সেটা হবার আগেই ওদেরকে সাবধান করে দিতে না পারলে সমূহ বিপদ। কিন্তু প্রতিবাদ করার জন্যে হাত তুলেও নামিয়ে নিলো সে। বরং গাছের বিস্তৃত শেকরের ওপরে শরীরটাকে আরো ছেড়ে দিয়ে চোখ মুদলো। এইটুকু বিশ্রামই এখন অনেক প্রাণ রক্ষাকারী মনে হচ্ছে ওর কাছে। শামান চোখ বন্ধ করে শরীরটাকে ছেড়ে দিলো।

বেশ কিছুক্ষণ পড়ে থেকে তন্দ্রামতো এসেছে, এমন সময় বিধুর গলা শুনে তন্দ্রা ছুটে গেল ওর। “ওস্তাদ দিনের আলো ফুটতে শুরু করছে।”

শামান চোখ ডলতে ডলতে উঠে বসলো শেকড়ের ওপরে। কিন্তু ওর কাছে অন্ধকারই মনে হচ্ছে। উঠে বসে ও দেখতে পেল বিধু হাতের ইশারায় পশ্চিমদিকে দেখাচ্ছে। সেদিকে দিগন্তের কাছটায় লালচে আলো ছড়িয়ে পড়েছে। শামান আলোটা দেখা মাত্রই চট করে উঠে বসলো, তার ঘুম একেবারে ভেঙে গেছে। আলোটাকে আরো ভালোভাবে দেখার জন্যে গাছের শেকরের ওপরে উঠে দাঁড়ালো ও।

“এইবার আর পথ চিনতে সমস্যা অইবে না,” বিধু আরো কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু তার আগেই শামান চট করে গাছের শেকড় থেকে নেমে তার একটা হাত ধরে প্রায় টানতে শুরু করলো।

“জলদি চল, বিধু আমাদেরকে ওদিকে এগোতে হবে,” সে বিধুকে প্রায় টেনে নিয়ে চলেছে।

“কি ব্যাপার, ওস্তাদ?” বিধু শামানের এই হঠাৎ পাগলামিতে অবাক হয়ে গেছে। “এতো তাড়াহুড়ার কী হইলো? ভালো কইরা দিনের আলো ফুটতে দেও...”

“গাধা, ওইটা দিনের আলো না,” শামান হাঁটার গতি আরো বাড়িয়ে দিলো। “সূর্যরে কোনদিন পশ্চিম দিক দিয়া উঠতে দেখছোস?” শামানের পিছু পিছু আসতে আসতে বিধু আবারো ফিরে তাকাল পশ্চিম দিকে, যেদিক থেকে লালচে আলোটা চোখে পড়েছে। “তাইলে ওইটা যে-”

“ওইটা আগুনের লালচে আলো, আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তবে ওটা থারুদের গ্রাম থেকে আসছে,” বলে শামান এগোতে এগোতেও থেমে গেল। বিধুর দিকে তাকিয়ে বলে

উঠলো। "ঠিকই আছে, আমাদের হিসেবে ভুল হইছিল। আমরা থারুগর গ্রামের দিকে আগাইতে গিয়া কিছুটা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে আগায়া গেছিলম পথের ভুলে। এহন যতোটা জলদি পারা যায় থারুগর গ্রামে পৌছাতে হবে। ওরা বিপদে আছে।"

"হ, তুমি ঠিকই বলছো," বলে বিধু আবারো সেই পশ্চিম দিগন্তে ফিরে তাকাল। "এহন ধুঁয়াও দেখতাছি হালকা-পাতলা, জলদি চলো। "

কিন্তু শত চেষ্টা করেও ওরা খুব দ্রুত এগোতে পারলো না। একে তো আহত-ক্লান্ত শরীর, তার ওপরে অচেনা পথ। তারপরও প্রায় ঘন্টা দুয়েকের ভেতরে ওরা যখন থারুদের গ্রামের কাছাকাছি পৌছালো তখন দিনের আলো ফুটে উঠেছে।

থারুদের গ্রাম থেকে আধ মাইলের মতো দূরত্বে থাকতেই একেবারে পরিষ্কার দেখতে পেল জঙ্গলের ভেতরে যেখানে থারু গ্রাম থাকার কথা সেখান থেকে বলকে-বলকে কালো ধোঁয়া আর আগুনের লেলিহান শিখা আকাশের পানে ধেয়ে চলেছে। "সর্বনাশ," বলে উঠলো বিধু। কিন্তু শামান তার কথা শোনার জন্যে বসে নেই। সে বরং দ্রুত এগিয়ে গেল জঙ্গলের পথে যেখানে থারুদের গোপন আস্তানার মতো জঙ্গলের গাছপালা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়ে সেখানটা হা হয়ে খুলে আছে। গাছের চাদোয়ার মতো আবরণটা একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়ে আছে মাটিতে।

জঙ্গলের পথটা ধরে আরেকটু এগোতেই দেখতো পেল থারু পাহারাদার কয়েকজন মাটিতে পড়ে আছে মৃত অবস্থায় , দুয়েকজনকে গেঁথে রাখা হয়েছে গাছের সাথে। থারুদের গ্রামের সেই খালটার কাছে এসেই দেখলো সেই কাঠের সেতুটা ভেঙে-চুড়ে একাকার হয়ে জলতে ভাসছে।

এক বিন্দু দ্বিধা না করে শামান লাফিয়ে পড়লো জলতে, ওকে অনুসরণ করলো বিধু। কয়েকবার হাত পা নেড়ে মিনিটখানেকের মধ্যে সরু জলাটার অন্য পাড়ে উঠে এলো ওরা। থারুদের গোছানো সুন্দর গ্রামটার আগের সৌন্দর্যের ছিটেফোটাও নেই। পুরো গ্রামে আগুন জ্বলছে, বিক্ষিপ্তভাবে ছোটছুটি করতে থাকা আগুনের শিখা, গবাদি পশু আর ভাঙাচোড়া জিনিসপত্রের ভেতরে এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে মানুষের লাশ।

থারুদের গ্রামের বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে শামান ছুট লাগালো থারু রাজা মানরুর বাড়ির দিকে। ধ্বংস-মৃত্যু আর যুদ্ধের মাঝেই বেড়ে উঠেছে শামান, কিন্তু এরকম বিনা বিচারে চালানো ধ্বংসযজ্ঞ আর মৃত্যু এর আগে কখনো দেখেনি শামান। থারু রাজা মানরুর বাড়ির সামনে পৌছে দুই হাঁটু মাটিতে গেড়ে বসে পড়লো শামান।

"এসবের জন্যে আমি দায়ি," আগুনের লেলিহান শিখা পুড়তে থাকা থারু রাজা মানরুর বাড়ির সামনেই একটা গাছ থেকে ঝুলছে শান্ত-শিষ্ট সৌম্য মানুষটার লাশ। অন্যের ভালো করতে গিয়ে নিজের মৃত্যু ডেকে আনা মানুষটার ঝুলন্ত লাশের পা চেপে ধরে অবারো কান্নায় ভেঙে পড়লো শামান।

“এসবের জন্যে আমি দায়ি,” সে ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলে উঠলো। “কালন্তি আমাকে বার-বার সাবধান করেছিল শাক্যদেরকে বিশ্বাস না করতে কিন্তু আমি শুনিনি।”

“শোনেনি তো তার বাপুও,” শামানের পাশ থেকে বিধু বলে উঠে সে এগিয়ে গেল ঝুলন্ত লাশটাকে গাছ থেকে নামানোর জন্যে ওরা রাজা মানরুর লাশটাকে গাছ থেকে নামিয়ে এক টুকরো কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলো। ওরা লাশটাকে সম্মান জানানোর জন্যে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠলো ওদের পেছন থেকে। ঝট করে সেদিকে ফিরেই দেখতে পেল কয়েকজন থারু সৈনিক হাতে তলোয়ার আর তীর-ধনুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ওদেরকে দেখেতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠে সাবধান করে দিলো। বিধু আর শামান নিজেদের দুই হাত তুলে দেখালো ওদের কাছে কোন অস্ত্র নেই। থারু সৈনিকেরা ওদের দিকে এগিয়ে আসতেই ওদের ভেতরে দুয়েকজন চিনতে পারলো ওদেরকে। “এরা সেই তিব্বতি যোদ্ধা, এরা আমগো শত্রু না,” একজন বলে উঠলো।

শামানদেকে দেখলো মোট পাঁচজন সৈনিক, তিনজনের হাতে তীর-ধনুক আর বাকি দুজনের হাতে তলোয়ার। “আমরা শত্রু নই। এখানে কী হয়েছিল। আর তোমরাই বা কোথা থেকে এলে?”

ওদেরকে উঠে দাঁড়ানোর জন্যে ইশারা করে নিজেদের তীর-ধনুক নামিয়ে নিলো থারু সৈনিকেরা। ওদের ভেতরে দলনেতা গোছের একজন এগিয়ে। এলো শামানের দিকে। “আমি আপনার সাথে মন্তলার হাটে ছিলাম রাজা বিক্রমরে উদ্ধার করার সময়ে।”

“এখানে আসলে হয়েছে কি, সেটা বলো,” শামান প্রায় ধমকে উঠলো।

লোকটা একবার শামানকে দেখে নিয়ে আরেকবার বিধুকে দেখলো তারপর নিজের সঙ্গীদের দেখিয়ে বলে উঠলো। “আমি মাতুরা, রাজা মানরুর সেনাবাহিনীতে ছিলাম। এরা আমার দলের লোক। গতকাল রাতে আপনেরা বিধোরীতে যাওনের লাই[1]া রওনা দিয়োনের পরে সব স্বাভাবিকই ছিল। আজ ভোরের দিকে হঠাৎ দিকে আগুনের তাপে ঘুম ভাঙে আমগোর। উইঠা দেহি পুরা গ্রাম জ্বলতাছে। আমরা আগুন নিভাইতে যাইতেই আমগো গ্রামে যেইসব শাক্যরা আশ্রয় নিছিল হেগোর একটা দল আমগোর উপরে আক্রমণ করে। আমরা হেগো লগে মারামারি করতে করতেই বাইরে থাইক্কা সৈনিকের দল আইসা পুরা গ্রাম ঘিইরা সমানে সবাইরে মারতে থাহে। রাজা মানরু হের দলে কিছু সৈনিক লয়া ছোট-খাট একটা প্রতিরোধ কইরা গ্রামের মহিলা-বাচ্চা আর যাগো পারছে প্রথমেই গ্রামের পিছন দিয়া জঙ্গলে ঢুকায়া দিছে। আমরা সেই দলেই ছিলাম। এরপরে কি অইছে আমরা জানি না। আমরা পলায়া জঙ্গলের অনেক ভিতরে চইলা যাই। জঙ্গলের একেবারে ভিতরে থারুগর ফসল মজুদের একটা গুদাম আছে। সেইহানে পৌছায়া যারা বাইচা আছে হেগোরে রাইখা গ্রামে কী আইলো সেইটা খোঁজ-খবর করার জন্যে ফিইরা আইসা আপনেগো পাইলাম।”

“শালারা কাপুরুষের দল, রাতের অন্ধকারে নিরীহ লোকগুলোকে খুন করেছে, গ্রাম জ্বালিয়ে শেষ করে দিয়েছে,” শামান বাকিদের দিকে ফিরে বলে উঠলো। “এরা জঙ্গলে ঢোকার পর কী হয়েছিল কে জানে।”

“আমি জানি, নতুন কণ্ঠস্বর শুনে সবাই ফিরে তাকাল।

মানুষটা আর কেউ না শাক্য রাজা বিক্রমের খাস লোক জাথুরিয়া। সে একটা ঘোড়ায় বসে আছে। মানুষটাকে দেখা মাত্রই রাগের সাথে ঘোড়া থেকে নামিয়ে তাকে চেপে ধরলো গাছের সাথে।

“শালা বেঈমানের বাচ্চা, তোর সাহস কী করে হলো এখানে আসার?” জাথুরিয়া তলোয়ারের ফলাটা থেকে নিজের গলা বাঁচানোর চেষ্টা করছে ওদের পেছন থেকে বিধু কথা বলে উঠলো।

“ওস্তাদ জাথুরিয়া বেঈমান না,” বলে সে পেছন থেকে শামানের একটা হাত টেনে ধরে সরিয়ে দিলো জাথুরিয়ার গলা থেকে। “মানে?” শামান পেছন ফিরে বিধুর দিকে ফিরে প্রায় ধমকে উঠলো। “এই ব্যাটা একটা শাক্য, এই শাক্যদের কারণেই-”

“জাথুরিয়া শাক্য হতে পারে কিন্তু হেয় বেঈমান না, কারণ বিধারীর জলগুহায় হে-ই আমারে পলাইতে সাহায্য করছে,” এই পর্যন্ত বলে বিধু থেমে আবারো যোগ করলো। “ওস্তাদ তুমি জানো না, জলগুহায় শাক্যরা আমগোরে বন্দি কারার পার রাজা বিক্রম যখন তোমারে মারার কতা কইতেছিল তখন জাথুরিয়া ছিল আমার পাশে। হে-ই আমার হাত বান্ধে নাই উল্টা আমারে সুযোগ কইরা দিছিল যাতে আমি তোমারে নিয়া ঝাপায়া পড়তে পারি। হেয় তোমারে বাঁচাইছে, আমারে বাঁচাইছে, আসল বন্ধুর কাম করছে হেয়।”

শামান নতুন দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল জাথুরিয়ার দিকে। একটা হাত বাড়িয়ে তাকে টেনে তুললো বসা থেকে।

“প্রকৃত বন্ধুর কাজ তুমি করছো বিধু, আগে আমারে প্রাণে বাঁচায়, জলগুহায় যা ঘটছে ওইটা স্রেফ প্রতিদান আছিল। আমি শাক্য হইতে পারি কিন্তু ওরা যা করছে হের ভাগিদার আমি হইতে পারুম না। জলগুহা থাইক্কা তোমরা পালানোর পরে রাজা বিক্রম বন্দি শাক্য সৈন্যগরে মুক্ত কইরা হেগোরে নিয়া পুরো বিধোরী দখল কইরা নেয়। লিচ্ছবী রাজা হেমচন্দের যতো লোক আছিল বেশিরভাগই মারছে। বাকি সবাইরে বন্দি কইরা রাখছে। উরগ যারা বাকি ছিল হেগোরেও মারছে। এরপরে হেরা ওইখান থাইক্কা রওনা দেয় থারুগর গ্রামের দিকে।”

“থারুগর গ্রামে একদিকে ভিতর থাইক্কা শাক্য যারা ভিতরে অছিল হেরা আক্রমণ চালায়, লগে বাইরে থাইক্কা যোগ দেয় রাজা বিক্রমের লোকেরা। হেরাই রাজা মানরুরে মারছে, বাকিগরে যারে পাইছে মারছে। যারা জঙ্গলে পলাইছে হেরা বাইচ্চা গেছে।”

“কালন্তি, ধোয়ী, ঘোষিত ওদের কী খবর?” বলতে গিয়ে শামানের গলা কেঁপে উঠলো। “ওরা কি বেঁচে আছে?”

“ওরা বাইচ্চা আছে, তয় রাজা বিক্রমের বন্দিশালায় বন্দি। হেগোরে নিয়া রাজা বিক্রমে পরিকল্পনা আছে,” বলে সে শামানের চোখের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে বলে উঠলো। “হেগো কথা জিগাইলা ওস্তাদ, বুদ্ধের অন্ধকারের অবতারের কথা জিগাইলা না? তুমি জানো না রাজা বিক্রম ওইডা দিয়া কী করবো?”

জাথুরিয়ার কথা শুনলেও কোন জবাব দিলো না শামান। কী বলবে।

“রাজা বিক্রম আইজকার মধ্যে পুরা কন্নরের দহল নিয়া শুঙ্গগরে খবর পাঠাইছে। হেয় এই রাজ্য থেকে সব থারু, সব লিচ্ছবী আর সব উরগরে যেহানে পাওয়া যাবে মারার ঘোষণা দিছে। সেইসাথে দুই তিব্বতি যোদ্ধার কাটা মাথার জন্যে হাজার স্বর্ণমুদ্রা পুরষ্কার ঘোষণা করা অইছে। তয় এইগুলাও কোনডাই বড় খবর না বড় খবর অইলো আইজ রাইতেই বুদ্ধের অবতার শুঙ্গগর হাতে তুইল্লা দেয়া অইবে। তাও কেমনে জানো,” বলে সে সবার কৌতুহলি দৃষ্টি পরখ করে বলে উঠলো। “আজ সন্ধায় বিধোরী থেইক্কা মুর্তি মন্তলার হাটে আনা অইবে। সেইহানে নাকি রাজ্যের সব প্রজাগর সামনে স্বয়ং বুদ্ধের অন্ধকার অবতার নামায়া আনা হবে।”

জাথুরিয়া এই পর্যন্ত বলতেই হেসে উঠলো শামান। “এরকম কিছুই হবে না, কারণ এর আগেই আমরা সেটা প্রতিরোধ করবো।”

“কেমনে ওস্তাদ, আমগো লোক নাই, কোন অস্ত্র নাই,” বিধু কথা বলে উঠলো। “কালন্তি-ধোয়ী-ঘোষিত তার হাতে বন্দি। একটা সেনাবাহিনীর লগে আমরা কী করতে পারমু?”

“আমাদের এগুলোর কোনটাই না থাকতে পারে কিন্তু বিরাট একটা শক্তি আছে,” বলে সে একে-একে সবাইকে দেখে নিয়ে বলে উঠলো। “তোমরা যদি আমাকে সহায়তা করো তবে আমি এটা তো প্রতিরোধ করতে পারবোই, সেইসাথে কালন্তি-ঘোষিত-ধোয়ীকেও ফিরিয়ে আনবো, আর সেইসাথে থারুদের সাথে এই জঘন্য অনাচারের জন্যে চূড়ান্ত প্রতিশোধ নেবো রাজা বিক্রমের ওপরে ।”

“কিন্তু কেমনে সম্ভব সেইটা?” বিধু কৌতুহলি স্বরে জানতে চাইলো।

“সম্ভব, কারণ আমার হাতে বিরাট একটা শক্তি আছে। ডুকপা লামা মারা যাবার আগে আমাকে অনেককিছুই বলে গেছে,” বলে শামান যোগ করলো। “আমি বুদ্ধের অন্ধকার অবতারের রহস্য জানি।”

অধ্যায় পঞ্চান্ন

বর্তমান সময়

ওসমানি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট।

সিলেট ওসমানি মেডিকেল কলেজের করিডর ধরে প্রায় দৌড়ে অপারেশন থিয়েটারের দিকে এগিয়ে চলেছে সুলতান আর ইকবাল।

তারা সুরমা নদীর টাইটানিকে গন্ডগোলের পর জালাল আর তানভীর মিলে ব্ল্যাক বুদ্ধা নিয়ে ল্যাবে রওনা দেয়ার পর থেকেই দুজনে টানা কাজ করে গেছে। মোটমুটি যখন সব গুছিয়ে এনে ভোরের আলো ফুটতে যাবে এমন সময় সিলেট থানা থেকে একটা কল পেয়ে ইকবাল সচকিত হয়ে ওঠে।

সেইসাথে সুলতানকে জানায় দূর্ঘটনা ঘটে গেছে। কী ঘটেছে একেবারে সঠিকভাবে বোঝাতে না পারলেও এটা বলতে পেরেছে সে যে ল্যাবে কিছু একটা ঘটেছে, সেখানে ঝামেলা হয়েছে। ওসি জালালকে মারাত্মক আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তার সাথে কমান্ডার তানভীরও আছে, কিন্তু তার কী অবস্থা, সে আহত বা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে কিনা সেটা ইকবাল বলতে পারেনি। খবরটা শোনামাত্রই ওরা তেমুখীর কাছ থেকে পুলিশের একটা জিপ ম্যানেজ করে রওনা দেয় সিলেট ওসমানি মেডিকেলের উদ্দেশ্যে। ওরা হাসপাতালে পৌছাতে পৌছাতে সকাল হয়ে গেছে। ভোরের আলো ফুটতে-ফুটতে ওরা হাসপাতালে প্রবেশ করে জানতে পারে, ওসি জালাল উদ্দিনকে মারাত্মক আহত অবস্থায় অপারেশন থিয়েটারের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কামন্ডার তানভীর মালিক অপারেশন থিয়েটারের সামনেই আছে। সেই পুলিশের কাছ থেকেই অপারেশন থিয়েটারটা কোনদিকে আছে সেটা জেনে নিয়ে দুজনে এখন ভোর বেলার খালি করিডর ধরে প্রায় দৌড়ে চলেছে সেদিকে।

অপরেশান থিয়েটারের কাছাকাছি এসে ওয়ার্ড দিয়ে বেরিয়ে আসা ট্রলিতে করে নিয়ে যেতে থাকা এক রোগীর সাথে আরেকটু হলে ধাক্কা খেয়ে নিজেও পড়তে যাচ্ছিলো রোগীকেও প্রায় ফেলে দিতে যাচ্ছিলো সুলতান। কোনমতে সামলে নিয়ে অপারেশান থিয়েটারের সামনে প্রবেশ করলো ওরা। অপারেশান থিয়েটারে একটার পর একটা রোগীর অপারেশান চলতেই থাকে। তাই এটার সামনে ভিড়ও থাকে সবচেয়ে বেশি।

সকালবেলা হলেও একদল উৎকণ্ঠিত আত্মীয়-স্বজনের ভিড়ে বসে থাকা তানভীরকে দেখে সুলতানের কলজেটা প্রায় লাফিয়ে উঠলো। কারণ আহত-বিধ্বস্ত রক্তে রঞ্জিত হয়ে থাকা তানভীরকে দেখে মুহূর্তের জন্যে সুলতান ভেবেছিল তানভীরেরই বুঝি গুলি লেগেছে।

তানভীরের রক্তে রঞ্জিত শার্ট দেখে এমনটা মনে হয়েছে ওর কাছে কিন্তু ওদেরকে দেখতে পেয়ে তানভীরকে স্বাভাবিকভাবে উঠে আসতে দেখে বুঝলো সে ঠিকই আছে।

"কি ব্যাপার বস, হয়েছে কি?" সুলতান একে তো দৌড়ে আসার বেগে হাঁপাচ্ছে তার ওপরে সে আসলে কথা খুঁজে পাচ্ছে না, কী বলবে। বিশেষ করে এখনো সে জানেই আসলে এখানে ঘটছে কি। "জালাল ভাইয়ের কি অবস্থা?"

"বস, আসলে হয়েছিল কি?" সুলতান যে-প্রশ্নটা আবারো করতে যাচ্ছিলো সেটা বেরিয়ে এলো ইকবালের মুখ দিয়ে।

তানভীর কোন জবাব না দিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো ওদের দিকে। তার সাদা শার্ট জালালের রক্তে রঞ্জিত হয়ে আছে। তানভীরের জিন্সের প্যান্টেও রক্তের ছাপ। গায়ের লেদার জ্যাকেকটা খুলে হাতে ধরা। সুলতানের কাছে মনে হলো মানুষটাকে এখন পর্যন্ত যতোক্ষণ ধরে দেখছে, এরকম দিশেহারা একবারও লাগেনি। তানভীর এগিয়ে এসে নিজের লেদার জ্যাকেটটা ইকবালের হাতে ধরিয়ে দিয়ে একটা হাত রাখলো সুলতানের কাঁধে। তারপর ফিরে তাকাল সুলতানের চোখে।

তানভীরের চোখ দুটো বসে অছে গর্তে, চেহারা একেবারে বিধ্বস্ত। সুলতানের চোখে চোখ রেখে সে দুইবার মুখ খুলেও কথা বলতে পারলো না। তৃতীয়বারের চেষ্টায় পরিষ্কার কথা বলে উঠলো। "সুলতান আমি ধোঁকা খেয়ে গেছি। ডক্টর মিতায়নই আসলে জেড মাস্টার। প্রফেসর টেড চ্যাঙ আসলে নির্দোষ ছিল। প্রফেসর টেড চ্যাঙই ছিল এই কেসের মূল প্রবক্তা, জেড মাস্টার প্রফেসর মিতায়নের কৃত্রিম একটা প্রোফাইল তৈরী করে সেটার আড়ালে লুকিয়ে সব কাজ সারছিল। বিশেষ করে আমাদেরকে সে ব্যবহার করেছে নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্যে। আমাদেরকে দিয়ে সে ব্ল্যাক বুদ্ধা উদ্ধার করিয়ে ওটা নিয়ে পালিয়েছে," বলে সে একটু থেমে ধীরে-ধীরে ইকবাল আর সুলতানকে বিস্তারিত বলে গেল ভোরবেলা ল্যাবের ভেতরে আসলে কী ঘটেছে।

তানভীরের কথা শেষ হতে দুজনেই চুপ হয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর সুলতান বলে উঠলো, "জালাল ভাইয়ের কী অবস্থা এখন?"

"ওটিতে ঢোকানো হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। এতোক্ষণে মনে হয় অপারেশনও শেষ হয়ে গেছে। তবে ডক্টর কিছু জানায়নি।"

"ল্যাব থেকে বের হলেন কিভাবে?" সুলতান প্রশ্ন করলো।

"ওরা বেরিয়ে যাবার পর জানালা দিয়ে আমি চিৎকার করতে থাকি," তানভীর যোগ করলো। "কিছুক্ষণ পরে রাস্তা থেকে একজন সুইপার আমার চিৎকার শুনে দেখতে আসে কী হয়েছে। এরপর..." বলে তানভীর কাঁধ ঝাঁকালো।

"বস, ইএএফ তো আমাদের চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে," সুলতান চিন্তিত মুখে বলে উঠলো। "একে তো ওদেরকে আপডেট দেয়া হয়নি, তার ওপরে আবার নিজেরা মাতব্বরি করে

ব্ল্যাক বুদ্ধা উদ্ধার করেও হারিয়েছি আমরা।”

“এগুলোর কোনটাই গুরুত্বপূর্ণ না,” তানভীর ইকবালের হাত থেকে জ্যাকেটটা নিয়ে নিলো। “ওরা আমাকে ধরবে নিজেদের আয়ত্বের ভেতরে জেড মাস্টারকে পেয়েও বুঝতে পারা তো দূরে থাকা আমরা তার দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছি, এটা-”

“আচ্ছা ওরা এভাবে ল্যাবে, মানে-” তানভীরকে থামিয়ে দিয়ে ইকবাল কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু তার আগেই তানভীর তাকে থামিয়ে দিয়ে কথা বলে উঠলো।

“আমি এখন এতো কিছু বলতে পারবো না,” বলে তানভীর ইকবালের হাত থেকে গাড়ির চাবিটা নিয়ে নিলো। “এটা কি জিপের চাবি?” ইকবাল মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতেই তানভীর বলে উঠলো, “আমি এখন ল্যাবে যাবো, গোসল দিবো, খাবো তারপর ঠান্ডা মাথায় ভাবতে বসবো। এতোসব কিছু হয়েছে একমাত্র তাড়াহুড়োর কারণে। আমি যদি একটু ঠান্ডা মাথায় ভাবতে পারতাম...” বলে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ইকবালের কাছ থেকে জিপের নম্বর জেনে নিয়ে ওদেরকে জালালের শারীরিক অবস্থার আপডেট জানাতে বলে চলে এলো পার্কিং লটে। সেখানে এসে নম্বর মিলিয়ে জিপটা খুঁজে বার করে ওটা নিয়ে চলে এলো ল্যাবে। ল্যাবে পৌছে নিজের রুমে গিয়ে খাবারের অর্ডার দিয়ে গোসলে ঢুকলো।

গরম জল দিয়ে ফ্রেশ গোসল দিয়ে, ফার্স্ট এইড কিট খুলে নিজের কাটাকুটির যত্ন নিতে বসলো ও। এর আগে ওসমানী মেডিকেলে ডক্টর চেক করে বলেছে মেজর কোন ইনজুরি নেই। ছোট-খাট ডাক্তারি শেষ করে খাবার খেয়ে নিয়ে বিছানার ওপরে পদ্মাসনে বসে ও মেডিটেশন করতে শুরু করলো।

ওকে নিজের কাছে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে, ব্যবহার করতে হবে নিজের অ্যানালিটিক্যাল স্কিল। ঠান্ডা মাথায় পুরো পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে, একে একে ভাবতে লাগলো সব প্রশ্নের উত্তর। ছোট্ট একটা হিসেব মেলানো বাকি রেখেই হঠাৎ ও বিছানা থেকে নেমে ইন্টারকমে কল দিলো ল্যাবের অপারেটরকে। টমি ল্যাবে আছে কিনা জেনে নিয়ে তাকে কয়েকটা নির্দেশ দিলো ও।

টমির সাথে কথা শেষ করে সিকিউরড লাইনে কল করলো পাশা স্যারকে। কিন্তু উনি কল না ধরাতে চুপচাপ জানালার কাছে এসে একটা সিগারেট ধরিয়ে আবারো ভাবতে শুরু করলো ও। হঠাৎ মনে হলো মাকে কল করা হয়নি। কিন্তু কয়েকবার কল করার পরও মা কল ধরলো না। ফোন রেখে পোশাক পরতে শুরু করলো ও। জিন্স প্যান্টটা পায়ে গলিয়েছে সাথে সাথে দরজায় ধাম-ধাম শব্দ হলো।

তানভীরের প্যান্ট পরা শেষ না হতেই আবারো দরজায় জোরে-জোরে শব্দ শুনে ও জবাব দিলো, “আসছি।” কোনমতে প্যান্টটা পরা শেষ করে দরজার লকটা আনলক করতেই

ধাম করে খুলে গেল ওটা। আরেকটু হলে তানভীরের নাক চেপ্টা হয়ে যেত দরজার আঘাতে।

দরজা খুলে যেতেই দুই পা পিছিয়ে গেল ও। ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলো তিনজন মানুষ। প্রত্যেকের পরনে বিশেষ কালো পোশাক। কেউই অস্ত্র বের করেনি কিন্তু তানভীর দেখলো প্রত্যেকেরই একটা করে হাত কোমরে, অস্ত্রের ওপরে রাখা।

"আপনি তানভীর মালিক?" মোটা লালচে গোঁফওয়ালা অফিসার প্রশ্ন করলো। এই লোকটাকেই তানভীর ঢাকা এয়ারপোর্টে ইএএফের প্রধান বাবুল আহমেদের সঙ্গে দেখেছিল। তানভীর হ্যাঁ-সূচক জবাব দিতেই সে বলে উঠলো, "আপনি আমাদের সাথে আসবেন, ইএএফের প্রধান বাবুল আহমেদ আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

"বাবুল স্যার, সিলেটে?" তানভীর বেশ অবাক হয়েই জানতে চাইলো।

"কোন কথা নয়," মোটা গোঁফ প্রায় ধমকে উঠলো। "আপনি আমাদের সাথে আসুন," বলে সে একটা হাত বাড়ালো তানভীরকে ধরার জন্যে। লোকটা তানভীরের কাঁধে একটা হাত রাখতেই রাগের হলকা বয়ে গেল ওর শরীরে। লোকটা ওর বাম কাঁধে নিজের ডান হাত রেখেছে, লোকটার কব্জিটা আলতো করে ধরে চট করে বিশেষ আর্ম লকে মোচড় দিলো তানভীর। এটাকে বলা হয় রিভার্স আর্ম লক। দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে পারলে যেকোন মানুষকে মুহূর্তের ভেতের শুইয়ে দেয়া সম্ভব।

তানভীর এতো দ্রুত রিঅ্যাক্ট করে উঠবে লোকটা কল্পনাতেও ভাবতে পারেনি। আর্মলকে লোকটার কব্জি ধরে মোচড় দিতেই ব্যথায় বসে পড়লো সে। তবে তার চেয়েও বেশি প্রতিক্রিয়া হলো তার পেছনের লোকদের ভেতরে। পেছনের দুজন মেশিনের মতো যার-যার অস্ত্র বের করে আনলো। সেইসাথে একজন মৃদু শিস দিতেই আরো দুজন অস্ত্রধারী ঢুকে পড়লো রুমের ভেতরে। ওদের ভাব দেখে মনে হচ্ছে গুলি করে দিবে যেকোন মুহূর্তে। সেই মোটা গোঁফই একটা হাত তুলে থামতে বললো নিজের লোকদেরকে।

একহাতে অন্য হাতটা ডলতে ডলতে সোজা হয়ে দাঁড়ালো সে। তানভীর দেখলো রাগে লাল হয়ে গেছে মানুষটার মুখ।

"অফিসার বিহ্যাইভ ইয়োরসেল্ফ, আমি যদি এখানে সরাসরি বাবুল স্যারের নির্দেশ পালনের জন্যে না আসতাম তবে..." সে কথা শেষ না করে নিজের লোকদেরেক অস্ত্র নামানোর ইশারা করে বলে উঠলো, "আপনি জলদি চলুন, দেরি হলে সে দায়ভার আমার নয়।"

তানভীর বিছানার ওপরে রাখা নিজের কাপড় দেখালো। "কাপড় তো পরতে পারবো, নাকি এরকম আধ ন্যাংটো অবস্থাতেই আপনাদের বসের সাথে মিটিং করতে হবে?"

মোটা গোঁফের মুখটা যেন রাগের সাথে জ্বলছে, কিছু না বলে সে কাপড় পরার জন্যে ইশারা করলো। তানভীর দ্রুত কালো একটা ফুল হাতা শার্ট পরে ওটার ওপরে কালো

জ্যাকেট চাপালো। ব্যাগের ভেতরে এই সেটটাই ছিল ওর। কাপড় পরা হতেই লোকগুলোর সাথে বেরিয়ে এলো ও করিডরে। ওকে নিয়ে সোজা চলে এলো ওরা ল্যাবের সেই কনফারেন্স রুমে।

রুমের ভেতরে প্রবেশ করে দেখলো ইএএফের প্রধান বাবুল আহমেদ পুরোদস্তুর ইউনিফর্মে সজ্জিত হয়ে বসে কথা বলছে ল্যাবের প্রধান ডক্টর প্রবীরের সাথে। ওকে দেখতে পেয়ে ডক্টর প্রবীর উঠে দাঁড়ালো। বাবুল আহমেদ স্রেফ ঘাড় ঘুরিয়ে ওকে দেখলো একবার। তারপর হাতের ইশারায় বসতে বললো।

"কমান্ডার, আপনি সুস্থ আছেন?" ল্যাবের প্রধান স্প্যানিশ অভিনেতার মতো দেখতে ডক্টর প্রবীর জানতে চাইলো।

তানভীর মাথা নেড়ে জবাব দিলো ও ভালো আছে। বাবুল আহমেদের দিকে দিকে ফিরে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগে বাবুল আহমেদই কথা বলে উঠলো।

"কমান্ডার, আপনি কি একটা গল্প জানেন?" বাবুল আহমেদ এখনো ওর দিকে সরাসরি তাকায়নি। একহাতে নিজের মোবাইলটা নাড়াচাড়া করতে করতে বাইরের তকিয়ে কথা বলছে সে। তানভীর কোন জবাব না দিয়ে তাকে দেখলো। তারপর বেশ দৃঢ় গলাতেই জানতে চাইলো, "কোন গল্প স্যার?"

বাবুল আহমেদ সরাসরি ফিরে তাকাল ওর দিকে। কোন কথা না বলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তানভীরও উদ্ধত দৃষ্টিতে সরাসরি তাকিয়ে আছে। "কমান্ডার, আমি তোমার সাহস দেখে অবাক হচ্ছি। এতোকিছুর পরেও তুমি গল্প শুনতে আগ্রহী, ব্যাপারটা খুবই অবাক করছে আমাকে," বলে বাবুল অহমেদ রোবটের মতো টেবিল ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা সেই লোকগুলোর ভেতরে মোটা গোঁওয়ালার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, "ফারুক, তুমি ভাবতে পারো এই লোক এখনো গল্প শুনতে চায়।"

লোকগুলা প্রায় সবাই হেসে উঠলো। সেই মোটা গোঁফ বাবুল আহমেদকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো। "স্যার, একজন ফিল্ড এজেন্ট কি জিনিস সেই ব্যাপারে এর কোন ধারণা নেই, তাই... "

"একদম ঠিক বলেছো ফারুক, ফিল্ড এজেন্ট-"

বাবুল আহমেদকে কথা শেষ করতে দিলো না তানভীর। "স্যার, অবশ্যই আমি জানি না ফিল্ড এজেন্টের মর্ম কি, কারণ আমি আপনাদের মতো ফিল্ড এজেন্ট নই। তাহলে আমি এখনো বুঝে উঠতে পারছি না আমার মতো আপনাদের ভাষায় 'একজন আনাড়ি'কে কেন আপনারা এতো গুরুত্বপূর্ণ একটা মিশনে কমান্ডার করে পাঠালেন।"

"কারণ, তোমার বসের কথায় আমি তোমার ওপরে বিশ্বাস রেখেছিলাম," বাবুল আহমেদ প্রায় গর্জে উঠলো। "সেটার প্রমাণও তুমি দিয়েছিল একদিনের ভেতরে ডক্টর মিতায়নকে খুঁজে বের করে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এসে এভাবে তুমি সব ধ্বংস করবে এটা কে ভাবতে

পেরেছিল। আমি ভেবেছিলাম তুমি পাশার কাছের লোক। তুমি অন্তত তার কথা শুনবে। কতো বড় সাহস, প্রথমবারের মতো ফিল্ডে নেমে তুমি আনঅথরাইজড অপারেশন কনডাক্ট করো! তুমি নিজের জীবন ঝুঁকিতে ফেলেছো, তোমার দলের লোকজনের জীবন ঝুঁকিতে ফেলেছো। সাধারণ জনগণের জীবন ঝুঁকিতে ফেলেছো, একটা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র অর্বাচীনের মতো সমাধান করার চেষ্টা করে সব গুবলট করেছো। ডু ইউ নো হোয়াট দ্য হেল ডিড ইউ ডু?" বাবুল আহমেদ রীতিমতো গর্জন করে চলেছে।

তানভীরের মাথা নিচু হয়ে গেছে। কথাগুলো একদম ঠিক। তবুও ও বোঝানোর চেষ্টা করলো। "স্যার, আমার আনঅথরাইজড অপারেশনের কারণে কিন্তু কিছু ঘটেনি। বরং-"

"কমান্ডার, তুমি কথা বলবে না, ইউ আর ফিনিশড, ইয়োর স্টোরি ইজ ফিনিশড," বাবুল আহমেদ রাগের সাথে উঠে দাঁড়িয়েছে। তানভীরের দিকে এগিয়ে এসে সে তানভীরের একেবারে মুখের কাছে মুখ এনে বলে উঠলো, "তোমার কাহিনী শেষ।"

তানভীর বাবুল আহমেদের রাগে জ্বলন্ত চোখের দিকে তাকিয়েই দৃঢ় স্বরে বলে উঠলো, "স্যার, আমার গল্প তো স্রেফ শুরু হলো। যদিও আমার গল্পটা একটু লম্বা কিন্তু এর ক্লাইমেক্স এখনো বাকি।"

বাবুল আহমেদ এখনো তানভীরের দিকে তাকিয়েই আছে। ছোট্ট করে সে জানতে চাইলো, "মানে?"

"মানে ব্যাখ্যা করার আগে আমি আপনার সাথে একা কথা বলতে চাই," বলে সে বাবুল আহমেদের লোকদেরকে দেখালো সেইসাথে ডক্টর প্রবীরকেও। "একদম একা।"

বাবুল আহমেদ একটু ভেবে সেই মোটা গোঁফ ফারুককে ইশারা করলো তার কাছে আসতে। তাকে ফিসফিসিয়ে কিছু বলে ফিরে তাকাল তানভীরের দিকে। "বলো কমান্ডার, কী বলতে চাও তুমি।"

তানভীর সবার বেরিয়ে যাবার জন্যে ইশারা করলো। "স্যার, আপনি কিছু মনে না করলে আমি ওই টেরেসে দাঁড়িয়ে কথা বলতে চাই," বলে সে টেবিলের ওপর দিয়ে একটা ছোট্ট চিরকুট এগিয়ে দিলো বাবুল আহদেমের দিকে। চিরকুটটা পড়ে বাবুল আহমেদ চিন্তিত মুখে তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। তানভীরও তাকিয়ে আছে, হুট করেই উঠে দাঁড়ালো বাবুল আহমেদ। "চলো, কমান্ডার।"

ওরা কনফারেন্স রুমের সাথে লাগোয়া টেরেসে চলে এলো। বাইরে খোলা টেরেসে হালকা রোদের ভেতরে দাঁড়িয়ে তানভীরের দিকে তাকিয়ে প্রায় ধমকে উঠে বাবুল আহমেদ একটা আঙ্গুল তুলে তানভীরকে সাবধান করে দিলো। "কমান্ডার, তুমি অনেক ঝামেলা করেছো কিন্তু যদি তুমি আর কোন বাড়াবাড়ি করো তবে-"

"স্যার, আমার অনুমান যদি ভুল না হয় তবে আমি জানি ব্ল্যাক বুদ্ধা কোথায় আছে," বাবুল আহমেদেকে থামিয়ে দিয়ে তানভীর বলে উঠলো। বাবুল আহমেদের অবাক দৃষ্টির

সামনেই ও যোগ করলো, “সেটাকে উদ্ধার করতে হলে অবশ্যই আপনার সহায়তা লাগবে।”

অধ্যায় ছাপ্পান্ন

সময়: ১৮৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ

কন্নোর, ভারতবর্ষ

হালকা স্বরে কারো ডাকে শামানের ঘুমটা ভেঙে গেল। অভ্যাসবশত ঘুমটা চটে যেতে আনমনেই ওর হাত চলে গেল বিছানার পাশে রাখা অস্ত্রের দিকে। কিন্তু মুখের সামনে চেহারাটা দেখে নিজেকে সামলে নিলো ও। বয়স্ক একজন মহিলা, হাতে একটা জলের পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শামানকে ডাকার জন্যে সামান্য ঝুঁকে ছিল সে, শামান উঠে বসতেই পিছিয়ে গেল খানিকটা।

শামান মৃদু হেসে তাকে আশ্বস্ত করলো। আড়মোড়া ভেঙে মহিলার দিকে হাত বাড়ালো জলের পাত্রটার জন্যে। শামানের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছোটখাট অসংখ্য ব্যথা-গতকালের যুদ্ধের ফসল। ফলে শরীর নাড়ালেই শরীরের এখানে ওখানে নানা ধরণের ব্যথার অস্তিত্ব অনুভব করছে, তবে এসব কিছু ওর জন্যে নতুন নয়। গতকাল ঝড়ের মতো একটার পর একটা ঘটনা ঘটে যাবার পর সারারাত একবারের জন্যে হলেও দুই চোখের পাতা এক করেনি। ফলে আজ দুপুরের ভেতরে সব পরিকল্পনা ঠিক করে জঙ্গলের ভেতরের দিকে থারুদের ফসলের গুদাম আর গবাদী পশুর সংরক্ষণাগারের দিকে রওনা দিয়ে দুপুরের ভেতরে পৌছানোর পর ওর প্রথম কাজ ছিল পরিচ্ছন্ন হয়ে ঘুমানো। সেই যে ঘুম দিয়েছিল এই বৃদ্ধার ডাকে ঘুম ভাঙলো।

মহিলার হাত থেকে জলের পাত্রটা নিতে-নিতে শামান একবার গুদাম ঘরটার একপাশের ছোট্ট জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে চমকে গেল। বাইরে গভীর অন্ধকার নেমে এসেছে। শামান জলের পাত্রটা হাতে নিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নিতে মহিলা হাতের ইশারায় ওর শোবার জায়গাটার পাশেই একটা খাবারের পাত্র দেখালো। শামান পাত্রটা তুলে নিয়ে খেতে-খেতে বৃদ্ধাকে ভালোভাবে খেয়াল করলো। বুড়ো মহিলার মুখের একপাশে পুড়ে যাবার দগ-দগে ক্ষত। চোখে-মুখে কেমন জানি দিশেহারা ভাব।

শামানের বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো। যুদ্ধ সাধারণ মানুষের সাথে কী করতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ এই বৃদ্ধা। ওর বুকের গভীর থেকে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। কে জানে হয়তো ওর নিজেও মা-ও কোন একদিন এরকমই কোন এক যুদ্ধের বলি হয়েছে। কিংবা কে জানে হয়তো এই বৃদ্ধার মতোই দিশেহারা হয়ে বেঁচে আছে আজো। শামানের মনে হলো বৃদ্ধাকে কিছু বলা উচিত। দুবার মুখ খুলেও কিছু না বলে চুপ করে রইলো ও। খেতে লাগলো মন দিয়ে।

"আইজ নাকি কী অইবে মন্তলার বাজারে?" শামান খেতে খেতেই বৃদ্ধার প্রশ্নটা শুনে মুখ তুলে তাকাল। কী জবাব দিবে বুঝতে না পেরে চুপ মেরে রইলো।

"শাক্যগর অত্যাচারের শেষ কোনহানে?" বলে বৃদ্ধা অন্যদিকে ফিরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। "আইজ থেকে বিশ বছর আগে আমগো লগে শাক্যগর যুদ্ধের সময় আমার স্বামী মারা যায়। তখন শাক্যর থারুগর লগে বেঈমানি কইরা শত-শত থারু সৈন্যরে বলি দিছিল। আর আইজ বিশ বছর পরে বিক্রমের হাতে আমার পোলা মারা গেছে," বলে বৃদ্ধা ফিরে তাকাল শামানের দিকে। "কইতে পারো বাপ কী নিয়া বাঁচবো আমি?" বৃদ্ধার চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে তার মুখের পোড়া ক্ষতের ওপরে।

কোন কারণ ছাড়াই শামানের চোখে জল চলে এলো। খাওয়া শেষ করে হাত ধুয়ে বৃদ্ধার দুই কাঁধে হাত রেখে শামান বলে উঠলো। "আমি কথা দিচ্ছি মা, যা হয়েছে হয়েছে কিন্তু এই উপত্যকায় আবারো শান্তি ফিরে আসবে। তোমাদের কালন্তি ফিরে আসবে, আর আজ মন্তলার বাজারে খারাপ কিছুই হবে না," বলে শামান চোরা চোখে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে রওনা দিলো বাইরের দিকে।

ইচ্ছে করেই বৃদ্ধার চোখের সাথে নিজের দৃষ্টি মেলাতে পারেনি ও। যদিও মনে-মনে একটা পরিকল্পনা ঠিক করেছে ও তবুও নিজেও জানে না একটা সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে আসলে কতোখানি কী করতে পারবে ও। আর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানে যার আপনজন গেছে তারই ক্ষতি, যুদ্ধের পর যতোই শান্তি ফিরে আসুক হারানো মানুষ তো আর ফিরে আসে না।

বাইরে বেরিয়ে দেখলো অন্ধকার নেমে এসেছে। থারুদের ফসলের গুদামের একপাশে বিরাট একটা জায়গা খালি করা হয়েছে, সেদিকেই রওনা দিলো ও। সেখানেই গুদাম ঘরের ছাউনির নিচে জড়াজড়ি করে অবস্থান করছে থারুদের গ্রাম থেকে পালিয়ে আসা জনগোষ্ঠি। ওদের সর্বাগ্রে অবস্থান করছে থারু সৈনিকেরা। শামান সেদিকে এগিয়ে যেতেই সৈনিকদের প্রধান এগিয়ে এলো ওর দিকে। লম্বা দাড়িওয়ালা লোকটা ওকে দেখে অভিবাদন জানালো। "যোদ্ধা, আমরা প্রস্তুত। সবাই আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় আছে।"

শামান নিজের তলোয়ারটা কোমরে ভালোভাবে গুঁজে নিয়ে লম্বা দাড়ির দিকে ফিরে জানতে চাইলো, "বিধু কোথায়?"

“এই যে ওস্তাদ,” জবাব এলো পেছন থেকে। শামান ফিরে তাকিয়ে দেখলো কোমরে বন্ধনি আঁটতে-আঁটতে এগিয়ে আসছে বিধু। ওদের সামনে এসে থেমে গেল সে। ওরা সকালবেলা থারুদের গ্রামে জাথুরিয়ার সাথে দেখা করার পর ওখানেই প্রাথমিক কিছু আলোচনা সেরে নিয়ে রওনা দেয় জঙ্গলের ভেতরের দিকে। জাথুরিয়া ওদেরকে প্রাথমিক সব তথ্য জানিয়ে বিধোরীর দুর্গে ফিরে যাবার জন্যে রওনা দেয়। কারণ তাকে খুঁজে না পেলে সন্দেহ করতে পারে বিক্রম কিংবা শঙ্কর।

বিধু কাছাকাছি আসতেই শামান জানতে চাইলো, “জাথুরিয়ার কাছ থেকে আর কোন খবর এসেছে?”

“হ্যাঁ, এসেছে,” কাছাকাছি এসে হাঁপাতে-হাঁপাতে বিধু জবাব দিলো। “সেটা আনার জন্যেই জঙ্গলের অন্যপাশে গেছিলাম আমি।”

“জাথুরিয়া নিজে এসেছিল?”

“নাহ,” দুইপশে মাথা নাড়তে নাড়তে বলে উঠলো বিধু। “হেয় লোক পাঠাইছিল। ওই লোকই সব খবর দিছে। রাজা বিক্রম কহন কী করবো, কেমনে কী করবো সব বইলা গেছে হেয়,” একটু থেমে সে সব বিস্তারিত বলে গেল শামানকে।

শামান মনোযোগ দিয়ে সব শুনে একটু ভেবে ফিরে তাকাল থারু সৈনিকদের প্রধান, লম্বা দড়িওয়ালা লোকটার দিকে। “তোমরা কয়জন আছো দলে?”

লোকটা নিজের লোকদের দিকে একবার দেখে নিয়ে জবাব দিলো, “মোট আছি আমরা আঠারোজন, আর গ্রামের কিছু যুবক আছে। চাইলে ওদেরকেও দলে নেয়া যাইতে পারে।”

শামান এক মুহূর্ত চিন্তা করলো। “নাহ শুধু আজ সন্ধ্যের কথা চিন্তা করলে হবে না। এখানকার নিরাপত্তার ব্যাপারটাও দেখতে হবে। এক কাজ করো, তোমার দলের আঠারো জনের ভেতর থেকে পনেরো জনকে বেছে নাও। বাকি তিনজন আর গ্রামের যুবকেরা মিলে এই জায়গাটা পাহারা দিবে।”

লম্বা দাড়ি দলের ভেতের লোক বাছাই করতে করতে শামান একটা লাঠি দিয়ে বালু মাটিতে দাগ কেটে জাথুরিয়ার পাঠানো তথ্য অনুযায়ী পরিকল্পনামাফিক কয়েকটা আকৃতি এঁকে ফেললো। লম্বা দাড়ি নিজের লোকদেরকে প্রস্তুত করে আনতেই ওদেরকে বালুময় জায়গাটার সামনে সারি দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলো বিধু।

লম্বা দাড়িসহ দলে পনেরো জন। সেইসাথে বিধু আর ও নিজে। “দলে তীরন্দাজ আছো কয়জন?” শামান জানতে চাইলো। পনেরো জনের ভেতরে ছয়জন হাত তুললো। ওদেরকে আলাদা করে দাঁড় করালো বিধু।

“এবার সবাই ভালোভাবে দেখো,” বলে ও মাটির দিকে নির্দেশ করলো। “আমাদের হাতে আসা তথ্য অনুযায়ী আজ সন্ধ্যের ঠিক পর দিয়েই রাজা বিক্রম তার লোক-লস্কর আর

ঘোরসওয়ার বাহিনী, বন্দি ও সেইসাথে বুদ্ধের অবতার নিয়ে মন্তলার হাটের দিকে রওনা দিবে। ওখানে পৌছে নাকি স্বয়ং বুদ্ধের অবতারের নির্দেশে হত্যা করা হবে কালন্তি-ঘোষিত-ধোয়ীসহ বাকিদেরকে। আমার পরিকল্পনা হলো; ওদেরকে আমরা মন্তলার হাটে পৌছাতেই দিবো না। পথিমধ্যেই আক্রমণ চালাবো। তাহলে ওদেরকে কাবু করারটা সহজ হবে মনে হচ্ছে। তবে শুরুতেই বলি, আমাদের পরিকল্পনার একটা বড় সমস্যা হলো, ওরা বিধোরী থেকে মন্তলার দিকে যেতে দুটো পথের কোনটা ব্যবহার করবে সেটা আমরা জানি না।"

লম্বা দাড়ি বলে উঠলো, "জোর সম্ভাবনা, ওরা বড় পথটাই ব্যবহার করবে। কারণ ঘোড়ার গাড়ি আর বাহিনী নিয়ে মন্তলা যেতে হলে ওই পথটাই সবথেকে নিরাপদ।"

"আমারও তাই ধারণা। কাজেই আমরা ধরে নেবো ওরা সেই পথেই যাবে সেই অনুযায়ীই পরিকল্পনা করবো। পরিকল্পনা খুব সহজ," বলে মাটিতে দেখালো। ওখানে পর পর কয়েকটা লম্বা বাক্সের মতো সাজানো। "যদি ধরে নেই এইটাই ওদের বহর। তাহলে প্রথমে থাকবে রাজা বিক্রমের লোকেরা। তারপর ঘোড়সওয়ার বাহিনী, তারপরে মনে হয় ঘোড়ার গাড়িতে বন্দি আর বুদ্ধি মুর্তি। আমরা তিনদলে ভাগ হয়ে যাবো। একটা দল থাকবে আমার নেতৃত্বে, এই দলটা ঘোড়ার ওপরে থাকবে। একেবারে বিধোরী থেকে নজর রাখা ও আক্রমণের মূল ভাগে থাকবো আমরা। এরপরের দলটা থাকবে তোমার নেতৃত্বে, তোমাদের কাজ হবে রাজার বাহিনীর শেষ ভাগে আক্রমণ চালানো," বলে ও আঁকা ছবির শেষটা দেখালো। "আর বাকি দলটা থাকবে বিধুর নেতৃত্বে, এই দলের বেশিরভাগ থাকবে তীরন্দাজ বাহিনী। এদের কাজ হবে দলের অগ্রভাগে আক্রমণ চালানো।"

সবাইকে বুঝে নেয়ার জন্যে একটু সময় দিয়ে ও আবারো বলে উঠলো, "আবারো বলছি, লম্বা দাড়ির দল আক্রমণ চালাবে বাহিনীর শেষ ভাগে, বিধুর দল আগ্রভাগে, দুই দিকের অক্রমণে ওরা যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে এই সুযোগে আমার দল যারা ঘোড়ার ওপরে থাকবে আমরা জায়গামতো আক্রমণ চালিয়ে বন্দিদের উদ্ধার করবো সেইসাথে বুদ্ধ মুর্তিটাও। আবারো বলছি আমাদের মূল কাজই হবে বন্দি আর মুর্তি উদ্ধার করা। আর যদি সুযোগ পওয়া যায় তবে রাজা বিক্রম আর শঙ্করাদিত্যকে শেষ করা। এই আমাদের পরিকল্পনা আর আমাদেরকে শাক্যদের ভেতর থেকে সহায়তা করবে জাথুরিয়া। কারো কোন প্রশ্ন?" কেউ কিছু জানতে চাইলো না।

বিধু আর লম্বা দাড়ির দিকে তাকিয়ে শামান বলে উঠলো, "সবাই মনে রাখবে, এই যুদ্ধ আপনজনদের বাঁচানোর যুদ্ধ, নিজের অস্তিত্বকে বাঁচানোর যুদ্ধ, সবচেয়ে বড় কথা নিজের ধর্ম, নিজের সম্মানকে বাঁচানোর যুদ্ধ, কাজেই সবাইকে প্রাণপনে লড়তে হবে," কথাগুলো বলে ও বিধুর দিকে ফিরে তাকাল। সামান্য মাথা নেড়ে সায় জানালো বিধু।

সময় এসে গেছে নিজেদেরকে প্রমাণ করার।

অধ্যায় সাতান্ন

বর্তমান সময়

নির্মাণাধীন ল্যাব, শাহী ঈদগাহ, সিলেট

মানুষ দৌড়াতে-দৌড়াতে হঠাৎ থেমে গেলে যেমন ধাক্কা খায় তানভীরের কথা শুনে বাবুল আহমেদ অনেকটা সেরকম ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল। "হোয়াট! কী বললে তুমি কমান্ডার?"

"জি স্যার, আপনি ঠিকই শুনেছেন," তানভীর দিগন্তের কাছে আবছাভাবে ফুটে ওঠা মেঘালয়ের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো। "একেবারে সঠিকভাবে না জানলেও আমি এটা অনুমান করতে পারি ব্ল্যাক বুদ্ধা ও জেড মাস্টার কোথায় আছে।"

"কমান্ডার, তুমি ঠিক বলছো তো?" বাবুল আহমেদ খুব সতর্ক গলায় কথা বলছে। "যদি তুমি ঠিক হও তবে ভালো কিন্তু যদি উল্টোপাল্টা কিছু করার চেষ্টা করো তবে তোমার ক্যারিয়ার তো যাবেই তুমি নিজেকেও বাঁচাতে পারবে না। মনে রেখো তুমি জেড মাস্টারের ব্যাপারে কথা বলছো, একজন আন্তর্জাতিক অপরাধি, যাকে এতোদিন পর্যন্ত কেউ খুঁজে বের করতে পারেনি। সে তোমার পাঞ্জার ভেতরে বসে তোমাকে নিয়ে খেলেছে, তারপর তোমাকে ব্যবহার করে জিনিসটা উদ্ধার করিয়ে তোমার হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়েছে।"

তানভীর মরিয়া হয়ে এগিয়ে গেল বাবুল আহমেদের দিকে। "স্যার, একটা ব্যাপার চিন্তা করে দেখেন। আজ ভোরের ব্যাপারটা তো সব আপনি জানেনেই। তাহলে বুঝে দেখেন, হতে পারে সে জেড মাস্টার। হতে পারে সে অনেক বড় কিছু কিন্তু সে এখানে যখন আসে সে খুবই খারাপ অবস্থায় ছিল। তার নিজের লোকেরা তার সাথে বেঈমানি করেছে-তার শরীর আহত ছিল। হঠাৎ সে এতোটা ক্ষমতা কোথায় পেল যে সে আমাদের সুরক্ষিত ল্যাবের ভেতরে নিজের লোক ঢুকিয়ে তাদেরকে দিয়ে আমাদের মতো ট্রেইনড এজেন্টদের কব্জা করে সে ব্ল্যাক বুদ্ধা নিয়ে পালালো," তানভীর তাকিয়ে আছে বাবুল আহমেদের দিকে।

"স্যার, অবশ্যই সে এখানকার ভেতরের কারো সাহায্য পেয়েছে। সেই লোকটা কে আমি জানি। অন্তত আমি অ্যানালিসিস করে বের করতে পেরেছি। সেইসাথে আরেকটা ব্যাপারও আমি অ্যানালিসিস করেছি জেড মাস্টার ব্ল্যাক বুদ্ধা নিয়ে কোথায় যেতে পারে।"

"বুঝতে পারলাম না তোমার কথা। এটা বুঝলাম যে এখানে ভেতরের কেউ জড়িত থাকতে পারে। কিন্তু এটা তুমি কিভাবে বলতে পারো সে মুর্তি নিয়ে কোথায় গেছে।"

“স্যার, এই শহরের ভেতরেই আছে সে,” তানভীর এখনো মরিয়া হয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছে বাবুল আহমেদকে। “একটা ব্যাপার ভেবে দেখুন স্যার। জেড মাস্টার মুর্তি নিয়ে আজ সকালে বেরিয়ে গেছে। এই মুহর্তে সব জায়গায় স্থল,জল- আকাশপথ মানে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত সবখানে আমাদের পাহারা আছে। আমি এটা বলছি না যে সে বেরুতে পারবে না ব্ল্যাক বুদ্ধা নিয়ে। কিন্তু আমার অ্যানসালিসিস বলে সে বেরুনোর চেষ্টাই করবে না। কারণ সেটা অনেক বেশি ঝুঁকি হবে। তারচেয়ে আপাতত এই শহরেই অনেক নিরাপদ জায়গা আছে, যেখানে সে নিজের লোকদেরকেসহ মুর্তি নিয়ে লুকিয়ে থাকবে। এমন জায়গা যেখানে তাকে খোঁজার কথা কেউ কল্পনাও করবে না।”

“কোন সেই জায়গা?”

“স্যার, আমার অ্যানালিসিস বলে দুটো সম্ভাব্য জায়গাতে সে লুকাতে পারে। এক, লাক্কাতুরার সেই বাংলো যেখান থেকে আমরা তাকে উদ্ধার করে এনেছিলাম। দুই, সিলেট শহরের দক্ষিণ সুরমা এলাকায় হেকমত আবদুল্লার বাসা। তবে আমার অ্যাসালিসিস যদি ঠিক হয় তবে আমাদেরকে রাফ গেস করার প্রয়োজনই হবে না। কারণ,” বলে তানভীর নিজের একটা আঙ্গুল তুললো। “আমাদের মাঝেই এমন কেউ একজন আছে যে জেড মাস্টারের সাথে হাত মিলিয়ে তাকে সাহায্য করেছে।”

“আর সেটা কে হতে পারে, যে এভাবে ল্যাবের ভেতরে লোক ঢুকতে দিতে পেরেছে?” বাবুল অহমেদ তানভীরের কথা বোঝার চেষ্টা করছেন এতোক্ষণে।

“স্যার, উর্দ্ধতন কেউ। যার কাছ এই ল্যাবের সমস্ত অ্যাকসেস আছে। আর এমন মানুষ একজনই আছে এই ল্যাবে। ডক্টর প্রবীর।”

বাবুল আহমেদ ঝট করে তানভীরের দিকে ফিরে তাকাল। “আর ইউ ইনসেন কামান্ডার! ডক্টর প্রবীর কতো পুরনো আর বিশ্বস্ত লোক তুমি জানো? তুমি তার বিরুদ্ধে আঙ্গুল তুলছো।”

“স্যার, এক মিনিট,” সত্যি-সত্যি তানভীর একটা আঙ্গুল তুলে বাবুল আহমেদকে থামালো। “স্যার, আমি কারো বিরুদ্ধেই আঙ্গুল তুলছি না, আমি আপনাকে কোন ব্যাপার অনুমান করতেও বলছি না। আমি ফ্যাক্ট অ্যানালিসিস করছি। আমি টমিকে নির্দেশ দিয়েছি এই ল্যাব থেকে বের হওয়া প্রতিটা টকি ডিভাইসের, প্রতিটা সেল ফোনের ইনপুট ও আউটপুট ডেটা অ্যানালিসিস করতে। যদি এই ল্যাব থেকে সন্দেহজনক কোন কোন কল বের হয় আর সেটা কোথায় যায় সেটা ট্রেস করতে পারলেই আমরা আমাদের বেঈমান কে সেটা যেমন জানতে পারবো তেমনি শত্রুর লোকেশনও পেয়ে যাবো। তারপর আপনি সেই ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নিবেন স্যার।”

বাবুল আহমেদ কিছু না বলে আপত্তির দৃষ্টিতে মাথা নাড়লো। “কমান্ডার, তুমি অথটিরির সিদ্ধান্ত ছাড়া এভাবে আর কখনো কোন কাজ করবে না। এখন টমিকে ডেকে পাঠাও

আমাকে তার সাথে কথা বলতে হবে।”

কিন্তু টমিকে ডাকতে হলো না, তার আগেই ল্যাবের এক লোক এসে জানালো কনফারেন্স রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে টমি। ডেকে পাঠানোর সাথে সাথেই টমি এসে ঢুকলো। তার পরনে আয়রন মেইডেনের টি-শার্ট, গলায় মোটা একটা হেডফোন, এক হাতে ল্যাপটপ, অন্যহাতে একটা মডেমের মতো জিনিস।

“টমি কিছু পেয়েছো?” তানভীর উদগ্রীব গলায় জানতে চাইলো।

“মনে হচ্ছে কিছু একটা পেয়েছি স্যার। এখন থেকে মিনিট সাতেক আগে আমাদের ল্যাবের ওয়াশরুম থেকে একটা আননোন নম্বর থেকে কল বেরিয়ে গেছে। আমি প্রথমবার ট্রেস করতে পারিনি। মনে হয় কলটা কেটে গিয়ে আবারো কল করা হয় তখন সেটা ট্রেস করতে পারি। কলটা বেরিয়েছে আমাদের ল্যাবের এই ফ্লোরের ওয়াশরুম থেকে। এখন থেকে ঠিক সাত মিনিট আগে,” নিজের ঘড়ি দেখতে দেখতে বললো টমি।

“মানে স্যার আমি যখন আপনার সাথে একা কথা বলার জন্যে ল্যাব খালি করতে বলি তার একটু পরেই,” তানভীর খুশি হয়ে বলে উঠলো।

“তাহলে সে-সময়ের ওই করিডরের সিসিটিভি চেক করো,” বাবুল আহমেদে নির্দেশের গলায় বলে উঠলো।

“করেছি স্যার, এই যে মানুষটা,” বলে টমি তার ল্যাপটপ ঘুরিয়ে দেখালো। তিনজনেই তাকিয়ে দেখেলো একমাথা ঝাঁকড়া এলোমেলো চুলের ডক্টর প্রবীর ওয়াশরুমে ঢুকলেন। পরেই এদিক সেদিক তাকিয়ে বেরিয়ে এলেন।

“বাস্টার্ড,” বাবুল আহমেদ গলায় রাগের হলকা।

“আরো মজা আছে স্যার, যে নম্বর থেকে থেকে কলটা করা হয়েছে সেটা একটা স্যাটেলাইট ফোন,” বলে টমি আরো কিছু বলার পায়তারা করছিল। তার আগেই তানভীর তাকে ধমকে উঠে বললো। “টমি, কথা সংক্ষেপ। কলটার ডেস্টিনেশন কোথায় ছিল?”

“গেস হোয়াট স্যার?” বলে সে আবারো ল্যাপটপ ঘুরিয়ে লোকেশন দেখালো। “লাক্কাতুরার সেই বাংলোতে যেখান থেকে আপনারা ডক্টর মিতায়ন মানে জেড মাস্টারকে উদ্ধার করে এনেছিলেন।”

তানভীর বাবুল আহমেদের দিকে ফিরে বলে উঠলো। “স্যার, আমার মনে হয় একটা কমান্ডো অপারেশন চালানোর জন্যে প্রস্তুতি শুরু করা উচিত আমাদের। জেড মাস্টার আর ব্ল্যাক বুদ্ধা দুটোই কোথায় আছে সেটা সম্ভবত বের করতে পেরেছি আমরা। এখন উদ্ধারের পালা।”

অধ্যায় আটান্ন

সময়: ১৮০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ

পৃথুরা বনভূমি, কন্নোর, ভারতবর্ষ

যদিও সন্ধ্যে নেমে এসেছে বনভূমিতে, তবে আকাশে চাঁদ উঠতে এখনো ঢের বাকি । শামান যে-ঘোড়াটার ওপরে বসে আছে সেটার গায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলাতে লাগলো ও। ঘোড়াটা একটু অস্থির হয়ে বার-বার হ্রেসা ধ্বনি ছাড়ছিল, শামান হাত বুলাতেই ওটা শান্ত হয়ে এলো অনেকটা। শামান আকাশের দিকে তাকাল, তারপর নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলো সামনে।

যদিও ওরা একেবারে ঘন জঙ্গলের ভেতরে অবস্থান নিয়ে আছে তবুও এখান থেকে বিধোরীর দুর্গটা পরিষ্কার চোখে পড়ে। বিশেষ করে দুর্গের মূল ফটক, যেখান দিয়ে রাজা বিক্রমের বহর বের হয়ে আসার কথা। ওরা থারুদের গুদাম এলাকা থেকে রওনা দিয়ে এখানে এসে পৌছেছে খুব বেশি সময় হয়নি। আগে থেকেই এখানে জাথুরিয়ার নিয়োগ দেয়া একজন লোক অপেক্ষো করছিল। ওরা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে রওনা দিয়ে এখানে এসে পৌছানোমাত্র লোকটা ওদেরকে জানায় রাজা বিক্রমের বাহিনী এখনো বের হয়নি, যেকোন সময় বেরুতে পারে। সেইসাথে ওদেরকে অপেক্ষা করার জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গাটা দেখিয়ে দেয়, যাতে বিধোরীর মূল ফটক দিয়ে রাজা বিক্রমের বাহিনী বেরিয়ে এলে ওরা পরিষ্কার দেখতে পায়।

শামান বসে থাকতে-থাকতে আরেকবার নিজের লোকদেরকে দেখলো। ওর দলের সবাই ওর একেবারে অচেনা। অচেনা মানুষ নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে উৎরানো খুব কঠিন কাজ, কারণ যুদ্ধ মানেই দলগত কাজ। আর তুমি দলনেতা হয়ে যদি নিজের দলের লোকদের শক্তি সামর্থের ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা না রাখো তবে সঠিক পদ্ধতিতে কাজ আদায় করা খুব কঠিন। তবে অচেনা মানুষ নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে উৎরানো ওর জন্যে এবারই প্রথম নয়। এর আগেও বহুবার ওকে অচেনা লোকজন নিয়ে যুদ্ধের ময়ধানে নামতে হয়েছে, কিন্তু এর আগে কোনবারই এখনকার মতো নাজুক অবস্থা ছিল না ওর।

তার ওপরে নিজের বন্ধু, নিজের অস্ত্র কোনটাই আর নিজের কাছে নেই। কোমরে ঝোলানো তলোয়ারটাতে একবার হাত বুলালো শামান। এই তলোয়ারটা থারু যোদ্ধারা দিয়েছে ওকে। একটা তলোয়ার, দুটো ছুরি আর একটা ঢাল। যদিও ঢাল জিনিসটা এর আগে কখনো ব্যবহার করেনি শামান, কিন্তু আজ ঘোড়াসওয়ারি হিসেবে যুদ্ধ করার জন্যে এটা লাগতে পারে, কারণ শামান জানে ঘোড়সওয়ারি যুদ্ধে তীরের হাত থেকে বাঁচার জন্যে হলেও ঢালের প্রয়োজন আছে। আর তলোয়ারটাও ওর প্রিয় কাতানার মতো নয়।

কাতানা পাতলা, সমতল আর কোপ মারার অস্ত্র, আর এদের তলোয়ারগুলো খাটো বাঁকা আর ভেদ করার অস্ত্র। যদিও আসার আগে বেশ কিছুক্ষণ অভ্যাস করে নিয়েছে ও, তবুও নিজের অস্ত্র নিজের অস্ত্রই।

আবারো ওর ঘোড়াটা নড়ে উঠলো, ব্যাপার কি, এই ব্যাটা এরকম নড়ছে কেন, নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলো ও। কিন্তু জবাবাটা অবশ্যই অবলা প্রাণীর তরফ থেকে না এসে জবাব এলো সামনে থেকে। ধীরে-ধীরে খুলে যাচ্ছে বিধোরীর মূল ফটক। ওরা যেখানে আছে সেখান থেকে ফটক খোলার দৃশ্য দেখতে পায়নি কিন্তু ওটার শব্দ শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার। দেখতে দেখতেই ফটক খুলে বেরিয়ে এলো ঘোড়সওয়ারের দল। ওরা যা আশা করেছিল দলটার আয়তন অনেকটা সেরকমই, দলটাকে বেরিয়ে আসতে দেখে খুশি হয়ে উঠলো শামান।

রাজা বিক্রমের ঘোড়সওয়ার বাহিনী বেশ দ্রুত গতিতে বেরিয়ে আসছে বিধোরীর মূল ফটক দিয়ে। পাহাড়ি ঢাল বেয়ে নামতে-নামতে ওদের গতি আরো বেড়ে যেতে লাগলো। শামানরা সবাই প্রায় দম আটকে বসে আছে। তবুও ওর দলের লোকজনকে হাতের ইশারায় আবারো সাবধান করে দিলো শামান। দেখতে দেখতে রাজা বিক্রমের বাহিনী বিধোরী থেকে নেমে এসে যেখানে পথটা দুইভাগে ভাগ হয়ে গেছে সেটার কাছাকাছি চলে এলো।

শমান উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে দলটা কোনদিকে মোড় নেয় সেটা দেখার জন্যে। দলটা রাস্তাটা যেখানে দুইভাগে ভাগ হয়েছে সেখানে এসে কোনরকম দ্বিধা ছাড়াই ওরা যে-রাস্তা অনুমান করে রেখেছিল সেটা দিয়েই প্রবেশ করলো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো শামানের দলের সবাই। যাক তাহলে পরিকল্পনা কাজে লাগতে যাচ্ছে।

দলটা ঝড়ের বেগে ওদের সামনে দিয়ে চলে গেল। দলটা জঙ্গুলে পথের বাঁকের অন্যপাশে গয়েব হয়ে যেতেই শামান আঙ্গুলের কড়ে এক, দুই, তিন করে গুনতে শুরু করলো। বিশ গোনা হতেই ঘোড়ার গায়ে চাপড় মেরে লাফ দিয়ে সামনে এগোল ও ঘোড়া নিয়ে। ওর দেখাদেখি বাকিরাও ঝড়ের বেগে সামনে এগিয়ে রাস্তাটা পার হয়ে অন্যপাশের জঙ্গলে প্রবেশ করলো। পরিকল্পনা কাজে লাগতে যাচ্ছে। এবার বিধুরা ঠিকমতো কাজ করতে পারলেই হয়।

বর্তমান সময়

শাহী ঈদগাহ, আম্বরখানা, সিলেট

দরজায় হালকা ঠক-ঠক শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তানভীরের। মুহূর্তের জন্যে খানিকটা দ্বিধা করে চট করে উঠে বসলো ও। আপনাতেই ওর দৃষ্টি চলে গেল বিছানার পাশে ছোট

সাইড টেবিলের ওপরে রাখা ঘড়িটার দিকে। সন্ধ্যে পার হয়ে রাত নেমে এসেছে।

ঘুম ভেঙে উঠে বসে তানভীর ঠিক নিশ্চিত হতে পারলো না দরজায় কি আসলেই কেউ নক করেছে নাকি শব্দটা ওর মনের ভুল। প্রায় সাথে সাথেই দরজায় আবারো আগের মতোই খুব আলতো ঠক-ঠক শব্দ হলো। বিছানা থেকে চাদরটা তুলে গায়ে জড়িয়ে এসে দরজাটা খুলে দিতেই চট করে ভেতরে ঢুকে পড়লো সুলতান আর ইকবাল।

ওরা দুজনে ভেতরে ঢুকতেই তানভীর সুলতানের কাছে জানতে চাইলো, "জালাল ভাইয়ের কী অবস্থা?" খালি গায়ে ঠান্ডায় প্রায় জমে যাবার মতো অবস্থা ওর কিন্তু সুলতানের সামনে চাদর সরিয়ে কাপড় পড়তে ইচ্ছে হলো না। চাদরটা আরো ভালোভাবে জড়িয়ে নিলো গায়ে।

"জালাল স্যার এখন অনেকটা ভালো। জ্ঞান ফিরে আসেনি কিন্তু অপারেশন ভালোভাবেই শেষ হয়েছে, ডাক্তার বলেছে আজ জ্ঞান ফিরে আসবে না, তবে প্রাথমিক বিপদ কেটে গেছে," সুলতান দ্রুত কথাগুলো বলে একবার দরজার দিকে দেখে নিয়ে ওটা ঠেলে বন্ধ করে দিলো। তানভীরের কাছে কেন জানি মনে হলো সুলতান আর ইকবাল দুজনেই খুব উত্তেজিত হয়ে আছে কোন কারণে।

"যাক এটা একটা ভালো খবর, জালালভাইকে নিয়ে আমি খুব চিন্তিত ছিলাম। আমি তো ভাবছিলাম-"

তানভীরকে কথা শেষ করতে দিলো না ইকবাল। "স্যার, অন্য একটা ঘটনা ঘটেছে। আপনাকে জানানো খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছিলো তাই জলদি এলাম আপনার সাথে দেখা করতে..."

"কি ব্যাপার, হয়েছে কি? দুজনেই খুব উত্তেজিত হয়ে আছো মনে হয়। কোন সমস্যা নেই, আমরা সম্ভবত জেড মাস্টার আর ব্ল্যাক বুদ্ধার খবর বের করতে পেরেছি। আমি আর টমি মিলে ইএএফকে কিছু ক্লু অ্যানালিসিস করে দিয়েছি। ওরা এতোক্ষণে ব্যাপারটা নিশ্চিত করে ফেলার কথা," তানভীর সুলতানের দিকে হাত বাড়িয়ে জানতে চাইলো, ওর কাছে সিগারেট আছে কিনা। সুলতান প্যাকেট আর লাইটার দিতেই সেটা দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে-টানতে বিছানায় গিয়ে বসে পড়লো ও। চাদরটা আবারো ভালোভাবে জড়িয়ে নিলো গায়ে।

"বস, এগুলো আমরা টমির কাছে শুনেছি কিভাবে তোমরা জেড মাস্টার আর ব্ল্যাক বুদ্ধার ব্যাপারে একটা হাইপোথিসিস ডেভলপ করেছো," সুলতান একটা চেয়ারে বসে ইকবালকে বাইরের দিকে খেয়াল রাখতে বললো। "আমরা সে-জন্যে উত্তেজিত না। আমরা উত্তেজিত অন্য কারণে। আমি আর ইকবাল এখানে এসেছি ঘন্টাখানেক আগে। আসার পরে টমির সাথে কথা বলার চেষ্টা করেও পারিনি। একটু আগে টমি আমাদের সাথে লুকিয়ে দেখা করে সব জানিয়ে বললো তোমাকে জানাতে যে, সম্ভবত ইএএফ কোন একটা শয়তানি

করছে। ওরা মনে হয় জেড মাস্টারের লোকেশনের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পেরেছে। এরপরেই ওরা পুরো অপারেশন নিজেদের কন্ট্রোলে নিয়ে নেয়ার পায়তারা করছে। এতোক্ষণে অপারেশন ব্ল্যাকবুদ্ধা- ওরা অপারেশরটার এই নামই দিয়েছে- এই অপারেশনটাকে ওরা এতোক্ষণে সম্ভবত অফিসিয়ালি নিজেদের কমান্ডে নিয়েও নিয়েছে।"

"তাই নাকি," সুলতানের কথা শুনতে-শুনতে তানভীর বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলেও বাইরে সেটা প্রকাশ করলো না। "সমস্ত কিছু করলাম আমরা আর এখন অপারেশন কিভাবে ওরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। দুপুরের পরেও ওদের সাথে কথা বলে আমি যখন পাশা স্যারকে সব রিপোর্ট করলাম তখনো তো এরকম কিছু শুনিনি। পাশা স্যার জানেন, ব্যাপারটা?"

"স্যারকে একটু আগে আমি জানিয়েছি," সুলতান জবাব দিলো। "পাশা স্যার সিলেটের উদ্দেশ্যে রওনা দিবেন যেকোন সময়," বলে সুলতান ঘড়ি দেখলো। "হয়েতো এতোক্ষণে রওনা দিয়েও দিয়েছেন।"

পাশা স্যার সিলেটে আসছেন শুনে একটু স্বস্তি বোধ করলো তানভীর। "আচ্ছা, ইএএফের ওরা আছে কোথায় এখন, এই ল্যাবেই?"

"ল্যাবেই মানে," সুলতান বেশ ঝাঁঝের সাথেই বলে উঠলো। "ওরা তো ল্যাবের কনফারেন্স রুমটাকে পুরোপুরি নিজেদের অপারেশনের কমান্ড রুম বানিয়ে ফেলেছে। অর বেচারা টমিকে খাটিয়ে মারছে।"

তানভীর এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলে উঠলো, "ঠিক আছে, আমি দেখছি," সিগারেটটাকে অ্যাশট্রেতে পিষে দিয়ে ও উঠে দাঁড়ালো। তোমরা বাইরে গিয়ে দাঁড়াও, আমি বেরুচ্ছি।" সুলতান সামান্য মাথা নেড়ে ইকবালকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

তানভীর দ্রুত ফ্রেশ হয়ে জিন্স, কালো শার্ট, শার্টের ওপরে ভেস্ট আর কালো জ্যাকেট পরে নিয়ে মোবাইলটা তুলে নিয়ে কল দিলো পাশা স্যারকে। কিন্তু তার ফোন সুইচড অফ দেখালো। তারপর কল করলো মাকে। "হ্যালো, মা, হ্যাঁ আমি ভালো আছি... তোমার কী অবস্থা.. ও আচ্ছা লোক এসেছিল ফার্নিচারের দোকান থেকে। ঔষুধগুলো এনেছিলে? ... ঠিক আছে বাকি ব্যাপারগুলো আমি ঢাকা এসে সামলাবো, কোন সমস্যা নেই..." মায়ের সাথে কথা বলতে-বলতে ও রুমের বাইরে এসে সুলতান আর ইকবালকে সামনে এগোনোর ইশারা করলো।

ওদের দুজনকে নিয়ে সোজা হেঁটে চলে এলো ল্যাবের কনফারেন্স রুমের সামনে। ওখানে দুজন কালো পোশাক পরা ইএএফের প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে মুর্তির মতো। ওরা ভেতরে ঢুকতে যেতেই থামিয়ে জানালো ভেতরে ঢোকা নিষেধ। তানভীর নিজের পরিচয় দিলো। ওদেরকে ওখানেই অপক্ষো করতে বলে একজন প্রহরী ভেতরে চলে গেল।

তানভীর একটু রাগের সাথেই ফিরে তাকাল সুলতানের দিকে। সুলতান কাঁধ ঝাঁকিয়ে অসহায় একটা ইশারা করলো। ব্যাপার কি, ওদের অপারেশন ওদের কাজ, এখন ওরাই বাইরের মানুষ।

"আপনি ভেতরে আসুন, আর আপনারা এখানেই অপেক্ষা করুন," বলে ফিরে আসা প্রহরী তানভীরকে ভেতরে ঢোকার জন্যে ইশারা করলো। তানভীর ওদের দুজনকে অপেক্ষা করতে বলে ভেতরে ঢুকে পড়লো।

কনফারেন্স রুমের ভেতরে রীতিমতো এলাহি কান্ড চলছে। রুমের ভেতরটাকে এখন আর কনফারেন্স রুম না বলে এটাকে রীতিমতো মিলিটারি কমান্ডের মতো দেখাচ্ছে। একদিকে বড় স্ক্রিনটা ওপেন করা। তাতে এটা সেটা ছবি ফুটে আছে। এক পলক বুলিয়ে তানভীর অনুমান করলো সম্ভবত স্যাটেলাইট নিউজ ফিড হতে পারে। ওটার সামনেই আরো দুজনের সাথে দাঁড়িয়ে আছে টমি। তার চোখ-মুখ লাল আর চেহারা বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। ওকে দেখে টমি শুকনো হাসি দিলো।

কনফারেন্স টেবিলের সর্বাগ্রে দাঁড়িয়ে আছে ইএএফের প্রধান বাবুল আহমেদ, তার পরনে কমান্ডোদের মতো পোশাক। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে মোটা গোঁফ, ফারুক। কনফারেন্স টেবিলটাকে ঘিরে বসে আছে একইরকম কমান্ডো সাজে সজ্জিত আরো বেশ কয়েকজন অফিসার। তানভীর তাদের দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে অনুমান করলো বাবুল আহমেদ সম্ভবত কিছু একটা নিয়ে ব্রিফ করছিল অফিসারদের। ওকে এগোতে দেখে থেমে গেল সে।

"গুড ইভিনিং অফিসার তানভীর," বাবুল আহমেদ মৃদু হেসে বলে উঠলো। "যাক ঘুম ভাঙলো তাহলে। বিশ্রাম হয়েছে ঠিকমতো?" বলে সে নিজের অফিসারদের দিকে ফিরে বলে উঠলো। "আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি," বলে সে তানভীরকে দেখালো। "উনি, অফিসার তানভীর মালিক, উনিই জেড মাস্টার আর ব্ল্যাক বুদ্ধার সন্ধান বের করেছেন।"

বাবুল আহমেদের কথা একেবারেই পাত্তা না দিয়ে তানভীর বলে উঠলো, "হচ্ছেটা কি, আমি জানতে পারি?"

বাবুল আহমেদ ওর দিকে একবার দেখে নিয়ে বলে উঠলো, "অবশ্যই অফিসার। তোমাকে না জানালে আর কাকে জানাবো," বলে সে টমির দিকে ইশারা করলো। বাবুল আহমেদের ইশারা দেখে টমি একটা রিমোটে চাপ দিতেই স্ক্রিনে একটা বাংলোর ছবি ফুটে উঠলো।

সাথে সাথে চিনতে পারলো তানভীর, লাক্কাতুরার সেই বাংলো- যেখান থেকে ওরা ডক্টর মিতায়ন মানে জেড মাস্টারকে উদ্ধার করে এনেছিল।

"নিশ্চই চিনতে পেরেছেন। আপনার অ্যানালিসিস অনুযায়ী আমরা অনুসন্ধান করে বের করেছি জেড মাস্টার সম্ভবত এখানেই আছে।"

"কিভাবে?" তানভীর প্রশ্নটা করেই একটু সচেতন হয়ে আবারো জানতে চাইলো। "মানে, আপনার শতভাগ নিশ্চিত হলেন কিভাবে?"

"আজ দুপুরের দিকে আপনার সাথে কথা বলার পর আপনার আর টমির হাইপোথিসিস জাজ করার জন্যে বাংলোটার ওপরে নজর রাখতে শুরু করি আমরা। বাংলোটা থেকে সতর্ক দূরত্বে এমনভাবে আমরা আমাদের এজেন্টদেরকে সেট করেছি যাতে ওরা ভেতর থেকে টের না পায় আবার পালাতেও না পারে। আর বাইরে রোড ব্লক ইত্যাদি তো আছেই। একটা পর্যায়ে ওখানে অবস্থান নেয়া আমাদের এজেন্ট কনফার্ম করে বাংলোতে কেউ রয়েছে। কিন্তু কাউকে সে দেখতে পায়নি। তবে সন্ধ্যার আগ দিয়ে বাংলোর জানালায় এক ঝলকের জন্যে ডক্টর মিতায়ন, মানে জেড মাস্টারকে দেখতে পেয়েছে বলে দাবি করেছে আমাদের সেই এজেন্ট।"

বাবুল আহমেদের কথা এই পর্যন্ত শুনতেই তানভীর উত্তেজিত হয়ে উঠলো। "তাই নাকি? তাহলে আপনারা এখনো অপারেশান না চালিয়ে বসে আছেন কেন? আমাকেই বা আরো আগে জানানো হয়নি কেন?"

"এরকম একটা অপারেশনের ব্যাপারে তুমি কী জানো?" বাবুল আহমেদের পাশে থেকে মোটা গোঁফ ফারুক কথা বলে উঠলো। "মুখে বললেই এরকম অপারেশন চালানো না, সবাই তো আর তোমার মতো না," লোকটা এই পর্যন্ত বলতেই তানভীর চট করে গরম চোখে ফিরে তাকাল তার দিকে।

"ফারুক, তুমি থামো," বাবুল আহমেদ তাকে ধমকে দিলো। "তানভীর, ও ঠিকই বলেছে। এরকম একটা অপারেশন চালাতে অনেক ধরণের প্রস্তুতি তো লাগেই সেইসাথে অনুমতি ইত্যাদির ব্যাপারও আছেই। আর তাছাড়া আমরা আসলে রাত নামার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম যাতে আমরা অপারেশন চালাতে গেলে বাংলো থেকে ওরা আগেই টের পেয়ে না যায়," বলেই সে ঘড়ি দেখলো। এখন বাজে সাড়ে আটটা। আমাদের টিম রেডি আছে, আমরা সাড়ে নয়টায় এখান থেকে বেরুবো, দশটার ভেতরে বাংলোতে অপারেশন চালানোর টার্গেট আমাদের। তোমার টিমকে আমরা রেগুলার আপডেট জানাবো," বলে বাবুল অহমেদ হালকা চালে একটা চাপড় মারলো তানভীরের কাঁধে। "তোমাকে ইএএফের তরফ থেকে ধন্যবাদ। তুমি না থাকলে কিছুতেই ব্যাপারটা এতো দ্রুত সমাধান করতে পারতাম না।"

"স্যার রেগুলার আপডেট মানে?" তানভীরের গলা উঁচু হয়ে গেছে। টেবিলের চারপাশে তো বটেই রুমের অন্যান্য অংশে অবস্থান করা লোকজন সবাই ফিরে তাকাল ওর দিকে। তানভীর গলা নামিয়ে বলে উঠলো, "স্যার রেগুলার আপডেটের কথা কেন বলছেন আপনি। আমি আর আমার টিম জীবন বাজি রেখেছি এই অপারেশনের জন্যে। আমরাই সবচেয়ে বেশি কষ্ট করেছি। স্যার, আমরাও এই অপারেশনে অংশ নিতে চাই। এটা আমাদের অধিকার।"

বাবুল আহমেদ কিছু না বলে চুপচাপ তাকিয়ে রইলো তানভীরের দিকে। "অফিসার, ফিল্ড লেভেলে কমান্ডে কাজ হয়। তুমি এসব জানো না, আর তাছাড়া ফিল্ডে তোমার অভিজ্ঞাও নেই কাজেই এসব ফালতু কথা বাদ দিয়ে বরং অন্যান্য দিক দিয়ে আমাদেরকে সহায়তা করো।"

"স্যার, আপনি আমাদেরকে এভাবে সরিয়ে দিতে পারেন না," বলে ও বাবুল আহমেদের পোশাকের হাতা চেপে ধরলো। সাথে সাথে মোটা গোঁফ ফারুক পিস্তল বের করে চেপে ধরলো তানভীরের কপালের পাশে।

অতীত

পৃত্থুরা বনভূমি, কন্নোর

একদিকে বিধুদের অবস্থা নিয়ে চিন্তিত শামান, অন্যদিকে ঠিক তেমনি বিধুরাও চরম উত্তেজনায় আছে।

বিধুর দলে আছে পাঁচ জন, সে সহ ছয় জন। এই ছয়জনই দক্ষ তীরন্দাজ। অবশ্য এই দলে এতোগুলো তীরন্দাজ রাখার পেছনে একটা গুরুতর কারণ আছে। রাজা বিক্রমের দলটাকে জঙ্গুলে পথে আক্রমণ চালানোর পেছনে অন্যতম একটা কারণ হলো যাতে ওরা সংখ্যায় কম হলেও জঙ্গলের আড়াল নিয়ে শাক্যদের কাবু করতে পারে। আর সেটা করতে হলে শামানের পরিকল্পনা অনুযায়ী ওদের দুটো প্রধান হাতিয়ার হলো; ওদেরকে চমকে দিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয়া। এরপর তাদের ছত্রভঙ্গের সুযোগ নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত করা। ছত্রভঙ্গ করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে লম্বা দাড়ির দলকে, আর দ্বিতীয় দায়িত্ব দেয়া হয়েছে বিধুকে। আর দ্বিতীয়টি করতে হলে তীরন্দাজ বাহিনীর কোন বিকল্প নেই।

কিন্তু বিধু ভয় পাচ্ছে অন্য জায়গাতে। একে তো ওর দলে যারা আছে সে নিজে ওদের তীর চালনোর দক্ষতার ব্যাপারে খুব বেশি একটা জানে না। সেইসাথে রাজা বিক্রমের বাহিনী যদি আদৌ এই পথে না অসে তবে একটা ভীষণ ঝামেলা হয়ে যাবে। যদিও থারু বাহিনীর লম্বা দাড়ি ওদেরকে কথা দিয়েছে, তার বহু বছরের অভিজ্ঞতা বলে রাজা বিক্রম কখনোই নিজের বিরাট বাহিনী নিয়ে অন্য পথটাতে যাবে না। কারণ সেটা অনেক বেশ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে। কারণ ওই পথে বিধোরী থেকে মন্তলা যেতে হলে তাদেরকে পথিমধ্যে একট খাল পার হতে হবে, ওই খালের ওপরে বাঁশ আর কাঠ দিয়ে সেতু বানানো আছে। সেতুটা দিয়ে বড় বাহন পার করা খুব কঠিন ব্যাপার। কাজেই লম্বা দাড়ির মতে রাজা বিক্রম এতোটা বোকা নয় যে সে বুদ্ধ মুর্তি আর বন্দিদেরকে নিয়ে ওই পথে যাবে, বিশেষ করে ওই খাল পার হবার ঝুঁকি সে নেবে ব'লে মনে হয়না।

আর শামানও ওকে বলেছে যদি কোনভাবে রাজা বিক্রম অন্য পথ ধরে তবে ওর নাকি একটা আলাদা পরিকল্পনা আছে, কিন্তু সেটা যে কী শামান আর বলেনি। কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই বিধু আনমনেই একবার হাই ছাড়লো। নিজেদের লোকদেরকে দেখে নিয়ে সামনে ফিরে তাকাল। প্রত্যেকেই প্রস্তুত, প্রত্যেকেই চিন্তিত। বিধু মনে-মনে ভাবলো এটা ওদের জন্যে জীবন মরণের লড়াই, ওদের পরিবার-গোত্র আর নেতৃত্ব রক্ষার লড়াই।

সামনে তাকিয়ে বিধু জঙ্গলের পথের দিকে মনোযোগ দিয়ে দেখার চেষ্টা করলো। ওরা যেখানে অবস্থান নিয়েছে সেখান থেকে আরো পাঁচশো গজ সামনে অবস্থান নেয়ার কথা লম্বা দাড়ির বাহিনীর। ওরা কেমনভাবে অবস্থান নিয়েছে কে জানে। বিধুর দলের আক্রমণের সাফল্যের একটা বড় অংশ নির্ভর করছে আসলে লম্বা দাড়ির বাহিনীর আক্রমণের ওপরে। বিধু জঙ্গুলে পথের অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল, হঠাৎ শিসের শব্দ শুনে সে ঝট করে ওপরে তাকাল। তার দলের একজনকে তুলে দেয়া হয়েছে গাছের ওপরে- যাতে সে দূর থেকে নজর রাখতে পারে। ওই ব্যাটাই নিশ্চই কিছু দেখেছে, না হলে শিস বাজানোর কথা নয়। বিধু ওপরে তাকাতেই দেখতে পেল লোকটা বানরের মতো দক্ষতার সাথে নেমে আসছে গাছের ওপর থেকে। দেখতে দেখতেই সে মাটিতে লাফিয়ে পড়লো।

“আসতাছে, ওরা আসতাছে,” লোকটা হাঁপাতে-হাঁপাতে কথাটা বলার সাথে সাথে বিধু ওর দলের অন্য ক’জনের দিকে ফিরে সামান্য মাথা নাড়লো। লোকটাও ওর দিকে একইভাবে মাথা নেড়ে মুখের ভেতরে আঙ্গুল ঢুকিয়ে বিচিত্র এক শব্দ করে উঠলো। রাতের বেলা জঙ্গলের ভেতরে সাদা পেঁচা এ-ধরণের শব্দ করে। লোকটা শব্দটা করে উঠতেই একটু পরেই সামনে জঙ্গল থেকে প্রায় একই ধরণের শব্দ ভেসে এলো।

নিজের লোকদেরকে প্রস্তুত হতে বলে বিধু পিঠের ওপর থেকে ধনুকটা টেনে নামিয়ে ওটাতে ছিলা জুড়ে দিয়ে অন্যহাতে তূণী থেকে তীর বের করে আনলো একটা। যথাসম্ভব নিঃশব্দে ওর দলের লোকেরাও অনুসরণ করলো ওকে।

মঞ্চ প্রস্তুত, এবার দেখা যাক নাটক কেমন হয়।

বর্তমান

নিমার্ণধীন ল্যাব, শাহী ঈদগাহ

তানভীরের কপালের পাশে পিস্তলটা চেপে ধরেই মোটা গোঁফ ফারুক বলে উঠলো, “সাবধান, স্মার্ট বয়।”

তানভীর তাকিয়ে আছে বাবুল আহমেদের দিকে, সেও এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। সময় যেন কিছুক্ষণের জন্যে স্থির হয়ে রইলো। বাবুল আহমেদই হাত তুলে সবাইকে শান্ত হতে বললো। তারপর তানভীরের চোখের দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে বলে

উঠলো, "ঠিক আছে কমান্ডার, তুমি যদি এই অপারেশনে অংশগ্রহণ করাটাকে নিজের অধিকার মনে করো তবে আমি তোমাকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করবো না," বাবুল আহমেদ এই পর্যন্ত বলতেই পাশ থেকে মোটা গোঁফ চট করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই বাবুল আহমেদ তাকে থামিয়ে দিলো।

"কিন্তু শুধু তুমি যাবে, তোমার টিমের বাকিরা এখানেই থাকবে," তানভীর কোন জবাব দেয়ার আগেই বাবুল আহমেদ নিজের ঠোঁটের ওপরে একটা হাত রেখে বললো, "আর কোন কথা শুনতে চাইনা আমি। এখানেই শেষ," বলে বাবুল আহমেদ তার নিজের একজন লোকের দিকে ফিরে ইশারা করে কী জানি বললো। তারপর সামনে ফিরে সে অপারেশনের ব্রিফিং শুরু করতে বললো।

বাবুল আহমেদের নির্দেশ পাওয়া মাত্র ফারুক উঠে দাঁড়ালো। টমির হাত থেকে সরুমতো দেখতে রিমোটটা নিয়ে সে টমিকে ধন্যবাদ জানিয়ে অন্যদের দিকে ফিরে বলতে শুরু করলো। "সবাইকে ধন্যবাদ, আমি ফারুক হাসান, অপারেশন ব্ল্যাকবুদ্ধার স্পেশাল অপস টিমের প্রধান। আমি আপনাদেরকে সংক্ষেপে পুরো অপারেশনটা বলছি। আমরা সোয়াট টিমে আছি আটজন। আমাদের সাথে থাকবে বাবুল আহমেদ স্যার ও অফিসার তানভীর মালিক। এই হচ্ছে সেই বাংলোটা," বল সে রিমোট টিপতেই বাংলোটার দিনের বেলার একটা ছবি দেখা গেল স্কিনে। আবারো রিমোট টিপতেই সেই ছবিটা সরে গিয়ে বাংলোর একটা থ্রিডি ইমেজ ফুটে উঠলো। "এটা বাংলোর ফ্রন্ট ভিউ, এটা ব্যাক ভিউ আর এই দুটো সাইড ভিউ, আর এটা টপ," বলে সে থ্রিডি ইমেজটাকে ওপর থেকে দেখালো। তারপর বলতে শুরু করলো।

তানভীর মনোযোগ দিয়ে দেখে-বুঝে নিতে লাগলো। মূলত সোয়াট টিমের মূল চারটা দলসহ ওরা গাড়িতে করে লাক্কাতুরা মেইন রোডের একটু ভেতরেই নেমে যাবে। চারটে দলের ভেতরে একটা দল সোজা চলে যাবে বাংলোর পেছনের পাহাড়ের পাদদেশে। ওরা মূল অপারেশনে অংশ গ্রহণ করবে না। ওরা শুধু বাংলোর পেছনটা গার্ড দিবে। যদি কেউ বাংলোর পেছনের পাহাড় দিয়ে পালানোর চেষ্টা করে তবে ওরা সেটা ঠোকাবে। আর বাকি তিন দল পায়ে হেটে বাংলোটার বাকি তিনদিক কভার করে এগোবে। বাংলোর দুইপাশে যেহেতু কোন প্রবেশ পথ নেই কাজেই ফারুকের নেতৃত্বে থাকা সামনের দলটার সাথে দুই পাশে থেকে একজন ক'রে এসে যোগ দেবে ওরা ভেতরে প্রবেশ করার সময়। আর বাকি দুইজন দুইপাশে অবস্থান নিবে। মূল অপারেশনটা চালাবে আসলে ফারুকের দল। আর ওদের ঠিক পেছনের ব্যাকআপ টিমে থাকবে বাবুল আহমেদ আর তানভীর।

"এই হলো মূল পরিকল্পনা," বলে ফারুক শেষ করে সবার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো, "কারো কোন প্রশ্ন?" কেউ কোন প্রশ্ন করলো না দেখে সে বাবুল আহমেদের দিকে ফিরে তাকাল। বাবুল আহমেদ মাথা নাড়তেই সে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো, "সময় হয়ে গেছে, আমরা মুভ করবো। প্রত্যেকেই নিজের গিয়ার চেক করে নাও, বাকি ড্রিলিং তোমরা সবাই জানো।"

প্রত্যেকেই যার-যার মতো প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো। তানভীর উঠে দাঁড়াতেই একজন তরুণ অফিসার ওকে নিয়ে চলে এলো রুমের কোনার দিকে। ওখানে সেট করা টেম্পোরারি একটা লম্বা টেবিলের ওপরে অস্ত্র থেকে শুরু করে অপারেশনের সাথে সংশ্লিষ্ট নানা ধরণের ডিভাইস সাজানো আছে।

প্রথমেই লোকটা অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্যে তানভীরকে হেডসেট পরিয়ে দিলো। ওটা পরে নিতেই তানভীরকে অস্ত্র চুজ করতে বললো। তানভীর দেখলো টেবিলের ওপরে হ্যান্ড গান থেকে শুরু করে শর্ট রেঞ্জে যুদ্ধ চালানোর মতো সব ধরণের অত্যাধুনিক অস্ত্র সাজানো আছে। ওর ডেজার্ট ঈগলটা জেড মাস্টারের লোকেরা নিয়ে গেছে, কাজেই ওর এখন একটা অস্ত্র দরকার। তানভীর একটা নইন এম এম হ্যান্ড গান তুলে নিতেই লোকটা হোলস্টার সহ ওর জ্যাকেটের ভেতরে সেট করে দিলো জিনিসটা।

"স্যার, এটাও রাখতে পারেন," বলে লোকটা একটা মাঝারি সাইজের কমান্ডো নাইফ দেখালো। পাটোয়ারীর দেয়া স্টিলেটোর চেয়ে বেশ বড় ছুরিটা। স্টিলেটোটা যেহেতু হারিয়ে ফেলেছে কাজেই এটাই ভরসা। জিনিসটা খাপসহ ওর জিন্স প্যান্টের ভেতরে হাঁটুর নিচে সেট করে দিলো সে। সব আরেকবার পরীক্ষা করে নিচ্ছে এমন সময় বাবুল আহমেদ বলে উঠলো, "সবাই প্রস্তুত? কমান্ডার?"

তানভীর মাথা নেড়ে জবাব দিলো, "আমি রেডি। চলুন দেখা যাক ভাগ্য কী অপেক্ষা করিয়ে রেখেছে আমাদের জন্যে।"

অতীত

পৃথুরা বনভূমি, কন্নোর

দেখতে দেখতেই জঙ্গুলে পথের অন্যদিকে আলো দেখা গেল। নড়তে থাকা মশালের আলোগুলো দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায় ওগুলো ঘোড়সওয়ারদের হাতে ধরা মশালের আলো। দলটা আকারে বড় হলেও বিধু অনুমান করলো ওরা যতোটা আন্দাজ করেছিল দলটা ততোটা বড় নয়। তারপরেও মশালের আলোয় মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে দলে অন্তত বিশ থেকে পঁচিশ জন ঘোরসওয়ার আছে, আর চারটে ঘোড়ার গাড়ি। এর ভেতরে দুটো রাজকীয় গাড়ি আর বাকি দুটো সাধারণ কাঠের গাড়ি। বিধু আন্দাজ করলো রাজকীয় গড়িগুলোর ভেতরে রাজা বিক্রম আর তার রাজ দরবারের গুরুত্বপূর্ণ লোকেরা আছে। আর বাকিদুটোর একটাতে বন্দিরা আর অন্যটাতে অবশ্যই সেই বুদ্ধ মুর্তি।

দলটা বেশ বীরদর্পে দ্রুত গতিতে বিধুদের অবস্থান পর হয়ে সামনে চলে গেল। বিধুরা উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। বিধুর হিসেব যদি ভুল না হয়ে থাকে তবে এক্ষুণি খেলা শুরু হয়ে যাবে। দলটা দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপার কি, থামছেনা কেন ব্যাটারা। কথাটা বিধু মনে-মনে ভেবে শেষও করতে পারলো না তার আগেই দলের একেবারে সামনের দিক থেকে ভেসে এলো হ্রেসা ধ্বনি। আচমকা ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলে সাধারণত ঘোড়া এরকম শব্দ করে ওঠে। মনে মনে খুশি হয়ে উঠলো বিধু, যাক রাস্তা আটকানোটা ভুল হয়নি, গাছগুলো থামাতে পেরেছে দলটাকে।

জঙ্গুলে পথটা ঠিক যেখানে বাঁক নিয়ে অন্যদিকে রওনা দিবে তার আগ দিয়ে রাস্তার ওপরে ডালপালাসহ পড়ে আছে বিরাট আকারের দুটো গাছ। এমনিতে যদি শুধু গাছ দুটো পড়ে থাকতো তবে ঘোড়সওয়ারদের জন্যে ও- দুটোকে টপকে যাওয়া অতোটা কঠিন হত না কিন্তু গাছদুটো পড়ে আছে ডালপালা সহ, আর তাছাড়া ঘোড়সওয়ারেরা পার হতে পারলেও ডালপালাসহ গাছ টপকে ঘোড়ার গাড়ি কোনমতেই পার হতে পারবে না। রাজার বহরের লোকজনের ভেতরে যারা আছে তারা গাছ দুটো দেরিতে দেখতে পেলেও দেখার সাথে-সাথে নিজেদের ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে থামালোই, সেইসাথে হাত তুলে পেছনে বাকিদের থামতে বললো। কিন্তু ভুল হয়ে গেল হিসেবে। কারণ একে তো দলটা চলছিল বেশ দ্রুত গতিতে তার ওপরে এরকম হঠাৎ করে থামতে বলাতে পেছনের অনেকেই সময়মতো থামতে পারলো না।

পুরো দলটা একটা সুশৃঙ্খল দল থেকে মুহূর্তের ভেতর তালগোল পাকিয়ে গেল। আর এটাই চেয়েছিল শামামের দলের লোকেরা। সেই সুযোগও নিলো তারা পুরোপুরি। দলটার সামনের দিকের প্রহরীরা পড়ে থাকা গাছগুলোর সামনে এসে পরীক্ষা করতে লাগলো। খুবই অল্প সময় লাগলো তাদের এটা বুঝতে যে এগুলো এমনি উপড়ায়নি বা ঝড়ে পড়েনি। এগুলোকে কাটা হয়েছে। প্রহরীদের প্রধান চিৎকার করে দলের সবাইকে

সাবধান করে দেয়ার আগেই ধপ করে জঙ্গলের দুপাশে আলো জ্বলে উঠলো। প্রায় সাথে-সাথে জঙ্গলের পথের দুপাশ থেকে দুটো বিরাট আকারের জ্বলন্ত গাছের গুড়ি গড়িয়ে এসে পড়লো ওদের ওপরে। প্রথম গুড়িটা ছোড়া হয়েছিল সৈন্যদেরকে লক্ষ্য করে। ওটা সরাসরি সৈন্যদেরকে আঘাত না করলেও যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের মাথার ওপর দিয়ে ছিটকে গিয়ে লাগলো যারা ঘোড়ায় বসে ছিল তাদের ওপরে। বেশ কয়েকজন সৈন্যসহ কয়েকজন ছিটকে পড়লো এদিক সেদিকে, আগুন ধরে গেল বাকিদের গায়ে। দ্বিতীয় গুড়িটা সোজা ছিটকে এসে পড়লো প্রথম ঘোড়ার গাড়িটার ওপরে। ফলাফল হলো ভয়ঙ্কর। গুড়িটা ছিটকে এসে ঘোড়ার গাড়ির কাঠের অংশটাকে একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়ে পথের ওপরে গড়িয়ে পড়লো আধা ভাঙা গাড়ি, মৃত কাচোয়ান আর আহত ঘোড়াসহ।

রাজা বিক্রমের দলের প্রথম অংশটা প্রায় বিধ্বস্ত হবার সুযোগ নিয়ে জঙ্গলের দুপাশ থেকে তলোয়ার আর বর্শা হাতে ওদের ওপরে আক্রমণ চালালো লম্বা দাড়ি আর তার বাহিনী। ঘোড়সওয়ার বাহিনীর অনেকে পেছন থেকে যখন দেখলো সামনের পথ বন্ধ অনেকেই ঘুরে দাঁড়িয়ে পেছন দিকে রওনা দিলো। এবার কাজ শুরু করলো বিধুর বাহিনী।

রাজা বিক্রমের দলের শেষভাগে ঘোড়ার গাড়িগুলোর শেষে ছিল ঘোড়সওয়ার বাহিনী। বিধু অনুচ্চ স্বরে শিস দিতেই দুই পাশ থেকে তীরন্দাজ বাহিনী পায়ে হেটে এগিয়ে গেল তাদের দিকে। সেইসাথে শুরু হলো তীর বৃষ্টি। বিধুর ছুঁড়ে দেয়া প্রথম তীরটা গিয়ে লাগলো এক ঘোড়সওয়ারে ঘোড়াতে। ঘাড়ের কাছে তীর খেয়ে লাফিয়ে উঠলো ঘোড়া। গিয়ে পড়লো আরেক ঘোড়ার ওপরে, দুটো ঘোড়া থেকেই ছিটকে পড়লো ওপরে বসা সৈনিক।

জঙ্গলের কিনারায় হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো বিধু, পিঠের ওপর থেকে তীর ভর্তি তূণীটা নামিয়ে আনলো মাটিতে। একের পর এক তীর ছুঁড়তে শুরু করলো সামনের লক্ষ্যের দিকে। সেইসাথে দুইপাশ থেকে সম্মিলিত আক্রমণ চালালো দলের বাকিরা। কিছুক্ষণ টানা তীর ছুঁড়ে বিধু একটা হাত তুলে থামিয়ে দিলো সবাই। শেষ একটা ইশারা করতেই দুজন এগিয়ে এলো সামনের দিকে। একজনের হাতে চামড়া দিয়ে গোল করে বানানো বলের মতো বিশেষ তরল ভর্তি গোলক, অন্যজনের হাতে চকমকি। চকমকি ঠুকে গোলকের মাথায় আগুন দিয়ে সেটা সে ছুঁড়ে দিলো পথের ওপরে সৈন্যদের মাথার ওপরে। এক চোখ বন্ধ করে নিখুঁত লক্ষ্যে তীর ছুড়লো বিধু। গোলকটা যখন সৈনিকদের মাথার ওপরে তীরটা গিয়ে ফাটিয়ে দিলো ওটা। আগুনের গোলার মতো বিস্ফোরিত হলো বিশেষ তরল ভর্তি গোলক। টুকরো-টুকরো আগুন ছড়িয়ে পড়লো অস্থিরভাবে নড়া-চড়া করতে থাকা সৈনিকদের মাথার ওপরে-গায়ে, সেই সাথে সবশেষে থাকা ঘোড়ার গাড়িটার কঠের শরীরের ওপরেও। প্রাণপনে চেঁচিয়ে উঠলো গায়ে আগুন ধরা সৈনিকেরা।

“এইবার,” বলে বিধু উঠে দাঁড়ারো। তীরভর্তি তূণীটা পিঠের ওপরে নিয়ে নিজের দলকে সমান্তরালে সাজিয়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। জীবিত কোন সৈনিক দেখা মাত্রই তীর

ছুঁড়তে লাগলো।

রাজা বিক্রমে দলের প্রহরীদের প্রধান দেখলো অবস্থা খুবই খারাপ সামনে ওদের সৈন্যদল আক্রান্ত তলোয়ার বাহিনী দ্বারা আর পেছন থেকে ভেসে আসছে সৈনিকদের আর্তনাদ, ওইদিকে কী হচ্ছে কে জানে। তবে এটা বুঝতে তার সময় লাগলো না যে ওইদিকটাতেও তাদের বাহিনী আক্রান্ত হয়েছে। সেইসাথে তারা আটকা পড়ে গেছে জঙ্গুলে পথের একেবারে মাঝামাঝি জায়গায়। সামনে এগোবার পথ বন্ধ তার ওপরে পেছনে যাবারও উপায় নেই। সাথে সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো, পলাবার একটাই উপায় আছে। নিজের সৈনিকদের উদ্দেশ্যে সে চেঁচিয়ে উঠে পালাতে বললো সবাইকে। সেইসাথে নিজে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আক্রমণরত এক থারু সৈন্যকে ঘায়েল করে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী দৌড় দিলো তৃতীয় গাড়িটার দিকে। গাড়ির কোচোয়ান নিজেকে বাঁচাতে ব্যস্ত। প্রহরী প্রধান লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো কাচোয়ানের বসার জায়গায়। এক হাতে কাচোয়ানকে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো একপাশে তারপর কাচোয়ানের বসার জায়গায় উঠে চাবুক চলালো একহাতে।

দুইপাশেই রাস্তা প্রায় বন্ধই বলা চলে। তবুও সে পালাবার উদ্দেশ্যে একহাতে চাবুক তুলে সর্বশক্তিতে সেটা নামিয়ে আনতে যাবে ঘোড়ার পিঠের ওপরে তার আগেই কিছু একটা এসে জড়িয়ে ধরলো তার হাতে। তারপর এক হ্যাচকা টানে ছিটকে পড়লো সোজা ঘোড়ার গাড়ি থেকে মাটিতে।

শামান নিজের ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নিচে নেমে এলো। একহাতে থেমে যাওয়া ঘোড়ার গাড়িটা টেনে থামিয়ে ফিরে তাকাল মাটিতে পড়ে যাওয়া প্রহরী প্রধানের দিকে। “আমরা জানতাম দুইপাশে আক্রান্ত হলে তোমরা জঙ্গলে প্রবেশ করার চেষ্টা করবে। আর সেজন্যে প্রস্তুত ছিলাম আমরা,” বলে সে উঠে বসলো ঘোড়ার গাড়িতে। ওটাকে আবারো চালিয়ে নিয়ে এলো পথের ওপরে। ওখানে পথের দুপাশে লম্বা দাড়ি আর বিধুকে দেখতে পেল শাক্যদের গাড়ি আার কিছু আত্মসমর্পণ করা সৈনিকদের পাহারা দিতে।

শামানকে দেখে হেসে উঠে অভিবাদন জানালো। “ওস্তাদ, জিতে গেছি আমরা,” খুশিতে চেঁচিয়ে উঠলো বিধু। শামান কিছু না বলে ঘোড়ার গাড়িটাকে থমিয়ে নেমে এলো। ও জানে প্রাথমিক জয় নিশ্চিত হলেও এখনো অনেক কাজ বাকি।

ও নামতেই লম্বা দাড়ি এসে পরিস্থিতি জানালো। “হুজুর, আপনি যেভাবে বলছিলেন সেভাবেই আক্রমণ করা হয়েছে। আর তাতে কাজও হয়েছে। কিছু সৈনিককে বন্দিকরা হয়েছে বাকিরা পালিয়ে গেছে কিন্তু রাজা বিক্রম বা শঙ্করাদিত্যকে দেখিনি আমরা কেউই।”

“দেখা যাক, এগুলোর ভেতরে আছে কিনা?” বলে শামান বিধু আর লম্বা দাড়িকে নিয়ে চলে এলো গাড়িটর পেছন দিকে। যেহেতু প্রহরী প্রধান এটাকে নিয়ে পালাচ্ছিলো তারমানে এটাতে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কিছু আছে। গাড়ির কাঠের পাল্লার কব্জা খুলে

সবাইকে সাবধান থাকতে বলে দরজাটা ঠেলে খুলে ফেললো শামান। গাড়ির ভেতরে মানুষ থাকতে পারে, জিনিস থাকতে পারে, ভেতর থেকে আক্রমণ হতে পারে এরকম অনেক কিছুই ভেবেছিল শামান কিন্তু যা দেখলো এরকম কিছু ভাবেনি ও।

ভেতরটা একদম ফাঁকা। কিছুই নেই।

বর্তমান

নির্মাাণাধীন ল্যাব, শাহী ঈদগাহ

কনফারেন্স রুমের বাইরে বেরিয়ে তানভীর দেখলো টমি-সুলতান আর ইকবাল দাঁড়িয়ে আছে। বাবুল আহমেদের কাছে একটু সময় চেয়ে নিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে গেল তানভীর।

"তোমরা হয়তো জেনে গেছো আমি মূল অপারেশনে যাচ্ছি কিন্তু তোমাদেরকে"

"বস সেটা কোন ব্যাপার না কিন্তু সাবধান," সুলতান বলে উঠলো।

"পাশা স্যার কতোদূর?" তানভীর প্রসঙ্গ এড়িয়ে জানতে চাইলো।

"সিলেটের কাছাকাছি, একেবারে সঠিকভাবে জানি না আর কতোক্ষণ লাগবে কিন্তু উনি চলে আসবেন ঘন্টাখানেকেরে ভেতরেই," সুলতান তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কিছু না বলে মুখটা সুলতানের কানের বেশ কাছাকাছি মুখ নিয়ে এলো তানভীর। তারপর মৃদু হেসে বলে উঠলো, "পৌছানো মাত্রই পাশা স্যারকে ব্রিফ করবে। আর হ্যাঁ, আমি তো সাবধান থাকবোই, তোমরাও সাবধান," বলে তানভীর একবার আঙ্গুল তুলে ভি-সাইন দেখিয়ে রওনা দিলো বাইরের দিকে।

বাইরে বেরিয়ে দেখলো ইএএফের সোয়াট কমান্ডোরা দুটো গাড়ির সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মোটা গোঁফ তাদেরকে আরেক দফা ব্রিফ করা হয়ে যেতেই দুটো গাড়িতে উঠে পড়লো ওরা। প্রথমে একটা জিপে বাকি কমান্ডোরা। পেছনে ইএএফের একটা সিভিল মাইক্রোতে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসেছে মোটা গোঁফ ফারুক, আর পেছনের সিটে বাবুল আহমেদের সাথে তানভীর।

রাতের বেলা এই রাস্তায় সিলেটের বাইরে থেকে প্রচুর পাথর বহনকারী ট্রাক ঢোকে। সারি-সারি ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার দুপাশে। ট্রাকগুলোর দিকে তাকিয়ে তানভীরের মনে পড়ে গেল সাস্টে পড়াকালীন সময় মাঝে মাঝে রাতের বেলা এসব ট্রাকে চড়ে ওরা জাফলং চলে যেত বেড়াতে। ওরা কিছুক্ষণ আম্বরখানার রাতের জ্যামে আটকে রইলো। তারপর সারি-সারি নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পাশ দিয়ে তীব্র বেগে এগিয়ে যেতে শুরু করলো ওদের গাড়ি দুটো। বাবুল আহমেদ ফোনে কথা বলেই চলেছে। তানভীর জানালার

বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো। ভাবতেই অবাক লাগছে খুব বেশ সময় আগে নয় ডক্টর মিতায়নকে এই রাস্তা দিয়ে লাক্কাতুরার বাংলো থেকে উদ্ধার করে এনেছিল ওরা। এই অল্প সময়ের ভেতরেই কতো কী বদলে গেছে। এখন চলেছে ছদ্মবেশি ডক্টর মিতায়ন ওরফে জেড মাস্টারকে সেই একই বাংলোতে অভিযান চালিয়ে ধরে আনার জন্যে।

"আচ্ছা ডক্টর প্রবীরের ওপরে কি নজর রাখা হচ্ছে?" বাবুল আহমেদের ফোনে কথা বলা শেষ হতেই তানভীর জানতে চাইলো।

বাবুল আহমদ হেসে উঠলো। "ব্যাটার কোন নড়াচড়া নেই। সে ল্যাবেই আছে। একেবারেই স্বাভাবিক। সেই একটা ফোন কলের পরে আর কোন কলও করেনি সে। একবার ভেবেছিলাম ব্যাটাকে ধরে ডলা দেই।"

তানভীর ঝট করে ফিরে তাকাল বাবুল আহমেদের দিকে। "সর্বনাশ, তারপর?"

"নাহ, ওরকম কিছু করা হয় নি। কারণ পরে ভাবলাম এই ব্যাটাকে ধরলে যদি কোনভাবে বাংলোর ওরা সতর্ক হয়ে যায়। কারণ হয়তো তার নির্দিষ্ট সময় পর-পর যোগাযোগের করার কথা। এই ব্যাটাকে ধরে ফেললে তো আর সেটা হবে না তারচেয়ে বরং সবকিছু স্বাভাবিকই থাক।"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো তানভীর। "ভালোই করেছেন," কথাটা বলে ও সিটে হেলান দিয়ে একবার নিজের অস্ত্রটা বের করে চেক করে নিলো। একবার ভাবলো জিজ্ঞেস করে, আর কতোদূর রাস্তা বাকি। কিন্তু সেটা করার আগেই সামনে থেকে মোটা গোঁফ জানালো, ওরা প্রায় চলে এসেছে। ওদের গাড়ি আরো কিছুদূরে এগিয়ে মূল রাস্তা থেকে খানিকটা বাঁক নিয়ে একটু বামে মোড় নিয়ে সেই রাস্তায় নেমে পড়লো- যেটা দিয়ে এর আগেরবার ওরা বাংলোতে গেছিল। অভিজ্ঞ ড্রাইভার আগেই হেড লাইট নিভিয়ে দিয়েছিল, পাশের কাঁচা রাস্তায় নামতেই সে গাড়িটাকে রাস্তার একপাশে অন্ধকার জায়গায় থামিয়ে দিলো।

"সবাই খুব সাবধান। কোন শব্দ করা চলবে না, এন্টারনাল কমিউনিকেশন ডিভাইস বাদে সব ধরণের মোবাইল ইত্যাদি বন্ধ," ওরা নেমে আসতেই সবাইকে সাবধান করে দিলো ফারুক। ওরা দল ধরে সামনে এগোল সারি দিয়ে। আরেকটু এগাতেই ফারুক সবাইকে থামতে ইশারা করলো। সবাই থেমে যেতেই মৃদু শিস বাজালো সে। প্রায় সাথে সাথেই একই ধরণের শিসের শব্দ ভেসে এলো। একটু পরেই অন্ধকারের ভেতর থেকে ভুতের মতো কালো পোশাক পরা এক লোক এসে হাজির হলো।

বাবুল আহমেদের সামনে দাঁড়িয়ে স্যালুট ঠুকে ফারুকের দিকে তাকিয়ে সামান্য মাথা নোয়ালো। "হাফিজ, এখানকার কী অবস্থা? কোনরকম মুভমেন্ট?"

"না স্যার, বাড়ির ভেতরে খুবই সামান্য আলো জ্বলছে। কিছু নড়াচড়া ছাড়া বিশেষ কিছু ঘটেনি। কেউ বেরও হয়নি, ঢোকেও নি," হাফিজ নামের লোকটা রিপোর্ট করলো।

“ঠিক আছে, তোমরা পোস্টে ফিরে যাও, আমরা এগোব,” বলেই ফারুক বাকিদের দিকে ফিরে ইশারা করলো। ওরা আবারো সারি দিয়ে এগোল, বেশ খানিকটা এগিয়ে বাংলোতে ওঠার পাহাড়ি ঢাল শুরু হতেই ওরা মূল রাস্তা এড়িয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়লো। এখান থেকেই একটা দল চলে গেল পাহাড়ি ঢালের অন্যপাশে। ওরা বাংলোর পেছনটা কভার করবে। বাংলো থেকে যদি কেউ নাইট ভিশনে চোখ রাখে থাকে তবুও ওদেরকে দেখতে পাবার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। জঙ্গলে প্রবেশ করে ধীরে-ধীরে ঢাল বেয়ে উঠতে উঠতে ওরা বাংলোর একেবারে কাছাকাছি চলে এলো। বাংলো থেকে হাজারখানেক গজ দূরত্বে এসে নিঃশব্দে সবাইকে থামার ইশারা করে ফারুক একবার নিজের তর্জনী তুলে শূণ্যে ঘোরালো। সাথে-সাথে পূর্বনির্ধারিত দলে ভাগ হয়ে গেল কমান্ডোরা।

বাংলোটা থেকে খুবই মৃদু আলো ভেসে আসছে। ভালোভাবে খেয়াল না করলে ঠিক বোঝাও যাবে না। দূর থেকে বোঝা তো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। বাংলোর পাঁচশো গজের ভেতরে প্রবেশ করতেই বাংলোর দুপাশে দুজন বাদে বাকিরা যোগ দিলো ফারুকের সাথে। ফারুকদের ঠিক পেছনেই তানভীর আর বাবুল আহমেদ। প্রত্যেকেই প্রস্তুত। বাংলোর কাঠের বেড়া টপকে ওরা ভেতরে ঢুকে পড়লো।

তানভীর দেখলো গতবারের অভিযানের ফলস্বরূপ এখানে ওখানে কিছু ভাঙা-চোড়া এটা-সেটা ছড়িয়ে আছে। বাংলোর সামনেই তেরপলে ঢাকা একটা গাড়ি দাঁড় করানো। তানভীর অনুমান করলো এটাই সম্ভবত সেই অ্যাম্বুলেন্স যেটাতে ক’রে তারা এখানে এসেছে। ফারুক ওদেরকে থামতে বলে নিজেরা সামনের দিকে এগিয়ে গেল। ওরা সেই পুরনো খোঁয়ারটার পেছনে আড়াল নিলো। তানভীর দেখলো বাবুল আহমেদ হাঁপাচ্ছে। তানভীর নিজের অস্ত্র সামলে সামনের দিকে উঁকি দিলো। ফারুকেরা বারান্দায় উঠে পড়েছে।

“স্যার, আমরা কি এগোব না?” তানভীর অস্থির হয়ে জানতে চাইলো।

“প্রশ্নই আসেনা। আমরা এখানেই অপেক্ষা করবো,” বাবুল আহমেদ হাঁপাতে-হাঁপাতে জবাব দিলো। এইটুকু পথ পাড়ি দিতেই সে হাঁপিয়ে গেছে।

তানভীর উঁকি দিয়ে দেখলো ফারুকেরা দুজনে বাংলোর দরজার দুপাশে অবস্থান নিয়েছে আর একজন কমান্ডো দরজা বরাবর দাঁড়িয়ে দুইপা পিছিয়ে গেল। ফারুক এক দুই তিন গুনতেই কমান্ডোটা এগিয়ে লাথি মারলো দরজায়। কিন্তু তানভীর অবাক হয়ে দেখলো দরজা খোলাই ছিল। কমান্ডোটা লাথি মারতেই সেটা ধাম করে খুলে গিয়ে জোরে বাড়ি খেল অন্যপাশের দেয়ালে। প্রায় সাথে সাথেই একটা বিস্ফোরণ হলো। দরজায় লাথি মারা কমান্ডো বিস্ফোরণের ধাক্কায় বারান্দা থেকে ছিটকে এসে পড়লো একেবারে লনের ওপরে।

অতীত

পৃথুরা বনভূমি, কন্নোর

"সর্বনাশ, ভিতরে তো..." ফাঁকা গাড়ি দেখে বিধু বলে উঠলো। বিধুকে কথা শেষ করতে না দিয়ে শামান চেঁচিয়ে উঠে বাকি ঘোড়ার গাড়িগুলোকে খোলার নির্দেশ দিলো ও। ওপাশ থেকে প্রথমটা খুলে লম্বা দাড়ি চেঁচিয়ে জানালো ওটাও খালি। শামানের মনে হলো এরকম বোকা ও জীবনেও বনেনি। এই সফরের পুরোটাই সাজানো হয়েছে ওদেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে। পথের অন্যপাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠে থারু সৈনিকেরা জানালো ওই গাড়িদুটোও ফাঁকা।

"ওস্তাদ এইডা কি হইলো?" বিধুর কথার জবাবে শামান কিছু না বললেও হেসে উঠলো শাক্যদরে প্রহরী প্রধান।

"বোকার দল, এই পুরা যাত্রাটাই সাজানি হইছে তগো বোকা বানানির লাইগা, জাথুরিয়া যারে দিয়া তগোরে খবর পাঠাইছে হেই লোকেই রাজা বিক্রমরে সব জানাই দিছে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে। তাই রাজায় পরিকল্পনা বাতিল না কইরা একটু পরিবর্তন করছে। এইদিকের রাস্তায় একটা দল পাঠাইছে যাতে তরা এইদিকে ব্যস্ত থাকতে পারোস। আর অন্য রাস্তা দিয়া..." লোকটার শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসে রইলো না শামান, তার আগেই ও চট করে সরে এলো ওখান থেকে। যা বোঝার বুঝে গেছে।

শামান দৌড়ে এসে একটা ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে লাফিয়ে উঠে বসলো ওটাতে। বিধু আর লম্বা দাড়িও দৌড়ে আসছিল ওর পিছু-পিছু, ওকে ঘোড়ায় উঠতে দেখে থেমে গেল ওরা।

"ওস্তাদ, এখন কি-"

লম্বা দাড়িকে উদ্দেশ্য করে কথা বলে উঠলো, "তোমরা এখানকার কাজ গুছিয়ে যতোটা দ্রুত পারো মন্তলার হাটে পৌছাও। ওখানে পৌছে অস্ত্রসহ সবকিছু নিয়ে প্রস্তুত থাকবা। আর আমার নির্দেশের অপেক্ষা করবা।"

"কিসের নির্দেশ," পেছন থেকে জানতে চাইলে বিধু কিন্তু জবাব না দিয়ে ততোক্ষণে পূর্ণবেগে ঘোড়া ছোটাতে শুরু করেছে শামান। ঘোড়া নিয়ে সোজা জঙ্গলে প্রবেশ করতে-করতে ও মনে-মনে ভাবতে লাগলো, এখনো একটা উপায় আছে যদি রাজা বিক্রমের বহর সেই বাঁশের সেতু না পার হয়ে থাকে।

শামান এই কয়দিনের যাতায়াতে মোটামুটি পথ চিনে ফেলেছে। ও জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যতোটা দ্রুত সম্ভব ঘোড়া ছোটালো। ওর ভাবনা যদি ভুল না হয় তবে ও এই মুহূর্তে যেখানে আছে সেখান থেকে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে মাইল তিনেক উত্তরের দিকে এগোতে পারলে ও সেই পথের কাছাকাছি পৌছাতে পারবে যেটা দিয়ে রাজা বিক্রমের বাহিনী মন্তলার হাটের দিকে চলেছে। ঘোড়া ছোটাতে-ছোটাতে ও মনে মনে হিসেব করলো রাজা বিক্রমের বাহিনীর বর্তমান সম্ভাব্য অবস্থান কোথায় হতে পারে। ওরা যখন প্রথম বাহিনীর

পিছু নিতে শুরু করে তার ঠিক পর দিয়েও যদি রাজা বিক্রমের বাহিনী মন্তলার হাটের দিকে রওনা করে থাকে তবে এই ঘুর পথে যেতে যেতে ওদের সময় অনেক বেশি লাগার কথা তার ওপরে ওরা যদি ওই কাঠের সেতু পার হতে চায় তবে অবশ্যই ওদেরকে অনেক বেশি সময় নিতে হবে। কাজেই এখনো একটু হলেও আশা আছে। শামান ঘোড়ার গায়ে আরো জোরে চাপড় লাগালো।

আধা ঘন্টার ভেতরে শামান সেই পথের ধারে পৌঁছে গেল কিন্তু কোথাও কারো চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে না।

ব্যাপার কি? কাউকেই দেখা যাচ্ছে না কেন? ও কি তবে ভুল পথে চলে এলো?

সেই সেতুটাও তো দেখতে পাচ্ছে না। ডানে না বামে এগোবে ঠিক বুঝতে পারছে না শামান। মনে-মনে দিকের হিসেব করে ঠিক সন্তুষ্ট না হলেও ও আন্দাজ করলো, ডানে এগোনোটাই উত্তম হবে। রাস্তাটাকে হাতের বামে সমান্তরালে রেখে জঙ্গলে প্রবেশ করে এগোতে লাগলো ও। আধ মাইলের মতো এগোতেই সামনে মানুষের হাঁক-ডাক শোনা যেতে লাগলো। মনের ভেতরে আশাবাদি হয়ে উঠলো শামান। ঘোড়ার গতি কমিয়ে আনলো।

আরেকটু এগোতেই দেখতে পেল সেই সেতুটা একে-একে পার হচ্ছে রাজা বিক্রমে বহিনীর লোকেরা। একদল সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে সেতুর এপাড়ে, সেইসাথে একটা কাঠের গাড়ি। রাজা বিক্রমকেও দেখতে পেলো ও ঘোড়ার পিঠে। লোকটাকে দেখে দাঁতে দাঁত পিষলো শামান।

আরেকটা ঘোড়ার গাড়ি সেতু পার হচ্ছে। সবাই সেদিকে তাকিয়ে আছে। লোকজন হাঁক-ডাক করছে। শামান ধীরে-ধীরে ঘোড়া থেকে নেমে এলো। ঘোড়টাকে জঙ্গলের ভেতরে একটা গাছের সাথে বেঁধে ও উঠে পড়লো রাস্তার ওপরে ঝুঁকে আছে এমন একটা গাছের ওপর। ভয়াবহ একটা ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে ও। কিন্তু এছাড়া আর কোন উপায় নেই।

গাছের ওপরে উঠেই দেখতে পেল দ্বিতীয় গাড়িটা প্রায় সেতু পার হয়ে চলে এসেছে। গাড়িটা এপাড়ে আসতেই রাজা বিক্রমের দলের বাকি লোকেরা দ্রুতই এপাড়ে চলে এলো। শামান মনে-মনে হিসেব করছে দুটো গাড়ির কোনটাতে মুর্তিটা থাকতে পারে। প্রথম গাড়িটা দ্বিতীয়টার চেয়ে তুলনামূলক ছোট। যদিও পুরোপুরি নিশ্চিত হবার উপায় নেই তবুও মোটামুটি ও আন্দাজ করে নিলো মুর্তিটা সম্ভবত প্রথম গাড়িতেই আছে, আর দ্বিতীয় গাড়িতে আছে সম্ভবত বন্দিরা।

শামান খুব সাবধানে অবস্থান নিয়ে আছে। এসব কাজে ওর জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু সবকিছু এমনভাবে লোকবেষ্টিত হয়ে আছে যে চাইলেও ওর মতো দক্ষ কসরৎকারীর পক্ষেও কিছু করা সম্ভব নাও হতে পারে। বিশেষ করে যে-কাজটা ও করতে যাচ্ছে। সেতুটা পার হয়েই রাজা বিক্রমের দলটা আবারো দ্রুত গতিতে চলতে শুরু করলো।

শামানের যতোটুকু মনে পড়ে এখান থেকে মন্তলার হাট একেবারেই কাছে। হয়তো মাইলখানেক হবে বড়জোড়। কাজেই এখান থেকেই দ্রুত পথ চলতে শুরু করার কারণটা আন্দাজ করা যায় সহজেই।

দম বন্ধ করে গাছের ওপরে অবস্থান নিয়ে ও নিচ দিয়ে রাজা বিক্রমের বাহিনীকে এগিয়ে যেতে দেখলো। দলের একেবারে অগ্রভাগে একটা সাদা ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে চলেছে রাজা বিক্রম। তার সাথে নিজের বাহিনী। ওদের পিছু-পিছু চলেছে ঘোড়সওয়ারা। তার ঠিক পেছনে শঙ্কতরাদিত্যকে দেখতে পেল ও। তার নেতৃত্বে দুটো গাড়ি এগিয়ে চলেছে। আগে ছোট গাড়িটা সামনে থাকলেও সেতু পার হবার পর বড় গাড়িটাকে আগে দেয়া হয়েছে। শামান যে-গাছের ডালে অবস্থান নিয়ে আছে সেটার নিচ দিয়ে চলে যাবার সময়ে বড় কাঠের গাড়ির ভেতর থেকে ভেসে আসা মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে একটু হলেও স্বস্তি বোধ করলো শামান। তারমানে মুর্তিটা দ্বিতীয় গাড়িতে থাকার সম্ভাবনা বেশি। প্রথম গাড়িটা পার হয়ে চলে যেতেই শরীরটাকে একেবারে টান-টান করে ফেললো ও।

দ্বিতীয় গাড়িটা ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে। শরীরটাকে আরো টান করে দিলো শামান, গাড়িটা ঠিক গাছের নিচে আসা মাত্রই অনেকটা গড়িয়ে পড়ার মতো শরীরটাকে ছেড়ে দিলো ও নিচের দিকে। বানর যেভাবে কোন উঁচু জায়গা থেকে নিচের দিকে লাফ দিয়ে পড়ে, অনেকটা তেমন ভঙ্গিতে ঝুপ করে কাঠের গাড়িটার ওপরে পড়লো ও।

সাথে সাথে গাড়ির ভেতরে নড়ে উঠলো কেউ একজন।

বর্তমান

লাক্কাতুরা টি-এস্টেট, সিলেট

বিস্ফোরণের ধাক্কায় দুজন কমান্ডো লনে ছিটকে পড়ার সাথে সাথেই বারান্দায় অবস্থানরত বাকি দুজনেই খক-খক করে কাশতে শুরু করেছে। "ব্লাডি হেল," বলে তানভীর লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। পিস্তল হাতে সাবধানে কিন্তু দ্রুত এগোল বাংলোর দিকে। বারান্দায় ফারুক আর তার সঙ্গী অনেকটাই সামলে নিয়েছে। ওরা সোজা হতে-হতেই তানভীরও পৌঁছে গেল।

তানভীরকে দেখে ফারুক বলে উঠলো, "অ্যামবুশ, দরজায় বোমা সেট করা ছিল। তারমানে ওরা ভেতর থেকে দরজা কভার করছে। ভেতরে ঢুকলেই গুলি করবে।"

"তাহলে আমরা একজন বাইরে থেকে কভার করবো। অন্য দুজন ভেতরে ঢুকবো। ঠিক আছে?" তানভীরের কথা শেষ হতেই তার হাতে দুটো বলের মতো জিনিস ধরিয়ে দিয়ে ফারুক মাথা ঝাঁকিয়ে গুনতে শুরু করলো। "এক দুই তিন..."

তিন পর্যন্ত গোনা শেষ হতেই তানভীরের হাতে ধরিয়ে দেয়া ফ্ল্যাশ গ্রেনেড আর স্মোক বম্ব দুটোই পিন খুলে ছুঁড়ে দিলো ভেতরের দিকে। দরজার দুপাশ থেকে সাব মেশিনগান দিয়ে ভেতরে গুলি করতে শুরু করলো ফারুক আর তার সঙ্গী। টানা দশ সেকেন্ড গুলি করেই থেমে গেল ওরা। সাথে-সাথে ভেতর দিকে লাফ দিলো তানভীর।

অনেকটা অন্ধের মতোই ভেতরে ডাইভ দিয়ে হাঁটুর ওপরে ভর দিয়ে সোজা হলো ও। ঘরের একপাশে একটা উল্টানো টেবিল আর অন্যপাশে একটা সোফা দেখতে পেল। সম্ভবত এই দুটোর আড়ালেই অবস্থান নিয়েছে ওরা। টেবিলটাকে লক্ষ্য করে এক পশলা গুলি করলো ও। টেবিলের আড়াল থেকে চিৎকার ভেসে আসতেই ও ঘুরে যেতে শুরু করলো সোফার দিকে কিন্তু তার আগেই বুকের একপাশে গুলির ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল আবার। সোফার আড়াল থেকে গুলি করেছে কেউ। মাটিতে পড়ে ব্যথার চোটে দম বন্ধ হয়ে এলো ওর। বুকের বাতাস সব বেরিয়ে গেছে। গুলি ভেস্টের ওপরে লাগলেও ব্যথার পরিমাণ ভয়াবহ। ও সোজা হবার আগেই দেখলো ফারুক আর তার সঙ্গী ভেতরে ঢুকে পড়েছে। দুজনেই সোফা লক্ষ্য করে সমানে গুলি করতে শুরু করলো।

ওদের গুলি থামতেই চুপ হয়ে গেল সব। ঘরের ভেতরে এখনো ধোঁয়ায় অন্ধকার। তানভীর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সোফার আড়ালে থাকা লোক দুজনকে দেখলো। এরা কেউই জেড মাস্টার না। বাংলোর ভেতরের দিকে ঢুকতে ইশারা করলো। ফারুক সবার সামনে, তার পেছনে তানভীর তার পেছনে কমান্ডোরা। একে অপরকে কভার করে এগোল ওরা। ভেতরের করিডরে ঢুকতেই দরজার আড়াল থেকে কেউ একজন ফরুকের সাবমেশিনগানের নল চেপে ধরে ঘুরিয়ে দিলো অন্যদিকে। সেইসাথে একটা ছুরি বসিয়ে দিলো ফারুকের বুকে। কিন্তু ভেস্টে আটকে গেল সেটা। ফারুককে দরজায় আটকে ফেলাতে পেছন থেকে ওরাও কোন সাহায্য করতে পারছে না। দুজনেই ধস্তাধস্তি করছে, তানভীর মাটিতে বসে আক্রমণকারীর পা লক্ষ্য করে গুলি করলো।

লাথি খাওয়া কুকুরের মতো কেঁউ শব্দ করে লোকটা টালমাতাল হয়ে গেল। হাত আলগা হয়ে যেতেই লোকটার থুতনির নিচে সাবমেশিনগান ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপে দিলো ফারুক। মানুষটা পড়ে যেতেই ওরা ভেতরে ঢুকে পড়লো। কেউ একজন বন্দুক হাত দাঁড়িয়েছিল করিডরের শেষ মাথায় কিন্তু গুলি না করে সে উল্টো ঘুরে দৌড় দিলো ভেতরের দিকে। ফারুকও দৌড় দিলো তার পিছু-পিছু। তানভীর দেখলো লোকটা সেই বেডরুমের দিকে দৌড়াচ্ছে ওখানেই এর আগেরবার ডক্টর মিতায়নকে খুঁজে পেয়েছিল ওরা।

তবে সে বেডরুমে প্রবেশ করতে পারলো না। চিৎকার করতে করতে বেডরুমের দরজার কাছে পৌছাতেই ফারুক হাঁটু গেড়ে বসে গুলি করলো। ফারুকের গুলি খেয়ে বেডরুমের ভেতরে উড়ে গিয়ে পড়লো সে। তানভীর বাকি দুজনকে সাবধান করে দিয়ে সামনে এগোল, আন্দাজ করছে বেড রুমেই সম্ভবত লুকিয়ে আছে জেড মাস্টার। সাবধানে পিস্তল হাতে দরজার পাশে বসে নিচ থেকে বেড রুমের ভেতরে উঁকি দিলো ও। কেউ আছে ভেতরে। ফারুকের দিকে ইশারা করে ও চট করে ঢুকে পড়লো কামরার ভেতরে। ও নিশ্চিত জেড মাস্টার ভেতরেই আছে, তাই যেকোন আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত।

অতীত

পৃত্থুরা বনভূমি, কন্নোর

যদিও যথাসম্ভব শব্দ কম করা চেষ্টা করছে ও তারপরও একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের পতনের শব্দ কানে যাবে যে কারো। গাড়িটার পেছন থেকে কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠে কিছু একটা জানতে চাইলো। গাড়ির ভেতরে থেকে কেউ জবাব দিলো কিন্তু পেছনের সৈনিককে সে-জবাব শুনে ঠিক সন্তুষ্ট মনে হলো না। সে ঘোড়া নিয়ে চলে এলো গাড়িটার একেবারে পাশে। শামান মটকা মেরে শুয়ে আছে গাড়ির কাঠের ছাদের ওপরে।

সৈনিকটা গাড়ির পাশাপাশি চলতে চলতে গাড়ির জানালা দিয়ে জানতে চাইলো শব্দ হলো কিসের। ভেতর থেকে কেউ একজন জবাব দিলো, কিছু হয়নি। হয়তো গাড়ির ওপরে জঙ্গল থেকে কোন প্রাণি লাফিয়ে পড়েছে তাই শব্দ হয়েছে। কিন্তু কোন ক্ষতি হয়নি। সৈনিককে এবার সন্তুষ্ট মনে হতেই সে আবারো পিছিয়ে গিয়ে তার সঙ্গীদের সাথে যোগ দিলো।

শামান মনে-মনে ভাবলো, এবার ওকে কাজ শুরু করতে হবে। একবারই সুযোগ পাবে ও। ছাদের ওপরে শুয়ে শরীরটাকে সাবধানে সামলে কোমর থেকে বের করে আনলো বাঁকানো ছুরিটা কাঠের গাড়িটার ছাদের একটা কাঠের জোড়ার ভেতরে ছুরিটার একটা মাথা ঢুকিয়ে দিলো ও সাবধানে। তারপর সাবধানে ছুরিটাকে এদিক সেদিক নাড়িয়ে আঙ্গুল ঢোকানোর মতো একটু ফাঁক করলো। আরো দুটো তক্তা তফাতে একইভাবে আরেকটা খাঁজ বানালো সাবধানে। তারপর ছুরিটা ভেতরে ঢুকিয়ে দুইহাতে দুই পাশের ফাঁকে দুই হাত ঢুকিয়ে সর্বশক্তিতে এক টান মারলো ও। যদিও আন্দাজ করেছিল তক্তাটা এতো সহজে খুলবে না তবুও এতোটা শক্তি লাগবে ও বুঝতে পারেনি। তারপরও একটানে না হলেও দ্বিতীয়বারের সময় খুলে আনতে পারলো দুই তক্তার জোড়াটা।

ওটা খুলেই মাঝখানের ফাঁক দিয়ে নিচের দিকে শরীর গলিয়ে দিলো ও। ঝপ করে লাপিয়ে পড়লো কাঠের গাড়ির মেঝেতে। ভেতরে কে আছে কয়জন আছে আন্দাজ করার উপায় ছিল না। ভেতরে নেমেই দেখলো একজন মানুষই আছে ভেতরে সে কালো কাপড়ে মুখ-চোখ ঢাকা শামানকে দেখে ভীষণভাবে চমকে উঠলো। ওপরে কিছু একটা হচ্ছে বুঝতে পারছিল সে কিন্তু ওপর থেকে এভাবে যমদূত নেমে আসবে ভাবতেও পারেনি বেচারা। কী করবে কাউকে সাবধান করবে বুঝে ওঠার আগেই শামান নিজের লম্বা একটা হাত বাড়িয়ে খপ করে চেপে ধরলো লোকটার মুখ, তারপর ভীষণ শক্তিতে শরীরটাকে ঘুরিয়ে একেবারে নিজের সামনে নিয়ে এলো। হাতের কব্জি-কনুই আর কাঁধের চাপে দক্ষতার সাথে মট করে ভেঙে দিলো লোকটার ঘাড়।

সাবধানে মানুষটাকে নিচে নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো ও। যদিও কাঠের গাড়ির ভেতরটা বেশ অন্ধকার তবুও ওটার ভেতরে একপাশে রাখা কাপড়ে ঢাকা অবয়বটা চোখে না পড়ার কোনই কারণ নেই। একটানে কাপড়টকে সরিয়ে চোখ তুলে তাকাল শামান।

অন্ধকারের ভেতরে যেন আরো গাড় এক টুকরো গভীর অন্ধকার। মুর্তিটার কালো অবয়ব যেন অদ্ভুত কোন এক জাদুকরি শক্তিতে সম্মোহন করে ফেলেছে ওকে। কী জানি আছে মুর্তিটার ভেতরে।

বাইরে থেকে কথাবার্তা ভেসে আসতেই শামান চট করে মুর্তি ঢেকে রাখা কাপড়ের খানিকটা অংশ ছিড়ে অজ্ঞান লোকটার হাত-পা বেঁধে কাপড়ের বাকি অংশটা দিয়ে তাকে ঢেকে দিয়ে আবারো মুর্তিটার সামনে এসে দাঁড়ালো। উচ্চতায় ওর থেকেও খানিকটা বড় মুর্তিটা। এমন অদ্ভুত কালো ধাতুর মুর্তি শামান এর আগে কখনো দেখেনি। মুর্তিটার কালচে অবয়বের দিকে তাকিয়ে কেমন জানি সম্মেহিতের মতো অনুভব করতে লাগলো ও।

কাঠের ঘোড়ার গাড়িটা থামতে শুরু করেছে। শামান মুর্তিটা সামনে দাঁড়িয়ে মনে-মনে বলে উঠলো, দেখা যাক ডুকপা লামার কথা কতোটা ঠিক হয়, মনে-মনে কথাটা বলেই ও মুর্তিটার কাঁধের বিশেষ একটা জায়গাতে চাপ দিলো।

কেমন জানি নিঃশ্বাস ফেলার মতো শব্দ করে একটা অংশ খুলে গেল মুর্তিটার।

এই তাহলে অন্ধকারের অবতার, শামান কথাটা ভাবতেই ঘোড়ার গাড়িটা থেমে গেল। আর শামান ঢুকে পড়লো ফাঁপা মুর্তিটার ভেতরে।

বর্তমান

লাক্কাতুরা টি-এস্টেট, সিলেট

যেভাবে ওরা পুরো বাংলো কর্ডন করে অপারেশন চালিয়েছে তাতে তানভীর ভেবেছিল জেড মাস্টার বেডরুমের ভেতরেই আছে। কিন্তু অস্ত্র বাগিয়ে ভেতরে ঢুকে বেডরুমে কাউকেই দেখতে পেলো না ও। ওর সাবধান বাণীর কোন প্রতিউত্তরও এলো না বেডরুমের ভেতর থেকে। না কোন গুলি বা অন্যকিছু।

তানভীর বেডরুমের ভেতরের ভালোভাবে তাকিয়ে দেখলো, যাকে আসলে মানুষ ভেবেছিল সেটা রুমের মাঝখানে দাঁড় করানো একটা বিরাট মুর্তি। বিশেষভাবে বলতে গেলে বুদ্ধ মুর্তি। ছয় ফিটের বেশি লম্বা কালো বুদ্ধ মুর্তিটার দিকে তাকিয়ে তানভীর আনমনেই বলে উঠলো, "ব্ল্যাক বুদ্ধা।"

ফারুক আর তার সঙ্গী বেডরুম আর লাগোয়া বাথরুম চেক করে ওর পাশে এসে দাঁড়ালো।

"এটাই তাহলে সেই ঐতিহাসিক মুর্তি," ফারুকের কথার কোন জবাব না দিয়ে তানভীর তাকিয়ে রইলো মুর্তিটার দিকে। অদ্ভুত এক কালচে সৌন্দর্যের গভীর কালো মুর্তিটা যেন

কালো রঙের দ্যুতি ছড়াচ্ছে। বিরাট মুর্তিটার অবয়বে এমন কিছু আছে যে তানভীর চাইলেও চোখ সরাতে পারছে না। মুর্তিটার গায়ে ও হাত দিয়ে দেখলো মুর্তিটার কালচে ভাবটা অদ্ভুত, কেমন যেন আশপাশ থেকে আলো সব শুষে নিচ্ছে। আবার মুর্তিটা নিজে খুব কালো যে তাও না। তেমন যেন স্বচ্ছ কালচে ধূসর একটা ভাব ওটার। মুর্তিটার পায়ের কাছেই ও নিজের ডেজার্ট ঈগলটা পড়ে আছে দেখে তুলে নিলো। হাতে নিয়ে দেখলো খালি ওটা।

"মুর্তিটা এতোবড় আমি ভাবতেই পারিনি," ফারুকের কথা শুনে ঘুরে তাকাল তানভীর। তার দিকে ফিরে তানভীর প্রশ্ন করলো, "মুর্তি তো পেলাম কিন্তু, জেড মাস্টার গেল কোথায়?"

"এখানে তো নেই, পুরো বাংলো চেক করা হচ্ছে হয়তো আছে কোথাও," বলে ফারুক মাছি তাড়ানোর মতো একটা ভঙ্গি করলো। "যাবে আর কই, ধরা পড়বেই।"

তানভীর তার দিকে ফিরে রাগের সাথে বলে উঠলো, "আপনি জেড মাস্টারের ব্যাপারে কথা বলছেন, আপনার কি মনে হয় না আমাদের আরেকটু সচেতন হওয়া উচিত, দেখুন-" তানভীরেরর কথা শেষ হবার আগেই রুমের ভেতরে প্রবেশ করলো বাবুল আহমেদ।

"মাই গড," সে বিস্ময়ের সাথে তাকিয়ে আছে মুর্তিটার দিকে। "এই সেই মুর্তি? অসাধারণ," বাবুল আহমেদ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মুর্তিটার দিকে।

"স্যার, জেড মাস্টারকে কিন্তু আমরা পাইনি, আমার ধারণা সে পালিয়েছে। কিন্তু পালিয়ে থাকলেও সে বেশিদূরে যেতে পারেনি। আমাদের এক্ষুণি বাংলোসহ এর আশপাশটা সিল করে দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা উচিত।"

"আছে আশেপাশেই, যাবে কোথায়-"

বাবুল আহমেদ কথা শেষ করার আগেই রুমের ভেতরে প্রবেশ করলো দুজন কমান্ডো। "স্যার, পুরো বাংলোর প্রত্যেকটি কোনা পরীক্ষা করা হয়েছে, কেউ নেই," কমান্ডো রিপোর্ট করতেই সবাই ফিরে তাকাল সেদিকে। তানভীর দুই পা তার দিকে এগিয়ে গিয়ে জানতে চাইলো, "আপনি নিশ্চিত?"

"অবশ্যই, স্যার," লোকটা জবাব দিতেই অন্য কমান্ডোর দিকে ফিরে তানভীর বলে উঠলো, "আপনি তো বাংলোর পাশে ছিলেন, বাংলোর পাশ দিয়ে কেউ বেরোয়নি তো?"

"স্যার, পাশ দিয়ে বের হবার কোন রাস্তাই নেই, তাও যদি কেউ বের হত একপাশে আমি আর অন্যপাশে হাবিব ছিল, আমরা একটা ইদুর নড়লেও দেখতে পেতাম, কিন্তু কাউকে দেখিনি।" লোকটার কথা শেষ হতেই তানভীর ফারুকের দিকে ফিরে বলে উঠলো। "হয়তো সে পেছন দিয়ে পালিয়েছে আপনার লোকদেরকে বলেন যারা পেছনে পাহারায় ছিল-"

তানভীর কথা শেষ করার আগেই ফারুক জবাব দিলো, “এইমাত্র ওদের রিপোর্ট শুনলাম। বাংলোর পেছনের পাহাড় সোজা নিচে নেমে গেছে, ওখানে জঙ্গল শুরু হবার আগে খোলা ফসলের মাঠ। ওদিকে দিয়ে কেউ নামলে ওরা পরিষ্কার দেখতে পেতো কিন্তু ওখানেও কিছু নড়তে দেখেনি ওরা।”

“আরে অফিসার,” পেছন থেকে বাবুল আহমেদ তানভীরের কাঁধে একটা হাত রাখলো। “তুমি এতো অস্থির হচ্ছো কেন। জেড মাস্টার যদি পালিয়েও গিয়ে থাকে, তাতে সমস্যা কোথায়, সে ধরা পড়বেই। মুর্তিটা তো পেয়েছি আমরা,” বাবুল আহমেদ মুর্তিটার দিকে এগিয়ে ওটার গায়ে হাত বুলাতে শুরু করেছে। “হাজার বছরের পুরনো অ্যান্টিক।”

“স্যার-” তানভীর তার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার অগেই বাবুল আহমেদ ফারুকের দিকে ফিরে ইশারা করলো। তানভীর একপা এগিয়ে গেছিল ফারুক আহমেদের দিকে। হঠাৎ পেছন থেকে কেউ লাথি মারলো ওর পায়ে। আচমকা হাঁটুর পেছনে লাথি খেয়ে আপনাতেই হাঁটু ভেঙে বাঁকা হয়ে গেল ওর শরীর। হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল খালি ডেজার্ট ঈগলটা। তানভীর হাঁটু ভেঙে বসে পড়তেই সামনে থেকে সরাসরি ওর বুকে গুলি করলো ফারুক। উজি সাবমেশিনগানের এক পশলা গুলি বুকের ভেস্টের ওপরে লাগতেই প্রায় উড়ে গিয়ে বাংলোর কাঠের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল তানভীর।

আকস্মিক ধাক্কায় ওর মাথা কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। প্রায় অবশ হয়ে আসতে থাকা বাম হাতের নিচে বগলের কাছে ডান হাত চলে গেল ওর। রক্তে ভিজে উঠছে জায়গাটা। ভেস্টের ফাঁক গলে একটা বুলেট ঢুকে পড়েছে ওখানে। বহু কষ্টে মাথা তুলে সামনে দেখলো। বাবুল আহমেদ হাত-পা নেড়ে কিছু একটা বলছে তার লোকদেরকে। ফারুক মাটিতে পড়ে থাকা তানভীরের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

ওদেরকে ছাড়িয়ে তানভীরের দৃষ্টি চলে গেল বেডরুমের মেঝের ওপরে সগর্বে দাঁড়িয়ে থাকা বুদ্ধ মুর্তিটার দিকে। এর আগে যতো বুদ্ধ মুর্তি দেখেছে সবগুলোর চোখে-মুখে অদ্ভুত এক প্রশান্তি বিরাজমান ছিল কিন্তু এই মুর্তিটার অন্ধকার অবয়বের সাথে চোখে-মুখেও কেমন জানি ক্রুরতা। জ্ঞান হারাবার আগে তানভীর মাথায় একটাই কথা ঘুরতে লাগলো। এ-কারণেই কি তবে একে ব্ল্যাক বুদ্ধা বলা হয়। কী এই মুর্তির রহস্য?

ভাবতে ভাবতেই চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে এলো ওর।

অতীত

মন্তলার হাট, কন্নোর

জীবনে অনেক ধরণের ধাতুর গন্ধ পেয়েছে শামান। বিশেষ করে তামা লোহা আর পিতলের গন্ধ ওর পরিচিত। কিন্তু এরকম গন্ধ কখনো পায়নি ও। গন্ধের বিভিন্ন রকমফের থাকে। কেমন জানি টক-টক একটা গন্ধ। মুর্তির ভেতরটা ভয়ানক টক-টক গন্ধে ভরপুর। প্রথমে বমি ঠেলে আসতে চাইলো কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে পড়ে গেল ঠিক এর কাছাকাছি গন্ধ ছিল শান্তির মঠ থেকে আনা ওর কাতানা জোড়াতে।

কোন মুর্তির ভেতরে থাকার অনুভূতি কেমন হতে পারে যে না ঢুকেছে তাকে কখনোই সেটা পুরোপুরি বোঝানো সম্ভব নয়। একই সাথে বদ্ধ কোন জায়গায় আটকা পড়ার অনুভূতি আবার ভাসমান কোন জায়গায় ভেসে থাকার অনুভূতিকে যদি এক করা যায় তবে এর কাছাকাছি একটা অনুভূতি পাওয়া যেতে পারে ব'লে মনে হতে লাগলো শামানের। শামানের মতো লম্বা মানুষের জন্যে মুর্তির ভেতরের জায়গাটা একেবারেই অপ্রতুল।

মুর্তিটার ভেতরে প্রবেশ করা মাত্রই একইসাথে অনেকগুলো অনুভূতি খেলা করে গেল শামানের মাঝে। ভেতরে অবস্থান নিয়েই শামান অনুধাবন করতে পারলো ওদের ঘোড়ার গাড়িটা থেমে গেছে। ডুকপা লামার নির্দেশনা অনুযায়ী শামান মুর্তির চোখের জায়গাতে বিশেষ কায়দায় চোখ রাখতেই খুবই ছোট প্রায় সূচের মতো সরু ছিদ্র দিয়ে বাইরে দেখতে পেল ও। প্রথমে সবই অন্ধকার লাগলো ওর কিন্তু কাঠের গাড়িটার পেছনের ডালা খুলে যেতেই ওর পড়লো মৃদু আলো। বাইরেটা পুরোপুরি পরিষ্কার বোঝা না গেলেও মোটামুটি ভালোই দেখতে পাচ্ছে শামান এখন।

ওদের গাড়িটা থেমে গেছে, সেইসাথে খুলে গেছে কাঠের গাড়িটার পেছনের ডালা। অনেক মানুষের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে বাইরে থেকে। কাকে যেন ধমকে উঠলো একটা ভারি গলা। শামান অনুভব করলো মুর্তির ভেতর থেকে বাইরের প্রায় সব ধরণের শব্দই পরিষ্কার শুনতে পাওয়া যায়। নিশ্চই এটার পেছনে কারিগরদের দক্ষতার অবদান আছে। শামান পরিষ্কার বুঝতে পারলো ভারি গলাটা রাজা বিক্রমের।

একটু পরেই গাড়ির ভেতরে দুজন লোক উঠে এলো। দুজনেই বিড়ি-বিড় করে রাজাকে গালি দিচ্ছে সেটাও পরিষ্কার শুনতে পেল শামান। "এই ভারি মুর্তি এখন নামিয়ে আমাদের দুজনকেই বহন করতে হবে," রাগে গজ-গজ করতে করতে বলতে লাগলো একজন। অপরজন তার কথার জবাবে বলে উঠলো, "কী আর করা রাজার ইচ্ছে। আচ্ছা, ওপরের এই ফোকরটা কিসের?" লোকটার গলা শুনে শামানের বুকের ভেতরটা ধরাস করে উঠলো। তাড়াহুড়োয় এই ব্যাপারটা একেবারেই মাথায় আসেনি।

"বাদ দে," অন্য লোকটা জবাব দিলো। "জলদি কর, দেরি করলে আবার রাজা বিক্রম গর্দান নিবে," দুজনে মিলে মুর্তিটাকে তুলে ধরলো। সাথে-সাথে শামানের মধ্যে আবারো সেই ভাসমান অনুভূতিটা ফিরে এলো। কারণ মুর্তিটাকে কাত করে তুলে নিয়ে যাওয়া

হচ্ছে। তবে মুর্তিটাকে কাঠের গাড়ির বাইরে বের করতেই মানুষের বিস্মিত গুঞ্জন ভেসে আসতে লাগলো চারপাশ থেকে।

শামান অনুভব করলো ভাসতে ভাসতে একটা মঞ্চের ওপরে এনে তোলা হলো ওকে। মঞ্চের ওপরে মুর্তিটাকে দাঁড় করিয়ে দিতেই আবারো পরিষ্কার চোখে পড়লো সব। মঞ্চের সামনে অসংখ্য মানুষের ভিড়। সবাই বিস্মিত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে, মানে মুর্তিটার দিকে। রাজা বিক্রমকে দেখতে পেল ধীরে-ধীরে মঞ্চের ওপরে উঠছে সে। সে মঞ্চের ওপরে এসে উঠে ঠিক মুর্তির পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। সে মঞ্চের ওপরে এসে উঠতেই সামনের দিকে তাকিয়ে শামানের বুকটা আবারো ধরাস করে উঠলো।

কারণ মঞ্চের সামনে দিয়ে হাটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বন্দিদেরকে। শামান দেখলো কালন্তি-ধোয়ী-ঘোষিত এমনকি জাথুরিয়াকেও হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো মঞ্চের সামনে দিয়ে। নিশ্চই ওদেরকে মঞ্চের পাশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মস্তক ছিন্ন করার জন্যে। শামানের বুকের ভেতরেটা ধরাস-ধরাস করতে লাগলো। এখন সময়ের ওপরে নির্ভর করছে অনেক কিছু। যে-খেলা ও খেলতে যাচ্ছে তাতে সময়ের একটু এদিক-সেদিক হলেই সর্বনাশ হয়ে যাবে। বিধুরা এতোক্ষণে জায়গামতো পৌছে অবস্থান নিতে পেরেছে কিনা কে জানে। যদি না পেরে থাকে তবে... এতো ভেবে লাভ নেই।

শামানের মনের ভাবনা শেষ হবার আগেই সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে কথা বলে উঠলো রাজা বিক্রম। সে একে একে জনতার উদ্দেশ্যে গত কিছুদিনের ঘটনা ব্যাখ্যা করলো। তারপর সে জানালো কিভাবে এই উপত্যকায় শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে সে দিনের পর দিন লিচ্ছবীদের হাতে বন্দি থেকে নির্যাতন সহ্য করে গেছে। তারপর ব্যাখ্যা করলো কিভাবে সে এখন থারু বেঈমানদের মস্তক ছিন্ন করে সেই মস্তক ভেট হিসেবে পাঠাবে ভারতবর্ষের বর্তমান সম্রাট শুঙ্গ রাজাকে।

সেইসাথে সে রাজাকে ভেট হিসেবে পাঠাতে চায় বুদ্ধের এই অবতারকে। আজকের এই ময়দানে সে যাদেরকে মৃত্যুদন্ড দিতে চায় তারা যে সত্যিকারে পাপী এটা সে প্রমাণ করে দিবে। কারণ এদের মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করবে স্বয়ং বুদ্ধের অবতার। কথাটা বলে সে আরো ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলো। শামানের দৃষ্টি ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছে ময়দানে। একটা পরিচিত মুখ যদি ও দেখতে পায়। একবার যদি নিশ্চিত হতে পারে বিধুরা চলে এসেছে তবেই- ময়দানে ভিড়ের ভেতরে লম্বা দাড়িকে দেখে আত্ম-প্রসাদে ভরে উঠলো ওর মন।

মুর্তির ভেতর থেকে জোর গলায় ও বলে উঠলো, "না।"

প্রায় সাথে সাথে সব থেমে গেল চারপাশে। পুরো মন্তলার হাটে উপস্থিত হাজারো মানুষের গুঞ্জন সব থেমে গেল। শুধু দূরের জঙ্গলে রাত জাগা কোন পাখির কড়-কড় শব্দ শোনা গেল। এছাড়া আর কোন শব্দ নেই। শামান অবাক হয়ে খেয়াল করলো ও যা বলেছে সেই আওয়াজটাই আরো জোরালো হয়ে বাতাসে ভেসে যাবার সাথে সাথেই থেমে গেছে সব কোলাহল।

রাজা বিক্রম জনতার উদ্দেশ্যে তড়-বড় করে কিছু একটা বলছিল, মুর্তির ভেতর থেকে ‘না’ শব্দটা উচ্চারিত হবার সাথে-সাথে সে চমকে উঠে থেমে গেছে। রাগের সাথে সে ফিরে তাকাল মুর্তির দিকে। বিড়-বিড় করে কিছু একটা বলতে লাগলে সে কারো নাম ধরে। সম্ভবত যে-লোকটার মূর্তির ভেতরে ঢুকে কথা বলার কথা ছিল তাকে নির্দেশনা দিচ্ছে সে। শামান আবারো তীব্র গলায় বলে উঠলো, “না।”

এবার প্রতিক্রিয়া হলো একেবারে বিপরীত। জমবেত জনতাকে যেন এক বাক্যে থামিয়ে দেয়া হয়েছিল এবার প্রায় সবাই একসাথে কথা বলতে শুরু করলো। সবাই রাজা বিক্রমের বাহিনীর অবস্থান আর সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে।

রাজা বিক্রম রাগের সাথে এগিয়ে এলো মুর্তির দিকে। শামান মুর্তির ভেতর থেকে একপাশ খুলে একটা হাত বের করে রাজা বিক্রমের কাঁধ চেপে ধরে তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলো। সেইসাথে ও মুর্তির পেছন থেকে বেরিয়ে এলো মঞ্চের ওপরে। মুর্তির ভেতর থেকে আওয়াজ শুনতে পেয়ে সমবেত জনতা এমনিতেই দ্বিধান্বিত-ভীত হয়ে উঠেছিল, এবার মুর্তিটাকে নড়ে উঠতে দেখে রাজা বিক্রমকে আঘাত করতে দেখে ভয়ের চোটে দিক-বিদিক ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো সবাই। সমবেত জনতার আরেকটা অংশ স্রোতের মতো ভাসিয়ে দিলো মঞ্চের আশেপাশে অবস্থানরত প্রহরীদের।

মঞ্চের ওপরে নেমেই শামান মুখের ভেতরে আঙ্গুল ঢুকিয়ে বিশেষ শব্দ করে উঠলো। অন্যপাশ থকে একই শব্দ ভেসে এলো। মঞ্চের ওপর নেমেই ও একহাতে ছুরি আর অন্যহাতে তলোয়ার বের করে এনেছিল, একপাশে দেখতে পেল বন্দিদেরকে সৈনিকেরা ঘিরে ফেলে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মঞ্চের ওপর থেকে সেদিকে লাফিয়ে নামলো ও। শামানকে এগোতে দেখে একজন সৈনিক এগিয়ে আসতে শুরু করলো শামান আঘাত ঠেকানোর প্রস্তুতি নিতে যাবার আগেই তীরের আঘাতে সৈনিক লুটিয়ে পড়লো। বিধুর দল আক্রমণ করেছে।

শামান জোরকদমে এগিয়ে গেল বন্দিদের দিকে। দুজন সৈনিককে নিকেশ করে মাটি থেকে দুটো তলোয়ার উঠিয়ে ছুঁড়ে দিলো কালন্তি আর ধোয়ীর দিকে। তলোয়ার হাতে পেয়ে ওরা নিজেরাই নিজেদেরকে মুক্ত করে ফেলতে বেশিক্ষণ লাগলো না। বন্দিদের মুক্ত করছে এমন সময় পেছন থেকে কাঁধের কাছে আঘাত পেয়ে মাটিতে পড়ে গেল ও। দেখলো রাগের সাথে ওর দিকে তাকিয়ে ফুঁসছে শঙ্করাদিত্য। খুশি হয়ে উঠলো শামান। যদিও ওর কাঁধ থেকে রক্ত গড়াচ্ছে তবুও এই লোকটাকেই মনে প্রাণে খুঁজছিল ও। ও শঙ্করাদিত্যের দিকে এগোতে যাবে কালন্তির ডাকে থেমে গেল।

“শামান, ওকে শিক্ষা দেয়ার অধিকার আমার বেশি,” কালন্তি বলে উঠলো ওর পাশে থেকে। ওর দিকে একবার দেখে নিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে তলোয়ার বাগিয়ে অন্যদিকে রওনা দিলো শামান। কারণ ও জানে যতোই প্রাথমিকভাবে চমকে দেয়ার সুযোগে ওদেরকে খানিকটা কাবু করে ফেলা গেছে কিন্তু রাজা বিক্রমের বাহিনী অনেক বড়। একবার ওরা নিজেদেরকে গুছিয়ে উঠতে পারলে শামানদের দলটাকে ওরা স্রেফ পিষে ফেলবে। কাজেই সাপকে কাবু করতে হলে সাপের মাথা কাটতে হবে। ওকে খুঁজে বের করতে হবে রাজা বিক্রমকে। একবার তাকে নিকেশ করতে পারলেই পূর্ণ বিজয় সম্ভব।

শামান দৌড়ে এসে আবারো মঞ্চের ওপরে উঠে দাঁড়ালো। একদিকে জনতা দিক-বিদিক হয়ে ছুটছে, তার মাঝে বিধু আর লম্বা দাড়ির সাথে খন্ড-খন্ড লড়াই চলছে শাক্য সৈন্যদের। আরেকদিকে এতোক্ষণ যারা বন্দি ছিল তারাও এখন অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে শাক্যদের ওপরে। বিশেষ করে কালন্তি আর শঙ্করাদিত্যের লড়াই তুঙ্গে উঠেছে। কিন্তু রাজা বিক্রমকে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না ও। কাপুরুষটা কি পালালো তবে।

“যোদ্ধা, তুমি মনে হয় আমাকেই খুঁজছো?” পেছন থেকে রাজা বিক্রমের গলা শুনে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো শামানের মুখে। খুব ধীরে-ধীরে ফিরে তাকাল ও রাজা বিক্রমের দিকে। মঞ্চ ফেলে দেয়াতে তার পরিধেয় আর মুখ-চুল বালিতে ভরে গেছে। কিন্তু তার ভেতর থেকেও ক্রুর হাসি হেসে তাকিয়ে আছে সে শামানের দিকে। “তুমি হয়তো ভাবছিল আমি কাপুরুষের মতো পালিয়েছি। কিন্তু যতোক্ষণ আমি তোমার মৃত আত্মার দখল না নিচ্ছি পালাই কী করে?” বলে সে মুর্তিটা দেখালো। “যোদ্ধা তুমি জানো না আজ এখানে কী করেছো। কতো বড় সর্বনাশের বীজ বপন করেছো। আজকের ঘটনা ওরা হাজারো বছর ধরে বলতে থাকবে,” বলে সে নিজের পেছন থেকে অস্ত্র বের করে আনলো। শামানের দৃষ্টি আটকে গেল ওদিকে। ওর জোড়া কাতানা- হিম্বা।

“কথিত আছে এই হিম্বা নাকি একমাত্র সেরা যোদ্ধার হাতেই শোভা পায়,” বলে রাজা বিক্রম মৃদু হেসে উঠলো। “আজ প্রমাণ হয়ে যাবে হিমালয়ের উপত্যকায় কে সর্বকালের সেরা যোদ্ধা,” বলেই সে আক্রমণ চালালো শামানের ওপরে।

বর্তমান

এয়ারপোর্ট রোড, সিলেট

কেমন জানি অদ্ভুত এক দুলুনির সাথে তানভীরের ঘুম ভেঙে গেল । সাথে সাথে আড়ষ্ট শরীরের বাম হাতের গোড়ায় তীব্র ব্যথার চোটে দম বন্ধ হয়ে এলো ওর। কাশির দমকে শরীর বাঁকা হয়ে এলো। মুখ খুলে বড়-বড় করে দম নিতে লাগলো।

“আহ, যাক জ্ঞান ফিরলো তাহলে কমান্ডার সাহেবের,” কেউ একজন আমুদে সুরে বলে উঠলো।

তানভীর চোখ মেলে দেখলো ও একটা বড় কার্বাড ভ্যানটাইপের বাহনের পেছনে আধশোয়া হয়ে আছে। আধশোয়া হয়ে থাকার কারণ ওর দুই হাত পেছনে নিয়ে আটকে রাখা হয়েছে স্ট্রিপ দিয়ে। দুই পায়েরও একই অবস্থা। ওর ঠিক সামনেই একটা বেঞ্চির মতো দেখতে আসনে বসে আছে বাবুল আহমেদ, আর তার সাথে মোটা গোঁফ ফারুক। ভ্যানের ভেতরে জ্বলতে থাকা ঘোলাটে বাল্বের আলোতে দেখা গেল ওদের একপাশে ভ্যানের মেঝেতে দাঁড় করিয়ে বেঁধে রাখা আছে মুর্তিটা, জিনিসটা যাতে নড়াচড়া না করে সেজন্যে হালকা দড়ি দিয়ে একপাশে হুকের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে ওটাকে।

“এইজন্যেই,” তানভীর কোনমতে দম নিয়ে বলে উঠলো। “শুরু থেকে আমার মনে বার-বার যে-প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছিলো সেটার জবাব তাহলে এই,” কথাটা তানভীর বাবুল আহমেদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো।

“কি প্রশ্ন, অফিসার?” বাবুল আহমেদকে দেখে মনে হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ সে এই মুহূর্তে।

“আমি কেন? এতো-এতো অভিজ্ঞ অফিসার থাকতে আমি কেন,” তানভীর রাগের সাথে বলে উঠলো। “কারণ আমার জন্যে ভুল করা সহজ হবে আর আমাকে নিয়ন্ত্রণ করা আপনাদের জন্যে সহজ হবে, সেইসাথে এখন যা ঘটছে সেটাও,” তানভীর একটু থেমে যোগ করলো। “আপনারা শুরু থেকেই জানতেন ব্ল্যাক বুদ্ধার ব্যাপারে তাইনা? আর শুরু থেকেই আপনাদের পরিকল্পনা ছিল এই মুর্তিটা হাসিল করা। বাকি পুরো অপারেশন, ডক্টর মিতায়নকে উদ্ধার সবই আসলে ছিল ভূয়া নাটক তাইনা?”

“আরে নাহ অফিসার, কী বলো তুমি,” বাবুল আহমেদ সহাস্যে কথাটা বলে ফারুকের দিকে ফিরে বলে উঠলো, “কী বলে এই ছেলে!” আবারো তানভীরের দিকে ফিরে জবাব দিলো। “হ্যাঁ, আমরা শুরু থেকেই সব জানতাম। ডক্টর মিতায়ন যখন থেকে সরকারি অনুমতির জন্যে আবেদন করে তখন থেকেই তার ওপরে নজর ছিল আমাদের। তবে সে যে জেড মাস্টার এটা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। আর এতো দ্রুত সে ব্ল্যাক বুদ্ধা উদ্ধার করে ফেলবে এটাও আমরা ভাবতে পারিনি।”

“তাই সে ওটা উদ্ধার করে আনার পর আমাদের হিসেবে একটু গরমিল হয়ে যায়। আর তাই তোমাকে পাঠানো হয় সিলেট। আমি আমার ফোর্সের কাউকে সরাসরি ইনভলভ করতে চাচ্ছিলাম না। কারণ আমার ফোর্সের কারো ট্র্যাক গায়েব করাটা অনেক কঠিন হত। আর তাছাড়া আমার ফোর্সের সেরা অফিসারটারও সেই অ্যানসালিটিক্যাল স্কিল ছিল না যেটা তোমার আছে। তাই আমি যখন ভাবছি কিভাবে কী করা যায় তখনই তোমার গর্দভ বস অতি-সৎ হাবিব আনোয়ার পাশা নিজ থেকেই আমার কাছে আমার কাজের সমাধান নিয়ে আসে। সে-ই জানায় তার এক এজেন্টের ট্রেনিং প্রায় শেষ করে সে দেশে ফিরবে, তাকে এই দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো যায়। তার মোটিভ ছিল ভিন্ন আর আমার মোটিভ ছিল ভিন্ন।”

“সে নিজের একটা উইং খোলার জন্যে অস্থির হয়ে আছে। ভেবেছে আজ আমাকে সহায়তা করলে এই ব্যাপারে পরে আমার কাছ থেকে হেল্প পাবে। প্লাস সে নিজেও তোমাকে জাজ করতে চাইছিল। আর আমি ওর প্রস্তাব পেয়ে তোমার ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম তুমি সিঙ্গেল পরিবারের ছেলে, মা বাদে তোমার পরিবারে আর কেউ নেই। তার ওপরে কোলাবোরেটিভ অপারেশনে এক অফিসারকে হ্যান্ডেল করে কাজ উদ্ধার করা আমার জন্যে যতোটা সহজ হবে অন্যক্ষেত্রে ততোটা হবে না,” বলে সে হেসে উঠে যোগ করলো। “আর তাই তোমাকে এখানে পাঠানো হয়। তবে,” সে এই পর্যন্ত বলে একটা আঙ্গুল তুললো। “তুমি এতো দ্রুত এতোকিছু করে ফেলবে এটা আমি ভাবতে পারিনি। বিশেষ করে এতো দ্রুত সূত্র মিলিয়ে ডক্টর মিতায়নকে উদ্ধার, তারপরে আবার মুর্তি হারিয়ে জেড মাস্টারের সন্ধান বের করা। আমি ইমপ্রেসড। আহা, তোমাকে কাজে লাগাতে পারলে বড্ড ভালো হত।”

“আপনার কি ধারণা পাশা স্যার আপনাকে ছেড়ে দিবে?” তানভীর ব্যথার চোটে ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলে উঠলো। “আর ব্ল্যাক বুদ্ধার মতো একটা আন্তর্জাতিক সেনসেশন আপনি এভাবে নিজের ফায়দার জন্যে ব্যবহার করতে পারবেন? এতোই সহজ?” তানভীরের মুখে উঠে আসা রক্তাক্ত থুতু ফেললো গাড়ির মেঝেতে। শরীরের পেছনে বাঁধা হাতের স্ট্রিপটা নাড়াচাড়া করছে ও।

“সেসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না, তুমি নিজেও জানো না কতো বড় বড় মাথা আছে এসবের পেছনে। পাশা কিছু ঝামেলা পাকাবে। তবে সেটা সামলানো সম্ভব। এসব কোন বিষয় না যখন তোমার হাতে মিলিয়ন কিংবা বিলিয়ন ডলারের একটা ঐতিহাসিক অ্যান্টিক আছে। কতো দাম হতে পারে এই জিনিসটার। এরকম একটা জিনিস আমাদের হাত গলে সরকারি হাতে চলে যাবে ভাবলে কী করে তুমি? লাইফ টাইমের অর্জন এরকম একটা জিনিস। সেটার জন্যে অনেক কিছুই বিসর্জন দেয়া সম্ভব,” বলে সে তানভীরের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠে বললো, “এর চেয়ে অনেক কম মূল্যের জিনিসের জন্যে আরো কত খারাপ কাজ করতে হয়েছে জীবনে, আর এটাতো অনেক বড় কিছু”

“এখন আমাকে আর ব্ল্যাক বুদ্ধা নিয়ে কী করবেন?”

“সব ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে। অন্যান্য কমান্ডোদেরকে বাংলোতে রেখে একটা সাজানো রিপোর্ট বানানো হয়েছে। ওটাই পেশ করা হবে। তাতে একটা অংশে বলা হবে আমরা পৌছানোর আগেই জেড মাস্টার মুর্তি নিয়ে পালিয়ে গেছে। আর জোর করে তার পিছু নিতে গিয়ে তুমিও মারা পড়েছো। আমরা এখন যাচ্ছি এয়ারেপোর্টে ওখানে বিশেষ প্লেন রেডি আছে। ব্ল্যাক বুদ্ধা ওতে তুলে বিশেষ জায়গাতে সরিয়ে ফেলা হবে আপাতত। পরে যা করার করবো,” বলে সে হেসে উঠে যোগ করলো। “আর হ্যাঁ, পথে যাবার সময়ে তোমাকে কোথাও গুলি করে রাস্তার ধারে ফেলে দেয়া হবে তোমরই মিসিং ডেজার্ট ঈগল পিস্তল দিয়ে,” বলে সে পিস্তলটা দেখালো ফারুকের হাতে। “আর তাতে দোষ হবে জেড মাস্টারের। কাজেই কোন চিন্তা নেই।”

তানভীর যদিও ব্যথার চোটে অন্ধকার দেখছে তবুও ও শরীরের পেছনে চাপা পড়া হাত আর কব্জি বাঁকিয়ে হাতটাকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে। এই জিনিসটা ও শিখেছিল ইংল্যান্ডে ট্রেনিঙের সময়ে, ওর আইরিশ ফ্রেন্ড ওকে শিখিয়েছিল কিভাবে স্ট্রিপ দিয়ে আটকানো থাকলেও হাত ছোটানো যায়। তবে সমস্যা হয়েছে বাম হাতের বগলের নিচে গুলি লাগাতে। ওই হাতটা প্রায় অকেজো, যে-কারণে ওই হাতটাকে কাজে লাগাতেই পারছে না ও। “আর এই ছাগলগুলোকে কী করবেন?” বলে তানভীর মোটা গোঁফ ফারুককে দেখালো। “এই ছাগলগুলোকেও তো মনে হয় বখরা দিতে হবে।”

“এই ব্যাটা, কী বললি তুই?” রাগের সাথে ঝট করে উঠে দাঁড়ালো সে। “গতকাল থেকে সহ্য করছি তোর মতো একটা আবালের মাতব্বরি,” ফারুক উঠে দাঁড়ানোর সাথে সাথে বাবুল আহমেদ ধমকে উঠে তাকে নিরস্ত করতে গেল। কিন্তু ফারুক রাগে অন্ধ হয়ে

গেছে। সে এগিয়ে এসে তানভীরের গায়ে লাথি মারলো। তানভীর লাথি খেয়ে বাঁকা হয়ে গেল। ব্যথার চোটে মনে হলো জ্ঞান হারাবে কিন্তু কব্জির কাছটাতে স্ট্রিপটা যতোটুক আটকে ছিল মাটিতে পড়াতে ধাক্কা লেগে সেটা ছুটে গেল। ফরুক এগিয়ে এসে আবারো ওকে লাথি মারার আগেই চট করে ফারুকের একটা পা ধরে ফেললো ও।

যদিও আহত শরীর তার ওপরে পা বাঁধা তবুও মরিয়া হয়ে পা'টাকে ওপরের দিকে ঠেলে দিলো ও। ফারুক ছিটকে গিয়ে গিয়ে পড়লো বাবুল আহদেমের ওপরে। কিন্তু তানভীরের হিসেবে ভুল হয়ে গেল। ও ভেবেছিল পা টাকে মুক্ত করে প্যান্টের নিচে বাঁধা ছুরিটা নিয়ে উঠে দাঁড়াবে। কিন্তু ও নড়ার আগে দুজনেই সোজা হয়ে গেল। ফারুকের হাতে ওর ডেজার্ট ঈগলটা আগে থেকেই ছিল, বাবুল আহমেদও নিজের অস্ত্র বের করে দুজনেই যার-যার অস্ত্র তাক করলো ওর দিকে।

“শুভ কাজে দেরি করে লাভ নেই, কি বলেন বস?” ফারুক অনুমতি প্রার্থনা করতেই বাবুল আহমেদ মাথা নেড়ে সায় জানালো।

অতীত

মন্তলার হাট, কন্নোর

রাজা বিক্রমকে ছুটে আসতে দেখে মুহূর্তের জন্যে থেমে গেল শামান। ওর এই থেমে যাওয়াতেই খানিকটা অস্বস্তি তৈরী হলো বিক্রমের মাঝে। সে আক্রমণ চালাতে গিয়েও মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করলো, এই সুযোগে শামানই প্রথম তলোয়ার চালালো। রাজা বিক্রমের কোমরের বন্ধনি দু-টুকরো করে দিয়ে সামান্য রক্তপাত ঘটিয়ে তলোয়ারের ফলাটা অন্যদিকে ছুটে গেল।

রাগের সাথে চিৎকার করে উঠে বিক্রম পাল্টা আক্রমণ চালালো। শামান যথাসম্ভব চেষ্টা করছে হিস্বার আয়ত্বের মাঝে না থাকতে, কারণ তাতে নিজের পুরনো তলোয়ারটা দু-টুকরো হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু রাজা বিক্রমের আক্রমণের সামনে বেশিক্ষণ টিকতে পেরে ঠিকই এক পর্যায়ে ও বাধ্য হলো হিস্বার আঘাত ঠেকাতে। প্রায় সাথে সাথেই ওর তলোয়ারটার মাঝপথে ফাটল দেখা দিলো। একপাশে সরে এসে হাত থেকে ওটা ফেলে দিলো শামান। রাজা বিক্রমের দুই হাতে জোড়া হিস্বা, শামানের দুই হাতই খালি। রাজা বিক্রম মুখে মৃদু হাসি নিয়ে শেষ আক্রমণ চালালো।

শামান বিক্রমকে ছুটে আসতে দেখে মাটিতে গড়ান দিলো। পরপর দুই গড়ান দিয়ে রাজা বিক্রম আক্রমণের আগেই শক্ত দুই হাতে ধরে ফেললো তার দুই কব্জি। অবিশ্বাসের সাথে রাজা বিক্রম তাকিয়ে আছে ওর দিকে। “রাজা মশাই আমার তলেয়ারগুলো আপনি চুরি করেছেন, ওগুলো অমার ফেরত চাই,” বলে হাসতে-হাসতে রাজার এক কব্জি দিয়ে অন্য

কব্জিতে বাড়ি মারলো। জোড়া হিম্বার একটা মাটিতে পড়ে গেল অন্যটা মাটিতে পড়ার আগেই বিক্রমের হাত ছেড়ে দিয়ে এক হাতে ধরে এক ধাক্কায় সেটা ঢুকিয়ে দিলো রাজা বিক্রমের গলায়।

শামানকে তলোয়ারটা গলার দিকে তাক করতে দেখে গগন বিদারী চিৎকার করে উঠেছিল রাজা বিক্রম। কিন্তু তলোয়ারের ফলা গলার হাড় ভেদ করতেই আচমকা চিৎকার থেমে গিয়ে ঘর-ঘর শব্দ করে উঠলো বিক্রম। বাতাসের জায়গা দখল করলো রক্ত। গলগল করে বেরিয়ে আসা রাজা বিক্রমের রক্ত ভাসিয়ে দিলো শামানকে। চোখ খোলা অর্ধমৃত রাজা বিক্রমের দেহটা মঞ্চ থেকে এক লাথিতে নিচে ফেলে দিলো শামান।

রাজা বিক্রমের দেহটা মাটি র্স্পশ করার আগেই প্রাণপনে চেঁচিয়ে উঠলো শামান। সমস্ত রাগ-ক্রোধ-ভালোবাসা-মনের যন্ত্রণা একাকার করে চিৎকার করে উঠলো ও। রাজা বিক্রমের দেহটা মঞ্চের নিচে গিয়ে পড়াতে এমনিতেই থেমে যাচ্ছিলো সব, তার ওপরে শামানের ভয়ঙ্কর চিৎকার শুনে চারপাশ থেকে সবাই ফিরে তাকাল মঞ্চের দিকে।

চিৎকার করতে-করতে থেমে গিয়ে আবারো চেঁচিয়ে উঠলো ও। তারপর আহত পশুর মতো সবার দিকে ফিরে তাকাল। মঞ্চের চারপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ও একপাশে তাকিয়ে দেখলো আহত শঙ্করাদিত্যকে বন্দি করেছে ঘোষিত আর ধোয়ী, ওদের সামনেই রক্তাক্ত তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে কালন্তি। সবাই তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

কালন্তির দিকে তাকিয়ে রক্তাক্ত মুখে সামান্য হেসে উঠলো শামান, বিজয়ী হয়েছে ওরা।

বর্তমান

এয়ারপোর্ট রোড, সিলেট

ফারুকের অস্ত্রের কালো নলের দিকে তাকিয়ে আছে তানভীর হঠাৎ ওর মুখ হা হয়ে গেল একটা দৃশ্য দেখে। ফারুক আর বাবুল আহমেদের পেছনে থাকা মুর্তিটা নড়ে উঠছে। প্রথমেই ওটার গায়ে জড়ানো দড়িটা খুলে পড়ে গেল। ধীরে-ধীরে ওটার একটা পাশ খুলে গিয়ে একটা ছুরি বেরিয়ে এসে সোজা ঢুকে গেল ফরুকের ঘাড়ে। চরম অবিশ্বাসের সাথে ঘুরে তাকাল ফারুক, মুর্তিটা তাকে ছুরি মেরেছে! কিন্তু ওর অবিশ্বাসের আরো বাকি ছিল। ছুরিটা তার ঘাড় থেকে খুলে সোজা সেটা ঢুকে গেলে বাবুল আহমেদের হা হয়ে থাকা মুখে।

তানভীর অবিশ্বাসের সাথে তাকিয়ে আছে সামনের ভৌতিক দৃশ্যটার দিকে। মুর্তি কী করে দুজন অস্ত্রধারী মানুষকে কাবু করে ফেললো ব্যাপারটা ঠিক মাথায় ঢুকছে না ওর। ফারুক ছুরি খেয়ে পড়ে যেতেই ও দেখতে পেল মুর্তিটা পুরোপুরি দুইভাকে ভাগ হয়ে গেল আর সেটার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো ছোট-খাট একজন মানুষ। বেরিয়ে এসেই সে বাবুল

আহমেদের মুখ থেকে ছুরিটা বের করে নিয়ে খঁচ করে সেটা ঢুকিয়ে দিলো বাবুল আহমেদেরই গলায়। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতেই ছুরিটা খুলে নিয়ে সে তানভীরের দিকে ফিরে একেবারে শান্ত গলায় বলে উঠলো, "হ্যালো কমান্ডার।"

তানভীরের মস্তিষ্ক এখনো মেনে নিতে পারছে না ব্যাপারটা। কিন্তু মুর্তির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা মানুষটাকে চিনতে পেরে সে বলে উঠলো, "ডক্টর মিতায়ন, ওরফে জেড মাস্টার।"

"ইয়েস কমান্ডার," ছুরিটা মুছতে-মুছতে ওটা দেখিয়ে সে বলে উঠলো। "চমৎকার জিনিস, তোমার কাছ থেকেই ধার নিয়েছিলাম। এবার তোমরই প্রাণ বাঁচালো জিনিসটা। মনে আছে?"

তানভীরের মনে পড়ে গেল এই স্টিলেটোটাই পাটোয়ারী ওকে দিয়েছিল। এটাই ও হাঁটুর নিচে রাখতো, জালালকে গুলি করার পর ওটা নিয়ে গেছিল জেড মাস্টার।

ছুরিটা মোছা শেষ করে সে বলে উঠলো, "আবর্জনা সাফ করতে আমার কখনোই ভালো লাগে না," বলে সে ইশারায় মাটিতে পড়ে থাকা মৃত বাবুল আহমেদ আর ফারুকের দিকে দেখালো। তারপর একেবারে ওর সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো তানভীরের সামনে। "কিন্তু তুমি কমান্ডার, তুমি কিন্তু সেই মাল। যেভাবে তুমি ব্ল্যাক বুদ্ধাটা খুঁজে বার করলে, উদ্ধার করলে, আর আমি একটা জিনিসও অনুমান করতে পারি আমি যে এই লাক্কাতুরার বাংলোতে থাকবো এটাও সম্ভবত তুমিই বের করেছো। কিভাবে করলে কমান্ডার, ওই গাধা প্রবীরের মাধ্যমে নাকি-" কথা বলতে বলতে সে ছুরিটা চেপে ধরলো তানভীরের গলায়।

যদিও গলায় ছুরি চেপে ধরা তবুও তানভীর একবার মুর্তিটা দেখলো আরেকবার জেড মাস্টারকে দেখলো। কোনমতে ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলে উঠলো, "এই তাহলে হাজার বছরের পুরনো মুর্তির রহস্য।"

তানভীর কথাটা বলতেই হা-হা করে হেসে উঠলো সে। " তোমার এলেম আছে কমান্ডার। মৃত্যুর মুখে বসেও রহস্য নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো," সে হাসতে হাসতেই তানভীরের গলা থেকে ছুরিটা সরিয়ে খানিকটা দূরে সরে গেল। "হ্যাঁ, কমান্ডার। ঠিকই বলেছো তুমি। এই সেই বিখ্যাত রহস্য। যতো কঠিন রহস্য, তত সহজ সমাধান। বহু পুরনো এক চালবাজি এটা; যে-চালবাজি কাজে লাগিয়ে হাজারো বছর ধরে জাদুকরেরা জাদু দেখিয়ে আসছে। তবে শুধু জাদুকরেরা নয় ধর্মগুরুরাও এসব ট্রিক্স কাজে লাগিয়েছে। প্রচীন মিথরা ধর্ম থেকে শুরু করে প্রাচীন ইটালির পম্পেই নগরীতেও ফাঁপা মুর্তির ভেতর মানুষ ঢুকে স্রষ্টার অবতার নামে মানুষকে বোকা বানিয়ে এসেছে। এটাও তার ব্যতিক্রম নয়।"

"আপনি তাহলে বাংলোতে-"

"ঠিক," তানভীরকে প্রশ্ন শেষ করতে দিলো না সে। "বাংলোতে যখন টের পেলাম যে আক্রমণ হচ্ছে এতোই দেরিতে টের পেয়েছি পালাবার উপায় ছিল না। তাই আমিও তাই করলাম যা পুরনো ধর্মগুরুরা করতো। ঢুকে বসে রইলাম মুর্তির ভেতরে। ওমা ঢুকে দেখি শুরু হয়ে গেছে আরেক নাটক। যাই হোক, তারপর তো তুমি জানোই, ভালোই এক দফা বিনোদন হলো, কি বলো?"

"এখন আমাকে নিয়ে-"

"হা-হা," আবারো তানভীর প্রশ্ন শেষ করার আগেই হেসে উঠলো সে। "আহারে কমান্ডার কি অবস্থা তোমার? জীবনের ভার এসে দাঁড়িয়েছে অন্যের হাতে। একটু আগে যে-প্রশ্ন করেছো বাবুলকে এখন একই প্রশ্ন করতে হচ্ছে আমাকে," মুখ দিয়ে চুক-চুক শব্দ করতে করতে সে ছুরিটা বুলাতে লাগলো তানভীরের মুখে। "কমান্ডার, আমি তোমাকে কিছু করবো না। কারণ যদিও বহুত ঝামেলা করেছো তুমি কিন্তু ব্ল্যাক বুদ্ধা উদ্ধার করে এনে দিয়েছো তুমিই, এখন আবার তোমার কারণেই আমি ওটা হাতে পেলাম, কাজেই কেন জানি তোমাকে ভালো লেগে গেছে আমার। আর তাছাড়া, তুমিও আমাকে একবার প্রাণে বাঁচিয়েছো বাংলো থেকে উদ্ধার করে। কাজেই তোমাকে আমি মারবো না," বলে সে চট করে উঠে দাঁড়িয়ে চলন্ত ভ্যানের পেছন থেকে ড্রাইভার যেখানে বসে তার পেছনে ছুরির বাট দিয়ে কয়েক ঘা দিয়ে গাড়ি থামাতে বললো। তানভীরের দিকে ফিরে মৃদু হেসে বললো। "আমি মুর্তির ভেতরে থাকা অবস্থায় বাবুল আহমেদকে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিতে শুনেছি, এরকম শব্দ করলে গাড়ি থামাতে।"

সত্যি সত্যি গাড়িটা থেমে যেতেই ধাম করে ভ্যানের পেছনের দরজাটা খুলে ফেললো সে। "আদিওস কমান্ডার। ড্রাইভারকে নিকেশ করে এই গাড়িটা নিয়ে এয়ারেপোর্ট যেতে হবে আমার। তারপর সেখান থেকে বাবুল আহমেদের ঠিক করা প্লেনটা খুঁজে বের করতে হবে। আর তোমাকে এখানেই বিদায় জানাবো," বলে সে লাফিয়ে নামতে গেল গাড়ির পেছন থেকে কিন্তু তার আগেই তানভীর দেখলো মানুষটার পুরো শরীর কেমন জানি নীলচে হয়ে গেল সেকেন্ডের জন্যে। সাথে-সাথে কাঁপতে শুরু করলো সে মৃগী রোগীর মতো। মুহূর্তের জন্যে কেঁপে উঠেই সে গাড়ি থেকে সোজা পড়ে গেল রাস্তার ওপরে।

"ড্যাম! মারাত্মক জিনিসতো," ভ্যানের পেছন থেকে হাবিব আনোয়ার পাশার অকৃত্রিম গলা ভেসে এলো। "শালারা দারুণ জিনিস বানিয়েছে," তার হাতে ধরা সাব মেশিনগানের মতো দেখতে অদ্ভুত একটা অস্ত্র। এই জিনিসটাই তানভীর তাকে এনে দিয়েছিল স্কটল্যান্ড থেকে। "এই কারণেই বুঝেছো আমি ফিল্ডে কাজ করাটাকে খুব মিস করি," কথাটা যদিও সে পাশ ফিরে সুলতানের উদ্দেশ্যে বলেছে কিন্তু সুলতান তার কথা শোনার মুডে নেই। সে লাফিয়ে উঠে পড়লো ভ্যানের ভেতরে।

হাবিব আনোয়ার পাশা হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো মাটিতে পড়ে থাকা অজ্ঞান জেড মাস্টারের পাশে, "জেড মাস্টার না?" বলে সে পেছন ফিরে ইকবাল আর নিজের সেক্রেটারির দিকে

তাকিয়ে বলে উঠলো, “খবর পাঠাও। গাড়ি লাগবে, লোক লাগবে। আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। মাল ওঠাতে হবে,” বলতে বলতে সে হাসতে-হাসতে উঠে দাঁড়ালো।

গাড়িতে উঠে তানভীরের দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠলো, “ভাগ্যিস তোমার হাতে পাটোয়ারীর বসানো ট্র্যাকারটা ছিল না হলে এতোটা সঠিকভাবে তোমাদের লোকেট করা সম্ভবই হত না।”

তানভীর অবশ্য এতোকিছু শুনতে পাচ্ছে না, তেমন কিছু দেখতেও পাচ্ছে না পরিষ্কার। তার মনের কোনে জমা হয়ে আছে অনেক প্রশ্ন, কিন্তু এগুলোর কোনটাই সে ভাবতে চাইছে না। বরং ঘোলাটে হয়ে আসতে থাকা দৃষ্টির সামনে সুলতানের পরিচিত মুখটা দেখতে পেয়ে তার খুশিতে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হলো। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হলো, ওদেরকে দেখে কতোটা খুশি হয়েছে সে। কিন্তু এগুলোর কোনটাই না করে সুলতানের কোলে মাথা রেখে শুয়ে রইলো চুপচাপ, মুখে ফুটে উঠলো প্রশান্তির মৃদু হাসি।

শেষ কথা

সময়: ১৮০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ

কন্নোর, ভারতবর্ষ

"তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দাওনি, ওইদিন ওভাবে চিৎকার দেয়ার পেছনে কারণ কী ছিল?" কালন্তি বেশ গম্ভীর মুখে জানতে চাইলো শামানের কাছে। কালন্তির মুখে প্রশ্নটা শুনে ফিক করে হেসে ফেললো শামান, আরেকটু হলে খাবারের শেষ টুকরোটা ওর গলায় আটকে যেতে বসেছিল। খাবার পাত্রটা নামিয়ে রেখে জল দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নিলো ও। কালন্তির দিকে এগিয়ে দুই হাত রাখলো ওর কাঁধে। শামানের মুখটা মুছে দিলো কালন্তি।

"যাওয়াটা কি খুব জরুরি?" খানিকটা বিষন্ন সুরেই জানতে চাইলো কালন্তি। "নতুন রাজ্য, নতুন মানুষ, এতোগুলো গোত্র আর সেনাবাহিনী, সবকিছুর দায়িত্ব এখন আমার ওপরে। আমি কি একা পারবো এসব সামলাতে?" কালন্তির গলায় না যাবার আবেদন।

শামান এখনো তাকিয়েই আছে কালন্তির ধূসর চোখে। "চিৎকারটা ছিল স্বস্তির-অস্বস্তির, দুঃখের-আনন্দের এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া," শামান কালন্তির পরের প্রশ্নগুলোর জবাব না দিয়ে বরং আগের কথার জের ধরে বলে উঠলো ও।

"সত্যি কথা হলো, রাজা বিক্রম যখন তোমাদেরকে বন্দি করলো এরপরে গুটিকয় লোক নিয়ে আমি অভিযান চালাতে গেলাম আমি মোটেই ভাবিনি বিজয়ী হতে পারবো। তাই যখন সেই বিজয়ের ক্ষণটা চলে এলো আমার পক্ষে সেটার ধাক্কা সামলানোটা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। মানুষ শুধু অনেক কষ্টের ধাক্কা সামলাতে হিমশিম খায়না, কখনো-কখনো অনেক বেশি আনন্দের ধাক্কা সামলাতেও তাকে বেগ পেতে হয়। ওই চিৎকারটা ছিল ওরকমই একটা প্রতিক্রিয়া," বলে শামান কালন্তির দুই কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে ওর দুই হাত ধরলো। ওকে এনে বসিয়ে দিলো বসার ঘরের দস্তরখানার ওপরে।

সেইদিন মন্তলার হাটের ওই ঘটনার পর কেটে গেছে পাঁচ দিন। এই পাঁচ দিনে অনেক কিছু ঘটে গেছে। সেইদিন মন্তলার হাটে রাজা বিক্রমকে শামান হত্যা করার পর ওদের সম্মিলিত আক্রমণের সামনে এমনিতেই দিশেহারা হয়ে গেছিল শাক্য বাহিনী, তার ওপরে রাজা বিক্রম মারা যাবার ও শঙ্করাদিত্য বন্দি হবার সাথে-সাথে ওরা আত্মসমর্পণ করে। ওরা সেখান থেকে রাজা বিক্রমের মৃতদেহ নিয়ে বিধোরীর দিকে রওনা দেয়। বিধোরীতে খুব কমই শাক্য সৈন্য ছিল। তারা রাজা বিক্রমের মৃতদেহ দেখার পর প্রথমে ওদেরকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে কিন্তু জাথুরিয়া ওদেরকে বোঝানোর পর তারা জাথুরয়ার নেতৃত্বে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু থারুরা দুর্গ দখল না করে বরং বন্দি শঙ্করাদিত্য আর বিধোরীর দুর্গের দায়িত্ব জাথুরিয়ার ওপরে ন্যস্ত করে ফিরে আসে নিজেদের গ্রামে। সঙ্গে নিয়ে আসা বুদ্ধ মুর্তিটাও লুকিয়ে ফেলা হয় ওদেরই গ্রামে।

এরপর থারুদের প্রতিনিধি হিসেবে কালন্তির নেতৃত্বে পরের দিন থারু-শাক্য-উরগ-লিচ্ছবীসহ কন্নোর উপত্যকায় যতো ছোট-খাট গোত্র আছে সবাইকে নিয়ে আলোচনা আহŸান করা হয়। সেই আলোচনা সভাতেই তারা কিছু বিষয়ে একমত পোষণ করে। ধর্ম-বণ নির্বিশেষে নিজেদের অবস্থান ও করণীর নিয়ে কিছু সিদ্ধান্তে আসে। প্রথমত, তারা নিজেদের জন্যে বরাদ্দ এলাকাতেই বাস করবে। যতো ধর্ম বিদ্বেষ আর যাই থাকনা কেন, একে অন্যের ওপরে আক্রমণ চালাবে না। আর সেইসাথে সব গোত্রের প্রধানকে একসাথে করে একটা জোট গঠন করা হবে। সবার সম্মিলিত বয়ানে সেই জোটের প্রধান ঘোষণা করা হয় মৃত থারু রাজার একমাত্র কণ্যা ও বর্তমান থারু গ্রোত্রের প্রধান কালন্তিকে। কালন্তি প্রথমে এই দায়িত্ব নিতে না চাইলেও শামানের ভরসাতেই সে এই দায়িত্ব নিতে রাজি হয়। কিন্তু সে কিছু কিছু শর্ত আরোপ করে।

সেইসব শর্ত অনুযায়ী পরের দিন তাকে কন্নোর এলাকার সকল গোত্র প্রধানদের প্রতিনিধি হিসেবে শপথ নেয়ার কার্যকম সম্পন্ন করা হয়েছে। অন্যদিকে কন্নোর এলাকায় সকল গোত্রদেরকে একসাথে হবার খবর শুনে কেন্দ্রীয় শাসন থেকে শুঙ্গ সৈন্যদের রওনা দেয়া বাহিনী ফেরত চলে যায়। তবে গুজব রটেছে শুঙ্গ বাহিনী ফেরত যাবার প্রকৃত কারণ হলো, শুঙ্গ সম্রাট নাকি অভ্যন্তরীণ গন্ডগোল মেটানোর চেয়ে উত্তর থেকে গ্রিক আক্রমণ ঠেকাতে বেশি ব্যস্ত এইমুহূর্তে। তবে গ্রোত্রদের প্রধান হবার পর কালন্তি নিজ থেকে তাদের কাছে একটা শান্তি প্রস্তাব পাঠিয়েছে। যদিও ওটার কোন জবাব এখনো আসেনি, তবু কালন্তি আশাবাদী।

সবশেষে ওই বুদ্ধ মুর্তিটার ব্যাপারে সিদ্ধান্তটা শামানই নিয়েছে। ভারতের অন্যপ্রান্তে বঙ্গীয় ব-দীপের অন্যপাশে সাত রাজ্যের সম্মিলিত এক ভূমি আছে। সেখানকার ত্রিপুরা আর আসাম রাজার অধীনে বিধু দীর্ঘদিন কাজ করেছে। বিধুর পরামর্শে শামানই প্রস্তাব করেছে মুর্তিটা ওরা আসামে নিয়ে যাবে। ওদের দুজনারই অভিমত হলো, এই মুর্তি শুধু অমঙ্গলই বয়ে আনবে। বিশেষ করে এই এলাকাতে থাকলে। কারণ এখানে মুর্তিটাকে নিয়ে এতো বেশি জলঘোলা হয়েছে অত্র এলাকাতে থাকলে কোন না কোন গোত্র এটাকে দখল করতে চাইবেই। ফলে এই মুর্তির কারণে আবারো উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে কন্নোর ভূমি। তারচেয়ে এলাকায় শান্তি বজায় রাখার জন্যেই ওটাকে আসাম নিয়ে লোকচক্ষুর আন্তরালে সরিয়ে ফেলা হবে। কালন্তি প্রথমে মেনে নিতে চায়নি। কিন্তু পরে মেনে নিয়েছে শামানের পরামর্শে। আজ শামানের বিদায় নেবার দিন।

কালন্তিকে ওর পাশে বসিয়ে শামান ওর ধূসর চোখ জোড়ার গভীরে তাকাল। “শোন, আমি না থাকলেও তোমার সমস্যা হবে না। কারণ মূল যে সমস্যাগুলো ছিল সেটার অনেকটাই সমাধান হয়ে এসেছে। প্রতিটা গোত্রই অন্যের ক্ষতি করতে গিয়ে, অন্যের ধর্মের ওপরে আরোপ বসাতে গিয়ে নিজেদের ক্ষতি করেছে। এটা তারা অনেকটাই বুঝতে পেরেছে এখন। কাজেই সবাই চেষ্টা করবে তোমাকে সহায়তা করতে, আর যদি তাও না

হয় বিশ্বস্ত সঙ্গীরা আছে তোমার সাথে। ওরা দেখবে তোমাকে। ঘোষিত, ধোয়ী, জাথুরিয়া এদের মতো বন্ধু ও সহকারি আর হয় না।"

"আমি তো শুধু বন্ধু কিংবা সহকারি চাইনা, আরেকটু বেশি কিছু চাই," কালন্তিও শামানের নীল চোখের দিকে ফিরে বলে উঠলো, "আর সে যদি আমার থেকে দূরে সরে যায় তবে এরচেয়ে কষ্টের আর কী হতে পারে?"

"আরে," হেসে উঠলো শামান। "আমি তো দূরে যাচ্ছি ফিরে আসার জন্যেই," বলে শামান একটু গম্ভীর হয়ে বলে উঠলো, "তুমি তো জানোই এই উপত্যকায় আমাকে ফিরে আসতেই হবে। আমি যার সন্ধানে এখানে এসেছিলাম ডুকপা লামা মারা যাবার আগে সেটার সন্ধান আমাকে বলে গেছে। কাজেই আমাকে আমার পরিবারে খোঁজ করতে হবে। আমাকে খুঁজে বের করতে হবে, আমি কে, কেন আমি অন্যদের থেকে আলাদা।"

ডুকপা লামা সেই জলগুহাতে মারা যাবার আগে শামানকে বলে গেছেন সে যখন শামানকে খুঁজে পায় তখন তার গলায় যে চামড়ার বটুয়াটার ভেতরে এক গাদা অচেনা ভাষায় লেখা তঞ্জুর ছিল সেগুলো শান্তির মঠের মূল্যবান তথ্য সংরক্ষণাগারের বিশেষ একটা জায়গায় রাখা আছে। সেই জায়গার নির্দেশনাও ডুকপা লামা জানিয়ে গেছে মারা যাবার আগে। আরো জানিয়ে গেছে, যদিও উনি অচেনা সেই ভাষা পুরোপুরি কখনোই বুঝতে পারেনি তবে যতোটুকু বুঝতে পেরেছিল তাতে এটা পরিষ্কার যে ওই চামড়ার বটুয়ার ভেতরে লেখাগুলো আসলে হিমালয়ের অচেনা এক অঞ্চল থেকে স্থানান্তরিত হওয়া শামানিক নামে এক গোত্রের ইতিহাস। আর সেই গোত্রের নামেই উনি শামানের নাম রেখেছিলেন।

"আমি এতোসব কিছু বুঝি না। তুমি ওই বুদ্ধ মুর্তি আসাম রাজার রাজ্যে গোপন করার ব্যবস্থা করে ফিরে আসবে আমার কাছে। এরপরে যেখানে খুশি যাবে যা খুশি করবে," বলে উঠে দাঁড়িয়ে কালন্তি তস্তরির একপাশে রাখা শামানের কাতানা জোড়ার চামড়ার খাপটা উঠিয়ে এনে বেঁধে দিলো ওর পিঠে। পূর্ণ সাজে সজ্জিত হয়ে শামান আর কালন্তি বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলো সবাই অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে।

ওদের যাত্রার সব আয়োজন প্রস্তুত আছে কিনা বিধুর কাছে জেনে নিয়ে একে একে ভাবলেশহীন ধোয়ী, সদা চঞ্চল ঘোষিতসহ সেই লম্বা দাড়ির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘোড়ায় উঠলো শামান। ঘোষিত আর বিধু এমনভাবে কান্নাকাটি করছে যেন কেউ মারা গেছে। বিধুকেও তাড়া দিয়ে ঘোড়ায় উঠিয়ে লোক লস্কর আর সেই মুর্তিটা রাখা বাক্সসহ রওনা দিলো ওরা।

খালের ওপরে সেই কাঠের সেতুটা মেরামত করা হয়েছে। ওটা পার হয়ে এসে থারুদের গ্রামের দিকে ফিরে তাকাল শামান। ওদের নতুন নেত্রী কালন্তির পেছনে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। কালন্তির ধূসর চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু। শামান যতো শক্ত মানুষই হোক ও জানে নিজের হৃদয়ের একটুখানি অংশ রেখে যাচ্ছে ও এই কন্নোর এলাকায়। এই

ধূসর চোখের মায়া কাটানো ওর পক্ষে সম্ভব হবে না। যতোই নীল চোখের মানুষদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করুক না কেন এই ধূসর চোখের টানে একদিন ওকে ঠিকই ফিরে আসতে হবে এখানে।

বর্তমান সময়

শাহী ঈদগাহ, সিলেট

তানভীরের হিসেবে সময়টা এখন সকাল আর দুপুরের মাঝামাঝি হওয়া উচিত, তাহলে ওর কামরাটা এমন অন্ধকার লাগছে কেন। হাতে-পায়ে শরীরের এখানে ওখানে ব্যান্ডেজ। একটা হাত ¯িøঙে ঝুলছে, অন্যহাতে সেলাইনের সূঁচ। কিন্তু চোখ মেলতে তো কোন সমস্যা নেই। চোখ মেলে আধো অন্ধকার দেখে কেন জানি বেশি অস্বস্তি বোধ হলো তানভীরে। রুমের ভেতরে কিছু একটা ঠিক নেই।

ওর মনের ভাবনাটা প্রমাণ করার জন্যেই একেবারে মাথার পাশ থেকে কথা বলে উঠলো একজন মানুষ।

"শেষ পর্যন্ত তাহলে 'বিদায়' বলতেই হলো, তাইনা?" তানভীর আস্তে-ধীরে উল্টোদিকে ফিরে তাকাল। ওর মাথার কাছেই চেয়ারে বসে থাকা মানুষটা আর কেউ নয়, স্বয়ং ওর ইউনিটের প্রধান হাবিব আনোয়ার পাশা। আনোয়ার পাশার হাতে এক টুকরো কাগজ। কাগজটা দেখার সাথে-সাথে চিনতে পারলো তানভীর। একটু লজ্জাও পেলো ওটা পাশা স্যারের হাতে দেখে। কাল বিকেলে এই কাগজটাই সে চেয়ে নিয়েছিল এক নার্সের কাছ থেকে। কাগজটার উল্টোপিটে কী লেখা আছে খুব ভালোভাবেই জানে ও।

ওইদিন লাক্কাতুরা আর এয়ারেপোর্ট রোড থেকে জেড মাস্টারকে বন্দি করে তানভীরকে উদ্ধার করে আনার পর একদিন পার হয়েছে। এই একদিন এক রাতে বাইরে কী ঘটেছে তানভীর খুব বেশি কিছু জানে না। কারণ ওকে যখন সিলেট সম্মিলিত পুলিশ হাসপাতালে আনা হয় বেশ আহত ছিল ও। একই সাথে গুলির আঘাত ও রক্তক্ষরণে অবস্থা খারাপ ছিল ওর। আর তাই ওইদিন রাতেই অপারেশনের পর থেকে পুলিশ হাসপাতালের এই কেবিনেই রাখা হয়েছে ওকে। কারো সাথে দেখা করার তেমন সুযোগ পায়নি। তবে ইতিমধ্যে একবার মায়ের সাথে কথা হয়েছে মোবাইলে। মা খুব বেশি কিছু না জানলেও অনুমান করতে পেরেছে কিছু একটা গন্ডগোল হয়েছে। তাই এক গাদা প্রশ্ন করতে শুরু করেছিল কিন্তু বেশি কথা বলেনি তানভীর। যতো বেশি কথা বলতে যাবে ততোই মায়ের কাছে ধরা পড়ার ঝুঁকি বাড়তে থাকবে। তাই কম কথা বলে মাকে কোনমতে এটা-সেটা বুঝিয়ে আবার কল করবে বলে বিদায় নিয়েছে। এই একদিন শুয়ে থেকে আরেকটা

ব্যাপার অবশ্য ঘটেছে; বাইরে থেকে বার-বার একজন মহিলা নাকি ওর সাথে দেখা করতে চাইছিল। মহিলাটা কে হাতে পারে খুব সহজেই অনুমান করতে পারছিল তানভীর, লায়লা। কিন্তু ওর লায়লার সাথে দেখা করার কোন ইচ্ছেই ছিল না। তাই এক নার্সকে অনুরোধ করে ওই চিঠিটা লিখে পাঠিয়েছিল লায়লাকে। কিন্তু ওটা পাশা স্যারের হাতে গেল কিভাবে কে জানে।

ওকে একটু চমকাতে দেখে যেন মজাই পেলো আনোয়ার পাশা। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে জানালার কাছে চলে গেল সে। একটানে জানালার ভারি পর্দাটা সরিয়ে দিতেই ঝলমলে রোদে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো কামরাটা। সেই চিরকুটটা টেবিলের পাশে নামিয়ে রাখতে-রাখতে সে বলে উঠলো, "এই বিদায়টা আরো অনেক আগে জানানো উচিত ছিল তোমার।"

"জালালভাই কেমন আছে?" পাশা স্যারের কথার জবাব না দিয়ে বরং প্রসঙ্গ এড়ানো জন্যে তানভীর জানতে চাইলো।

তানভীরের প্রশ্ন শুনে মৃদু হেসে উঠলো আনোয়ার পাশা। "জালাল ভালো আছে, প্রাথমিক বিপদ কেটে গেছে। বেচারার এখন একটাই সমস্যা, হাসপাতালের বেডে শুয়ে তো আর সিগারেট খেতে পারবে না। তাকে কয়দিন শাস্তি পেতে হবে বিছানায় শুয়ে।"

তানভীরও সামান্য হেসে উঠলো পাশা স্যারের কথায়। ওর চোখের সামনে ভেসে উঠলো জালাল রাগের সাথে বিছানায় শুয়ে সিগারেট খাবার জন্যে ছটফট করছে কিন্তু কোন উপায় নেই। "স্যার, হয়েছিল কী আসলে?"

পাশা স্যার মাথা নাড়লো। "তুমি তো কমবেশি সবই জানো। তারপরও বলছি। প্রফেসর টেড চ্যাঙ বহু বছর ধরে ব্ল্যাক বুদ্ধা নিয়ে গবেষণা করছিল। সে-ই প্রথম লন্ডনে এক ফ্রেন্ডের মাধ্যমে জেড মাস্টার মানে মিতায়নের সাথে পরিচিত হয়ে কথা প্রসঙ্গে ব্ল্যাক বুদ্ধার কথা তাকে জানায়। জেড মাস্টার তখনই বুঝে ফেলে এর মধ্যে বড় কিছু আছে। সে তখন থেকেই পরিকল্পনা করে নিজের একটা আলাদা আইডেনটিটি প্রতিষ্ঠা করতে লেগে যায়। সব ঠিক হবার পর তারা গবেষণা করে বের করে ব্ল্যাক বুদ্ধা যদি আদৌ থেকে থাকে তবে সেটা আছে আসামের কোথাও। আমরা যতোটুকু জানতে পেরেছি আজ থেকে দুই হাজারেরও বেশি সময় আগে মৌর্য আর শুঙ্গদের গন্ডগোলের সময়ে বানানো হয়েছিল এই মুর্তি। কারা বানিয়েছিল-কেন বানিয়েছিল এসব কিছুই ঠিকমতো জানা যায়নি। তবে ইতিহাসের পাতায় নাকি এক লাল চুলের তিব্বতি যোদ্ধার কথা উল্লেখ আছে। সে নাকি বিভিন্ন গোত্রের ভেতরে বিবাদ মেটানোর জন্যে এই ব্ল্যাক বুদ্ধাকে তৎকালীন আসামের রাজার সহায়তায় গোপনে দাফন করেছিল। কিন্তু জিনিসটা কোথায় আছে এটার একটা ক্লু সেই যোদ্ধা রেখে গেছিল তার ব্যবহৃত জোড়া কাতানার হাতলে। এই তিব্বতি যোদ্ধার রেখে যাওয়া নোট থেকেই তারা ব্যাপারটা খুঁজে বের করে।"

"জেড মাস্টার যখন জানতে পারে জিনিসটা আসামে আছে তখন সে সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশের সিলেটে থেকে সে আসামে অপারেশন চালাবে। কারণ ভারতে সে চাইলেও নিজের ভূয়া পরিচয় প্রতিষ্টিত করতে পারতো না। অন্তত বাংলাদেশে সাস্টের শিক্ষক সেজে যেভাবে করেছিল অতোটা ভালোভাবে করতে পারতো না। তো এরপরে জেড মাস্টার তার সেই নকল আইডেন্টিটির মাধ্যমে সিলেট এসে আস্তানা গেড়ে কাজ শুরু করে। ওদের এই প্রজেক্টের ওপরে চোখ ছিল সরকারের একটা মহলের। এই মহলটার উদ্দেশ্যই ছিল ওরা কিছু পেলেই সেটা হাতিয়ে নিবে। তো যাই হোক, ওরা যখন আসামে মোটামুটি সফলতার দিকে যেতে থাকে তখন প্রফেসর টেড চ্যাঙ ধীরে-ধীরে অনুমান করতে থাকে আসলে ভুল লোকের সাথে সে কাজ করছে। সে ভেবেছিল বাংলাদেশে এসে এটা নিয়ে সে কিছু একটা করবে। অন্যদিকে তারা যখন আসামে ব্ল্যাক বুদ্ধা উদ্ধার করছে তখন বাংলাদেশে জেড মাস্টারের ডান হাত শেখারভ আর প্রজেক্ট স্পনসর হেকমত আবদুল্লাহ দুজনে মিলে জেড মাস্টারের সাথে বেঈমানির সিদ্ধান্ত নেয়।"

"তাদের ব্যাপারটা বুঝলাম কিন্তু টেড চ্যাঙ তো একজন সম্মানিত প্রফেসর, চাইলেই তো সে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সাহায্য নিতে পারতো," তানভীর বলে উঠলো। "পরবর্তীতে শেখারভের সাথে সে কেন যোগ দিতে গেল?"

"এটাই তো কথা। আসলে সে কেন এমন করেছিল এখন তো আর পুরোপুরি জানা সম্ভব নয় তবে আমি অনুমান করতে পারি, সে প্রজেক্টের এতো ভেতরে জড়িয়ে গেছিল যে ভয় পাচ্ছিলো পুলিশ বা সরকারের লোকজন তার কথা বিশ্বাস করবে না।"

"কিংবা এমনও হতে পারে সে হয়তো ভয় পাচ্ছিলো বাংলাদেশ বা ভারত সরকারকে সব জানালে আরো বেশি বিপদ হবে তার... কে জানে!" তানভীর আনমনেই বলে উঠলো। "তার মৃতদেহ কি পাওয়া গেছে?"

"হ্যাঁ, সুরমা নদীর তীর ধরে বেশ কিছুদূরে এক মোহনার কাছে ভেসে ওঠা দেহটা উদ্ধার করা হয়েছে গতকাল," বলে আনোয়ার পাশা কাঁধ ঝাঁকালো। "তুমি যা বললে সেটাও হতে পারে। হয়তো সে ভয় পেয়ে গেছিল। তো যাই হোক বেঈমানির সিদ্ধান্ত নেয়ার পর শেখারভ আর ওদের প্রজেক্টের ফাইনেন্সিয়ার হেকমত মিলে মিতায়নরা মুর্তি নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের সাথে সাথে ওদের ওপরে হামলা চালায়। জেড মাস্টারকে বন্দি করে রাখে লাক্কাতুরার বাংলোতে।"

"এই ব্যাপারটাও পরিষ্কার নয় আমার কাছে," তানভীর একটু উঠে বসলো। "ওরা জেড মাস্টারকে ওই বাংলোতেই রাখলো কেন?"

"কারণ ওরা জানতো যে ওই বাংলোর কথা কেউ জানে না। কিন্তু ডক্টর মিতায়ন যে ওটার কথা তার স্ত্রীকে বলেছে, এটাও ওরা জানতো না। কিন্তু অনুমান করেছিল। যে-কারণে তাকে ধরে আনার জন্যে লোক পাঠায়। আর তখুনি তোমরা সেখানে গিয়ে হাজির হও," বলে পাশা স্যার একটু থেমে আবারো বলতে লাগলো।

“তো যাই হোক, জেড মাস্টারকে বাংলোতে বন্দি করে ওরা অবস্থান নেয় হেকমতের ওখানে। ওখানে সম্ভবত হেকমত ওদেরকে ব্ল্যাক মেল বা কিছু একটা করার চেষ্টা করে। শেখারভ তখন হেকমতসহ তার লোকদেরকে মেরে স্থানীয় গডফাদার কানা মাতবরের আশ্রয়ে সিলেট থেকে পালানোর পরিকল্পনা করে। তার সাথে ইতিমধ্যেই যোগ দিয়েছে প্রফেসর টেড চ্যাঙ। এরমধ্যে সরকারি দুর্নীতিবাজ মহল দেখে ওদের এতোদিনের সাধের পরিকল্পনা মাঠে মারা যাচ্ছে,” বলে পাশা স্যার হেসে উঠে বলে চললো।

“তখনই কাহিনীতে যুক্ত হয় বাবুল আহমেদ। বাবুল এটা বুঝতে পারে যে নিজের এজেন্টদেরকে সে সরাসরি বলি দিতে পারবে না। তাই সে আমার কাছে সাহায্য চায়। সে জানতো আমি আমার এজেন্টদের দক্ষতা মাঠ পর্যায়ে যাচাইয়ের জন্যে অস্থির হয়ে আছি। এইবার কাহিনীতে এন্ট্রি ঘটে তোমার। কিন্তু হেকমত, শেখারভ কিংবা বাবুল কেউই ভাবতে পারেনি তুমি মাঠে নেমেই এতো দ্রুত ডক্টর মিতায়নকে উদ্ধার করে ফেলবে। মিতায়নকে উদ্ধার করার পর শুরু হয় নতুন খেলা। এবার মিতায়ন তোমাদেরকে ব্যবহার করতে শুরু করে নিজের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে। সেটা হবার পর সে যখন পালালো, বাবুলের তখন মাথা খারাপ। কিন্তু এবারো ফিল্ডে অনভিজ্ঞ তানভীর আর আইটি এক্সপার্ট টমির কাজের সামনে মাথা নোয়াতে হয় সবাইকে। এবারও কেউই ভাবেত পারেনি এতো দ্রুত জেড মাস্টারকে বের করে ফেলতে পারবে তুমি। এরপরে তো সব তুমি জানো।”

“স্যার, এই তাহলে সেই মুর্তির রহস্য। ওটা আসলে ফাঁপা, ওটার ভেতরে মানুষ ঢুকে কথা বলতে পারে,” বলে হেসে উঠলো তানভীর। “মুর্তিটা কোথায় স্যার? আর জেড মাস্টার?”

“দুটোই এখন আমাদের জিম্মায় আছে,” বলে আনোয়ার পাশা একটু ভেবে বলে উঠলো। “তানভীর এই ঘটনার ভেতরে আরো অনেক ব্যাপার আছে, যেগুলো এখনো পরিষ্কার না। প্রথমত, সরকারি মহলের ভেতর থেকে কেউ বাবুল আহমেদকে ব্যাকআপ করছিল। দ্বিতীয়ত, একটা ব্যাপার কেউই খেয়াল করেনি, এমনকি তুমিও খেয়াল করোনি। জেড মাস্টার হাসপাতালে থাকার সময় সে অসহায় দূর্বল ছিল হঠাৎ সে লোকবল, অস্ত্র এসব পেলো কোথায়। ডক্টর প্রবীর তাকে শুধু তথ্য দিয়ে সহায়তা করছিল কিন্তু বাকিগুলো সে কোথায় পেয়েছে?”

তানভীর চুপ, এই ব্যাপারগুলো আসলেই সে ভেবে দেখেনি।

“তানভীর তুমি রেলিক নামে কোন সংস্থার নাম শুনেছো?” পাশা স্যারের প্রশ্নের জবাবে তানভীর চুপ করে রইলো। “কিংবা নেক্রপলিস?” এবারও তানভীর চুপ। পাশা স্যার বলে চলেছে, “এই দুটোই আন্তর্জাতিক অ্যান্টিক চোরাচালান সংস্থা। প্রথমটা এশিয়াতে অ্যাকটিভ আর দ্বিতীয়টা সারা বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অ্যান্টিক চোরাচালানি সংস্থাগুলোর একটা। এতোদিন পর্যন্ত আমরা বাংলাদেশে কখনো রেলিক কিংবা নেক্রপলিসের কোন অ্যাক্টিভিটি টের পাইনি। কিন্তু জেড মাস্টার যেহেতু বাংলাদেশে কাজ করছিল কাজেই

অব্যশই এই দুটো সংস্থা এখন বাংলাদেশে অ্যাকটিভ। জেড মাস্টার সম্ভবত এই দুটো সংস্থার কারো কাছ থেকেই সাহায্য পাচ্ছিলো। সেইসাথে আমাদের সরকারি সংস্থার ভেতরে একটা দুনীতীগ্রস্থ সুডো অর্গানাইজেশনের অস্তিত্বও টের পাচ্ছি আমরা- আনঅফিসিয়ালি আমরা ওটার নাম দিয়েছি ‘পরজীবী’। এরা কারা- কিভাবে অপারেট করে এখনো কিছুই জানি না আমরা। তবে এদেরকে খুঁজে বের করতে আমি বদ্ধ পরিকর,” এই পর্যন্ত বলে একটু ভেবে খানিকটা উদাস কিন্তু গম্ভীর গলায় বলে উঠলো, “সব মিলিয়ে আমাদের সামনে অনেক বড় একটা ঝড় আসছে,” পাশা স্যার জানাল দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। “আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে তানভীর, ঝড় সমলানোর মতো প্রস্তুতি।”

তানভীর চুপ, কিছু বলছে না।

পাশা স্যার বলেই চলেছে, “কখনো ভেবে দেখেছো তানভীর, এক সময় তুমি সাংবাদিক হতে চাইতে, এরপরে লেখক হতে চেয়েছো, কিন্তু তোমার নিয়তি তোমার জন্যে অন্যকিছু ঠিক করে রেখেছিল। আর তাই তুমি আজকে এখানে,” বলে সে একটা খাম দেখালো তানভীরকে। “আমার হাতে এটা কি দেখতে পাচ্ছো?” খামটা সামান্য নেড়ে বলে উঠলো সে, “তোমার নিয়তি,” বলে আরো যোগ করলো, “তুমি হয়তো জানো না শারিয়ার দেশে ফিরেছে।”

শারিয়ারের কথা শুনে চোখ-মুখ উজ্জল হয়ে উঠলো তানভীরের। “কবে স্যার?”

“গত পরশু দিন। আমি আগামী দুয়েকদিনের ভেতরে ওকে আমি চট্টগ্রাম পাঠাচ্ছি একটা জরুরি কাজে। আমাদের সোর্স অনুমান করছে মগ জলদস্যুদের সাথে সংশ্লিষ্ট ইতিহাস নিয়ে বেশ রহস্যময় কিছু ঘটনা ঘটছে ওখানে। ওই ব্যাপারটা দেখার জন্যে আমি চট্টগ্রাম পাঠাচ্ছি ওকে। ও যদি সফলভাবে চট্টগ্রামের মগ জলদস্যুদের কেসটা সমাধান করে ফিরে আসতে পারে তবে আমি চাই তুমি ওকে নিয়ে একটা দল গঠন করো। আমার ধারণা যদি ভুল না হয় ইতিমধ্যেই সুলতান, জালাল, ইকবাল এদের সাথে তোমার একটা সখ্যতা গড়ে উঠেছে। তুমি এদেরসহ শারিয়ারকে নিয়ে একটা দল গঠন করবে। ক্রিমিনাল অ্যানালিসিস উইঙের পাশাপাশি একেবারে স্বতন্ত্র আর স্বাধীন একটা অপারেটিভ দল। আমি তোমার দলটার জন্যে একটা নামও ঠিক করে ফেলেছি। দুয়েকদিনের ভেতরেই প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে এটার প্রাথমিক প্রস্তাব পেশ করা হবে,” বলে সে একটু থেমে যোগ করলো,

“তানভীর তুমি সারাটা জীবন কাটিয়েছো খুঁজে বের করতে যে তুমি আসলে কী চাও। আমি তোমাকে একটা সুযোগ ক’রে দিচ্ছি। বাকিটা তোমার সিদ্ধান্ত,” বলে আনোয়ার পাশা একবার ছোট ক’রে মাথা ঝাঁকিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

তানভীর ওর মাথার কাছে রাখা খামটা নিয়ে খুলে দেখলো বেশ কয়েকটা প্রিন্টেড কাগজ ভাজ করে রাখা ওটার ভেতরে। ওটার সর্বাগ্রে লেখা ‘প্রপোজাল ফর টিম আলফা’,

শিরোনামের ঠিক নিচের ধাপেই লেখা প্রপোজড কমান্ডার; তানভীর মালিক। কাগজগুলো খামে ঢুকিয়ে রেখে দিলো ও বালিশের পাশে।

বালিশটার ঠিক পাশেই রাখা চিরকুটটা, যেটা ও লায়লাকে পাঠিয়েছিল।

লায়লা ওটা পড়েছে কিনা কে জানে। ওটাতে তানভীর খুবই সহজ-সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করে বলেছে ও লায়লার সাথে কথা বলতে আগ্রহী নয়, কিংবা কোন ধরণের যোগাযোগও রক্ষা করতে চায়না। তবে তার ওপরে তানভীরের কোন রাগ নেই। তানভীরে সাথে লায়লা যা করেছিল সেটার শাস্তি সে পেয়েছে মিতায়নের কাছ থেকে। সবশেষে ওকে ভালো থাকার উইশ করে বিদায় জানিয়েছে তানভীর। নার্সকে ডেকে আবারো চিরকুটটা লায়লার কাছে পাঠাতে হবে।

তবে মনের কোনে ও এটাও জানে ওকে আরেকটা চিরকুট পাঠাতে হবে লায়লার ছোট বোন শায়লার কাছে। কারণ শায়লাকে একটা ব্যাপারে ধন্যবাদ জানাতে হবে ওর। সুস্থ হতে হবে ওকে, মায়ের সাথে কথা বলতে হবে, সুলতান-জালাল-ইকবালের সাথে মিটিং করতে হবে। প্রচুর কাজ পড়ে আছে। শারিয়ার চট্টগ্রাম থেকে মগ জলদস্যুদের কেসটা সামলে ঢাকা এলে ওর সাথে বসতে হবে, তবে এই মুহর্তে এগুলোর কোনটাই ভাবতে ইচ্ছে করছে না ওর।

বিছানার পাশে রাখা মোবাইলটা তুলে নিয়ে ওটাতে হেডফোন লাগালো। অডিও ফোল্ডারে ঢুকে একটা বিশেষ গান খুঁজে পেতেই মুখে ফুটে উঠলো মৃদু হাসি। কানে হেডফোন লাগিয়ে গানটা ছেড়ে দিয়ে প্রশান্তির সাথে চোখ বন্ধ করে নিজের ভাবনার জগতে হারিয়ে গেল ও।

মোবাইলের সাথে সংযুক্ত হেডফোনের ক্ষুদে স্পিকারের ভেতর দিয়ে ভেসে আসা সুরলহরিতে জন ডেনভার তার মায়াবি গলায় গেয়ে চলেছে,

‘কান্ট্রি রোডস টেক মি হোম...’ শুনতে-শুনতে ঠোঁটের কোনে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো তানভীরের। ওকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে, মায়ের কাছে।

----- সমাপ্ত -----

লেখক পরিচিতি



রবিন জামান খানের জন্ম ময়মনসিংহ শহরে, পৈত্রিক নিবাস নেত্রকোনার কেন্দুয়া থানায়। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে পড়ালেখা শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষাতত্বে দ্বিতীয় মাস্টার্স সম্পন্ন করেন তিনি। পড়া-পড়ানো, শেখা-শেখানোর চর্চা থেকেই শিক্ষকতাকে পেশা ও লেখালেখিকে নেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সংকলনে বেশকিছু মৌলিক ও অনুবাদ গল্প লেখার পাশাপাশি লিখেছেন একাধিক টিভি নাটক। তার মৌলিক থ্রিলার উপন্যাস ২৫শে মার্চ, সপ্তরিপু, ব্ল্যাক বুদ্ধা, ফোরটি এইট আওয়ার্স, দিন শেষে, আরোহী ও অন্ধ প্রহর ইতিমধ্যেই অর্জন করেছে বিপুল পাঠক প্রিয়তা। বাংলাদেশের পাশাপাশি কলকাতা থেকে প্রকাশিত তার মৌলিক গ্রন্থ ২৫শে মার্চ ও সপ্তরিপু পশ্চিম বঙ্গের পাঠক মহলে ভালোবাসা কুড়িয়েছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের রহস্যময় ঘটনাবলী, সেইসাথে মানব মনের জটিল মনস্তত্ত নিয়ে আগ্রহ থেকে উনি বর্তমানে কাজ করে চলেছেন একাধিক ইতিহাস নির্ভর ও সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার উপন্যাস নিয়ে। এরই প্রেক্ষিতে খুব শিঘ্রই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তার মৌলিক থ্রিলার উপন্যাস শব্দজাল, মগরাজ, বিখন্ডিত, রাজদ্রোহী, একটি গল্প বলতে চাই। বর্তমানে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগের সহকারি অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন তিনি।